নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র

ইসলাম ও আমাদের জীবন-৭

মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন

আধ্যাত্মিক রোগের ভয়াবহতা ও তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম

নির্বাচিত রচনা ও বয়ানসমগ্র
ইসলাম ও আমাদের জীবন-৭

মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন

মূল: শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ: মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
চতুর্থ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-8950-59-3

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, ✆16297 or 01519521971
facebook.com/EhsanBookshop, ✆ 01832093039
khidmashop.com ✆ 01939773354

মূল্য : চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র

MONDO CHORITRO O TAR SONGSHODHON
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam
Price: Tk. 440.00 US$ 20.00

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। সন্ধ্যায় হাঁটতে গেলেন ঢাকার একটি পার্কে। এসময় আমাদের এক সাথী আমাকে দেখিয়ে হযরতকে বললেন, 'হযরত! আমাদের হাবীব ভাই তার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে আপনার সফরনামাসহ অনেক কিতাবের খুবই উন্নত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। মাশাআল্লাহ সারাদেশের উলামায়ে কেরাম এ সকল কিতাবকে খুবই পছন্দ করছেন। হযরত একথা শুনে খুব দু'আ দিলেন। সেসময় থেকেই হযরতের সাথে সম্পর্ক আরো মজবুত হলো। এ সফরেই অথবা অন্য কোন সফরে আমি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ পর্যন্ত হযরতের যত কিতাবের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলো ছিলো আমাদের নির্বাচন, হযরতের দৃষ্টিতে কোন্ কিতাবের অনুবাদ হলে এদেশের সাধারণ মুসলমানের জন্য বেশি উপকারী হবে? হযরত সামান্য সময় চিন্তা করে উত্তর দিলেন, আমার মতে 'আসান নেকীয়াঁ' ও 'ইসলাহী খুতবাত'-এর অনুবাদ সাধারণ লোকদের জন্য বেশী উপকারী হবে।

হযরতের এ পরামর্শের পর থেকেই আমরা হযরতের খুতবাত অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু মূল খুতবাত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমার মনে হলো, এসকল বয়ানকে যদি বিষয়ভিত্তিক সাজানো যেতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এ কিতাব থেকে উপকৃত হওয়াটা তুলনামূলক সহজ হতো। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কয়েকজন অনুবাদক বন্ধুকে খুতবাতসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করতে বলি। কেউ কেউ কিছু কিছু কাজ করলেও তাকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো হয়ে ওঠেনি। ইতোমধ্যে আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানীতে পাকিস্তানের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইদারায়ে ইসলামিয়্যাত'-এর তত্ত্বাবধানে জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমের সকল উর্দূ রচনা হতে সাধারণ মুসলমানের জন্য উপকারী বিষয়সমূহ এবং ইসলাহী বয়ানসমূহ বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করেন এবং আপাতত চৌদ্দ খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। এ কিতাবের প্রথম খণ্ড : 'ইসলামী আকীদা বিষয়ক', দ্বিতীয় খণ্ড : 'ইবাদাত-বন্দেগী-এর স্বরূপ', তৃতীয় খণ্ড : 'ইসলামী মু'আমালাত', চতুর্থ খণ্ড : 'ইসলামী মু'আশরাত', পঞ্চম খণ্ড : 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন', ষষ্ঠ খণ্ড : 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি', সপ্তম খণ্ড : 'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন', অষ্টম খণ্ড : 'উত্তম চরিত্র ও তার ফযীলত',

নবম খণ্ড : 'ইসলামী জীবনের সোনালী আদাব', দশম খণ্ড : 'দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাত ও আদাব', একাদশ খণ্ড : 'ইসলামী মাসসমূহের ফাযায়েল ও মাসায়েল', দ্বাদশ খণ্ড : 'সীরাতুন্নবী ও আমাদের জীবন', ত্রয়োদশ খণ্ড : 'উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য' এবং চতুর্দশ খণ্ড : 'ইসলাম ও বর্তমানকাল' সম্পর্কে।

গ্রন্থনাকালে হযরত মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেব এমন কিছু বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যাতে কিতাবের মান আরো উন্নত হয়েছে।

ক. তিনি সকল কুরআনী আয়াতের সূরার নাম উল্লেখপূর্বক আয়াত নম্বর লাগিয়েছেন।

খ. সকল আয়াত ও হাদীসে হরকত লাগিয়েছেন।

গ. হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে কিতাবের নাম, পৃষ্ঠা ও হাদীস নম্বর দিয়েছেন।

ঘ. এ সংকলনে এমন অনেক খুতবা আছে যা পূর্বে ছাপা হয়নি।

আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা সবগুলো খণ্ডই অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম খণ্ড : 'ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস', দ্বিতীয় খণ্ড : 'ইবাদাত-বন্দেগী ঃ হাকীকত ফযীলত ও আদব' তৃতীয় খণ্ড : 'ইসলামী মু'আমালাত' চতুর্থ খণ্ড : 'ইসলামী মু'আশারাত' পঞ্চম খণ্ড : 'ইসলাম ও পারিবারিক জীবন' এবং ষষ্ঠ খন্ড : 'তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি' নামে পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে সম্মানিত পাঠকের ভূয়সী প্রসংশা কুড়িয়েছে। আমাদের বর্তমান আয়োজন এ ধারারই সপ্তম খণ্ড : **'মন্দ চরিত্র ও তার সংশোধন'** প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহপাক অবশিষ্ট খণ্ডসমূহও দ্রুত প্রকাশ করার তাওফীক দান করুন।

আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী এ গ্রন্থকে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন ভুল-ত্রুটি (বিশেষত হরকতের ভুল) থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তি সংস্করণে সংশোধন করে নিবো।

আমাদের ধারণা উলামা-তলাবা, খতীব-ইমাম, ওয়ায়েয ও সাধারণ মুসলমানসহ সকলের জন্য এ গ্রন্থ অতীব উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই অনেকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং মূল গ্রন্থকার, সংকলক, অনুবাদক ও প্রকাশক, পাঠকসহ সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ
রবিউছ ছানি ১৪৩৬ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ইসলাম ও আমাদের জীবন

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যতসব জটিলতা ও দুর্ভাবনার সম্মুখীন হই, কেবল কুরআন-হাদীছেই আছে তার নিখুঁত সমাধান। সে সমাধান অবহেলা ও সীমালংঘন উভয়রূপ প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত। ইসলামের সেই অমূল্য শিক্ষা মোতাবেক আমরা কিভাবে পরিমিত ও ভারসাম্যমান পথে চলতে পারি? কিভাবে যাপন করতে পারি এমন এক জীবন, যা দ্বীন দুনিয়ার পক্ষে হবে স্বস্তিদায়ক ও হৃদয়-মনের জন্য প্রীতিকর? এসব মুসলিমমাত্রেরই প্রাণের জিজ্ঞাসা। 'ইসলাম ও আমাদের জীবন' সরবরাহ করে সেই জিজ্ঞাসারই সন্তোষজনক জবাব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّابَعْدُ!

বছরের পর বছর ধরে কলম ও যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কসরত করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের যে কালজয়ী দিকনির্দেশনা রয়েছে, তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের কাছেও সে দিকনির্দেশকে পৌঁছিয়ে দেয়া। বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ জাতীয় লেখাজোখা ও বক্তৃতা-বিবৃতি যেমন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্র পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা বিশেষ সংকলনের অংশরূপেও প্রকাশিত হয়েছে। এবার স্নেহের ভাতিজা জনাব সঊদ উসমানী সেগুলোর একটি 'বিষয়ভিত্তিক সমগ্র' প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করলেন এবং জনাব মাওলানা ওয়ায়েস সরওয়ার ছাহেবকে সেটি তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি অত্যন্ত মেহনতের সাথে বিক্ষিপ্ত সেসব রচনা ও বক্তৃতাসমূহ, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে-খুঁজে সংগ্রহ করেন এবং বিষয়ভিত্তিক আকারে সেগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত একই জায়গায় জমা হয়ে যায়। তাছাড়া বক্তৃতাসমূহে যেসব কথা বিনা বরাতে এসে গিয়েছিল, তিনি অনুসন্ধান করে তার বরাতও উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং এ সংগ্রহটিকে তাঁর অধম বান্দার ও প্রকাশকের জন্য আখেরাতের সঞ্চয়রূপে কবূল করুন আর পাঠকদের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

বান্দা
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪১৩ হিজরী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মিথ্যা ও তার নানা রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وفى رواية وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّهٗ مُسْلِمٌ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : (ক) কথা বললে মিথ্যা বলে : (খ) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (গ) তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করে। এক বর্ণনায় আরও আছে, যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে' (অর্থাৎ এ তিনটি কোন মুসলিম ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। কোনও ব্যক্তির মধ্যে এ তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে বুঝতে হবে সে মুনাফিক। সে মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা মুসলিম হওয়ার মৌলিক গুণাবলী সে হারিয়ে ফেলেছে।)[১]

---

১. বুখারী, হাদীছ নং ৩২; মুসলিম, হাদীছ নং ৮৯; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৫৫; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৩৩১

ইসলাম এক পরিপূর্ণ দীন

আমরা কেবল নামায-রোযাকেই দীন মনে করি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কোথা থেকে এই ধারণা আমাদের অন্তরে ঢুকে পড়েছে। কেউ নামায পড়ল, রোযা রাখল এবং এসবের প্রতি যত্নবান থাকল, ব্যস এতেই সে পাক্কা মুসলিম হয়ে গেল। তার যেন করণীয় আর কিছুই নেই। এখন বাজারে গেলে মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা কোন কিছুতেই কোন বাধা নেই। হালাল-হারামে কোন ভেদাভেদ নেই। কিভাবে টাকা হাতে আসছে, সম্পদের মালিক হচ্ছে তার কোন চিন্তা নেই। জবান লাগামহীন। আমানত লোপাট। ওয়াদারক্ষারও কোন দায় নেই। নামায-রোযা যখন ঠিক-ঠিক চলছে, তখন আর কিসের দরকার? ইসলাম সম্পর্কে এরূপ চিন্তাধারা নিতান্তই ভুল এবং খুবই বিপজ্জনক। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাচ্ছেন, এরূপ লোক যতই নামায পড়ুক ও রোযা রাখুক, সে মুসলিম নামের উপযুক্ত নয়। তাকে কাফের বলা হবে না সেটা ভিন্ন কথা, যেহেতু কাউকে কাফের ফতোয়া দেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়, তা কাফের নাই বলা হোক এবং ইসলামের পরিমণ্ডল থেকে তাকে খারিজ নাই করা হোক, কিন্তু কাজ সে করছে কাফের ও মুনাফিকদেরই মত।

তো হাদীছে মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে। এবার আমরা এ বিষয় তিনটির অল্প-বিস্তর ব্যাখ্যা পেশ করতে চাচ্ছি। কেননা বর্তমানে এ তিনটি সম্পর্কে মানুষের ভাবনা খুবই সীমিত ও সংকীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে এর মর্ম ও পরিমণ্ডল অনেক বিস্তৃত। তাই বিষয়টা খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে।

মিথ্যা সম্পর্কে জাহিলী যুগের ধারণা

মিথ্যা বলা হারাম। এমনই কঠিন হারাম যে, অতীতের কোনও ধর্মে এর বৈধতা ছিল না। কোনও জাতির কাছে এটা পসন্দনীয় ছিল না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই এটা হারাম ছিল। জাহিলী যুগের মানুষ পর্যন্ত মিথ্যা কথাকে ঘৃণা করত। একটি দৃষ্টান্ত শুনুন–

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি পাঠালেন। চিঠিখানি তার সামনে পড়া হল। তিনি ভাবলেন অনুসন্ধান দরকার। সুতরাং সভাসদদের হুকুম দিলেন, আমার দেশে তাঁর সম্পর্কে অবগত আছে এমন কেউ থাকলে তাকে আমার

সামনে উপস্থিত কর, যাতে তার কাছ থেকে আমি পত্রপ্রেরক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। ঘটনাক্রমে হযরত আবূ সুফ্য়ান (রাযি.) যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, এক বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের লোকজন তাকে দরবারে উপস্থিত করল। সম্রাট তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল, বল ইনি কোন বংশের লোক? তাঁর বংশ কেমন? তাদের সুনাম-সুখ্যাতি কেমন? আবূ সুফয়ান (রাযি.) উত্তর দিলেন, তিনি খুবই অভিজাত বংশের লোক। সারা আরব তার বংশ মর্যাদা স্বীকার করে।

সম্রাট বললেন, সত্য বটে, আল্লাহর নবীগণ উঁচু বংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। সম্রাট দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, তাঁর যারা অনুসরণ করে, তারা কি মামুলি কিসিমের লোক, না উচ্চ শ্রেণীর? তিনি জানালেন, তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর লোক। সম্রাট বললেন, শুরু দিকে নবীর অনুসারীগণ দুর্বল ও সাধারণ পর্যায়ের লোকই হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন করলেন, তাঁর সাথে তোমাদের যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, তাতে জয়লাভ কি তোমরা কর, না তিনি? আবূ সুফ্য়ান (রাযি.) বললেন, কখনও আমরা জয়ী হই এবং কখনও তিনি। উল্লেখ্য, এ সময় পর্যন্ত যুদ্ধই হয়েছিল মাত্র দু'টি। একটি বদরে এবং একটি উহুদে। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণ কিছুটা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবূ সুফ্য়ান (রাযি.) জানান, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সাথে সেই সাক্ষাতকারের সময় তো আমি কাফের ছিলাম। তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম কোনও ফাঁকে এমন কিছু কথা বলে দেব, যার ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তার মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু সম্রাট যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে এ জাতীয় কিছু বলার সুযোগ আমার লাভ হয়নি। কেননা তিনি যেসব প্রশ্ন করছিলেন, আমাকে তো তার উত্তর দিতেই হত। আবার মিথ্যা বলাও সম্ভব ছিল না। কেননা তাহলে সাধারণ্যে আমি একজন মিথ্যুকরূপে চিহ্নিত হতাম। ফলে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরই দিতে হচ্ছিল, আর তা সবই মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষে যাচ্ছিল।

চিন্তা করে দেখুন, জাহিলী যুগের লোক, যে কিনা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, সেও মিথ্যা বলতে প্রস্তুত নয়। তাহলে ইসলামের অধীন একজন লোক কিভাবে মিথ্যা বলতে পারে?

মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট

আফসোসের কথা হল, এখন মিথ্যা বলাটা একটা মহামারিতে পরিণত হয়ে গেছে। এমনকি যেসব লোক হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয বিচার করেও শরীআতের উপর চলার চেষ্টা করে তাদেরকে পর্যন্ত দেখা যায় বিভিন্ন রকম মিথ্যাচারে অবলীলায় জড়িত হয়ে পরে। তারা সেগুলোকে মিথ্যার সীমারেখা থেকে খারিজ করে দিয়েছে। মনে করে তা আদৌ মিথ্যা নয়। অথচ যে কাজ করছে তা মিথ্যা এবং যা বলছে তা অসত্য। এতে তো দু'রকম অপরাধ। প্রথমত মিথ্যা বলার অপরাধ আর দ্বিতীয়ত পাপকে পাপ মনে না করার অপরাধ।

এক ব্যক্তির ঘটনা জানি। বেশ নেককার। নামায-রোযায় যত্নবান, যিকির-আযকারেও নিয়মিত। বুযুর্গানে দীনের সাথেও সম্পর্ক রাখেন। প্রবাসে অবস্থান করছিলেন। একবার দেশে ফিরলে তিনি আমার সাথে মুলাকাত করতে আসলেন। জিজ্ঞেস করলাম আপনি ফিরে যাচ্ছেন কবে? বললেন, আরও আট-দশ দিন থাকার ইচ্ছা। ছুটি তো শেষ হয়ে গেছে। তবে ছুটি বৃদ্ধির জন্য গতকালই একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছি।

দীন কি কেবল নামায-রোযার নাম?

তিনি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠানোর কথাটা এমন সহজভাবে বললেন, যেন এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মেডিকেল সার্টিফিকেট বিষয়টা কী? তিনি উত্তর দিলেন, বাড়তি ছুটির জন্য এটা পাঠাতে হয়েছে। এমনি আবেদন করলে ছুটি পাওয়া যেত না। এখন ছুটি পাওয়া যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম সার্টিফিকেটে আপনি কী লিখেছেন? তিনি বললেন, তাতে লেখা হয়েছে, এই ব্যক্তি অসুস্থ, সফর করার উপযুক্ত নয়। আমি বললাম, দীন শুধু নামায-রোযারই নাম? কেবলই যিক্র-আযকারের নাম? বুযুর্গানে দীনের সাথে আপনার সম্পর্ক, তা সত্ত্বেও এরূপ মেডিকেল সার্টিফিকেট ব্যবহার করছেন? লোকটি যেহেতু নেককার, তাই পরিস্কার স্বীকার করল, আমি আজ এই প্রথমবার শুনলাম যে, এটা একটা অন্যায় কাজ। আমি বললাম, এটা কি মিথ্যা নয়? মিথ্যা বলা কি এ ছাড়া অন্য কিছু? তিনি বললেন, তা হলে অতিরিক্ত ছুটি কিভাবে নেওয়া যাবে? বললাম, যে পরিমাণ ছুটি আপনার প্রাপ্য কেবল তাই নেবেন। তার বেশি দরকার হলে তা বিনা বেতনেই নেবেন,। তবুও এই মিথ্যা সার্টিফিকেটের আশ্রয় কিছুতেই নেবেন না।

আজকাল মানুষ মনে করে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট বানানো মিথ্যার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেবল নামায-রোযার মধ্যেই দীনকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অবলীলায় মিথ্যা বলছে। তা যে দ্বীন বিরোধী কাজ সেদিকে কোন খেয়ালই নেয়।

মিথ্যা সুপারিশ

একজন বেশ উচ্চ শিক্ষিত নেককার সমঝদার ব্যক্তি আমার কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। আমি তখন জিদ্দায়। তাতে লেখা ছিল, পত্রবাহক লোকটি ইন্ডিয়ান। সে পাকিস্তান যেতে চাচ্ছে। সে যেন একজন পাকিস্তানী নাগরিক তার পাসর্পোট এখানে সৌদী আরবে হারিয়ে গেছে, এ হিসেবে আপনি পাকিস্তানী দূতাবাসে সুপারিশ করে দিন। যেন তাকে একটি পাকিস্তানী পাসর্পোট দিয়ে দেয়। সে নিজেও দূতাবাসে দরখাস্ত জমা দিয়ে রেখেছে যে, তার পাসর্পোট হারিয়ে গেছে। সুতরাং আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন।

এবার আপনারা বলুন, একদিকে তো হজ্জ ও 'উমরা করা হচ্ছে, তাওয়াফ ও সা'ঈ হচ্ছে আবার অন্যদিকে এরূপ মিথ্যা ও প্রতারণা, এটা কেমন দীনদারী। তা এটা কি দীনের অংশ নয়? দীনের সাথে কি এর কোন সম্পর্ক নেই? যেন লোকে মনে করে নিয়েছে, যখন মিথ্যাকে যথারীতি মিথ্যা মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে তা বলা হবে কেবল তাই মিথ্যা, কিন্তু ডাক্তার দ্বারা মিথ্যা সার্টিফিকেট বানানো, মিথ্যা সুপারিশ করানো বা মিথ্যা মামলা সাজানো– এসব কোন মিথ্যা নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ⑱

মানুষ মুখে যে কথাই উচ্চারণ করে, এক সদাতৎপর প্রহরী উপস্থিত থেকে তা সঙ্গে-সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে ফেলে।[২]

শিশুদের সাথে মিথ্যা বলা

একবার এক মহিলা তার শিশুকে ডেকে কোলে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু শিশুটি কাছে আসছিল না। মা' তাকে আকৃষ্ট করার জন্য বলল, বাবা এসো, তোমাকে মজা দেব। মহানবী সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কথা শুনে ফেললেন। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই তাকে কিছু

---

২. কাফ্: ১৮

দিতে চাচ্ছিলে, না কি ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে আনার জন্যই একথা বললে। মহিলা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার হাতে খেজুর ছিল। ইচ্ছা ছিল কাছে আসলে তাকে তা দেব। নবী সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তো ঠিক আছে। কিন্তু তাকে যদি তা দেওয়ার ইচ্ছা না থাকত; বরং কেবল ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাছে আনার জন্যই এরূপ বলতে তবে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হত।[৩]

এ হাদীছের শিক্ষা-শিশুদের সাথেও মিথ্যা বলো না এবং ওয়াদা ভঙ্গ করো না। অন্যথায় এই কাঁচা বয়সেই তার অন্তর থেকে মিথ্যার মন্দত্ব দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভাবতে শুরু করবে মিথ্যা বলা মন্দ কিছু নয়।

রসিকতা করেও মিথ্যা বলা উচিত নয়

আমরা অনেক সময় আনন্দ-ফুর্তি করেও মিথ্যা বলে দেই, অথচ নবীজি রসিকতায়ও মিথ্যা বলতে বারণ করেছেন। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, সেই ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ, অথবা অর্থ করতে পারেন, সেই ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি, যে কেবল মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে।'[৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রসিকতা

রসিকতা ও আনন্দ-ফুর্তির কথা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলতেন। কিন্তু তাতে তিনি কখনও কোন অবান্তর বা ভ্রান্ত কথা বলেননি। তাঁর রসিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা হাদীছ গ্রন্থ সমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন, একবার এক বৃদ্ধা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কোনও বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। পরে তিনি ব্যাখ্যা করে দেন যে, নেককার বৃদ্ধাগণ যখন জান্নাতে যাবে তখন বৃদ্ধা থাকবে না। জান্নাতে তাদেরকে যুবতী বানিয়ে দেওয়া হবে।

তো এ ঘটনায় তিনি এমন সূক্ষ্ম রসিকতা করেছেন, যাতে কোনও অবাস্তব ও অসত্য কথা ছিল না।

---

৩. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৩৯; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫১৪৭।

৪. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৭; আহমাদ, হাদীদ নং ১৯১৭০; দারিমী, হাদীছ নং ২৫৮৬; মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩খ, ৫৯।

এক অপূর্ব রসিকতা

এক বেদুঈন এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি উটনী দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা দেব। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব? আমার তো উটনী দরকার সওয়ার হওয়ার জন্য। তিনি বললেন, তোমাকে যে উটই দেই না কেন তা কোনও না কোনও উটনীর বাচ্চাই তো বটে! এভাবে তিনি তার সাথে রসিকতা করলেন। কিন্তু তিনি কোন অসত্য ও অবাস্তব কথা বলেননি।

সুতরাং রসিকতার ক্ষেত্রেও লক্ষ রাখা চাই যাতে জবান থেকে কোন মিথ্যা কথা বের না হয়ে যায়। সর্বাবস্থায়ই মুখ সামলে কথা বলতে হবে। কিন্তু আমাদের সে দিকে লক্ষ নেই। আমাদের মাঝে সত্য-মিথ্যা সব নির্বিচারে বলা হচ্ছে। রসিকতায় আমরা মিথ্যা বলে ফেলি। ব্যস আনন্দ তো দেওয়া হচ্ছে। অথচ এসবই মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।[৫]

মিথ্যা চরিত্র সনদ

আজকাল মিথ্যা চরিত্র সনদের প্রচলন হয়ে গেছে। শিক্ষিত ও দীনদার লোক পর্যন্ত এতে জড়িত হয়ে যায়। কেউ তো নিজের জন্যই মিথ্যা ক্যারেকটর সার্টিফিকেট তৈরি করিয়ে নেয়, কেউ অন্যকে তা প্রদান করে। উদাহরণত কারও চরিত্র সনদের দরকার হলে সে কারও কাছে যায় এবং তাকে একটা সনদ লিখে দিতে অনুরোধ করে। সে তাতে লিখে দেয়, আমি এই ব্যক্তিকে পাঁচ বছর ধরে চিনি। খুব ভালো মানুষ। আখলাক চরিত্র ভালো এবং সে দেশের একজন সুনাগরিক। একবারও চিন্তা করে না যে, সে একটি অবৈধ কাজ করছে। বরং সে মনে করে ভালো কাজ করছে। কারণ প্রার্থীর এ সনদের প্রয়োজন ছিল। সে তার প্রয়োজন পূরণ করছে। এভাবে সে তার উপকার করছে। কাজেই এর দ্বারা সে একটা ভালো কাজ করছে। এতে তার পুণ্যার্জন হবে। অথচ আপনি যদি তার চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকেন, তবে তাকে এরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন বৈধতা আপনার নেই। তা দেওয়া আপনার জন্য সম্পূর্ণ না জায়েয। সওয়াবের কাজ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আপনাকে চেনে না তার কাছ থেকে চরিত্র সনদ গ্রহণ করাও আপনার জন্য জায়েয নয়। এরূপ সার্টিফিকেট দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গুনাহগার হবে।

---

৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯১৪; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৪৬; আহমাদ, হাদীছ নং ১৩৩১৫

স্বভাব-চরিত্র জানার দু'টি উপায়

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু)-এর সামনে তৃতীয় এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলল, সে বড় ভালো মানুষ। খলিফা বললেন, তুমি যে বললে, সে বড় ভালো মানুষ, তা তুমি কি কখনও তার সাথে লেনদেন করেছ? সে বলল, না, তার সাথে কখনও কোন লেনদেনের অবকাশ আসেনি। খলিফা বললেন, ঠিক আছে, সে অবকাশ যদি কখনও না এসে থাকে। তবে বল তো তার সাথে কখনও সফর করেছ? সে বলল, না আমি তার সাথে কখনও সফর করিনি। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি করে জানতে পারলে যে, সে ভালো মানুষ এবং তার স্বভাব-চরিত্র ভালো?

বস্তুত কারও সাথে লেনদেন করলেই জানা যায় সে কেমন লোক! এতে খাঁটি প্রমাণ হলে বোঝা যায় সে আসলেই ভালো মানুষ। তার নীতি নৈতিকতা নির্ভেজাল। এটা জানার দ্বিতীয় উপায় হল তার সাথে সফর করা। সফরে মানুষের স্বভাব-চরিত্র উন্মুক্ত হয়ে ধরা দেয়। তার চিন্তা-ভাবনা, নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণ সব কিছুই সামনে চলে আসে। সুতরাং তুমি যদি তার সাথে লেনদেন করতে বা একত্রে সফর করতে তবে তো তোমার একথা বলা সঠিক হত যে, সে একজন ভালো লোক।

কিন্তু এর কোনওটিই যখন তার সাথে করনি তখন তো তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জান না। যখন তার সম্পর্কে তোমার কিছুই জানা নেই, তখন তাকে ভালো-মন্দ কিছুই বলার দরকার নেই; বরং চুপ থাক। কেউ জিজ্ঞেস করলে যতটুকু জানা আছে কেবল ততটুকুই বলে দাও, যেমন বলতে পার, ভাই, আমি তাকে মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি। এর বেশি তার সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই।

শরী'আতের দৃষ্টিতে সার্টিফিকেট সাক্ষ্যতুল্য

কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

'যারা সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় জেনে শুনে।'[৬]

অর্থাৎ সাক্ষ্যদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা থাকা শর্ত। মনে রাখতে হবে সার্টিফিকেট ও সত্যায়নপত্রও এক ধরনের সাক্ষ্য। যে ব্যক্তি

---

৬. যুখরুফ : ৮৬

তাতে দস্তখত করছে সে যেন সার্টিফিকেট গ্রহীতা সম্পর্কে সাক্ষ দান করছে। আর এ আয়াতের আলোকে সাক্ষ্য দান করা কেবল তখনই জায়েয, যখন জানা থাকবে লোকটি বাস্তবিক পক্ষে তার বক্তব্যের অনুরূপ। তা জানা না থাকলে সাক্ষ্য দেওয়া কিছুতেই জায়েয হবে না। আজকাল এরূপ সাক্ষ্য না জেনেই দেওয়া হচ্ছে। একজন লোক আপনার কাছে চরিত্র সনদের জন্য আসল। আপনি তার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তা সত্ত্বেও তাকে একজন চরিত্রবান লোক আখ্যায়িত করে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। তার কাছে মুখ রক্ষা করলেন, কিন্তু দিলেন মিথ্যা সাক্ষ্য এবং নিজেকে গুনাহগার বানালেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দান এমনই গুরুতর অপরাধ যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে শিরকের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষ্য শির্কতুল্য অপরাধ

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, আমি কি তোমাদের জানাব বড়-বড় গুনাহ কি কি? তারা 'আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, বড়-বড় গুনাহ হল– আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, এ পর্যন্ত তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।[৭]

এর দ্বারা আপনি অনুমান করতে পারেন মিথ্যা সাক্ষ্য কি গুরুতর ব্যাপার। এক তো তিনি একে শিরকের কাতারে উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত এটা তিনবার উচ্চারণ করেছেন, তৃতীয়ত অন্যগুলো তো বলেছেন হেলান দেওয়া অবস্থায়, কিন্তু এটা বলার সময় সোজা হয়ে বসেছেন। খোদ কুরআন মাজীদও মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

প্রতিমাপূজার অপবিত্রতা পরিহার কর এবং পরিহার কর মিথ্যা কথা।[৮]

৭. বুখারী, হাদীছ নং ২৪৬৫; মুসলিম, হাদীছ নং ১২৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮২৩; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৪৬৫।

৮. হজ্জ : ৩০

বোঝা গেল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর পাপ ও কঠিন অপরাধ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া মিথ্যা বলা অপেক্ষাও ঘৃণ্য কাজ ও মারাত্মক অপরাধ। কেননা এতে একই সাথে কয়েকটি গুনাহ হয়ে যায়। (ক) মিথ্যা বলার গুনাহ, (খ) অন্য লোককে বিভ্রান্ত করার গুনাহ। কেননা আপনি যখন মিথ্যা সার্টিফিকেট দেয়ার মাধ্যমে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন এবং সেই সার্টিফিকেট যখন অন্যের কাছে পৌছল, তখন সে মনে করবে এই লোক বেশ ভালো এবং এর ভিত্তিতে তার সাথে কোন কাজ-কারবার করবে বা তাকে চাকরিতে নিয়োগ দেবে। এভাবে আপনার সার্টিফিকেটের দ্বারা সে বিভ্রান্ত হল। (গ) এর ফলে সেই নিয়োগদাতা যদি কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে ক্ষতির জন্য আপনিই দায়ী হবেন। এমনভিাবে যদি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন এবং তার ভিত্তিতে কোন ফয়সালা হয়ে যায়, তবে সেই ফয়সালা দ্বারা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার ক্ষতির দায়ও আপনার উপর বর্তাবে। সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য কোন মামুলী ব্যাপার নয়। এটা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ।

আদালতে মিথ্যার ছড়াছড়ি

আজকাল মিথ্যাচার এক মহামারিতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে আদালতের স্থান সর্বশীর্ষে। অর্থাৎ একজন লোক অন্যত্র মিথ্যা বলুক, না বলুক আদালতে কিন্তু মিথ্যা বলবেই। এমনও বলতে শোনা গেছে–

সাহেব সত্য যদি বলেন, আদালতে দাঁড়াতেই পারবেন না।

অর্থাৎ আদালত যেন মিথ্যা বলারই জায়গা। সেখানে গিয়ে মিথ্যা বলতেই হবে। বাইরে তুমি যতই সত্য বল না কেন, কিন্তু সাবধান আদালতে গিয়ে যেন তা করে বসো না। সেখানে অবশ্যই মিথ্যা বলবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে শিরকের সমতুল্য গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন এবং এটা কেবল একটি গুনাহ নয়; বরং বহু গুনাহের সমষ্টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সত্যায়নপত্র

সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে যত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, যেমন অসুস্থতার সার্টিফিকেট, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট, চারিত্রিক সার্টিফিকেট ইত্যাদি, এসবই মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

আমার কাছে অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সত্যয়নপত্র নেওয়ার জন্য আসে। তাতে লিখতে হয়, এ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, তাতে এই-এই বিষয়ে উন্নতমানের শিক্ষাদান করা হয়। এর উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে আশ্বস্ত করা যে, বাস্তবিকই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেটি সাহায্য-সহযোগিতাদানের উপযুক্ত। আমার খুবই ইচ্ছা হয় সত্যায়নপত্র লিখে দেই, কিন্তু আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-কে দেখেছি, তার কাছে কেউ সত্যায়নপত্রের জন্য আসলে এই বলে ওযর পেশ করতেন যে, ভাই এটা একটা সাক্ষ্য আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সরাসরি জানতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সম্পর্কে সত্যায়নপত্র লিখতে পারি না। কেননা তাতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যে সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর জানা থাকত, সে সম্পর্কে নিজ জানা অনুসারে সত্যায়নপত্র দিতেন।

বই-পুস্তক সম্পর্কে অভিমত প্রকাশও এক রকম সাক্ষ্যদান

অনেকেই বই-কিতাব লিখে আমার কাছে নিয়ে আসে এবং অনুরোধ করে, আমি এটি লিখেছি, আপনি এতে অভিমত লিখে দিন যে, এটি একটি বিশুদ্ধ ও ভালো রচনা। কারও রচনা আগাগোড়া না পড়ে সেটি ভালো না মন্দ এরূপ অভিমত কি করে দেওয়া যায়?

অনেকে না পড়েই অভিমত লিখে দেয়। চিন্তা করে এতে লেখকের ভালো হবে ও তার উপকার করা হবে। ভেবে দেখে না যে, অভিমত প্রকাশও এক ধরনের সাক্ষ্য। আর এ সাক্ষ্যদানে যদি অবাস্তব ও অসত্য কথা বলা হয় তবে যে মিথ্যা বলার গুনাহ হয় সেদিকে তারা নজর দেয় না। কার্যত তারা একে মিথ্যাকথনের আওতা থেকে খারিজ করে দিয়েছে। আর এ কারণেই লোকে বলে, ভাই, আমরা তো একটা তুচ্ছ কাজ নিয়েই তার কাছে গিয়েছিলাম। একটু কলম নাড়ালেই কাজটা হয়ে যেত। তা যদি একটা সার্টিফিকেট লিখে দিত তাতে তার এমন কি ক্ষতি হত? কেমন অভদ্রতা যে, একটা সার্টিফিকেট পর্যন্ত লিখে দিতে চায় না! তা যতই তারা বলুন না কেন। বিষয়টা বাস্তবে অত তুচ্ছ নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রতি শব্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। শব্দ জবান থেকেই বের হোক আর কলম দিয়েই লেখা হোক আল্লাহ তা'আলার কাছে তা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যে অমুক কথাটি বলেছিলে বা লিখে দিয়েছিলে, তা কিসের ভিত্তিতে দিয়েছিলে? তা জেনে বুঝে করেছিলে নাকি না জেনেই?

আমাদের সমাজে যে মিথ্যার এহেন ছড়াছড়ি, এতে দীনদার, শিক্ষিত, নামাযী, যারা বুযুর্গানে দীনের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যারা নিয়মিত ওজীফা ও তাসবীহ আদায় করে তারা পর্যন্ত জড়িত। তারাও এটাকে নাজায়েয ও মন্দ কাজ মনে করে না। এভাবে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিলে তাতে গুনাহ হবে- এ অনুভূতিও যেন তাদের নেই। অথচ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন, মুনাফিকের আলামত হল إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ 'যখন কথা বলে মিথ্যা বলে'। এসব জিনিসও তো তার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এসব পরিহার করে চলাও দীন। একে দীনের বাইরে মনে করা নিকৃষ্টতম বিভ্রান্তি। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া অতীব জরুরী।

যে সব ক্ষেত্রে মিথ্যার অবকাশ আছে

হ্যাঁ, এমন কিছু ক্ষেত্রও আছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলারও অনুমতি দিয়েছেন। যেমন কেউ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে বাধ্য হযে গেল। প্রাণরক্ষা করতে হলে তাকে মিথ্যা বলতেই হবে। তার এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অথবা মিথ্যা না বললে তাকে অসহনীয় জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হবে, তাকে এমন কষ্ট-ক্লেশ দেওয়া হবে যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই, এরূপ ক্ষেত্রে শরীআত তাকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও প্রথমে চেষ্টা করতে হবে যাতে সরাসরি মিথ্যা বলতে না হয়; বরং কোন গোলমেলে কথা বলে দেবে যাতে উপস্থিত বিপদ কোনমতে টলে যায়। শরী'আতের পরিভাষায় একে 'তারীয' ও 'তাওরিয়া' (পরোক্ষ-উক্তি ও দ্ব্যর্থবোধক কথা) বলে। অর্থাৎ এমন কোন শব্দ বলা, যার এক বাহ্যিক অর্থ থাকে এবং শ্রোতা সেই অর্থই বুঝে নেয়, কিন্তু বক্তার মনে থাকে অন্য অর্থ, যে অর্থের অবকাশও শব্দটি রাখে। তো সরাসরি মিথ্যা না বলে এ রকম কোন কৌশলী কথা বলে দেওয়া চাই।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সতর্কতা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহ...) যখন প্রিযনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনা মুনাওয়ারা হিজরত কছিলেন, তখন মক্কাবাসী তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য চারদিকে তাদের গুপ্তচর ও পেয়াদা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে-কেউ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। পথে এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়ে যায়। সে হযরত আবূ বকর (রাযি.)-কে

চিনত, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত না। লোকটি হযরত আবূ বকর (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথে ইনি কে? হযরত আবূ বকর (রাযি.) সতর্ক হয়ে গেলেন। পাছে এমন কিছু বলে ফেলেন যদ্দরুন দুশমনদের কাছে বার্তা পৌঁছে যায়। সত্য বললে তো তাই হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। আর তা এড়াতে চাইলে মিথ্যা বলতে হয়।

এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাই তার প্রিয় বান্দাদের পথ দেখান। সুতরাং তিনি বলে উঠলেন–

هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ

'ইনি আমার পথ প্রদর্শক।'[৯]

তিনি এমনই শব্দ ব্যবহার করলেন, যা শুনে সেই ব্যক্তি মনে করল, সাধারণ সফরের জন্য মানুষ যেমন সঙ্গে কোন গাইড নেয়, যে পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়, ইনিও তার সেই রকম কোন গাইড, কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে ছিল, তিনি আমার দীনী রাহবার, যিনি আমাকে জান্নাতের পথ দেখান এবং আল্লাহর পথ চিনিয়ে দেন। লক্ষ করুন তিনি কিভাবে সরাসরি মিথ্যা বলাকে এড়িয়ে গেছেন এবং এমন শব্দে লোকটিকে বুঝ দিয়ে ফেলেছেন, যা দ্বারা উপস্থিত কাজও চলে গেছে আবার মিথ্যাও বলতে হয়নি।

যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা ও অবাস্তব কথা না বলার ফিকির ও সংকল্প দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি এভাবে সাহায্যও করে থাকেন।

মিথ্যা পরিহারে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর সতর্কতা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের একদম শীর্ষসারির বুযুর্গ। তিনি ১৮৫৭ খৃ-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন। তিনি ছাড়াও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহ.), হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) প্রমূখ এ জিহাদে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধশেষে ইংরেজগণ ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেয়। মুজাহিদেরকে গ্রেপ্তার করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে থাকে। মহল্লায় মহল্লায়

৯. বুখারী, হাদীছ নং ৩৬২১; আহমাদ, হাদীছ নং ১১৬১৫

তথাকথিত মোবাইল কোর্ট বসিয়ে দেয়। যার সম্পর্কেই কিছুই সন্দেহ হত, তাকেই মেজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হত এবং মেজিস্ট্রেট হুকুম জারি করত 'একে ফাঁসিতে লটকে দাও।' ব্যস ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হত। এ সময় মীরাঠে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়।

যথারীতি তাকে মেজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল। মেজিস্ট্রেট তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে? সরকার জানতে পেরেছিল তার কাছে বন্দুক আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছে তা ছিলও। কিন্তু তিনি কৌশলে বিষয়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। প্রশ্নোত্তরকালে তার হাতে ছিল তাসবীহ। তিনি সেই তাসবীহ মেজিস্ট্রেটকে দেখিয়ে বললেন, এটাই আমার অস্ত্র, বললেন না যে, আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই। কেননা তা সরাসরি মিথ্যা হত। বেশভূসা দেখেও তাকে দরবেশ মতই মনে হচ্ছিল। ফলে উত্তরে যা বলেছিলেন তাও বিশ্বাসযোগ্যই ছিল। এই প্রশ্নোত্তরকালেও সেখান দিয়ে এক দেহাতী যাচ্ছিল। সে যখন দেখল হযরতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তখন বলে উঠল, আরে, একে কোত্থেকে ধরে আনলে। এ যে আমাদের মহল্লার মুআজ্জিন। সব মিলিয়ে মেজিস্ট্রেটের তাকে নির্দোষ মনে হল। তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

হযরত নানূতবী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়ে গেল। পুলিশ তাকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি নিশ্চিন্তে দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে অবস্থান করছেন। সেখানেও পুলিশ পৌঁছে গেল। তিনি মসজিদে সম্পূর্ণ একা ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী- এ নাম শুনলেই মনে হত এত বড় 'আলেম, না জানি জমকালো পোশাকের কী আলিশান পুরুষ। কিন্তু বাস্তবের সাথে সে কল্পনার কোন মিল ছিল না। তিনি সর্বদা অতি সাধারণ পোশাকে থাকতেন। সাধারণ লুঙ্গি ও মামুলী জামা। তাকে দেখে পুলিশ মনে করল মসজিদের কোন খাদেম হবে।

কাজেই তাঁকেই জিজ্ঞেস করল মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব কোথায়? সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আপন স্থান থেকে এক কদম পেছনে সরে বললেন, এই মাত্র তো এখানে ছিলেন। পুলিশ মনে করল তিনি এখন

মসিজদে নেই, হয়ত কোথাও সরে গেছেন। তাদেরকে এই ধারণা দেওয়ার জন্য তাঁকে কোন মিথ্যা বলতে হয়নি। বলেননি যে, তিনি এখানে নেই। কিন্তু পুলিশ তাই ধরে নিয়েছে এবং ওয়াপস চলে গেছে।

যখন প্রাণের ঝুঁকি দেখা দেয়, সেই সংকটময় মুহূর্তেও আল্লাহ ওয়ালাদের পরহেযগারী জাগ্রত থাকে। হুঁশিয়ার থাকেন যাতে জবান থেকে কোন অসত্য কথা বের না হয়, কোন মিথ্যা কথনে লিপ্ত না হয়ে পড়েন।

মোটকথা কঠিন মুহূর্তেও সরাসরি মিথ্যা না বলে গোলমেলে ও কৌশলী কথা বলে কাজ বানানোই শ্রেয়। হ্যাঁ যদি প্রাণের দায় দেখা দেয় বা অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনের ভয় দেখা দেয় এবং কৌশলী কথা দিয়েও নিস্তার পাওয়া সম্ভব না হয়, সে রকম নিরুপায় অবস্থায় শরীআত মিথ্যা বলারও অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেই অনুমতির সুযোগ নেওয়া এবং ব্যাপকভাবে মিথ্যাচারে লিপ্ত হওয়া, যেমনটা আজকাল দেখা যাচ্ছে, এর কোন বৈধতা নেই, এটা বিলকুল হারাম। এতে মিথ্যা সাক্ষ্যেরও গুনাহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন– আমীন।

শিশু মনে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি

নিজেও মিথ্যা পরিহারে অভ্যস্ত হতে হবে এবং শিশুদের মনেও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলুন যাতে মিথ্যার কদর্যতা তাদের অন্তরে বসে যায় এবং সত্যকথার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। এর জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি কাজ হল শিশুর সামনে কখনও অবাস্তব ও অসত্য কথা না বলা। কেননা শিশু যখন দেখবে তার বাবা মিথ্যা কথা বলছে, মা মিথ্যা বলছে, তখন তার অন্তরে মিথ্যার প্রতি কোনও ঘৃণা থাকবে না। সে মনে করবে মিথ্যা বলাটা তো প্রতিদিনের প্রয়োজন। এতে কোন দোষ নেই। এতে করে সেও দিন দিন মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তাই এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এমনভাবে কথাবার্তা বলতে হবে, যে সত্যপ্রেম ও মিথ্যা বিদ্বেষ তার অন্তরে উৎকীর্ণ হয়ে যায়। মিথ্যা তো নয়ই, ভুলচুক কথাও যেন তার সামনে উচ্চারিত না হয়। বাস্তবের সাথে মিল নেই এমন কথা কিছুতেই তার সামনে বলা যাবে না।

মনে রাখতে হবে, নবুওয়াতের পর সর্বোচ্চ মর্যাদা হল 'সিদ্দীক'-এর। সিদ্দীক অর্থ সত্যনিষ্ঠ। যার কথায় অসত্যের লেশমাত্র থাকে না।

কর্ম দ্বারাও মিথ্যাচার হয়ে থাকে

মুখ দিয়ে যেমন মিথ্যা বলা হয়, তেমনি তা হয় কাজ দ্বারাও। অনেক সময় মানুষ এমন কাজও করে, বাস্তবিক পক্ষে তা মিথ্যা হয়ে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ

যে ব্যক্তি তার যা নেই, নিজ কর্ম দ্বারা তার অধিকারী রূপে প্রকাশ করে, সে মিথ্যা পোশাক পরিধানকারীতুল্য।'[১০]

অর্থাৎ নিজে যা নয় কাজ-কর্ম দ্বারা তা প্রকাশ করাও গুনাহ। যেমন এক ব্যক্তি গরীব, বিশেষ টাকা-পয়সা নেই, কিন্তু চলাফেরা; বেশভূষা ও জীবনাচার দ্বারা দেখানোর চেষ্টা করে সে একজন ধনী লোক। এটা কর্মগত মিথ্যা। এর বিপরীতে একজন লোক বেশ স্বচ্ছল, কিন্তু ভান করে এমন, যেন সে নিতান্তই গরীব, যেন তার কিছুই নেই। এটাও মিথ্যাচার। কেননা বাস্তবে তো সে গরীব নয়; বরং যথেষ্ট টাকা-পয়সার মালিক। এ জাতীয় কাজকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্মগত মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এমন কোন ভান-ভনিতা করা যা দ্বারা মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। তা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, তা পরিত্যাজ্য।

নিজ নামের সাথে 'সায়্যিদ' লেখা

অনেকে নিজ নামের সাথে এমন পদবী ও উপাধী যোগ করে, যা বাস্তবানুগ নয়। যেহেতু চালু হয়ে গেছে, তাই অন্যরাও যাচাই-বাছাই না করেই তা লিখে দেয়। যেমন এক ব্যক্তি নিজ নামের সাথে সায়্যিদ লেখে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সায়্যিদ নয়। মূলত সায়্যিদ বলা হয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের লোককে। এটা পিতার দিক থেকে হতে হবে। অনেকে মায়ের দিক থেকে নবী বংশের হওয়ায় নিজের নামে সায়্যিদ লিখে দেয়। এটাও ভুল। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুসন্ধানে সায়্যিদ হওয়া প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সায়্যিদ লেখা জায়েয নয়। অনুসন্ধানের জন্য পুরুষানুক্রমে সায়্যিদরূপে পরিচিত হওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু সে রকম না হলে এবং সায়্যিদ হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকলে কিছুতেই তা লেখা যাবে না। লিখলে মিথ্যা বলার গুনাহ হবে।

---

১০. বুখারী, হাদীছ নং ৪৮১৮ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৯৭২; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৩৪৫; আহমাদ হাদীছ নং ২৪১৭৫

প্রফেসর বা মাওলানা লেখা

এমন লোকও আছে যে বাস্তবে প্রফেসর না হওয়া সত্ত্বেও নিজ নামের সাথে প্রফেসর লেখে। অথচ প্রফেসর একটা বিশেষ পরিভাষা। বিশেষ লোকদের জন্যই এটা প্রযোজ্য। এমনিভাবে মাওলনা বা আলেম শব্দও এক পরিভাষা। যে ব্যক্তি যথারীতি মাদ্‌রাসায় পড়াশুনা করেছে এবং সর্বশেষ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাকে মাওলানা বলা হয়। কিন্তু অনেকে সে রকম লেখাপড়া না করা সত্ত্বেও নিজ নামে মাওলানা লেখে। এটাও যেহেতু বাস্তবানুগ নয় তাই মিথ্যা এবং সে কারণে গুনাহ। কিন্তু এসব ব্যাপারকে আমরা মিথ্যা মনে করি না। আমরা ভাবিই না যে, এটাও গুনাহের কাজ। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া ও এসব পরিহার করে চলা অবশ্যকর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঐ সর্বপ্রকার মিথ্যা ও গুনাহ হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত ৩য় খণ্ড, ১৩৬-১৫৫ পৃষ্ঠা

ওয়াদা ভঙ্গ ও তার নানারূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভংগ করে এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় তাতে খেয়ানত করে। এক বর্ণনায় আছে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দাবি করে সে মুসলিম।[১১]

গেল জুমুআয় এ হাদীছে বর্ণিত তিন আলামতের একটি অর্থাৎ 'মিথ্যা' সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের দ্বিতীয় আলামত বলেছেন-

وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

যখন ওয়াদা করে তা ভংগ করে। মুমিনের চরিত্র হল ওয়াদা রক্ষা করা। সে কারও সাথে কোন ওয়াদা করলে যথাসাধ্য তা পূরণ করবে।

---

১১. বুখারী, হাদীছ নং ৮৯ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৫৫ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৩৩১

শরী'আতের বিধান হল, কেউ যদি কারও সাথে কোন ওয়াদা করে, তারপর তার এমন কোন কঠিন ওযর বা কঠিন বাধা দেখা দেয় যদ্দরুন সেই ওয়াদা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে যায়, তবে সে যার সাথে ওয়াদা করেছিল, তাকে জানিয়ে দেবে – আমার পক্ষে সেই ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমি আমার ওয়াদা প্রত্যাহার করে নিলাম।

উদাহরণত, এক ব্যক্তি কাউকে ওয়াদা দিল, আমি অমুক তারিখ তোমাকে এক হাজার টাকা দেব পরে সেই ব্যক্তির টাকা-পয়সা খতম হয়ে গেল। ফলে এখন আর তাকে সেই টাকা দিয়ে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তার কর্তব্য তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, ভাই আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু এখন সেই ওয়াদা পূরণ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। এক্ষেত্রে তার ওয়াদা ভংগের গুনাহ হবে না। পক্ষান্তরে শরী'আতসম্মত কোন ওযর যদি না থাকে, তবে যতক্ষণ সম্ভব তার কর্তব্য সেই ওয়াদা পূরণ করা।

'বাগদান' একটি ওয়াদা

কারও যদি বাগদান হয়ে যায় অর্থাৎ কোথাও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তবে এটাও ওয়াদার মধ্যে পড়ে যায়। কাজেই যতদূর সম্ভব এ ওয়াদা রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ যুক্তিসংগত কোন ওযর দেখা দিলে ভিন্ন কথা, যেমন কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর জানা গেল ছেলে ও মেয়ের চিন্তা-ভাবনা ও স্বভাব- চরিত্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যদ্দরুন উভয়ের বনিবনাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ইতঃপূর্বে এসব জানা না থাকায় কথা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন জানা হয়ে গেল তখন এটা ওযর হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অপর পক্ষকে জানিয়ে দেবে যে, আমরা তো আপনাদের সাথে আত্মীয়তা করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু এখন অমুক ওযরের কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোন ওযর না থাকবে ততক্ষণ এ ওয়াদা পূরণের চেষ্টা করতে হবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পূরণ করা ওয়াজিব ও অবশ্যকর্তব্য। পূরণ না করলে তা আলোচ্য হাদীছের আওতায় পড়ে যাবে।

আবূ জাহ্‌লের সাথে হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর ওয়াদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এমন সব ওয়াদাও রক্ষা করেছেন যে, আল্লাহু আকবার বর্তমান কালে তার কোন নজির দেখানো সম্ভব

হবে না। সাহাবায়ে কিরামকেও তিনি এ আদর্শের উপর গড়ে তুলেছিলেন। হযরত হুযায়ফা ইবনুল- ইয়ামান (রাযি.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বহু গোপন কথা তাঁকে জানিয়ে ছিলেন। তিনি ও তাঁর পিতা ইয়ামান ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা মুনাওয়ারায় আসছিলেন। পথে আবূ জাহল ও তার বাহিনীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়ে যায়। আবূ জাহল তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধের লক্ষে মদীনাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। হযরত হুযায়ফা (রাযি.)কে দেখে আবূ জাহল জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? তিনি বললেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। আবূ জাহল বলল, তবে তো তোমাকে ছাড়া যায় না। কেননা, মদীনায় গিয়ে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যোগ দেবে। তিনি বললেন, আমাদের তো উদ্দেশ্য কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করা। যুদ্ধে অংশ নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আবূ জাহল বলল, আমাদের সাথে ওয়াদা কর সেখানে গিয়ে কেবল তাঁর সাথে সাক্ষাতই করবে, আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। তিনি ওয়াদা করলেন। ফলে আবূ জাহল তাঁকে ছেড়ে দিল। তিনি যখন মদীনা মুনাওয়ারার কাছাকাছি পৌছান, ততক্ষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছেন। পথেই তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়।

হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই

চিন্তা করে দেখুন, কী কঠিন পরীক্ষা ! হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। কুরআন মাজীদের ভাষায় এটা ছিল 'ইয়াওমুল-ফুরকান' অর্থাৎ সত্য- মিথ্যার মধ্যে মীমাংসাকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে 'বদরী' যোদ্ধা বলা হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে। এমন কি ওজীফা হিসেবেও বদর যোদ্ধাদের নাম পড়া হয়ে থাকে। তাদের নাম পড়ার পর দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে থাকেন। বদর যোদ্ধাদের এমনই মহিমা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

যে ওয়াদা নেওয়া হয়েছে ঘাড়ের উপর তরবারি রেখে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংগে যখন সাক্ষাত হল হযরত হুযায়ফা (রাযি.) তাঁকে সবটা ঘটনা জানালেন। বললেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ ! আবূ জাহল আমাদেরকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমরা যুদ্ধে অংশ নেব না-এই মর্মে ওয়াদা করেই কোনও রকমে প্রাণ রক্ষা করেছি। কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ সংঘঠিত হতে যাচ্ছে। আপনি সংগীদের নিয়ে সেই উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। বড় আশা আপনি আমাদেরকেও সংগে নেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদার কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আবূ জাহল তো আমাদের থেকে এ ওয়াদা নিয়েছে ঘাড়ের উপর তরবারি রেখে। আমরা যুদ্ধে যাব না-এ ওয়াদা না করলে সে আমাদের ছাড়ত না। আমরা নিরুপায় হয়েই ওয়াদা করেছি। কাজেই আপনি আমাদের অনুমতি দিন। আমরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফযীলত ও সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।[১২] কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তোমরা তো যুদ্ধে না যাওয়ার ওয়াদা করে এসেছ। তোমরা তাদেরকে কথা দিয়েছ। তোমরা কেবল আমার সাথে সাক্ষাতই করবে, যুদ্ধে যোগদান করবে না। এই শর্তেই তোমাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারি না।

এরূপ ক্ষেত্রেই মানুষের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে নিজ কথা ও ওয়াদা রক্ষায় কতটা যত্নবান থাকে। আমাদের মত লোক হলে নানা ছল-ছুতার আশ্রয় নিত। হয়ত বলত, তাদের সাথে তো মন থেকে ওয়াদা করিনি। তারা জবরদস্তি করছিল, তাই মুখে মুখে তা স্বীকার করেছি মাত্র। কিংবা বলত, এটা যুদ্ধাবস্থা। এটা একটা ওযর। বিশেষত যখন মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র তিনশ তের জন। তাও প্রায় নিরস্ত্র। মাত্র সত্তরটি উট, দু'টি ঘোড়া ও আটটি তরবারি। অধিকাংশের হাতে লাঠি বা পাথর। এই ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এক হাজার সংখ্যক সশস্ত্র যোদ্ধার বিরুদ্ধে। এহেন পরিস্থিতিতে একজন লোকের অনেক মূল্য। তাই আপনার সাথে আমার যুদ্ধে যাওয়া উচিত। আল্লাহই জানেন এ জাতীয় আরও কত বাহানা দেখাত। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে কথা দেওয়া হয়েছে এবং যে ওয়াদা করা হয়েছে, তার বিপরীত করা যাবে না।

জিহাদের উদ্দেশ্য

জিহাদের উদ্দেশ্য সত্যকে সমুন্নত করা। এর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয় এবং নয় রাজ্য- বিস্তার করা। সুতরাং সত্যকে পদদলিত করে আর যাই হোক

১২.আল-ইসাবা : ১খ, ৩১৬

জিহাদ হয় না। গুনাহ ও পাপ কর্মে জড়িত হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আজকাল যে আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ যাচ্ছে, সকল মেহনত নিষ্ফল সাব্যস্ত হচ্ছে, এর একমাত্র কারণ আমরা তাবলীগ করতে চাই অবৈধ পন্থায়, ইসলাম কায়েম করতে চাই গুনাহে লিপ্ত হয়ে। আমাদের মন-মস্তিষ্কে নানা-রকম বাহানা সওয়ার হয়ে আছে। তাই কখনও বলা হয়, এখন কর্মকৌশলের দাবি হল শরী'আতের এই বিধানটি পাশ কাটিয়ে চলা। কখনও বলা হয়, এ সময়ের জন্য বিচক্ষণতা হবে এই কাজটি করার মধ্যে, যদিও শরী'আত অনুমোদন করে না। সুতরাং এসো; এটা করে ফেলি।

কিন্তু নববী দরবার ও সাহাবায়ে কিরামের পরিমন্ডলে এ জাতীয় ছলা-কলা ছিল কল্পনাতিত। ওখানে তো উদ্দেশ্য ছিল একটাই- আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। টাকা-পয়সা লক্ষবস্তু ছিল না এবং বিজয় লাভ বা বীর পুরুষ রূপে খ্যাতি কুড়ানোর দিকেও নজর ছিল না। কিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে সেটাই ছিল তাদের ধ্যান-জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত ওয়াদা পূরণের মধ্যে। সর্বাবস্থায় তা পূরণে বদ্ধপরিকর থাক। সুতরাং হযরত হুযায়ফা (রাযি.) ও তাঁর পিতা ইয়ামান (রাযি.) তা-ই করলেন। ফলে বদর যুদ্ধের ফযীলত থেকে তারা বঞ্চিত থাকলেন। এর নাম ওয়াদা রক্ষা।

আজ আপনি এর নজীর তালাশ করলে দুনিয়ার কোথায় তা পাবেন ? হাঁ মুহাম্মাদুর- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামদের দিকে তাকালে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে রাশি-রাশি। তারা এর এমন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যার দিক তাকালে যে কেউ অবাক মানতে বাধ্য।

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)কেই দেখুন না। লোকে তাঁর সম্পর্কে কত রকম মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করেছে। কেউ-কেউ তো তাঁর সম্পর্কে বেআদবীর কথাবার্তা পর্যন্ত বলছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাযত করুন। তাঁর একটি ঘটনা শুনুন।

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর একটি ঘটনা

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ছিলেন শামের গভর্নর। যদ্দরুন তৎকালীন রোমের সাথে তার যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। রোম সাম্রাজ্যকে তৎকালীন সুপার পাওয়ার মনে করা হত। অসাধারণ সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল। একবার হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর সাথে তাদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়।

একটি মেয়াদ স্থির করা হয় যে, এ মেয়াদ পর্যন্ত আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে-আগে হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর মাথায় একটি কৌশল জাগল। তিনি চিন্তা করলেন, মেয়াদের ভেতর যুদ্ধ করা তো জায়েয নয়, কিন্তু প্রস্তুতি গ্রহণে দোষ কী? কাজেই আমার সৈনিকদের সীমান্ত এলাকায় জড়ো করে রাখি, যাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র আক্রমণ শুরু করে দেওয়া যায়। তাতে জয়লাভ খুব সহজ হবে। কেননা, শত্রুরা তো ভাববে মুসলিম সৈন্যরা মেয়াদের ভেতর যেহেতু হামলা করবে না, তাই তাদের কোনও রকম রণপ্রস্তুতিও থাকবে না। তারা প্রস্তুত হবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর তখন প্রস্তুতি নিয়ে এই এলাকায় পৌঁছাতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগে যাবে।

এই ভাবনায় রোমান সৈন্যরা নিশ্চিন্ত বসে থাকবে। আক্রমণ ঠেকানোর কোন প্রস্তুতি তাদের থাকবে না। ফলে মুসলিম বাহিনী বিনা বাধায় তাদের দেশ দখল করতে পারবে। কৌশলটি হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর খুব পসন্দ হল। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে সীমান্ত এলাকায় গিয়ে ছাউনি ফেলতে বললেন। সেমতে বিপুল সৈন্য সেখানে সমবেত হল। অতঃপর যেই না মেয়াদ শেষ হল অমনি তিনি তাদেরকে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। বাহিনী এগিয়ে চলল এবং এলাকার পর এলাকা তাদের দখলে চলে আসল। কেননা, শত্রুসৈন্য এই আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তারা বিনা বাধায় একটির পর একটি নগর ও একের পর এক জনপদ মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিতে থাকল। এভাবে রোম সাম্রাজ্যের বহু দূর পর্যন্ত তারা পৌছে গেল। বিজয়ের নেশায় তখন তারা দুর্নিবার। সামনে চলছে তো চলছেই। এই উম্মাতাল অবস্থায় অকস্মাৎ এক ঘোড়সওয়ারের প্রতি নজর পড়ল। পেছন দিক থেকে দ্রুত ঘোড়া হাকিয়ে আসছে। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তার অপেক্ষায় থেমে গেলেন। হযরত আমীরুল-মু'মিনীনের দূত কোন নতুন ফরমান নিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার যখন আরও কাছে এসে পৌঁছাল তখন তার আওয়াজ শোনা গেল-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قِفُوْا عِبَادَ اللّٰهِ قِفُوْا عِبَادَ اللّٰهِ

'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার। আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা থাম। আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমরা থাম।'

যখন সে আরও কাছে আসল হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তাকিয়ে দেখেন এ যে হযরত 'আমর ইবনে আবাসা (রাযি.)। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী ?

তিনি বললেন-

وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ

চুক্তিরক্ষাই মুমিনের কাজ, বিশ্বাসঘাতকতা নয় ; চুক্তিরক্ষাই মুমিনের কাজ বিশ্বাসঘাতকতা নয়। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) বললেন, আমি তো চুক্তি ভংগ করিনি। আমি যুদ্ধবিরতির মেয়াদের ভেতর আক্রমণ করিনি ; বরং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই করেছি।

হযরত 'আমর ইবনে 'আবাসা (রাযি.) বললেন, যদিও হামলার আগে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আপনি আপনার সীমান্তে সেনাসমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তার আগেই। এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য তখনই সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। এটা স্পষ্টতই চুক্তির লংঘন ছিল। আমি নিজ কানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّهُ وَلَا يَشُدَّنَّهُ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَجَلٌ لَهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

কোন সম্প্রদায়ের সাথে যার কোন চুক্তি হয়েছে, সে তা খুলবেও না এবং বাঁধবেও না (অর্থাৎ যথাযথভাবে তা রক্ষা করবে)-যাবত না তার মেয়াদ শেষ হয় বা খোলাখুলি ঘোষণা করে দেয় যে, আমরা চুক্তি বাতিল করলাম।[১৩]

সুতরাং মেয়াদ শেষ না হতেই কিংবা চুক্তি বাতিলের ঘোষণা না করেই সীমান্তে সেনাসমাবেশ ঘটানো এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যের সীমান্ত অতিক্রম করা কিছুতেই বৈধ ছিল না। এ হাদীছের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ হয়েছে।

হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) আর একটি কথাও বাড়ালেন না। তখনই সৈন্যদেরকে ফিরে আসার হুকুম দিলেন এবং বিজিত সবটা এলাকা বিজিতদের হাতে প্রত্যার্পণ করলেন। একবার ভেবে দেখুন, বিজয় নেশায় বুঁদ একটি বাহিনী, যারা নগরের পর নগর দখল করে চলেছে, বিনা বাধায় শত্রু দেশের বিস্তৃত এলাকা করতলগত করে ফেলেছে, তাদের পক্ষে নিঃশর্ত ভাবে সেইসব এলাকা প্রত্যার্পন করে নিজ দেশের সীমানার মধ্যে ফিরে যাওয়া কতটা কঠিন কাজ হবে। বিশ্ব ইতিহাসে কেউ কোনও জাতির ভেতর

---

১৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৫০৬

এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না যে, কেবল ওয়াদা ভংগের আশংকায় নিজেদের জয় করে নেওয়া এলাকা শত্রুর হাতে প্রত্যার্পন করেছে। এটা দীনের সেবকগণেরই ঐতিহ্য। এখানে তো ভূমি দখল ও রাজ্য বিস্তার লক্ষবস্তু নয়। লক্ষবস্তু কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। সে কারণেই যখন আল্লাহ তা'আলার বিধান জানা গেল যে, ওয়াদা ভংগ জায়েয নয় এবং এক্ষেত্রে তাই হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, তাই এত বড় ত্যাগ স্বীকার করে তারা নিজ দেশে ফিরে গেলেন। এটাই হল ওয়াদা রক্ষা। যখন মুখ থেকে একটা কথা বের হয়ে গেছে, তখন যে কোনও মূল্যে তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

হযরত উমর (রাযি.)-এর ওয়াদা রক্ষা

বায়তুল-মুকাদ্দাস জয়ের পর সেখানকার ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর চুক্তি হয়েছিল যে, আমরা তোমাদের জানমালের নিরাপত্তাবিধান করব এবং এর বিনিময়ে তোমরা আমাদেরকে 'জিযিয়া' দেবে। অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তাবিধানের বিনিময়ে তাদের থেকে যে কর নেওয়া হয় তাকে 'জিযিয়া' বলে। চুক্তি অনুযায়ী তারা প্রতি বছর জিযিয়া আদায় করত।

একবারের ঘটনা। অন্য এক এলাকায় শত্রুদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ লেগে গেল। তাতে অতিরিক্ত সৈন্যের প্রয়োজন দেখা দিল কিন্তু সৈন্য কোথায় পাওয়া যাবে ? একজন পরামর্শ দিল বায়তুল-মুকাদ্দাস এলাকার নিরাপত্তা কার্যে যে সকল সৈন্য নিয়োজিত আছে, তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। হযরত উমর (রাযি.) পরামর্শ পছন্দ করলেন, তিনি হুকুম দিলেন অবিলম্বে বায়তুল-মুকাদ্দাসে নিয়োজিত সৈন্যদেরকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেই সংগে হুকুম দিলেন, এখানকার সকল ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সমাবেশ ডাক এবং তাদের জানিয়ে দাও, আমরা তোমাদের জান মাল হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলাম এবং তার বিনিময়ে তোমরা জিযিয়া দিয়ে যাচ্ছিলে, আমরা সেই কাজের জন্য এখানে সেনাবাহিনী বসিয়েছিলাম। কিন্তু এখন জরুরি ভিত্তিতে এসকল সৈন্যকে অন্যত্র পাঠাতে হচ্ছে, যদ্দরুন তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বপালন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর বিনিময়ে এ বছর যে জিযিয়া তোমরা আদায় করেছিলে আমরা তা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নাও।

এই হচ্ছে ওয়াদা রক্ষায় মুসলিম ঐতিহ্যের কিছু দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের পাতায় তাদের এ জাতীয় ঘটনা বেশুমার। আমরা জোর গলায়ই বলতে পারি, দুনিয়ায় ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের প্রতি এ রকম আচরনের দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতি দেখাতে পারবে না। এটা কোন ফাঁকা দাবি নয় যে, কেউ সহজে উড়িয়ে দিতে পারবে।

ওয়াদাভঙ্গের প্রচলিত যতরূপ

যা হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে মুনাফিকের দ্বিতীয় আলামত বলেছেন ওয়াদাভংগ করা। অর্থাৎ ওয়াদা করার পর তার বিপরীত কাজ কোন মুসলিম ব্যক্তি করতে পারে না। এটা মুনাফিকের কাজ। সুতরাং মুসলিমজনের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু আফসোস, গত জুমুআয় মিথ্যা সম্পর্কে যেমন আরয করেছিলাম যে, মিথ্যার বিভিন্ন রূপকে আমরা মাতৃদুগ্ধের মত হালাল বানিয়ে ফেলেছি এবং মিথ্যার পরিমন্ডল থেকে তাকে খারিজ করে দিয়েছি, তেমনি ওয়াদা ভংগেরও এমন বহু রূপ আছে, যাকে আমরা ওয়াদাভংগের মধ্যে গণ্য করছি না। কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় ওয়াদা ভংগ কেমন কাজ ? সে অবশ্যই বলবে, এটা খুবই খারাপ কাজ। এ পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এ কথার সাথে তার মিল বড় কম। যখনই ওয়াদা সংক্রান্ত কোন ব্যাপার সামনে এসে যায় সে নির্বিকারভাবে তার বিপরীত কাজ করে ফেলে এবং সে মনেই করে না যে, কোন ওয়াদা ভংগ করেছে।

রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা ওয়াজিব

এ রকমই একটা বিষয় রাষ্ট্রীয় আইন। লোকে সাধারণত এর প্রতি লক্ষ করে না এবং একে দীনের কোন ব্যাপারে মনে করে না। আমার মহান পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলতেন, ওয়াদা কেবল মৌখিকই হয় না, কর্মগতও হয়। যেমন এক ব্যক্তি একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সে দেশে বসবাস করে। নাগরিক হিসেবে সে কার্যত রাষ্ট্রের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে, রাষ্ট্রের সমস্ত আইন- কানুন সে মেনে চলবে। তো এই ওয়াদারক্ষা করা তার জন্য ওয়াজিব। রাষ্ট্রীয় আইন যতক্ষণ তাকে কোন গুনাহ করতে বাধ্য না করবে ততক্ষণ তাকে এ ওয়াদা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। হ্যাঁ কোন আইন যদি তাকে গুনাহ করতে বাধ্য করে তবে সে আইন মানা তার জন্য অপরিহার্য নয় ; বরং মানা জায়েযই নয়।

কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নয়।'[১৪]

কিন্তু যে আইন কোন গুনাহ করতে বাধ্য করে না, তা মেনে চলা অবশ্যকর্তব্য। কেননা, নাগরিক হওয়ার কারণে কার্যত আপনি রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন মেনে চলতে ওয়াদাবদ্ধ।

ফির'আওনের রাষ্ট্রীয় আইন ও হযরত মূসা (আঃ)

এর উদাহরণে আমার মহান পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা শোনাতেন। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের রাজ্যে বাস করতেন। নবুওয়াত লাভের আগে তিনি ঘুষি মেরে এক কিবতীকে হত্যা করেছিলেন। এ ঘটনাটি সুবিদিত। কুরআন মাজীদেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) সে কারণে ইসতিগফার করতেন এবং বলতেন,

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝١٤

আমার বিরুদ্ধে এক অপরাধের অভিযোগ তাদের আছে; ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।[১৫]

অর্থাৎ তিনি কাজটিকে একটা অপরাধ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন আর এ কারণেই তিনি ইসতিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। হযরত মূসা (আঃ) যদিও তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেননি, বরং তিনি এক মজলূমের সাহায্য করেছিলেন। এক ঘুষিতে লোকটি মারাই যাবে তা তিনি অনুমান করতে পারেননি। তাই প্রকৃতপক্ষে এটা গুনাহ ছিল না। এবং এটা হযরত মূসা আলাইহিস- সালামের ইসমত (নিষ্পাপতা)-এর পরিপন্থীও ছিল না। তারপরও বাহ্য দৃষ্টিতে এটা যেহেতু অপরাধ ছিল, সে কারণেই তিনি এটাকে অপরাধ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত মূসা (আঃ) যেই কিবতীকে হত্যা করেছিলেন সে তো একজন কাফের ছিল এবং তাও শত্রু রাষ্ট্রের কাফের। পরিভাষায় যাকে 'হারবী' বলে। তিনি যদি ইচ্ছাকৃতও তাকে হত্যা করতেন তবুও তো হারবী

---

১৪. মুসনাদে আহমাদ, ১০৪১

১৫. সূরা শু'আরা : ১৪

হওয়ার কারণে সে হত্যায় গুনাহ হওয়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও একে অপরাধ বলা হল কেন ?

আমার মহান পিতা (রহঃ) বলতেন, তা অপরাধ হয়েছিল এ কারণে যে, হযরত মূসা 'আলাইহিস- সালাম সে দেশে বসবাস করার কারণে কার্যত দেশের সমস্ত আইন মেনে চলতে ওয়াদাবদ্ধ ছিলেন। একটা আইন ছিল কাউকে হত্যা করা যাবে না। কিবতীকে হত্যা করার দ্বারা সে আইন লংঘন করা হয়েছিল এবং ওয়াদার বিপরীত কাজ করা হয়েছিল।

সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্র হোক বা অমুসলিম রাষ্ট্র, তার অধিবাসীরা নাগরিক হিসেবে কার্যত সে রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন মেনে চলতে ও তার বিপরীত কোন কাজ না করতে ওয়াদাবদ্ধ- যতক্ষণ না সে আইন কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে।

'ভিসা' গ্রহণও কার্যত এক ওয়াদা

এমনিভাবে ভিসা নিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রে গেলে, তা সে রাষ্ট্র আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত বা এ রকম অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্রই হোক না কেন, কার্যত এই ওয়াদা করা হয় যে, আমি যথাসম্ভব এ রাষ্ট্রের আইন- কানূন মেনে চলব- যতক্ষণ না সে আইন কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। সে রকম কিছু হলে তা মান্য করা জায়েয নয়। কিন্তু যে সকল আইন পাপকার্যে বাধ্য করে না বা অসহনীয় কোন জুলুম-নির্যাতনের কারণ হয় না, তা মেনে চলা অবশ্যকর্তব্য এবং তা ওয়াদা রক্ষারই অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাফিক আইন অমান্য করা গুনাহ

উদাহরণত ট্রাফিক আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাস্তায় নির্দেশনা দেওয়া থাকে 'ডানে চলুন' 'বামে চলুন' 'লাল বাতি জ্বলাকালে থেমে যান' সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে গাড়ি ছাড়ুন ইত্যাদি। একজন নাগরিক হিসেবে আপনি ওয়াদা করেছেন যে, এসব আইন আমি মেনে চলব। সুতরাং কখনও এর কোনও লংঘন করলে আপনি ওয়াদাভংগের অপরাধে অপরাধী হলেন। এটা গুনাহ। লোকে মনে করে ট্রাফিক আইন অমান্য করলে তাতে দোষ কী? আজকাল মানুষ নিজেকে সেয়ানা ও বুদ্ধিমান প্রমাণিত করার জন্য আইন অমান্য করার ছল গ্রহণ করে। তারপর ধরা না পড়লে কৃতিত্বও জাহির করে।

বস্তুত এসব কাজ বহু গুনাহের সমষ্টি। এক তো এতে ওয়াদা ভংগের গুনাহ হয়। দ্বিতীয়ত আইন-কানূন তৈরীর উদ্দেশ্য শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা,

যাতে একের দ্বারা অন্যের কষ্ট পাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আপনি আইন অমান্য করে সেই শৃংখলা ভাঙলেন এবং এভাবে অন্যকে কষ্ট দিলেন ও অন্যের ক্ষতি সাধন করলেন। এই কষ্টদান ও ক্ষতিসাধনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি অবশ্যই দায়ী সাব্যস্ত হবেন।

আল্লাহ তা'আলার দীনের ব্যাপকতা

এসব বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা মানুষকে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য। লোকে মনে করে দীনের সাথে এর কী সম্পর্ক ? এসব তো পার্থিব বিষয়। এগুলো মানার কী প্রয়োজন ? ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার দীন অতি ব্যাপক। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রই দীনের আওতাভূক্ত। বিশেষ কোন ক্ষেত্রের মধ্যে দীন সীমাবদ্ধ নয়।

সারকথা যে আইন কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতে বাধ্য করে তা তো মানা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এমনিভাবে যে আইন অসহনীয় জুলুমের কারণ হয়, তাও মানা যাবে না। তা ছাড়া অন্য সব আইন মেনে চলা কেবল পার্থিব ব্যাপার নয়। শরী'আতের দৃষ্টিতেও অবশ্যকর্তব্য। তা অমান্য করলে ওয়াদাভংগের গুনাহ হয়।

বস্তুত এমন বহু জিনিস আছে যাকে আমরা ওয়াদা বলে গন্য করি না এবং তার লংঘনকে ওয়াদাভংগের অন্তর্ভূক্ত ও পাপকার্য মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে তা ওয়াদাভংগ ও গুনাহের অন্তর্ভূক্ত তা পরিহার করা অবশ্যকর্তব্য। দীন যেহেতু জীবনের সকল অংগের সাথে জড়িত তাই এসব বিষয়ে উদাসিনতা দীনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনেরই নামান্তর হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সতর্ক হওয়ার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী খুতুবাত : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৭১

খেয়ানত ও তার নানা রূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভংগ করে, আর আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করে। এক বর্ণনায় আছে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দাবি করে সে মুসলিম।[১৬]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে মুনাফিকের তিনটি আলামত বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা বোঝাচ্ছেন যে, এ তিনটি কোন মু'মিনের কাজ হতে পারে না। এগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে সত্যিকার অর্থে মুসলিম ও মু'মিন বলা যায় না। আলামত তিনটি সম্পর্কে আলোচনা চলছে। দু'টি সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ পূর্বের দুই জুমু'আয় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

---

১৬. বুখারী, হাদীছ নং ৩২ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৮৯ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৫৫ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৩৩১।

আমানতদারির গুরুত্ব

মুনাফিকের তৃতীয় আলামত বলা হয়েছে আমানতের খেয়ানত করা। অর্থাৎ আমানতের খেয়ানত করা কোন মুমিনের কাজ নয় ; তা কেবল মুনফিকই করতে পারে। বহু আয়াত ও হাদীছে আমানত রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন মুমিনগণ আমানতদারির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে এবং তার দাবিসমূহ যথারীতি আদায় করে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমানতসমূহ তার হকদারকে দিয়ে দাও।[১৭]

এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَّا أَمَانَةَ لَهُ

'যে ব্যক্তির আমানতদারি নেই, তার ঈমান নেই।'[১৮]

অর্থাৎ ঈমানের অপরিহার্য দাবি হল, মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই আমানতদার ও বিশ্বস্ত হবে, সে কখনও আমানতে খেয়ানত করবে না।

ইসলামে আমানতের ধারণা

আজকের আলোচনায় আমি মূলত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। বিষয়টি হচ্ছে আমরা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে অত্যন্ত সীমিত অর্থে গ্রহণ করছি। এই আমানতের কথাই ধরুন না ! আমরা মনে করি এর সম্পর্ক কেবল টাকা-পয়সার সাথে। কেউ কিছু টাকা এনে বলল, এটা আপনার কাছে আমানত রাখুন। আমার যখন দরকার হবে আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিব। ব্যস এটা আমানত। কেউ যদি এতে খেয়ানত করে, নিজে সে টাকা হজম করে ফেলে বা মালিক এসে যখন তা ফেরত চায় তখন দিতে অস্বীকার করে, তবে সে হয় খেয়ানতকারী। আমানত ও খেয়ানত সম্পর্কে আমাদের ধারণা ব্যস এতটুকুই। এ ব্যাপারে আমরা এর

---

১৭. নিসা : ৫৮

১৮. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ, নং ১১৯৩৫

বেশি কিছু ভাবি না। সন্দেহ নেই এটাও আমানত ও খেয়ানত। কিন্তু কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে আমানত এরই মধ্যে সীমবদ্ধ নয়। বরং এর সীমারেখা অনেক বিস্তৃত। আরও অনেক জিনিসই আমানতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে সাধারণত আমরা আমানতের মধ্যে গণ্য করি না। ফলে সে সব ব্যাপারে আমরা ভয়াবহ রকমের অবহেলা করে থাকি। অথচ সেগুলোও আমানত এবং সেই গুরুত্বের সাথেই সেগুলো দেখা উচিত।

আমানতের অর্থ

'আরবী ভাষায়' 'আমানত'-এর অর্থ কোন বিষয়ে কারও প্রতি নির্ভর করা। সুতরাং যে সব বিষয় কারও প্রতি ন্যস্ত করা হয় এবং সে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে ও তার হক আদায় করবে বলে ভরসা রাখা হয়, তাই আমানত। কাজেই কারও প্রতি কোন কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হলে সেটা তার জন্য আমানত হয়ে যায়। কেননা, দায়িত্ব অর্পনকারী ব্যক্তি সে কাজের দায়িত্ব তাকে এই ভরসায় দিয়েছে যে, সে তা যথাযথভাবে আনজাম দেবে। এমনিভাবে কোন বস্তু বা টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখা হলেও তা আমানত। যেহেতু তার প্রতি আস্থা রাখা হয়েছে যে, সে তা পুরোপুরি সংরক্ষণ করবে, তাতে কোন ত্রুটি করবে না। এভাবে আমানতের মর্মবস্তুর প্রতি লক্ষ করলে অনেক কিছুই এর আওতায় পড়ে যাবে।

রূহানী জগতের স্বীকারোক্তি

রূহানী জগতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, বল তো আমি তোমাদের রব্ব কি না? এবং তোমরা আমার আনুগত্য করবে কি না? সমস্ত মানুষ স্বীকার করেছিল, আপনিই আমাদের রব্ব এবং আমরা আপনার অনুগত্য করব। সূরা আহযাবের শেষ রুকুতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতিকে আমানত শব্দেই ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

'আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত অর্পণ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল। সে তো অতিশয় জালিম, অতিশয় অজ্ঞ।'[১৯]

---

১৯. আহযাব ৭২

অর্থাৎ আমি প্রথমে যমীনের সামনে আমানত পেশ করে বললাম, তুমি কি এ আমানতের ভার বহন করবে ? সে তা বহন করতে অস্বীকার করল। তারপর আসমানের সামনে পেশ করে বললাম, তুমি কি এ ভার বহন করবে? সেও তা বহন করতে অস্বীকার করল। তারপর পাহাড়ের সামনে এ আমানত পেশ করলাম। সেও এর ভার বহন করতে রাজি হল না। এভাবে তারা সকলেই এর ভার গ্রহণ করতে ভয় পেল। পরিশেষে যখন মানুষের সামনে পেশ করলাম, তোমরা কি আমানতের ভার বহন করবে, তখন সে বড় সাহস দেখাল এবং স্বীকার করল, হ্যাঁ আমি এই ভার বহন করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বস্তুত্ব মানুষ বড় জালেম ও জাহেল এবং সে কারণেই সে এত বড় ভার বওয়ার সাহস দেখাল, চিন্তা করল না যে, আদৌ তা বহন করতে পারবে কি না। আর যদি নাই পারে তবে তার পরিণাম কত অশুভ হতে পারে।

এ জীবনও আল্লাহর আমানত

যা হোক আল্লাহ তা'আলা একটা ভারকে আমানত শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তা কি সে আমানত ভার, যা মানুষের সামনে পেশ করা হলে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে নিল ? মুফাসসিরগণ বলেন, তা হল মানুষের বর্তমান জীবন। অর্থাৎ তাকে বলা হয়েছিল, তোমাকে এমন এক জীবন দিতে চাই, যে জীবনে তোমার ভালো কাজ করারও এখতিয়ার থাকবে এবং মন্দ কাজ করারও এখতিয়ার থাকবে। ভালো কাজ করলে তো আমার সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং জান্নাতের স্থায়ী নিয়ামতের অধিকারী হবে আর যদি মন্দ কাজ কর, তবে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তোমার উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে এবং জাহান্নামের স্থায়ী আযাব ভোগ করবে। বল, তোমরা কি এরূপ জীবন গ্রহণ করবে ? কেউ প্রস্তাবে রাজি হল না, কিন্তু মানুষ তা স্বীকার করে নিল।

হাফিজ সীরাজী (রহঃ) বলেন,

آسماں بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زند

'আমানতের ভার বহনে আসমান তো সক্ষম হল না। সে তো এই বলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল যে, এটা বহনের সাধ্য আমার নেই, কিন্তু এই পাগল মানুষ ঠিকই তা কাঁধে তুলে নিল। লটারিতে নাম উঠল আমারই। যা হোক কুরআন মাজীদ একেই আমানত নামে অভিহিত করেছে।

এই দেহও এক আমানত

এই জীবনটাই আমাদের কাছে আমানত। এ আমানতের দাবি হল গোটা জীবনকে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান মোতাবেক পরিচালিত করা।

প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা বড় আমানত হল তার নিজ অস্তিত্ব। এ আমানত ভার প্রতিটি মানুষের কাঁধে চাপানো। এর বাইরে নেই কেউ। মানবদেহ তার অংগ-প্রত্যংগ তার সময় ও শক্তি তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সবই তার কাছে আমানত। কেউ কি নিজেকে তার হাতের মালিক মনে করে এমন কে আছে, যে বলতে পারে এই চোখের মালিক আমি নিজে? কেউ তা বলবে না। বরং আমার প্রতিটি অংগই আমার কাছে গচ্ছিত আমানত। আমি এর মালিক নই। কাজেই আমি আমার ইচ্ছামত একে ব্যবহার করতে পারি না। এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। তিনি আমাদেরকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এর দাবি হল, আমি আমার অংগ-প্রত্যংগ এবং আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে কেবল সেই কাজেই ব্যবহার করব, যে কাজের জন্য এগুলো আমাকে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া অন্য কোন কাজে কিছুতেই ব্যবহার করব না। তা করলে আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে।

চোখ এক আমানত

উদাহরণত চোখ আল্লাহ তা'আলার এক নিআমত। তিনিই আমাদেরকে এটা দিয়েছেন। এটা এমনই এক নিয়ামত, যা সারা দুনিয়ার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও অর্জন করা সম্ভব নয়। জন্ম থেকেই যেহেতু এই সরকারী মেশিন আমাদের কপালে লাগানো আছে এবং অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে, তাই আমাদের কাছে এর কদর নেই। এর জন্য আমাদের কোন পয়সা খরচ করতে হয়নি, কোন মেহনতও করতে হয়নি। তাই এ মুফ্ত মালের কোন মূল্য আমরা দেই না। আল্লাহ না করুন কখনও যদি দৃষ্টিশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং এমন রোগ দেখা দেয়, যদ্দরুন এ শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন এর মূল্য ঠিকই বুঝে আসে। তখন মানুষ তার এই এক অংগের জন্য সারা জীবনের সবটা সঞ্চয়ও ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এটা এমনই এক মেশিন, যার না সার্ভিসিং দরকার পড়ে, না ওভারহলিং। এমনিভাবে না আছে এর কোন মাসিক খরচ, না ট্যাক্স ও ভাড়া। একদম মুফতের মাল।

আল্লাহ তা'আলা এই মেশিন আমাদেরকে আমানতস্বরূপ দান করেছেন। বলে দিয়েছেন, তোমরা এটা ব্যবহার কর, এর দ্বারা দুনিয়া দেখ, দুনিয়ার মনোরম দৃশ্যাবলী উপভোগ কর এবং সব কিছুই কর, তবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র আছে, তাতে এই সরকারি মেশিন ব্যবহার করো না। যেমন, এর দ্বারা পরনারীর দিকে তাকিও না। সুতরাং আমরা যদি এর দ্বারা পরনারী দেখি, তবে আমানতের খেয়ানত হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাতকে খেয়ানত শব্দে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ

'তিনি জানেন চোখের খেয়ানত এবং সেই সব কিছু যা অন্তর গোপন করে।'[২০]

অর্থাৎ যা দেখতে নিষেধ করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে চোখ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে চোখকে ব্যবহার করে যে খেয়ানত তুমি করেছ, তা আল্লাহর অগোচর নয়। তিনি তা ঠিকই জানেন। সময় মত কৈফিয়ত নেবেন। এটা ঠিক এরকম, যেমন কেউ নিজের কোন মাল অন্যের কাছে আমানত রাখল, আর সেই লোক লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের আড়ালে তা নিজে ব্যবহার করল। আল্লাহ প্রদত্ত নিআমতের অন্যায় ব্যবহারও ঠিক এরকমই। কিন্তু নির্বোধ মানুষ চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির আড়ালে নেই কোন কিছু। কিছুই তাঁর থেকে লুকানো যায় না। তাই আল্লাহ তা'আলা চোখের খেয়ানতকে কঠিন গুনাহ ও গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ভয়ানক শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। পক্ষান্তরে চোখের এ আমানত ও নি'আমতকে সঠিক জায়গায় ব্যবহার করলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন এবং এজন্য বান্দার প্রতি রহমত নাযিল করেন। হাদীছ শরীফে আছে,কেউ যদি ঘরে ঢুকে নিজ স্ত্রীর প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় এবং স্ত্রীও স্বামীকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তবে আল্লাহ তা'আলা তখন উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন। কেননা, তারা আমানতের সঠিক ব্যবহার করেছে, যদিও সে দৃষ্টি ছিল নিজেদের জৈবিক আনন্দের জন্য। হোক তা ব্যক্তিগত ও জৈবিক আনন্দের জন্য, কিন্তু তা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক করেছে, তাই তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়েছে।

---

২০. গাফির :৯

কানও এক আমানত

বান্দা যাতে শুনতে পায় তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে কান দিয়েছেন এবং তা দ্বারা শোনার অনুমতি দিয়েছেন, কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। যেমন গান- বাজনা শুনবে না, গীবত শুনবে না, এবং অপবাদ ও মিথ্যা কথা শুনবে না। সুতরাং কেউ যদি কানকে এসব জিনিস শোনার কাজে ব্যবহার করে তবে তা হবে আমানতের খেয়ানত।

জিহবা আল্লাহর আমানত

জিহবাও আল্লাহ তা'আলার এমন এক নি'আমত যা বান্দা জন্ম থেকেই লাভ করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা তার সংগে থাকে। জিহবার সামান্য একটু নাড়াচাড়ার মাধ্যমে মানুষ যে কত রকম কাজ নেয় তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এটা কত বড় নি'আমত তা তো এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, সামান্য একটু নাড়লেই উচ্চারণ করা যায়,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

আর হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে এতে দাড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়। সুতরাং এর মাধ্যমে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সেটাই হবে এর যথার্থ ব্যবহার। তার পরিবর্তে একে যদি মিথ্যা বলা, গীবত করা, মুসলিমদের মনে আঘাত করা ও অন্যকে কষ্টদানের কাজে ব্যবহার করা হয় তবে তা হবে আমানতের খেয়ানত।

আত্মহত্যা যে কারণে হারাম

এ তো ছিল অংগ-প্রত্যংগের কথা। আমাদের গোটা অস্তিত্বই আল্লাহ তা'আলার আমানত। যারা মনে করে দেহ আমার, কাজেই এর ব্যবহারও করব নিজ ইচ্ছামত, তারা মহাভুলের উপর আছে। কেননা, আমার দেহের মালিক আমি নিজে নই। এটা আল্লাহ তা'আলার আমানত। এ কারণেই শরীআতে আত্মহত্যা করা হারাম। এ দেহ আমার মালিকানাধীন হলে আত্মহত্যা হারাম কেন ? হারাম তো এ কারণেই যে, আমার এ দেহ, এই প্রাণ, এই অস্তিত্ব ও এই অংগ-প্রত্যংগ মূলত আমার মালিকানাধীন নয় ; বরং এর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি আমাদের কাছে আমানত রেখেছেন। এবং ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

উদাহরণত এ বইটির মালিক আমি। এখন আমি যদি কাউকে বলি, এটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, তুমি নিয়ে যাও, তা আমার জন্য জায়েয হবে। কিন্তু কেউ যদি অন্যকে বলে, আমাকে হত্যা কর, আমার জান নিয়ে নাও, তবে তার জন্য তা জায়েয নয়। সে যদি এ অনুমতির কথা লিখে দেয় এবং তাতে দস্তখত করে ও সিল ছাপ দিয়ে দেয়, তবুও যাকে অনুমতি দিয়েছে তার পক্ষে তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না। কেননা, এ জানের মালিক সে নিজে নয়। মালিক হলে এ অনুমতি দান জায়েয হত। যখন মালিক নয়, তখন অন্যকে এ রকম অনুমতি দেওয়ারও কোন অধিকার সে রাখে না।

গুনাহ্ করাও খেয়ানত

এই অস্তিত্ব ও দেহমন এবং সকল যোগ্যতা ও ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমানত স্বরূপ দান করেছেন। বরং গোটা জীবনই আল্লাহর আমানত। তাই লক্ষ রাখতে হবে, জীবনের কোন কাজ, এসব অংগ-প্রত্যংগের কোনওরকম প্রয়োগ এবং কোনও ধরনের কথাবার্তা যাতে এমন না হয়, যা দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানতের খেয়ানত হয়ে যায়।

সুতরাং আমানত সম্পর্কে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী আমরা পোষণ করে থাকি তা নিতান্তই ভুল। আমানত বলতে কেবল টাকা-পয়সার আমানতকেই বোঝায় না এবং তালা খুলে সেই গচ্ছিত টাকা-পয়সা খরচ করার মধ্যেই খেয়ানত সীমাবদ্ধ নয়। এটাও খেয়ানত বটে। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়। বস্তুত সমগ্র জীবনই আল্লাহর আমানত। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজই আমানত এবং তার যে কোনও অপব্যবহারই খেয়ানত।

কাজেই হাদীছে যে আমানতের খেয়ানত করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে তার অর্থ হল, যত রকম গুনাহ আছে, তা চোখের গুনাহ হোক, কানের গুনাহ হোক, মুখের গুনাহ্ হোক, বা অন্য কোন অংগ-প্রত্যংগের গুনাহ হোক সবই খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। তার কোনওটিই মুমিনের কাজ নয় ; বরং মুনাফিকের কাজ।

ধারের বস্তুও আমানত

এ তো গেল আমানত সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা। এ ছাড়া আমানতের বিশেষ কিছু শাখাও আছে, যাকে আমরা অনেক সময় আমানত মনে করি না এবং আমানতের মত তার হেফাযত করি না। যেমন ধারে আনা বস্তু, যাকে আরিয়াত বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তির কোনও একটা জিনিস দরকার, কিন্তু

তার নিজের কাছে তা নেই। কাজেই সে প্রয়োজন সমাধানের জন্য যার কাছে জিনিসটি আছে, তার কাছে গিয়ে বলল, এ জিনিসটি আমার একটু দরকার। এটি আমাকে দাও, কাজ সেরে দিয়ে দেব। একে 'আরিয়াত বা ধার বলে। এই ধারের বস্তুটিও আমানত।

মনে করুন আমার একটি বই পড়ার ইচ্ছা, কিন্তু সেটি আমার কাছে নেই। তাই অন্যের কাছ থেকে সেটি চেয়ে নিলাম এবং বললাম পড়া হলে ফেরত দেব। শরী'আতের পরিভাষায় এভাবে কোন জিনিস চেয়ে নেওয়াকে 'আরিআত' বলে। আর আরিআতের বস্তু আমানত হয়ে থাকে। সুতরাং এখন বইটি আমার কাছে আমানত। এর হেফাজত আমার কর্তব্য এবং মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার বা সে কষ্ট পেতে পারে এতে এমন কিছু করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। সেই সংগে সময় মত ফেরত দেওয়াও জরুরি। অন্যথায় তা আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তার বহু ওয়াজে সতর্ক করেছেন যে, একটা অবহেলা সচরাচরই হয়ে থাকে। কেউ কারও ঘরে খাবার পাঠালে তার পাত্রটি যে ফেরত দিতে হবে সে কথা মাথায়ই থাকে না। যেন বেচারা খাবার পাঠিয়ে ভুল করেছে। উচিত তো ছিল খাবার অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে তখনই পাত্রটি ফেরত দেওয়া। কিন্তু এমনটি কদাপি করা হয়। ফলে পাত্রটি তার ঘরেই পড়ে থাকে ; বরং অনেক সময় সে পাত্র নিজেই ব্যবহার শুরু করে দেয়। এটা স্পষ্ট খেয়ানত। কেননা, পাত্রটি আপনার কাছে আরিয়াত হিসেবে এসেছিল। আপনি তার মালিক নন। কাজেই সেটি ফেরত দিতে গড়িমসি করা এবং নিজে ব্যবহার করা খেয়ানত রূপেই গণ্য হবে।

এমনিভাবে কারও কাছ থেকে পড়ার জন্য যে বই কিতাব এনেছেন, পড়ার পর মালিককে ফেরত না দিলে খেয়ানত হবে। এখন তো প্রবচনই চালু হয়ে গেছে যে, বই চুরি চুরি নয় ; এভাবে যখন বই চুরি করা জায়েয হয়ে গেল, তখন খেয়ানত জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। আর এ জন্যই দেখা যায় কাউকে কোন বই পড়তে দেওয়া হলে তা আর ফেরত পাওয়া যায় না। যে নেয় সে আর ফেরত দেওয়ার কথা চিন্তাই করে না। অথচ এ সবই সুস্পষ্ট খেয়ানত। মনে রাখতে হবে 'আরিয়াত ও ধারের সব কিছুই আমানত। তার যথাযথ হেফাযত করতে হবে। মালিক যা পছন্দ করবে না এমন কোনও কিছুই তাতে করা জায়েয হবে না। করলে তা খেয়ানত রূপে গণ্য হবে।

চাকরির সময়কালও আমানত

চাকরিতে যে আট ঘন্টা ডিউটি করার চুক্তি থাকে। সে আট ঘন্টা আপনি বেতনের বিপরীতে বিক্রি করে দিয়েছেন। এ সময়কাল আপনার কাছে মালিকপক্ষের আমানত। কাজেই এর থেকে এক মিনিটও যদি আপনি মালিকের অনোনুমোদিত কাজে ব্যয় করেন তবে তা আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হবে। উদাহরণত ডিউটির সময়ে বন্ধু- বান্ধব সাক্ষাত করতে আসল আর আপনি তাদের নিয়ে হোটেলে চা খেতে চলে গেলেন, অথচ এ সময়টা মালিক পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেওয়া, যা আপনার কাছে আমানত ছিল। আপনি ঐ সময়টা বন্ধুদের পেছনে খরচ করলেন, তাদের সাথে হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দিলেন। এভাবে আমানতের খেয়ানত করলেন।

চিন্তা করে দেখুন ! এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সতর্ক ? আমরা এভাবেই আমাদের ডিউটির সময়টা অন্য কাজে খরচ করে ফেলি আর আমানতের খেয়ানত করি। এর ফলে মাসশেষে যে বেতন পাই তা পুরোপুরি হালাল হয় না। যেহেতু সবটা সময় এ বেতনের বিপরীতে ব্যয় করিনি।

দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাযগণের নীতি

দারুল- উলূম দেওবন্দের উস্তাযগণের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এ ব্যাপারে তাদের আদর্শ কেমন ছিল। সত্য কথা হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের যুগের স্মরণকে তাজা করিয়ে দিয়েছেন। তাদের মাসিক বেতন ছিল দশ- পনের টাকা। তাদের নিয়ম ছিল, মাদরাসার কার্যকালের সময়ে কোন মেহমান আসলে সংগে- সংগে তারা ঘড়ি দেখে সময় নোট করে রাখতেন এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেখা সাক্ষাত সমাপ্ত করার চেষ্টা করতেন। তারপর যখন মেহমান বিদায় নিত আবার ঘড়ি দেখে লিখে রাখতেন এভাবেই সারা মাসে যত মেহমান আসত, তাদের জন্য ব্যয়িত সময় নোট করে রাখতেন। মাস শেষে তারা দরখাস্ত লিখতেন যে, এ মাসে আমার এই পরিমাণ সময় মাদরাসার কাজের বাইরে অন্য কাজে ব্যয় হয়েছে। অতএব আমার বেতন থেকে এই পরিমাণ টাকা কেটে রাখবেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, অন্য কাজে ব্যয় করা সেই সময়ের বেতন গ্রহণ করলে তা তাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে। তাই দরখাস্ত করে তা কাটিয়ে নিতেন। আজকাল বেতন বৃদ্ধির জন্য তো দরখাস্ত করা হয়, বেতন কর্তনের জন্য দরখাস্ত দেওয়ার কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

হযরত শায়খুল- হিন্দ (রহঃ)- এর ঘটনা

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল-হাসান (রহঃ) ছিলেন দারুল-উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। তাঁর মাধ্যমে দারুল-উলূম দেওবন্দের সূচনা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলম, তাকওয়া ও মা'রিফাতের উচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। তিনি যখন এ মহান প্রতিষ্ঠানের শায়খুল-হাদীছ তখন তার বেতন ছিল দশ টাকা। তারপর যখন তার বয়স বাড়ে এবং অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়, তখন মজলিসে শূরা স্থির করল যে, হযরতের তো এখন ব্যস্ততা অনেক। এবং সাথে প্রয়োজনও বিপুল। সেই অনুপাতে বেতন অনেক কম। তাই তার বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। সিদ্ধান্ত হল এখন থেকে দশের পরিবর্তে তাঁর মাসিক বেতন হবে পনের টাকা। বেতন গ্রহণের সময় তিনি দেখলেন বেতনে পাঁচ টাকা বেশি- দশের স্থানে পনের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে পাঁচ টাকা বেশি কেন ?

জানানো হল, মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখন থেকে আপনার বেতন হবে পনের টাকা। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। তারপর দারুল উলূমের মুহতামিম (মহাপরিচালক) বরাবর দরখাস্ত লিখলেন যে, হযরত ! আপনি আমার বেতন দশের স্থানে পনের করেছেন, অথচ এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আগের মত উদ্যম নেই। আগে টানা দুই- তিন ঘন্টা পড়াতাম, কষ্টবোধ হত না। আর এখন কম সময় পড়াই ও সময় কম দেই। সুতরাং আমার বেতন বৃদ্ধির কোন বৈধতা নেই। বৃদ্ধি যা করা হয়েছে তা মওকুফ করা হোক এবং আগে যেমন ছিল তেমনি দশ টাকাই রাখা হোক।

সকলে এসে তাকে অনুনয় বিনয় করে বোঝাতে লাগল যে, হযরত ! আপনি তো নিজ তাকওয়া- পরহেযগারির কারণে বৃদ্ধিটা স্থগিত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাতে অন্যদের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে। তাদের উন্নতি আটকে যাবে। সুতরাং আপনি এটা গ্রহণ করে নিন। কিন্তু তিনি নিজের জন্য তা মানতে পারলেন না। তা কেন ? কেবল এ কারণেই যে, তারা সর্বদা আখিরাতের ফিকির করতেন। দুনিয়া তো দু'দিনের। আল্লাহ তা'আলাই জানেন কবে তা খতম হয়ে যায়। আজ, না কাল। তারপর আল্লাহ তা'আলার সামনে দাড়াতে হবে। তখন এই পয়সার জন্য জবাবদিহি করতে হবে যে, তা কিভাবে আমার হাতে এসছে। তখন যাতে এটা লজ্জার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

দারুল-উলূম দেওবন্দ দুনিয়ার সাধারণ ইউনিভার্সিটির মত ছিল না, যেখানে পঠন-পাঠনই শেষ কথা। শিক্ষক পাঠদান করলেন, আর ছাত্র পাঠগ্রহণ করল, ব্যস আর কোন কাজ নেই। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার চেতনাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণবস্তু। এরই ভিত্তিতে তা গড়ে ওঠেছে। তাকওয়া-পরহেযগারিই এর ভিত্তিপ্রস্তর। সেখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে যে, বেতনের বিনিময়ে আমরা সময় বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আমার কাছে সে সময় আমানত হয়ে গেছে। এতে খেয়ানত করার কোন অবকাশ নেই।

এখন চলছে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের যুগ

আজকাল সর্বশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে হক আদায়ের সংগ্রামে। এ নিয়ে সভা-সমাবেশ হচ্ছে, শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে এবং চলছে নানামুখী আন্দোলন। প্রত্যেকের দাবি আমাকে আমার হক দিয়ে দাও, আমার অধিকার আমাকে বুঝিয়ে দাও। কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় যে অন্যদের বহু অধিকার চাপানো আছে, তা নিয়ে কারও চিন্তা নেই যে, সে তা আদৌ আদায় করছে কি না ? প্রত্যেকের দাবি আমার বেতন বৃদ্ধি কর,আমাকে প্রমোশন দাও। কেউ ছুটি বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে, কেউ এলাউন্স নিয়ে দৌড়-ঝাপ করছে, কিন্তু আমার যা দায়-দায়িত্ব তা আমি যথাযথ আদায় করছি কি না, সে চিন্তা কেউ করছে না।

প্রত্যেকের উচিত নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যত্নবান হওয়া

অথচ অধিকার প্রাপ্তির উপায় এটা নয়। মানুষের মাথায় যতক্ষণ এই দৃষ্টিভংগী বদ্ধমূল থাকবে যে, আমি অন্যের কাছে নিজ অধিকারের দাবি জানাব, কিন্তু আমার কাছে কেউ অধিকারের দাবি নিয়ে না আসুক এবং আমি আমার দায়িত্ব- কর্তব্য পালনে উদাসীন থাকব, কিন্তু আমার প্রাপ্য পরিশোধে কেউ গড়িমসি করতে পারবে না, সত্যি কথা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার কারও অধিকার আদায় হওয়া সম্ভব নয়। হক আদায়ের উপায় কেবল একটাই, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান থাকবে। চিন্তা করবে, আমি আমার কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করছি তো ? অন্তরে যখন এই চেতনা দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যাবে, তখন প্রত্যেকের অধিকার আপনিই আদায় হয়ে যাবে। স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যাপারে তার যে দায়-দায়িত্ব

আছে তা পালনের চেষ্টা করে, তবে স্ত্রীর অধিকার এমনিই আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ স্ত্রী যদি চিন্তা করে স্বামীর ব্যাপারে আমি আমার দায়িত্ব পালনে যত্নবান থাকব, তবে স্বামীর প্রাপ্যও যথাযথভাবে আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকলে মালিকের প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে আর মালিকও তার দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকলে শ্রমিক তার অধিকার বুঝে পাবে। বস্তুত অন্তরে এই অনুভূতি জাগ্রত করাই আসল কাজ। এটা যতক্ষণ অন্তরে জাগ্রত না হবে, ততক্ষণ হক আদায়ের জন্য যত শ্লোগান দেওয়া হোক, যত ইউনিয়ন ও সংগঠন গড়ে ওঠুক, যত আন্দোলন ও লড়াই- সংগ্রাম চালানো হোক তার কোনওটিই কখনও সফল হবে না। হক আদায় হবে না কারওই। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি যতক্ষণ অন্তরে না জাগবে তার কাছে অন্যের হক সম্পর্কে আমাকে কৈফিয়াত দিতে হবে- এই চিন্তা যতক্ষণ অন্তরে কার্যকর না হবে, ততক্ষণ কোনও চেষ্টাই কখনও সফল হওয়ার নয়। ব্যস, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার এই একই পথ- এর কোন বিকল্প নেই।

সুতরাং ডিউটির সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, এটাও আমাদের কাছে আমানত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

'মন্দ পরিণাম' তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় আর যখন তাদের জন্য মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।'[২১]

এই যে মাপে কম দেওয়া এ কথাটি অতি ব্যাপক। আমরা কিন্তু একে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করছি। লোকে মনে করে কারও কাছে কোন পণ্য বিক্রি করে তাতে ওজনে ফাঁকি দিলেই মাপে কম দেওয়া হল। মাপে কম দেওয়ার ব্যাপারটা এর বাইরে কোথাও নেই। অথচ ব্যাপারটা সব জায়গায়ই আছে ; উলামায়ে কিরাম বলেন, اَلتَّطْفِيْفُ فِيْ كُلِّ شَيْئٍ 'মাপে কম সব কিছুতেই হতে পারে, যার আট ঘন্টা ডিউটি করার কথা, সে যদি ডিউটি তার কম করে, তবে সে মাপে কম দিল। ফলে সে আয়াতে বর্ণিত শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেল। সুতরাং এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

---

২১. মুতাফ্ফিফীন ১-৩

পদ ও দাপ্তরিক দায়িত্ব ও আমানত

আজকাল সরকারি অফিস থেকে কাজ আদায়ের ব্যাপারটা এক মহামসিবতে পরিণত হয়ে গেছে। কোন সরকারি অফিসে যদি কারও কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তার উপর আসমান ভেংগে পড়ে। কারও পক্ষে সহজে সে প্রয়োজন সমাধা করা সম্ভব নয়। দৌড়াতে-দৌড়াতে জুতার তলা ক্ষয় হয়ে যায়। একবার যাও তো অফিসার সাহেব চেয়ারে নেই, আরেকবার যাও বলা হবে কাল এসো। সেদিন যাও তো বলা হবে পরের দিন এসো। এভাবে চক্কর লাগাতে থাক, কিন্তু কাজ কিছুতেই এগোয় না। এর কারণ দায়িত্বের অনুভূতি বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। আমানতদারী খতম হয়ে গেছে। কেউ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকলে সে পদটি তার কোন লাভের বেসাতি নয়, কিংবা নয় কোন ফুলশয্যা। বরং তার জন্য তা দায়িত্ব ও যিম্মাদারির ফাঁস। নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও পদ মূলত দায়িত্বেরই ফাঁস। এ অনুভূতির কারণেই হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বলেন, ফুরাত নদীর তীরে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে আমার ভয় হয় কিয়ামতের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে, হে উমর ! তোমার আমলে অমুক কুকুর না খেয়ে মরল কেন ?

খিলাফত সম্পর্কে হযরত উমর (রাযি.)- এর অনুভূতি

হযরত উমর ফারুক (রাযি.) যখন আততায়ীর আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন, তখন কয়েকজন সাহাবী তাঁর কাছে এসে আরয করেছিলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আপনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান, যাতে আপনার পর তিনি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতে পারেন। কেউ কেউ তাঁর পুত্র বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 'আব্দুল্লাহ (রাযি.)-এর নাম প্রস্তাব করল। হযরত উমর (রাযি.) প্রথমে বললেন, তোমরা আমার সামনে খলীফা হিসেবে এমন একজনের নাম প্রস্তাব করছ, যে স্ত্রীকে তালাক কেমনে দিতে হয় তাও জানে না।[২২]

ঘটনা হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় একবার হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) তাঁর স্ত্রীকে মাসিক চলা অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু শরী'আতের বিধানে স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নয়। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর এ মাসআলা

---

২২. তারীখুল- খুলাফা, পৃ: ১১৩

জানা ছিল না। নবীজি তা জানতে পেরে বললেন, তুমি এটা ভুল করেছ। কাজেই স্ত্রীকে এখন ফেরত নিয়ে নাও আর একান্ত যদি তালাক দিতেই চাও, তবে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিও। হযরত উমর (রাযি.) এই ঘটনার দিকেই ইংগিত করে বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানাতে চাও যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়মও জানে না।[২৩]

অতপর হযরত উমর (রাযি.) তাদেরকে দ্বিতীয় উত্তর দিলেন যে, খিলাফতের এ ফাঁস খাত্তাবের সন্তানদের একজনের গলায় লেগেছে এই তো যথেষ্ট। অর্থাৎ বার বছর যাবত এই ফাঁস আমার গলায় লেগে আছে। ব্যস যথেষ্ট হয়েছে। আমার বংশের আর কারও গলায় আমি এ ফাঁস লাগাতে চাই না। কেননা, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলার দরবারে যখন এ দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে হিসাব দিতে হবে তখন আমার কী অবস্থা হবে।

হযরত উমর ফারুক (রাযি.) তো সেই মহান খলীফা, যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ শুনিয়েছেন عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ উমর জান্নাতে যাবে।[২৪]

এ সুসংবাদের পর তো তার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে হিসাব নিকাশের কী প্রবল ভীতি তাঁর অন্তরে কাজ করত এবং খিলাফত যে এক গুরুভার আমানত এর কী গভীর অনুভূতি তিনি লালন করতেন!

এ গুরুভার সম্পর্কে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন এ আমানতের হিসাব দিয়ে যদি আমি সমান-সমান পার পেয়ে যাই এবং আমার কাঁধে ছওয়াব ও গুনাহ কিছুই না থাকে, ফলে পাপ-পুণ্য যাদের সমান-সমান তাদের মত জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী এলাকা আ'রাফে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাতেও আমি খুশী। কারণ অন্তত জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি তো পেয়ে গেলাম। প্রকৃতপক্ষে এটাই আমানত ভার সম্পর্কে যথাযথ অনুভূতি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ অনুভূতির সামান্য একটা অংশও যদি আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন তবে অতি সহজেই আমাদের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

---

২৩. তারীখুল-খুলাফা, পৃ : ১১৩ ; তারীখুত তাবারী ৩খ,২৯২ পৃষ্ঠা
২৪. তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৬৮০ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪০৩১ ; ইবনে মাজা, হাদীছ নং ১৩০ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৪৩ ; [illegible] . ২৯২ পৃষ্ঠা

পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সমস্যা হল 'খেয়ানত'

এক সময় প্রশ্ন উঠেছিল পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সমস্যা কী ? সবচেয়ে বড় সেই সংকটটি কী, যার নিরসনকে সবার আগে ভাবা দরকার। এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনা- পর্যালোচনা চলছিল। একেকজন একেকটি সমস্যাকে পয়লা নম্বরে স্থান দিচ্ছিল। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে,পয়লা নম্বরের সমস্যা খেয়ানত ছাড়া আর কিছু নয়। আজকাল আমানতের কোন ধারণা আমাদের অন্তরে নেই। নিজ দায়িত্ব পালনের অনুভূতি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার বোধ আমাদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই। জীবন বড় দ্রুত চলছে। দৌড়ঝাঁপ চলছে উপকারের জন্য। খাদ্যের জন্য ও ক্ষমতার জন্য। এই দৌড়ে কে কাকে টপকে সামনে চলে যাবে সেটাই সকলের ধ্যান-জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোন ফিকির নেই। এটাই আজকের সর্বপ্রধান সমস্যা এবং এটাই সকল রোগের মূল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে এ চেতনা সৃষ্টি করে দিলে বাকি সব সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যেতে পারে।

অফিসের আসবাবপত্র ও আমানত

আপনি যেই অফিসে কাজ করছেন, সেখানে যত আসবাবপত্র আছে তার প্রতিটিই আপনার কাছে আমানত। সেগুলো কেবল দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্যই সেখানে রাখা হয়েছে। কাজেই তার কোনওটি আপনি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। তা করলে আমানতের খেয়ানত হবে। লোকে মনে করে অফিসের ছোট-খাট জিনিস নিজ কাজে ব্যবহার করলে এমন কি ক্ষতি হবে ? মনে রাখতে হবে খেয়ানত ছোট জিনিসে হোক বা বড় জিনিসে সর্বাবস্থায়ই তা হারাম। হারামে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহ। উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয়। তাই ছোট-বড় সব রকম খেয়ানতই পরিহার করতে হবে।

সরকারি মালামাল আমানত

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমানতের প্রকৃত অর্থ হল, কেউ আপনার প্রতি আস্থা রেখে কোন কাজ আপনার উপর ন্যস্ত করল আর আপনি তা গ্রহণ করলেন। ব্যস সে কাজ আপনার জন্য আমানত হয়ে গেল। এখন তার আস্থা অনুযায়ী আপনি যদি তা আনজাম না দেন, তবে তা খেয়ানত হবে।

সুতরাং যে সড়কে আপনি চলাচল করেন তা আমানত। যেই বাস বা ট্রেনে আপনি ভ্রমণ করেন তাও আমানত। কাজেই এর ব্যবহার হতে হবে বৈধ উপায়ে। অন্যথায় তা খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন ব্যবহার কালে নষ্ট করে ফেলা, ময়লা করে ফেলা ইত্যাদি। মানুষ তো আজকাল সরকারি রাস্তাকে পৈত্রিক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছে। যার যেমনি ইচ্ছা ব্যবহার করছে। কেউ রাস্তা কেটে পানি নিষ্কাশনের পথ তৈরী করছে, কেউ রাস্তা দখল করে মঞ্চ বানাচ্ছে কিংবা ব্যক্তিগত মালামাল রাখছে। অথচ মাসআলা হল, কেউ যদি ছাদের পানি নামানোর জন্য রাস্তার দিকে নল লাগায়, তবে তার জন্য তাও জায়েয হবে না। কেননা, সে ব্যক্তিগত কাজে এমন শূন্যমন্ডল ব্যবহার করেছে, যার মালিক সে নিজে নয়। অথচ সে নল কোন স্থান দখল করে না, বরং শূন্যে লটকে থাকে মাত্র। পানি নিষ্কাশনের নল কোন দিকে কতটুকু বের করা জায়েয, কোন দিকে কতটুকু জায়েয নয়, এ সম্পর্কে আমাদের ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেহেতু বাড়ির সীমার বাইরে নিজ মালিকানা নেই এবং এ কারণে তা আমানত।

হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত আব্বাস (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। তাঁর ছাদের নল সংক্রান্ত ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ। তার ঘর ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন। তিনি ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য যে নল লাগিয়েছিলেন, তা ছিল মসজিদে নববীর চত্বরের দিকে। ফলে তা থেকে সেই চত্বরে পানি পড়ত। একবার হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর দৃষ্টি সেই নলের দিকে পড়লে দেখলেন মসজিদের চত্বরের দিকে তা লাগানো রয়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন এ নল ভেঙে ফেলা হোক। এভাবে মসজিদের দিকে নল লাগানো জায়েয নয়। সুতরাং নলটি ভেংগে ফেলা হল।

হযরত আব্বাস (রাযি.) যখন দেখলেন, তার ছাদের নল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং জানতে পারলেন তা করা হয়েছে হযরত উমর (রাযি.)- এর নির্দেশে, তখন তিনি খলিফার সংগে দেখা করলেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেন করা হল। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, তা মসজিদের দিকে লাগানো ছিল, তাই ভেংগে ফেলা হয়েছে। হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন, আমি তো এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমেই লাগিয়েছিলাম। হযরত উমর (রাযি.) একথা শোনামাত্র চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমার সাথে চলুন, তিনি হযরত আব্বাস (রাযি.) কে নিয়ে নলের

সেই স্থানে গেলেন। তারপর রুকুর মত নুয়ে পড়লেন এবং হযরত 'আব্বাস (রাযি.)কে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে নলটি যথাস্থানে লাগিয়ে দিন। খাত্তাবের ব্যাটার কি সাহস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে লাগানো নল ভেংগে ফেলে! হযরত 'আব্বাস (রাযি.) বললেন, আপনি শান্ত হোন, আমি এটা লাগিয়ে নেব। কিন্তু হযরত উমর (রাযি.) নাছোড়। বললেন, আমিই এটা ভেংগেছি, আমাকেই এর সাজা ভোগ করতে হবে।[২৫]

তো শরী'আতের মাসআলা তো এটাই যে, সরকারি অনুমতি ছাড়া সে নল লাগানো জায়েয ছিল না। হযরত 'আব্বাস (রাযি.) এর জন্য তা জায়েয হয়েছিল, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকাল কে কার অনুমতি নেয়, যার যতটুকু ইচ্ছা সরকারী জমি দখল করে নেয়। তাতে গুনাহের কাজ হচ্ছে কিনা তার কোন পরওয়া নেই। এমন কি নামাযী লোক পর্যন্ত এরূপ কাজ করছে। একদিকে নামাযও পড়ছে, অন্যদিকে খেয়ানতও হচ্ছে। স্মরণ রাখতে হবে, এ জাতীয় সব কিছুই আমানতের খেয়ানত। এর থেকে বিরত থাকা অবশ্যকর্তব্য।

মজলিসের কথাবার্তাও আমানত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন,

اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ

'মজলিস আমানতের সাথে সম্পৃক্ত।'[২৬]

অর্থাৎ মজলিসে যারা উপস্থিত থাকে মজলিসের কথাসমূহ তাদের জন্য আমানত। এর হেফাজত জরুরি। উদাহরণত এক বৈঠকে দু'তিনজন লোক ছিল। পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধুসুলভ সরলতাবশত তাদের একজন তার একান্ত কোন ব্যক্তিগত কথাও সেখানে বলে ফেলল এবং নিজের গোপন কোন বিষয় প্রকাশ করে ফেলল। ব্যস তার সে কথা অন্যদের জন্য আমানত হয়ে গেছে। তার অনুমতি ছাড়া সে কথা অন্য কারও কাছে বলা জায়েয নয়। বললে তা খেয়ানত হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষ সচেতন নয়। অনেকেরই অভ্যাস হল এর কথা ওর কাছে এবং ওর কথা এর কাছে লাগিয়ে

---

২৫. তাবাকাতে ইবন সা'দ ৪খ, ২০ পৃ

২৬. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২২৬ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৪১৬৬

দেওয়া। এর থেকে নানা অশান্তি ও কলহের সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ মজলিসে যদি কেউ এমন কোন কথা বলে যা দ্বারা অন্য কারও ক্ষতির আশংকা আছে, তবে সেই ব্যক্তিকে তা জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য। যেমন দু'তিনজন মিলে কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল অমুক সময়ে তার বাড়িতে তারা আক্রমণ চালাবে। বলা বাহুল্য এরূপ কথা গোপন করার বিষয় নয় ; বরং দ্রুত সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত যে, তোমার বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্র চলছে, কিন্তু এরূপ বিষয় না হলে মজলিসে বলা কারও গোপন কথা অন্যদের কাছে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

অন্যের গোপন কথাও আমানত

অনেক সময় এমনও হয় যে, মজলিসে কেউ কারও একটা গোপন কথা শুনল। সে অন্য কারও কাছে গিয়ে তা বলে দিল এবং সাবধান করে দিল যে, দেখ এটা কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। তোমাকে জানালাম, কিন্তু তুমি যেন অন্য কারও কাছে প্রকাশ করো না। সে মনে করে যেহেতু কাউকে বলতে মানা করে দিয়েছে, তাই তার দ্বারা আমানতের খেয়ানত হয়নি, সে আমানতের যথাযথ হেফাজত করেছে। অতঃপর ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিও একই কাজ করে। তৃতীয় একজনকে তা জানিয়ে দেয় এবং সাবধান করে দেয় অন্য কাউকে যেন না বলে। এভাবে পর্যায়ক্রমে তা বিস্তার হতে থাকে আর প্রত্যেকেই মনে করে সাবধান করে দেওয়ার কারণে গোপন কথা প্রকাশে তার কোন দোষ হয়নি এবং সে আমানত রক্ষা করেছে। অথচ ব্যাপারটা গোপনীয় হওয়ায় প্রথম ব্যক্তির জন্যও তা প্রকাশ করা জায়েয হয়নি। যতই সে তা অন্যকে বলতে নিষেধ করুক। তারপরও সে আমানতের খেয়ানত করে ফেলেছে এবং একটি নাজায়েয কাজ করেছে।

মানুষের এ অভ্যাস সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। আমাদের সমাজে নানারকম অশান্তি এ পথেই বিস্তার লাভ করে। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, লাগানি-ভাঙ্গানি সামাজিক সব অশান্তির মূল। একজন কারও কাছে গিয়ে বলল, অমুকে আপনার সম্পর্কে এই-এই কথা বলছিল। এ কথা শোনামাত্র তার অন্তরে সেই ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল। অতঃপর উভয় পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে কতটুকু কি করতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল। সেই প্রতিযোগিতা থামানোর সাধ্য কার ? এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লাগানি-ভাংগানির কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।

টেলিফোনে আড়ি পাতাও খেয়ানত

দু'জন লোক এক পাশে গিয়ে আস্তে কথা বলছে। দূর থেকে আপনি কান পেতে শোনার চেষ্টা করছেন তারা কী বলছে, এটাও আমানতের খেয়ানত। সুতরাং এটাও পরিত্যাজ্য।

অনেক সময় টেলিফোনের লাইন ক্রসিং হয়ে যায়। ফলে একজনের ফোনে অন্যদের ফোনালাপ চলে আসে। মনে রাখতে হবে এভাবে আপনার ফোনে যদি অন্যদের ফোনালাপ চলে আসে, আর আপনি তা শুনতে থাকেন, তবে এতে খেয়ানতের গুনাহ হবে। এটা গুপ্তচরবৃত্তিও। এভাবে কোন মুসলিমের পেছনে গুপ্তচরগিরি করা বা তার গোপন বিষয় জানার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ না জায়েয। অথচ আজকাল এরূপ কাজ নিয়ে গর্ব করা হয়। অন্যের গুপ্ত বিষয় জানতে পারাকে কৃতিত্ব মনে করা হয়। খুশির সাথে বলা হয় আমি অমুকের গোপন খবর জানতে পেরেছি। একবারও ভাবা হয় না এটা কতবড় অপরাধ, যাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়ানত ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা

সারকথা হচ্ছে, 'আমানতের খেয়ানত' কথাটি অতি ব্যাপক। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যে সম্পর্কে আমাদেরকে আমানত রক্ষার হুকুম দেওয়া হয়নি এবং খেয়ানত করতে নিষেধ করা হয়নি। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম সবই আমানতের পরিপন্থী ও খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এ হাদীছ সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনটি জিনিস মুনাফিকের আলামত- কথা বললে মিথ্যা বলা, ওয়াদা করলে তা ভংগ করা এবং আমানতের খেয়ানত করা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর অনুসরণ করার তাওফীক দিন। বস্তুত এ সবই দীনের অংশ। আমরা দীনকে খুবই সীমিত করে ফেলেছি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা দীনের এসব শিক্ষা ভুলে গেছি। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাদের অন্তরে প্রকৃত দীনের চেতনা দান করুন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেখে যাওয়া শিক্ষা অনুযায়ী চলার তাওফীক দিন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :
ইসলাহী খুতুবাত ৩য় খণ্ড, ১৭৪-১৯৫ পৃষ্ঠা

নিন্দা করা ও খোঁচা দেওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَاهَادِىَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا بِلَعَّانٍ وَلَا الْفَاحِشِ ولا الْبَذِءِ

'হযরত ইবন মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন নয় নিন্দা-কটাক্ষকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীল ভাষা ও অশিষ্ট।[২৭]

কয়েক জুমু'আ যাবৎ মুখের গুনাহ সম্পর্কে আলোচনা চলছে। সূফী সাধকগণ এ জাতীয় গুনাহকে 'মৌখিক আপদ' নামে উল্লেখ করে থাকেন।

আমরা কেবল বাহ্যিক বিপদাপদের দিকেই নজর রাখি। তাই কোন রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে, জানমালের কোন ক্ষতি হলে কিংবা পার্থিব কোন অনিষ্ট সাধিত হলে কেবল তাকেই মসিবত মনে করি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সকল বান্দাকে সত্যদর্শী দৃষ্টি দিয়েছেন তারা বলেন ভিন্ন কথা। তারা বলেন, প্রকৃত বিপদ সেটাই যার দরুন মানুষের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণেই দুনিয়া

কারও পার্থিব কোনও ক্ষতি হয়ে গেলে তা হতেই পারে। সেটা কোনও দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কেননা, দুনিয়ায় সুখ- দুঃখ পাশাপাশি চলে। কখনও

---

২৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯০০ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৩৬৪৬

লাভ কখনও লোকসান, কখনও আনন্দ কখনও বেদনা- এ-ই হচ্ছে দুনিয়া। এখানকার সুখ স্থায়ী নয়, দুঃখও নয় অনন্ত। কারও কোন দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন তার অবসান হবে এবং তখন সে অতীতের সব কষ্ট ভুলে যাবে, কিন্তু আল্লাহ না করুন, কারও দীনী কোন মসিবত দেখা দিলে সেটা সত্যিই ভাবনার বিষয়। কেননা, তা দ্বারা যে ক্ষতি হয়ে যায় তা কখনও পূরণ হওয়ার নয়।

আমাদের কোন দীনী মসিবত যেন দেখা না দেয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী চমৎকার চমৎকার দু'আ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তার একেকটি শব্দের উপর জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া যেতে পারে। তিনি তাঁর এক দু'আয় বলেন-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا

'হে আল্লাহ ! আমার দীনের উপর কোন মসিবত দিওনা।'[২৮]

কেননা দুনিয়ায় আসার পর মানুষকে কোনও না কোনও মসিবতের সম্মুখীন হতেই হয়। রাজা-বাদশা, বিত্তবান-ক্ষমতাবান যাই হোক না কেন, কখনও মসিবতে পড়েনি এমন কোনও মানুষ পাওয়া যাবে না। কাজেই মসিবত ভোগ দুনিয়ার এক অনিবার্য বিষয়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আয় দীনকে প্রাধান্য দিয়ে বলা হয়েছে, কোনও দীনী মসিবত যেন আমাদের দেখা না দেয়। এ দু'আর পরবর্তী অংশ হল-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا

'হে আল্লাহ ! দুনিয়াকে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তা-ভাবনার বিষয়ে পরিণত করবেন না এবং আমাদের জ্ঞানের সীমা ও আগ্রহের লক্ষবস্তুতেও নয়।

অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, সর্বক্ষণ দুনিয়া নিয়েই পড়ে থাকি আর আখিরাতের চিন্তা ভুলে যাই। যা কিছু জ্ঞান শিখি তাও কেবল এই দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই হয়, দীন সম্পর্কে থাকি অজ্ঞ-উদাসীন হয়ে আর যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা করি তাও কেবল ইহলৌকিকই হয় আর আখিরাত সম্পর্কে থাকি গাফেল, তা থাকে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরে।

---

২৮. রাওযাতুল-মুহাদ্দিছীন, ৮খ, ৪১পৃ, হাদীছ নং ৩৩১৬ ; আল-জামিউস-সাগীর, ১খ, ২১৫,হাদীছ নং, ২১৪৮

সমস্ত গুনাহই মসিবত

সুতরাং আসল বিপদ সেটাই যা দীনের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। সে হিসেবে যাবতীয় গুনাহই মসিবত, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাকে সুখকর ও আনন্দদায়ক বিষয় বলে মনে হয়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা মানুষের দুনিয়াকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে আর আখিরাতকেও ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই সূফিয়ায়ে কিরাম পাপাচারকে 'মসিবত' শব্দেই ব্যক্ত করে থাকেন। তো মুখ দিয়ে যে সব গুনাহ করা হয়, তাঁদের ভাষায় তা হচ্ছে آفَةُ اللِّسَانِ 'জবানের মসিবত। কেননা, তার পরিণামে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে মহামসিবতের সম্মুখীন হয়। জবানের মসিবতসমূহের মধ্যে একটা তো গীবত, সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আমি যে হাদীছখানি পড়েছি, তাতে আরও কিছু মসিবতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-'মুমিন হয় না নিন্দাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও রূঢ়ভাষী। অর্থাৎ মু'মিন তার জবানকে সর্বদা এসব জিনিস থেকে হেফাজত করবে। নিন্দাসূচক কোন শব্দ সে তার মুখ থেকে বের হতে দেবে না। কাউকে কখনও অভিশাপ দেবে না, কখনও কারও সাথে অশ্লীল কথা বলবে না এবং মুখ খারাপ করবে না। এ হাদীছে চারটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে। চারওটির সম্পর্ক মুখের সাথে।

খোঁচা মেরে কথা বলা

এ হাদীছে প্রথমে বলা হয়েছে 'মু'মিন কটাক্ষকারী হয় না'। অর্থাৎ কারও মুখের উপর এমন বাঁকা কথা বলে না, যা দ্বারা সে আহত হয়। কাউকে তার দোষ সম্পর্কে সচেতন করার এক পদ্ধতি হল সোজাসুজি তাকে বলে দেওয়া যে, আপনার মধ্যে এই দোষ আছে। কিন্তু আরেকটি হল কুটিল পদ্ধতি। অর্থাৎ অন্য কোনও কথার ফাঁকে কাউকে খোঁচা মারা। যেমন একটা বিষয়ে কথা হচ্ছে। সেখানে একজন লোককে খোঁচা মারা আপনার উদ্দেশ্য। আপনি সেই কথার মাঝখানে একটা বাক্য বলে দিলেন। তা দ্বারা আপনি সরাসরি তার দোষের কথা বললেন না, কিন্তু যে-কেউ লক্ষ করলে বুঝবে আপনি সেই বিশেষ লোকটিকেই খোঁচা মেরেছেন। আরবীতে একে বলে طعن (তা'ন) অর্থাৎ কঠাক্ষ করা। এতে সরাসরি বলার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত লাগে। তাই এটা কঠিন গুনাহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এ পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, কটাক্ষ করা বা কাউকে খোঁচা মেরে কথা বলা কোন মু'মিনের কাজ নয়।

মুখের কথায় অন্তর জখম হয়

طعن (তা'ন) শব্দের মূল অর্থ 'বর্শা' দ্বারা আঘাত করা।' কটাক্ষ করাকে এ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মাঝে ইশারা রয়েছে যে,এটা বর্শা দ্বারা আঘাত করার মত। অর্থাৎ এর দ্বারা অন্যের অন্তর জখম হয়। কবি বলেন-

جِرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

'বর্শার দ্বারা আঘাত করলে সে ঘা তো শুকিয়ে যায়, কিন্তু মুখের দ্বারা যে আঘাত করা হয় সে ঘা কখনও শুকায় না।'[২৯]

অর্থাৎ কেউ অন্যকে নিন্দা-কটাক্ষমূলক কোন কথা বললে তাতে তার অন্তরে স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মানুষ বহু দিন তা ভুলতে পারে না। ক্ষণে-ক্ষণে মনে পড়ে অমুক ব্যক্তি অমুক দিন আমাকে খোঁচা মেরে কথা বলেছিল। এভাবে তার সে ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সুতরাং অন্যকে খোঁচা মারা পরিহার করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে কিছুতেই মুখ থেকে এমন কোন কথা বের না হয়ে যায়, যা অন্যের অন্তরকে জখম করে ও অন্যের ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ অনুযায়ী এরূপ কাজ ব্যক্তির ঈমানের পরিপন্থী।

মু'মিনের জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা

একজন মু'মিনের জানমাল ও ইজ্জত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্নভাবে এ তিনটি জিনিসের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। তিনি এর এমন মর্যাদাই উল্লেখ করেছেন যা আমাদের পক্ষে অনুমান করাই সম্ভব নয়। বিদায় হজ্জের ভাষণের দিকেই লক্ষ করুন না। তিনি ভাষণের এক পর্যায়ে বলে ওঠেন, আজকের এ দিনটি কোন দিন ? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এটা তো আরাফার দিন। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যেখানে অবস্থান করছি, এটা কোন জায়গা? সাহাবীগণ আরয করলেন, এটা পবিত্র হারামের এলাকা। তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, এটা কোন মাস ? সাহাবীগণ আরয করলেন, এটা যুলহিজ্জা মাস। অবশেষে তিনি বললেন, শোন হে মুসলিমগণ ! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এমনই মর্যাদাপূর্ণ, যেমন মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা এই দিন এই মাস ও এই স্থানকে দিয়েছেন।[৩০]

---

২৯. শারহু কিতাবিল-আমছাল,১খ, ২৩ পৃ,তাজুল-আরূস ১খ, ৭০৬৭ পৃ.।

৩০. বুখারী, হাদীছ নং১৬২৩ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৯৩২

পবিত্র কা'বা ঘরকে ভেংগে ফেলার মত অপরাধ

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরের তওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ তিনি পবিত্র কা'বাকে লক্ষ করে বললেন, হে কা'বা ! তুমি কতই না মর্যাদাপূর্ণ ঘর! কতই না তোমার পবিত্রতা ! তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুল্লাহ ! দুনিয়ায় এই কা'বা ঘর অপেক্ষাও বেশি মর্যাদাপূর্ণ কোনও জিনিস আছে কি ? আমি আরয করলাম 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। এটা ছিল সাহাবায়ে কিরামের এক সুনির্দিষ্ট জবাব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে-কোনও প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

হযরত ইবন উমর (রাযি.) সেই উত্তরই দিলেন। অর্থাৎ কা'বার চেয়েও বেশি মর্যাদা কোন জিনিসের আছে তা আমার জানা নেই। তা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, একটা জিনিস আছে, যার মর্যাদা কা'বারও উপরে। তোমাকে আমি যে জিনিস সম্পর্কে জানাচ্ছি। শোন, তা হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির জান-মাল ও তার ইজ্জত। কেউ এর কোন একটির ক্ষতিসাধন করলে সে যেন কা'বাঘরকে ভেংগে ফেলল।[৩১]

মু'মিনের অন্তর আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীর স্থান

কাউকে কটাক্ষ করলে মূলত তার ইজ্জত-সম্মানকেই আঘাত করা হয়। এতে তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়। আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল-হাই 'আরেফী (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ মু'মিনের অন্তরকে তো একটি কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সে কাজটি হল আল্লাহর তাজাল্লী ও জ্যোতিপাত। অর্থাৎ মু'মিনের অন্তর কেবল আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লীরই স্থান হবে। সেখানে থাকবে আল্লাহর জিকির ও তাঁর স্মরণ, তাঁর ফিকর ও তাঁর মহব্বত।

সূফী-সাধকদের কেউ-কেউ তো এ পর্যন্তও বলেছেন যে, মু'মিনের অন্তর আল্লাহর আরশ। অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত অধিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ তা'আলার নূর তাতে বিচ্ছুরিত হয়। একজন মানুষ যতই খারাপ হোক, তার অন্তরে যদি ঈমান থাকে, তবে একদিন না একদিন সেখানে আল্লাহপ্রেম এসে ঠাঁই নেবেই। যে অন্তরকে আল্লাহপ্রেমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে আঘাত করা তো – আল্লাহ পানাহ – মহান আরশে আঘাত করারই নামান্তর। তাই বলা হয়েছে, কোন মুসলিমের অন্তরে আঘাত করা

---

৩১. ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৯২২

কা'বা ঘরকে ভেংগে ফেলার সমান। কোন মুসলিমের পক্ষে তো এহেন কাজ শোভা পেতে পারে না।

মুসলিমের মন রক্ষা অতিবড় পুণ্যের কাজ

অপরপক্ষে কোনও মুসলিমের মন রক্ষা করা ও তাকে সান্ত্বনা দেওয়া বা এমন কোনও কথা তাকে বলা যাতে তার অন্তর খুশি হয়ে যায়, অতিবড় পুণ্যের কাজ। মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন,

دل بدست اور کہ حج اکبر است

'অন্যের প্রাণে শান্তি জোগাও। এটা বড় হজ্জতুল্য !

অর্থাৎ এতে হজ্জের ছওয়াব মেলে। অন্যের মনে কষ্ট দিও না। তাতে কবীরা গুনাহ হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, একদিকে আমর বিল-মারূফ ওয়া নাহী 'আনিল-মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবার অন্যদিকে বলা হচ্ছে, কারও মনে আঘাত দিও না। এটা কি পরস্পরবিরোধী হুকুম হল না ? উত্তর হল, অন্যকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে কল্যাণকামিতার চেতনায়। তাকে যা বলবে একাকি বলবে, কোমল ভাষায় বলবে এবং মহব্বতের সাথে বলবে। বলার ধরন এমন হবে, যাতে তার অন্তরে আঘাত না লাগে। উদাহরণত, তাকে বলবে, ভাই ! তোমার এ বিষয়টা সংশোধনযোগ্য। তুমি এটা সংশোধন করে ফেল। কোনওক্রমেই খোঁচা দিয়ে কথা বলা যাবে না। লোকসম্মুখে হেয় করা যাবে না। সে রকম কিছু করলে তার অন্তরে আঘাত লাগবে এবং সে কারণে তা সম্পূর্ণ হারাম কাজ হবে।

এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য আয়নাস্বরূপ

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

এক মু'মিন অপর মু'মিনের আয়না।[৩২]

---

৩২. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৭২

আয়নায় চেহারা দেখলে চেহারার খুঁত, দাগ, ময়লা, ইত্যাদি নজরে আসে, ফলে তা দূর করা সম্ভব হয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব-চরিত্রের ত্রুটি তো আয়নায় দেখা যায় না। তা সংশোধনের উপায় কী ? এ হাদীছ জানাচ্ছে, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না। অর্থাৎ একজনের দোষ অন্যজনের নজরে আসে, অন্যের কাছে ধরা পড়ে তার মধ্যে কি কি দোষ আছে। সে তাকে বলে দেবে, ভাই তোমার মধ্যে এই- এই দোষ আছে, তুমি এসব সংশোধন করে ফেল।

আয়নার সাথে তুলনা করার কারণ

এ হাদীছ আমিও পড়েছি এবং আপনারাও পড়েছেন কিংবা শুনেছেন। কিন্তু এর তাৎপর্য আমরা ঠিক কতটুকু বুঝেছি? আল্লাহ তা'আলা যাকে সত্যিকারের ইলম দান করেন, তার দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি এমন অনেক কিছুই বুঝতে পারেন, যা আমাদের মত লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) ছিলেন সেই ধরনের এক ব্যক্তি। তিনি এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীছে মু'মিনকে আয়নার সাথে তুলনা করা হয়েছে। লোকে এ তুলনার এতটুকু ব্যাখ্যা তো বুঝতে পারে যে, আয়না যেমন চেহারা ও দেহের দোষ ত্রুটি জানিয়ে দেয়, তেমনি একজন মু'মিনও অন্য মু'মিনের দোষ ত্রুটি বলে দেয়। কিন্তু এর তাৎপর্য কেবল এতটুকু নয়। বরং কথা আরও আছে। তা হল আয়নার কাজ হল দোষ ত্রুটির কথা কেবল তাকেই জানানো যার মধ্যে তা আছে এবং যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের লোকদের ডেকে জানায় না যে, দেখ এই লোকের মধ্যে এই-এই ত্রুটি আছে। মু'মিনকেও ঠিক এরকমই হতে হবে। সেও কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই গোপনে মহব্বতের সাথে দরদপূর্ণ ভাষায় বলবে, ভাই তোমার মধ্যে এই ত্রুটি ও দুর্বলতা আছে। সংশোধন করে ফেল। অন্যদের বলে বেড়াবে না যে, অমুকের মধ্যে এই-এই দোষ আছে। বস্তুত অন্যকে হেয় করা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো কোন মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

উপরিউক্ত হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (ক) মু'মিনের কাজ হল অন্য মু'মিনের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখতে পেলে তাকে তা অবহিত করবে ; (খ) তা অবহিত করবে কেবল তাকেই। অন্যদের কাছে গেয়ে বেড়াবে না এবং লোকসম্মুখে তাকে লজ্জিত করবে না।

অন্যকে খোঁচা মারাও এখন এক শিল্প

আধুনিক সমাজে অন্যকে খোঁচা মারার ব্যাপক প্রচলন। এখন এটা যথারীতি শিল্পে পরিণত হয়ে গেছে। কত কায়দা করে অন্যকে নিন্দা-কটাক্ষ করা যায় চর্চা করে করে তা আয়ত্ত করা হচ্ছে এবং এতে কারও দখল থাকাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এতে যে অন্যের মনে আঘাত দেওয়া হয় অন্যকে লোক সমাজে হেয় করা হয়, সে দিকে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

নবীগণ কারও মনে আঘাত দিতেন না

আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা প্রায় এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার দীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্যই এসেছিলেন। এ কাজে তারা অশেষ মেহনত করেছেন। কিন্তু তাদের একজনের জীবনেও এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না, যাতে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে বা কোন কাফেরকে খোঁচা মেরেছেন কিংবা কারও মনে আঘাত দিয়ে কথা বলেছেন। বরং তারা যাকেই যে কথা বলতেন অত্যন্ত কল্যাণকামিতার সাথে বলতেন, দরদপূর্ণ ভাষায় বলতেন, যাতে তা দ্বারা অন্যের ইসলাহ ও সংশোধন হয়। কিন্তু আজকাল অন্যকে কটাক্ষ করা ও খোঁচা মেরে কথা বলা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

কারও যখন সাহিত্য চর্চা বা কোনও বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা হয় কিংবা বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করে তোলার আগ্রহ হয় তখন সেই রচনা বা বক্তৃতার একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে থাকে অন্যের নিন্দা-সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষ। এ ছাড়া যেন লেখা ও বক্তৃতা পূর্ণতা পায় না বা আকর্ষণীয় হয় না।

আমার একটা রচনার কাহিনী

আনুমানিক ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর আগের কথা। আমি দারুল-উলূম করাচি থেকে পড়াশুনা সবে শেষ করেছি। মরহুম আয়্যুব খানের শাসনকাল, তার আমলে নতুন পারিবারিক আইন জারি করা হয়, আমি তার বিরুদ্ধে কলম ধরি। একটি বইও লিখে ফেলি। তাতে যারা যারা সে আইনের সমর্থন করেছিল, তাদের নাম ধরে ধরে তাদের প্রদত্ত দলীল খন্ডন করি। বইয়ের কোথাও কোথাও তাদের লক্ষ করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভাষাও ব্যবহার করা

হয়েছিল। তখন যেহেতু লেখক হওয়ার খুব সখ, তাই বিভিন্নভাবে নিজ লেখাকে ধারালো করার কসরত চলছিল। ফলে বইটিতে এমন বহু বাক্য এসে যায় যা ছিল তীব্র আক্রমণাত্মক এবং এই ভাবে বেশ তৃপ্তিও বোধ করছিলাম যে, বেশ যুৎসই কথা বলে দিয়েছি। রচনা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-কে পড়ে শোনালাম। প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার বই।

কী উদ্দেশ্যে এটি লিখেছ ?

সম্পূর্ণ রচনাটি তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শেষে বললেন, তুমি এটি কী উদ্দেশ্যে লিখেছ? যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে এই যে, তোমার সাথে যারা আগে থেকেই একমত, তারা এতে খুশি হবে, প্রশংসা করে বলবে বাহবা! কী দাঁতভাঙা জবাব! কী চমৎকার ভাষা এবং এর রচনাশৈলি কতই না শিল্পমান সম্মত, তবে বলতে হবে এটি সুন্দর বই হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাকে এও ভাবতে হবে যে, আল্লাহর কাছে এর কতটুকু মূল্য হবে?

আর যদি উদ্দেশ্য থাকে মানুষের ইসলাহ, অর্থাৎ যারা ভুল ধারণার উপর আছে, এই লেখা পড়ে তারা নিজেদের সংশোধন করে ফেলবে, তবে তুমি যে ভাষায় এটি লিখেছ তাতে এটা পড়ে কারও ইসলাহ তো হবেই না ; উল্টো এতে তাদের অন্তরে জিদ সৃষ্টি হবে এবং তারা আরও বিগড়াবে। দেখ, আম্বিয়া 'আলাইহিমুস-সালাম দুনিয়ায় এসে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, কুফর ও শিরকের মুকাবিলা করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একজনকেও পাবে না, যিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাষায় কথা বলেছেন। কাজেই প্রথমে স্থির কর তুমি এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য লিখেছ না মাখলূকের জন্য। যদি আল্লাহর জন্য লিখে থাক অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয়, তবে এর থেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অংশটুকু ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং পদ্ধতি বদলাতে হবে।

এটা নবীগণের পন্থা নয়

আমার স্মরণ আছে, আব্বাজী যখন আমাকে এ পরামর্শ দিলেন, মনে হচ্ছিল মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়েছে। কেননা, দুই-আড়াইশ পৃষ্ঠার একটি বই সম্পূর্ণ লিখার পর সেটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিষয়টা আমার কাছে খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। বিশেষত এ কারণেও যে, তখন লেখক হওয়ার বড় সাধ এবং সেই সাধ পূরণার্থে লেখাটিতে যথেষ্ট

পরিশ্রম করা হয়েছে। বেছে বেছে বাক্য বানানো হয়েছে। সে সব বাক্য ছেটে ফেলতে হবে ভাবতেই মন দমে যাচ্ছিল। কিন্তু আব্বাজীর ফয়েযই বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমি বইটিকে আবার নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে, বরং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লিখতে সক্ষম হই। অতঃপর সেটি ہمارے عائلی قوانین (আমাদের পারিবারিক আইন) নামে মুদ্রিত হয়- আলহামদুলিল্লাহ। তা সেটাও একটা দিন ছিল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এখন অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, যে ব্যক্তি সত্যের পথে দাওয়াতদাতা হবে, তার জন্য বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী অবলম্বন কিছুতেই জায়েয নয়। এটা আম্বিয়া 'আলাইহিস-সালামের তরিকা নয়।

হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামকে ইলাহী নির্দেশনা

আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা 'আলাইহিস-সালামকে ফির'আওনের কাছে দাওয়াতী কাজের জন্য পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাকে ও তাঁর ভাই হারুন 'আলাইহিস সালামকে নির্দেশনা দান করেন-

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

'তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে বা ভয় পায়।[৩৩]

আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, তোমরা হযরত মূসা 'আলাইহিস-সালামের চেয়ে বড় সংস্কারক হতে পারবে না এবং তোমরা যাকে দাওয়াত দেবে সেও ফির'আওনের চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট হবে না। ফির'আওন তো নিজেকে 'খোদা' বলে দাবি করেছিল। আল্লাহ তা'আলা জানতেন সে কখনও ঈমান আনবে না এবং কুফর অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে, তা সত্ত্বেও নির্দেশ দিয়েছেন যে তার কাছে গিয়ে নম্র ভাষায় কথা বলো। তাকে কোমলভাবে দাওয়াত দাও। তা হযরত মূসা 'আলাইহিস-সালামকেই যখন নম্রপন্থা অবলম্বনের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তখন তুমি আমি কোন কাতারে পড়ি ?

হক কথা তো লাঠি নয়

আজকাল আমরা হক কথা-এর ক্ষেত্রে দু'রকম প্রান্তিকতার শিকার। (ক) এক তো অধিকাংশ লোকের এই চিন্তাই নেই যে, দীনের কথা কাউকে

---

৩৩. তোয়াহা : ৪৪

শিখাতে হবে কিংবা কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাকে শোধরাতে হবে। (খ) দ্বিতীয়ত কারও অন্তরে যদি এ চিন্তা থাকেও, তবে সে চরমপন্থা অবলম্বন করে। যেন 'হক কথা' একটা লাঠি, যেভাবে ইচ্ছা তুলে কারও মাথায় বাড়ি মারল। কিংবা যেন একটা পাথর, তা তুলে কারও উপর ছুড়ে মারল।

নবীগণ কিভাবে জবাব দিতেন ?

আম্বিয়া 'আলাইহিস-সালামের তরিকা তো এ রকম ছিল না। তারা দাওয়াত দেওয়ার সময় কাউকে খোঁচা মারতেন না। কাউকে বিদ্রূপ করতেন না। এমনকি তারা যাদের দাওয়াত দিতেন, তারাও যদি তাদের গালমন্দ করত, তার জবাবেও তারা মন্দ কথা বলতেন না। হযরত হূদ 'আলাইহিস-সালামের ঘটনা। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল,

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٦٦

'আমরা তো তোমাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।'[৩৪]

চিন্তা করে দেখুন, একজন নবী, জ্ঞানবত্তা ও সত্যবাদিতা যার মজ্জাগত, তাকে ন্যাক্কারজনকভাবে নির্বোধ ও মিথ্যুক ঠাওরানো হচ্ছে। কী চরম ধৃষ্টতা! অথচ এর জবাবে তিনি কী দরদের সাথে বলছেন-

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦٧

হে আমার সম্প্রদায় ! আমি নির্বোধ নই। বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন রাসূল।'[৩৫]

হযরত নূহ 'আলাইহিস-সালামকে লক্ষ করে তার কওম বলেছিল,

إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٦٠

'আমি দেখছি, তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার ভিতর রয়েছ।'[৩৬]

এর উত্তরে তিনি বলছেন,

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦١

---

৩৪. আরাফ : ৬৬

৩৫. আ'রাফ : ৬৭

৩৬. আ'রাফ : ৬০

'হে আমার কওম ! আমার মধ্যে কোনও পথভ্রষ্টতা নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন রাসূল।

দেখতেই পাচ্ছেন, নবীগণ আঘাতের জবাবে আঘাত করেননি। মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দিয়ে দেননি।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ঘটনা

আমি আমার মহান পিতা (রহঃ)-এর কাছে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ঘটনা শুনেছি। তিনি এত বড় বুযুর্গ ছিলেন। যার তুলনা নিকট অতীতে খুজে পাওয়া কঠিন। শাহী খান্দানের এক শাহযাদা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষে বের হয়ে পড়েন এবং সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করে নেন। একদিন দিল্লীর জামে মসজিদে ভাষণ দিচ্ছিলেন, ভাষণের মাঝখানে জলসার ভেতর একজন লোক দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল, আমরা শুনেছি আপনি নাকি জারজ সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। এত বড় একজন 'আলেম ও শাহযাদাকে এহেন জঘন্য গালি, তাও ভরা মজলিসে ! মজলিসও ছিল ভক্ত-অনুরক্তদের।

আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, আমাদের মত লোক হলে কি কঠিন শাস্তিই না তাকে দিত আর নিজে না দিলেও ভক্তবৃন্দ তাকে পিষে ফেলত। অন্ততপক্ষে গালির জবাবে গালি তো দিতই। বলত তুই হারামযাদা, তোর বাপও হারামযাদা। কিন্তু হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) তো ছিলেন নবীসুলভ দাওয়াতের ঝান্ডাবাহী। তিনি শান্ত সমাহিত কণ্ঠে উত্তর দেন,

'আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। আমার বাবা মায়ের বিবাহের সাক্ষী তো আজও দিল্লীতে সশরীরে বর্তমান আছে।

তিনি গালিটিকে মাসআলার লেবাস পরিয়ে দিয়েছেন। গালির জবাবে গালি দেননি।

সুতরাং নিন্দার জবাব নিন্দা দিয়ে নয় যৌক্তিকভাবেই দেওয়া চাই। যদিও শরী'আত মানুষকে এই অধিকার দিয়েছে যে, কেউ আপনাকে যেই গালি দেবে আপনিও তাকে অনুরূপ গালি দিতে পারেন, কিন্তু আম্বিয়া 'আলাইহিস-সালাম ও তাদের ওয়ারিশগণ প্রতিশোধ গ্রহণের এ অধিকার কখনও প্রয়োগ করেননি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবন উন্মুক্ত গ্রন্থ হয়ে মানুষের সামনে বর্তমান। চোখ বুলিয়ে দেখুন জীবনে একটিবারও তিনি এ অধিকার প্রয়োগ করেছেন কি না। সারা জীবন কেবল ক্ষমাই করে গেছেন। নবীগণের যারা উত্তরাধিকারী তারাও ক্ষমা করতেই ভালোবাসতেন।

প্রতিশোধ গ্রহণ নয়, ক্ষমা করতে শিখুন

আপনাকে কেউ গালি দিলে তাতে আপনার এমন কী ক্ষতি হয়ে গেছে? আপনার কী আখেরাত বরবাদ হয়ে গেছে ? বরং তাতে তো আপনার লাভই হয়েছে। আখিরাতে সেজন্য আপনি অনেক ছওয়াব পাবেন। আপনি যদি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেন, তবে আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে ক্ষমা করবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেই দিন ক্ষমা করে দেবেন, যেদিন তার ক্ষমার প্রয়োজন অনেক বেশি হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা ছেড়ে দিন এবং যত বেশি সম্ভব ক্ষমা করতে থাকুন।

বুযুর্গদের বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি

এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বলল, হযরত ! আমরা শুনেছি বুযুর্গানে দীনের ধরন-ধারণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাদের একেকজনের একেক রকম রঙ। আমার বড় জানতে ইচ্ছা করে ব্যাপারটা কী রকম। বুযুর্গ বললেন, তুমি আবার এ চক্করে পড়লে কেন ? বুযুর্গদের রঙ তাদের থাকুক। তোমার এর পেছনে পড়ার কোন দরকার নেই। নিজ কাজে লেগে থাক। কিন্তু লোকটি পীড়াপীড়ি করতে থাকল। তাকে জানতেই হবে বুযুর্গদের বিচিত্র ধরনের ব্যাপারটা কেমন। শেষে সেই বুযুর্গ বললেন, তোমার যদি তা জানার এতই সাধ, তবে দিল্লীর অমুক মসজিদে যাও। সেখানে তিনজন বুযুর্গ আছে। তাদেরকে যিকর-আযকারে মশগুল দেখতে পাবে। তুমি গিয়ে তাদের প্রত্যেকের পিঠে একটা করে ঘুষি মারবে। তারপর কার কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করবে। কথা মত লোকটি চলে গেল, গিয়ে দেখল ঠিকই তিনজন বুযুর্গ যিকরে মশগুল আছেন। সে প্রথমে একজনের পিঠের উপর একটা ঘুষি মারল। কিন্তু সে বুযুর্গ ফিরেও তাকালেন না। আপন কাজে লেগে থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় জনকে ঘুষি মারল, সংগে সংগে বুযুর্গ ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাকেও অনুরূপ একটা ঘুষি মারলেন। তারপর তিনি আবার যিকরে লেগে গেলেন। শেষে তৃতীয় জনকে ঘুষি মারলেন। তিনি উঠে লোকটার হাত চেপে ধরলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আহা : আপনার লাগেনি তো।

তারপর লোকটি সেখান থেকে ফিরে আসল এবং নিজ বুযুর্গের কাছে ঘটনার বিবরণ দিল। জানাল যে, বড় আজব ব্যাপার দেখে আসলাম। প্রথমজনকে যখন মারলাম সে ফিরেও তাকাল না ; বরং আপন কাজে ডুবে

থাকল। দ্বিতীয়জনকে মারামাত্রই সে ঘুরে দাঁড়াল এবং আমাকেও একটা ঘুষি লাগিয়ে দিল। আর তৃতীয়জন উল্টো আফসোস করতে করতে বলল, আহা তুমি ব্যাথা পাওনি তো ?

বুযুর্গ বললেন, আচ্ছা বল তো, দ্বিতীয়জন যখন তোমাকে ঘুষি মেরেছিল। সে কি মুখে কিছু বলেছিল ? সে বলল, না মুখে তো কিছু বলেনি, বরং একটা ঘুষি মেরে ফের আপন কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। বুযুর্গ বললেন, তা হলে এবার শোন এর রহস্য। প্রথমজন যে বদলা নেননি তার কারণ তিনি চিন্তা করেছেন, মেরেছ তো আমার কি ক্ষতি হয়েছে। এখন যদি আমি কে মেরেছে তা দেখতে যাই এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করি তবে অহেতুক সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে যিকরে রত থাকি। তাতেই আমার লাভ। তাঁর দৃষ্টান্ত এ রকম, জনৈক বাদশা এক ব্যক্তিকে বলে পাঠাল যে, আমি তোমাকে একটি মূল্যবান উপহার দেব। সংবাদ শোনামাত্র লোকটি রাজ দরবারের উদ্দেশ্যে ছুটল। হাতে সময় বড় কম। উপহার পেতে হলে সময় মত পৌছতে হবে। কাজেই এ দিক-ওদিক লক্ষ করার অবকাশ নেই। সে সোজা ছুটতে লাগল। অকস্মাৎ পথে এক ব্যক্তি তাকে এক ঘুষি লাগিয়ে দিল। এখন সে ব্যক্তি কি করবে ? সে কি যে মারল তার সাথে বোঝাপাড়া করবে, না তাকে উপেক্ষা করে আপন পথে চলতে থাকবে ? বলা বাহুল্য সে ওই লোকটার পেছনে পড়বে না বরং কিভাবে সময় মত পৌছা যায় এবং বাদশাহর কাছ থেকে সেই মূল্যবান উপহার অর্জন করা যায় সেই চেষ্টাতেই থাকবে, অন্য কিছুতে না জড়িয়ে সেই পথেই চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় বুযুর্গ যে প্রতিশোধ নিয়েছেন সেটাও তার দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ হয়েছে। তিনি চিন্তা করেছেন, কেউ আঘাত করলে অনুরূপ আঘাত করার অধিকার শরী'আতই দিয়েছে। কাজেই কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার প্রতিশোধ নিতেই পার। তবে লক্ষ রাখতে হবে যাতে বেশি না হয়ে যায়। তো বুযুর্গ সেটাই করেছেন। তুমি তাকে ঘুষি মেরেছ, তিনিও তোমাকে অনুরূপ ঘুষি মেরে দিয়েছেন। মুখে কিছু বলেননি। যেহেতু তুমিও মুখে কিছু তাকে বলনি।

প্রতিশোধ গ্রহণেও কল্যাণকামিতা

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, কোনও কোনও বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা তাদের সাথে কৃত জুলুমের বদলা নিয়েছেন। মনে রাখতে হবে তাদের বদলা নেওয়ার ভেতরও কল্যাণকামিতা থাকে। কেননা কোনও

কোনও বুযুর্গ আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন মর্যাদা রাখেন যে, কেউ যদি তাদের প্রতি জুলুম করেন আর তারা প্রতিশোধ না নিয়ে সবর করেন, তবে তাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলাই প্রতিশোধ নিয়ে নেন। ফলে জুলুমকারী ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। হাদীছে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَادَلِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

'যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা করে, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দেই।'[৩৭]

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হলে অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা সেজন্য এমন কঠিন শাস্তি দান করেন, যেমনটা কোন মানুষ দিতে পারে না এবং কোন মানুষ তা সহ্যও করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। এ রকম হয় তখনই, যখন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি সবর করেন। তাঁর সবরই জালেমের উপর শাস্তি হয়ে নেমে আসে। এ কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ অনেক সময় সবর না করে প্রতিশোধ নিয়ে নেন, যাতে তার ব্যাপারটা শোধবোধ হয়ে যায় এবং তার উপর কোন আসমানী আযাব নাযিল না হয়।

আল্লাহ তা'আলা কেন বদলা নেন ?

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, প্রশ্ন হতে পারে ওলীগণ তো দয়াপরবশ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ হতে বিরত থাকেন এবং যে কোনও অন্যায় আচরণে সবর করেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা পরম দয়াময় হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষ হতে প্রতিশোধ নিয়ে নেন, তা এমনটা কেন হয় ? কেন তিনি ক্ষমা না করে প্রতিশোধ নেন ? এর অর্থ তো দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা তার ওলীদের দয়া ও মমতা বেশি।

এর উত্তর সহজ ! লক্ষ করলে দেখা যায় বাঘিনীকে খোঁচালে বাঘিনী তা টালিয়ে দেয়, প্রতিশোধ নিতে যায় না। কিন্তু বাঘিনীর বাচ্চাকে কেউ খোঁচাতে গেলে তার রক্ষা নেই। বাঘিনী তা বরদাশত করে না, সংগে সংগে হামলা করে বসে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষ কত বেআদবী করে, তার হুকুম অমান্য করে, কেউ তার সাথে অন্যকে শরীক করে, কেউ তো তার অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা উপেক্ষা

৩৭. ইবন রাজাব, জামি'উল-উলূম ওয়াল-হিকাম, ১খ, ৩৫৭ ; হাফিজ ইবন আহমাদ, মা'আরিজুল-কাবূল, ৩খ, ১০০১

করেন ও ক্ষমা করে যেতে থাকেন, কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ তাঁর বড় পেয়ারা। তাদের সাথে কেউ বেআদবী করলে তিনি তা বরদাশত করেন না। শাস্তি দিয়ে দেন। কাজেই ওলীদের কষ্ট দিতে নেই। তাদের সাথে গুস্তাখী করলে সে গুস্তাখী মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।'

সুতরাং যে সকল আল্লাহওয়ালা সম্পর্কে জানা যায় তারা কারও থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বুঝতে হবে তা সেই ব্যক্তির প্রতি কল্যাণকামিতার কারণেই করেছেন। কেননা প্রতিশোধ না নিলে না জানি তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কী কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ হত।

তৃতীয় যেই বুযুর্গ কোন প্রতিশোধ নেনইনি, উল্টো তোমার হাত মালিশ করে দিয়েছেন, তার রয়েছে ভিন্ন রঙ। আল্লাহ তা'আলা তার আন্তরে সৃষ্টির প্রতি বিশেষ মায়া-মমতা দান করেছেন আর সে কারণেই তিনি তোমার দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও এ রকম আচরণ করেছেন।

সুন্নতসম্মত পন্থা

তবে প্রথম বুযুর্গ যা করেছেন সেটাই আসল সুন্নত। কেননা, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করলে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কতদূর পর্যন্ত তার পেছনে দৌড়াবে ? প্রতিশোধ নিলেই বা তোমার লাভ কী ? বড় জোর তোমার বুকের আগুন ঠান্ডা হবে। কিন্তু তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, তবে বুকের আগুন কি, জাহান্নামের আগুনই তো ঠান্ডা হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

ক্ষমার ফযীলত

আজকাল আমাদের সমাজে ঘরে-বাইরে সর্বত্র একের বিরুদ্ধে অন্যের অভিযোগ যে, অমুক আমার এই ক্ষতি করেছে, অমুকে আমার সাথে এই-এই ব্যবহার করেছে। কাজেই কেউ নিন্দা করে বেড়াচ্ছে, কেউ প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকির করছে, কেউ গাল-মন্দ করছে ইত্যাদি। অথচ এ সবই গুনাহের কাজ, তাকে যদি ক্ষমা করে দিত কতই না ছওয়াবের অধিকারী হত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ-

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করল ও ক্ষমা করল, নিশ্চয়ই তা দৃঢ় সংকল্পজনিত কাজ রূপে গণ্য হবে।'[৩৮]

---

৩৮. শূরা : ৪৩

অন্যত্র ইরশাদ-

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

'অন্যের মন্দ আচরণের জবাব দাও ভালো আচরণ দ্বারা। এর ফলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরংগ বন্ধুতে পরিণত হবে।'[৩৯]

তবে এরূপ মহানুভবতা যে-কেউ দেখাতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

'এই গুণের অধিকারী কেবল তাদেরকেই করা হয়, যারা ধৈর্যশীল এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তাদেরকেই করা হয় যারা মহা ভাগ্যবান।'[৪০]

নিন্দা- কটাক্ষ পরিহার করুন

যা হোক এ হাদীছে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে নিন্দা কটাক্ষ পরিহারের তাগীদ। বলা হয়েছে, মু'মিন কটাক্ষকারী হয় না। অন্যকে খোঁচানো মু'মিনের কাজ নয়। কাজেই নিন্দা-কটাক্ষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ইত্যাদি যা দ্বারা অন্যের মনে আঘাত লাগে একজন মু'মিনকে তা পরিহার করে চলা অবশ্যকর্তব্য। কেননা, এর ফলে যদি কারও মনে আঘাত লাগে, কেউ মনে কষ্ট পায়, তবে তাতে এমনই কবীরা গুনাহ হয়, যা সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত কিছুতেই ক্ষমা হবে না। এর জন্য কেবল তাওবা যথেষ্ট নয়। এটা বান্দার হক। বান্দার হক কেবল তখনই ক্ষমা হতে পারে যখন বান্দা নিজে ক্ষমা করবে। সুতরাং সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত আমরা যা কিছু কাজ কর্ম করি, তাতে মানুষের সংগে যত লেনদেন, মেলামেশা ও কথাবার্তা হয় এবং অভিযোগ অনুযোগও দাঁড়িয়ে যায় তার প্রত্যেকটি খতিয়ে দেখতে হবে। সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখতে হবে তার কোনওটিতে আমি কাউকে কটাক্ষ করে বসছি না তো ? আমার কোনও কথায় কারও মনে আঘাত লাগছে না তো ? এ দিকে লক্ষ রেখেই জীবন কাটাতে হবে। অন্যকে যে কথাই বলি না কেন মমতার সাথে বলব। কোমল ভাষায় বলব। কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলেও তাকে নির্জনে ডেকে একাকি বলব। বুঝিয়ে বলব যে ভাই তোমার এই কাজটি আপত্তিকর, এটি সংশোধন করে ফেল।

---

৩৯. হা-মীম সাজদা : ৩৪

৪০. হা-মীম-সাজদা : ৩৫

সর্বাবস্থায় লক্ষ রাখব যাতে অন্যের মনে আঘাত না দেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

মু'মিন কাউকে লা'নত করে না

এ হাদীছের দ্বিতীয় শব্দ হল-

وَلَا بِلَعَّانٍ

এবং মু'মিন লা'নতকারী হয় না।

মুখে কোন লা'নত ও অভিশাপমূলক শব্দ উচ্চারণ করা মু'মিনের কাজ নয়।

একবার নিজ গোলামের উপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খুব রাগ হল, বোঝাই যাচ্ছে গোলাম মারাত্মক কোন ভুল করেছিল। অহেতুক রাগ করার মানুষ তো হযরত সিদ্দীক আকবর (রাযি.) ছিলেন না। তো রাগের বশে তাঁর মুখ থেকে লা'নতের শব্দ বের হয়ে গেল। এমনি সময়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত। তিনি লা'নতের সে শব্দটি শুনে ফেললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বললেন,

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কেউ সিদ্দীকও হবে আবার লা'নতকারীও। কখনও নয় কা'বার রব্বের কসম![৪১]

অর্থাৎ এ দু'টো জিনিস এক পাত্রে জমা হতে পারে না। কেননা, যে ব্যক্তি সিদ্দীক হবে, সে কিছুতেই লা'নতকারী হয় না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যখন শুনলেন লা'নত করা সিদ্দীকের কাজ নয়, অথচ এ ভুলটিই তাঁর দ্বারা হয়ে গিয়েছে, সংগে সংগে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এ গোলামকে আযাদ করে দিচ্ছি। এই বলে তিনি গোলামটিকে আযাদ করে দিলেন।

---

৪১. জামিউল- হাদীছ, ২৩খ, ৩৫পৃ হাদীছ নং ২৫৫০৮ ; শু'আবুল-ঈমান, ৪খ, ২৯৪, হাদীছ নং ৫১৫৪ ; তাবারানী, আল-মুজামুল-কাবীর ১৯,৩৫, হাদীছ নং ৯১ ; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ, ৩১২, হাদীছ নং ৪২১১ ; কানযুল-উম্মাল, ৩খ, ৬১৬, হাদীছ নং ৮১৮৯

অপর বর্ণনায় আছে। তিনি এর সাথে আরও কয়েকটি গোলাম আযাদ করেছিলেন। সুতরাং অন্যকে কটাক্ষ করা যেমন পরিহার করতে হবে, তেমনি লা'নত করা ও অভিশাপ দেওয়া থেকেও বাঁচতে হবে।

অন্যের জন্য বদদু'আ করা

আমাদের সমাজে নানা রকম বদ দু'আ চালু আছে। তা সবই লা'নতের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের মুখেই তা বেশি উচ্চারিত হয়ে থাকে, যেমন বলে থাকে তুই একটা হতভাগা, তুই একটা ঝাটাখেকো বা পিছামারা ইত্যাদি। অহেতুক অভিশাপ দিলে আমলনামায় পাপ বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই হয় না। কাজেই কারও উপর রাগ উঠলেও লা'নত করা বা বদ দু'আ দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

যে লা'নত জায়েয

সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে লা'নত করা তো জায়েয নয় ; তবে অনির্দিষ্ট ভাবে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে লা'নত করা যেতে পারে। যেমন বলা- যে ব্যক্তি এই কাজ করবে তার প্রতি লা'নত বা এই অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি লা'নত ইত্যাদি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ লা'নত বর্ণিত আছে। যেমন তিনি বলেন-

لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ

'যে ব্যক্তি সুদ খায় তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত হোক এবং যে ব্যক্তি সুদ দেয় তার প্রতিও।'[৪২]

অপর এক হাদীছে তিনি বলেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْمُصَوِّرِيْنَ

'আল্লাহ তা'আলার লা'নত হোক চিত্রকরদের প্রতি।'[৪৩]

এমনিভাবে আরও বহু পাপকাজ আছে, যাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। কাজেই

---

৪২. বুখারী, হাদীছ নং ৪৯২৮ ; মুসলিম, হাদীছ নং ২৯৯৪ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১১২৭ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩৩৬৩ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৮৯৫ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ২২৬৮

৪৩. আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ৫খ, ২৪৫ ; যাহাবী, আল-কাবাইর,১খ, ১৬৪ ; নববী, আল-আযকার, ১খ, ৮১৮

অনির্দিষ্টভাবে পাপাচারীদের প্রতি লা'নত করার অবকাশ আছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কারও নাম নিয়ে লা'নত করা হারাম। তা কোনও মু'মিনের কাজ হতে পারে না।

অশ্লীল কথা বলাও মু'মিনের কাজ নয়

এ হাদীছের তৃতীয় কথা হল–

وَلَا الْفَاحِشِ

এবং মু'মিন হয় না অশ্লীলভাষী। অর্থাৎ যে সব কথা অশ্লীলতার আওতায় পড়ে মু'মিন ব্যক্তি তা কখনও মুখে উচ্চারণ করে না। কাজেই রাগের সময়ও সতর্ক থাকতে হবে যাতে মুখে কোন অশ্লীল শব্দ না আসে। লজ্জা-শরমের পরিপন্থী কথা সর্বাবস্থায়ই পরিত্যাজ্য।

কটুক্তি করাও মু'মিনের কাজ নয়

হাদীছটির শেষ শব্দ হল وَلَا الْبَذِيءِ এবং মু'মিন নয় কটুক্তিকারী। البذى এর অর্থ দুর্বাক, দুশ্চরিত্র, অর্থাৎ মু'মিন যখন কথা বলে তখন কোন মন্দ কথা বলে না, অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে না ও খারাপ শব্দ উচ্চারণ করে না। বরং সে নিজ জবানকে মন্দ কথা হতে হেফাজত করে।

ইয়াহুদীদের ধোঁকাবাজী

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে ইয়াহুদীরা খুবই ধূর্ত ছিল। ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারটা বলতে গেলে তাদের মজ্জাগত। তারা যখন দেখল মুসলিমগণ পরস্পর সাক্ষাতকালে 'আস-সালামু'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' (তোমার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বলে, তখন তারা একটা শঠতার আশ্রয় নিল। তারা কোন মুসলিমের সংগে সাক্ষাত হলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এর স্থলে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (আস-সামু আলায়কুম) বলা শুরু করল। মাঝখান থেকে 'লাম' বাদ দিয়ে দিত। আরবীতে اَلسَّامُ অর্থ 'মৃত্যু'। কাজেই আস-সামু আলায়কুম-এর অর্থ হয় 'তোমার মরণ হোক'।

একবার কয়েকজন ইয়াহুদী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ওই ভাষায় অভিবাদন জানাল, বলল 'আস-সামু আলায়কুম'। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বুঝে

ফেললেন তারা সালামের ছলে কী বলে দিয়েছে। শুনতে যেন সালামই, প্রকৃত পক্ষে বদ দু'আ। সুতরাং তিনিও যথোচিত উত্তর দিলেন। বললেন-

عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ

'তোমাদের মরণ হোক, তোমরা অভিশপ্ত হও। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন-

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ

'হে আয়েশা ! নম্রতা অবলম্বন কর।'

হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি কি শোনেননি তারা কি বেতমিযী করেছে ? তারা তো আস-সামু আলায়কুম বলে আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তিনি বললেন, তুমি শোননি আমি কি জবাব দিয়েছি ? আমি তো উত্তরে বলে দিয়েছি وَعَلَيْكُمْ (তোমাদেরও)। অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তোমরা যা কিছু বলেছ সেসব তোমাদের ঘটুক। বলা বাহুল্য, আমার প্রতি তাদের অভিশাপ কোন কাজে আসবে না। কিন্তু তাদের প্রতি আমার অভিশাপ ঠিকই ফলে যাবে।[৪৪]

কোমলতা মু'মিনের শোভা বর্ধন করে

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে বললেন-

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

'কোমলতা যে জিনিসের মধ্যেই থাকে, তা তাকে শোভা দান করে আর যা কিছু থেকেই তা তুলে নেওয়া হয়, তা তাকে ত্রুটিযুক্ত করে।

কাজেই এভাবে উত্তর দিয়ে কেন শুধু শুধু মুখ খারাপ করছ ? শুধু 'ওয়া 'আলায়কুম' বললেই যথেষ্ট। উপযুক্ত উত্তরও হয়ে যাবে আবার মুখেরও হেফাজত হবে।

এ হাদীছ শেখাচ্ছে কথাবার্তা বলার সময় এমন কি রাগের সময়ও সতর্ক থাকতে হবে যাতে মুখ থেকে কোন মন্দ কথা বের হয়ে না যায়। পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে

---

৪৪. বুখারী, হাদীছ নং ৫৭৮৬ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৪০২৭ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬২৫ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২২৯৬১

গুণাবলী তাঁর নবুওয়াতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে এ কথাও আছে যে,

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

'তিনি অশ্লীলভাষী হবেন না। অশ্লীলতার ভানকারীও হবেন না। তিনি বাজারে হইচইকারী হবেন না, এবং অন্যায় আচরণের বদলে অন্যায় আচরণ করবেন না, বরং ক্ষমা করবেন ও উপেক্ষা করবেন।'[৪৫]

আজও পর্যন্ত বাইবেলে আছে, হাটে-বাজারে তার আওয়াজ শোনা যাবে না, তিনি থেতলে যাওয়া নলখাগড়া ভাংবেন না এবং টিমটিমে বাতি নেভাবেন না। এসব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই গুণ।

আখলাক-চরিত্রেও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু...)-এর অনুসরণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ কেবল বাহ্য কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং আখলাক-চরিত্রেও তার অনুসরণ অবশ্যকর্তব্য। কেউ যদি মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হয়, তবে নিশ্চয়ই এতেও ছওয়াব আছে এবং এটাও সুন্নতের অনুসরণ হবে, যাতে অবহেলার সুযোগ নেই। তবে এতেই ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক-চরিত্রকে নিজের আখলাক-চরিত্র বানিয়ে নেওয়া ও তাঁর আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করাও তাঁর অনুসরণের অপরিহার্য অংশ, বিশেষত অন্যের সাথে আচার আচরণে। যেমন অন্যের সাথে কথা বলতে অশ্লীল ও রূঢ়ভাষী না হওয়া, মন্দ কথা উচ্চারণ না করা এবং কোনওভাবেই মুখ খারাপ না করা।

লা'নতের পরিণাম

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত ও অভিশাপের আরও একটি পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি জানান, কেউ যখন অন্যকে অভিশাপ দেয়। প্রথমে সে অভিশাপ আসমানের দিকে যায়, তারপর তা

---

৪৫. জামিউল-আহাদীছ, হাদীছ নং ৪৩২৫৯ ;৪০খ, ১২০পৃ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৬০৩২ ; ইবন 'আসাকির, ৩খ, ৩৮০ ; কানযুল-উম্মাল, ১১খ, ৬০০ ; হাদীছ নং ৩২০৯১

যমীনের দিকে ফিরে আসে এবং যাকে লা'নত দেওয়া হয়েছে তার কাছে চলে যায়, সে যদি তার উপযুক্ত হয় তবে তো তার সাথেই লেগে যায় আর যদি উপযুক্ত না হয়, তবে যে ব্যক্তি লা'নত করেছে তার কাছে চলে আসে এবং তা তাকেই জড়ায়।

বোঝা গেল, লা'নত-অভিশাপ অন্যায়ভাবে দেওয়া হলে যাকে দেওয়া হয় তার কোন ক্ষতি হয় না ; বরং যে ব্যক্তি দেয় তা তারই সর্বনাশ ঘটায়।

আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে আমাদের জবানকে হেফাযত করুন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :
ইসলাহী খুতুবাত : খণ্ড১১, পৃষ্ঠা ৮৪-১১৮

গীবত : জবানের এক মহাপাপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

'তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।'[৪৬]

ইমাম নববী (রহঃ) রিয়াযুস-সালিহীন গ্রন্থে জবানের গুনাহসমূহ সম্পর্কিত হাদীছসমূহকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে সবার আগে স্থান দিয়েছেন গীবতকে, যেহেতু অন্যান্য গুনাহের তুলনায় এটা অনেক বেশি হয়ে থাকে। এটা এমনই এক মসিবত, বর্তমানকালে যা আমাদের বৈঠক-মজলিস সহ সমাজের সব ক্ষেত্রে ছেয়ে গেছে। এমন কোন মজলিস পাওয়া ভার যেখানে গীবত ও পরনিন্দা করা হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কুরআন মাজীদে তো এর জন্য এমনই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটা অন্য কোন

৪৬. হুজুরাত : ১২

গুনাহের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ একে মৃত ভায়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে।

'তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। (কেননা, এটা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত ন্যাক্কারজনক কাজ)। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা তো একে ঘৃণাই করে থাক।

তা তোমরা যখন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা কর, তখন তোমাদের অবশ্যকর্তব্য গীবত করাকেও ঘৃণা করা। তোমরা চিন্তা করে দেখ এটা কত খারাপ কাজ। মানুষের গোশত খাওয়া কি তুচ্ছ ব্যাপার ? নরমাংস ভোজী হওয়ার মত ঘৃণ্য আর কী হতে পারে ? তাও কি যে কারও গোশত ? নিজ ভাইয়ের গোশত, তাও মৃত ভাইয়ের। মনে রেখ নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যতটা ন্যাক্কারজনক, অন্যের গীবত বা পরনিন্দা করা সে রকমই এক ন্যাক্কারজনক কাজ ও ভয়াবহ গুনাহ।

গীবত কাকে বলে

কারও পেছনে বদনাম করাকে গীবত বলে। যে দোষের কথা বলা হচ্ছে তা যদি সত্যও হয় অর্থাৎ তার মধ্যে যদি তা থাকেও তবুও তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে আছে, একবার এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! গীবত কী ? উত্তরে তিনি বললেন,

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

'তোমার ভাইকে এমনভাবে চর্চা করা, যা তার পসন্দ নয়।'

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি জানতে পারে তার সম্পর্কে তুমি এই-এই কথা বলেছ তবে তার ভালো লাগবে না ; বরং সে তাতে কষ্ট পাবে। ব্যস এটাই গীবত। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ-

اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ

'আমি যে দোষের কথা বলি, বাস্তবিকই যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা থাকে ?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বাস্তবিকই দোষ তার মধ্যে থাকলে তবেই তা গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে

তবে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে ! সেটা গীবত নয় ; বরং গীবত অপেক্ষা আরোও গুরুতর । তাতে দ্বিগুণ গুনাহ হয় ।[৪৭]

একবার আমাদের মজলিস ও বৈঠকগুলোর প্রতি চোখ বুলান । দেখতে পাবেন গীবত কী মহামারী আকার ধারণ করেছে। দিবারাত মানুষ এই মহাপাপে লিপ্ত রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন ।

কেউ কেউ গীবতকে বৈধ বানানোর জন্য এই বাহানা দেখায় যে, আমি তার গীবত করছি না। আমি একথা তার মুখের উপরও বলতে পারব, বোঝাতে চাচ্ছে, এ কথা আমি যখন তার সামনেও বলতে পারব, তখন পেছনে বলার দ্বারা গীবত হচ্ছে না । কাজেই আমার জন্য এটা জায়েয ।

মনে রাখতে হবে, আপনি এটা তার মুখের উপর বলতে পারেন বা নাই পারেন, সর্ববস্থায় তা গীবত। কারও দোষের কথা তার পেছনে বলাই গীবত । সুতরাং এটা হারাম ও কবীরা গুনাহ ।

গীবত একটি মহাপাপ

অর্থাৎ মদ পান করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা প্রভৃতি যেমন কবীরা গুনাহ, এটাও সেই রকম কবীরা গুনাহ । তার সাথে এর কোন পার্থক্য নেই । তা যেমন নিশ্চিত হারাম, এটাও তেমনি নিশ্চিত হারাম। বরং মদ পান অপেক্ষা গীবতের গুনাহ আরও বেশি কঠিন। কেননা এটা হক্কুল-ইবাদের সাথে সম্পৃক্ত । হক্কুল-ইবাদের গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মাফ হয় না, যতক্ষণ না বান্দা নিজে তা মাফ করে দেয় । অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কেবল তাওবা যথেষ্ট নয় । পক্ষান্তরে অন্যান্য গুনাহ কেবল তাওবা দ্বারাই মাফ হয়ে যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় গীবতের ব্যাপারটা কত কঠিন । সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন । নিজেও অন্যের গীবত করা হতে বিরত থাকুন এবং অন্যে গীবত করলে তা থেকে নিজের কানকেও হেফাজত করুন । যদি কোন মজলিসে কারও গীবত শুরু হয়ে যায়, তবে চেষ্টা করুন, যাতে আলোচনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় । অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিন, যাতে গীবত থেকে সকলেই মুক্তি পেয়ে যায় । আর তা সম্ভব না হলে মজলিস থেকে উঠে পড়ুন । অন্ততপক্ষে নিজেকে তো রক্ষা করুন! কেননা গীবত করা যেমন হারাম, তেমনি তা শোনাও সমান হারাম ।

---

৪৭. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬৯০ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮৫৭ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৩১; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৬২৫ ; দারিমী, হাদীছ নং ২৫৯৮

নিজ চেহারা আঁচড়ানোর শাস্তি

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَآءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰؤُلَآءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

'মিরাজের রাতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো তামার, তা দিয়ে তারা তাদের চেহারা ও বুক আঁচড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল ! এরা কারা ? তিনি বললেন, এরা সেইসব লোক, যারা নরমাংস খেত, তাদের মান-সম্মানের উপর আঘাত করত অর্থাৎ পেছনে বদনাম করত।'[৪৮]

গীবত ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গুনাহটির কদর্যতা বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। সবগুলো হাদীছে আমাদের নজর দেওয়া দরকার, যাতে এর মন্দত্ব ও কদর্যতা আমাদের অন্তরে বসে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে তা বসিয়ে দিন এবং এই কঠিন পাপ থেকে আত্মরক্ষার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এ হাদীছ দ্বারা তো জানা গেল, আখিরাতে এর জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তামার নখ দ্বারা চেহারা ও বুক আঁচড়াতে-খামচাতে হবে।

আরেকটি হাদীছ আছে, যা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী নয়, কিন্তু তার অর্থ ও বিষয়বস্তু সঠিক। তাতে বলা হয়েছে, গীবত করা ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর। অর্থাৎ এর গুনাহ আরও বেশি কঠিন। তার কারণ বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ পানাহ, কারও দ্বারা ব্যভিচারের গুনাহ হয়ে গেলে সে যদি অনুতপ্ত হয়ে খাঁটিমনে তাওবা করে তবে ইনশাআল্লাহ তার ক্ষমা হয়ে যাবে। কিন্তু গীবতের গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা হবে না, যতক্ষণ না গীবত দ্বারা যার মান-সম্মানে আঘাত করা হয়েছে সে নিজে তা ক্ষমা করবে। ভাবুন কী কঠিন গুনাহ।[৪৯]

৪৮.আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৩৫ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১২৮৬১

৪৯. মাজমাউস-যাওয়াইদ-৮খ, ৯১পৃ.

গীবতকারীকে জান্নাতে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হবে

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন অনেক গীবতকারী আছে, যারা আপাতদৃষ্টিতে দুনিয়ায় বেশ ভালো-ভালো আমল করছে, যেমন নামায পড়ে, রোযা রাখে, এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুলসিরাতে আটকে দেওয়া হবে। আপনারা জানেন, জাহান্নামের উপর একটা সেতু আছে, যাকে পুলসিরাত বলা হয়ে থাকে, সেটি সকলকেই পার হতে হবে। জান্নাতবাসীগণও সেটি পার হয়েই জান্নাতে যাবে আর আল্লাহ পানাহ যারা জাহান্নামী হবে, তাদেরকে সেই সেতুর উপর থেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যারা মানুষের গীবত করে, তাদেরকে সেই সেতুর গোড়ায় আটকে দেওয়া হবে। বলা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গীবতের কাফফারা আদায় না করবে সামনে বাড়তে পারবে না। অর্থাৎ যাদের গীবত করেছ তাদের থেকে ক্ষমা নিয়ে নিতে হবে। তারা ক্ষমা না করা পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না।

গীবত নিকৃষ্টতম সুদ

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যন্ত বলেছেন যে, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সুদ হল মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতে আঘাত করা অর্থাৎ গীবত করা।[৫০]

সুদ কী কঠিন গুনাহ তা তো জানাই আছে। এটা বহু গুনাহের সমষ্টি, যার সর্বনিম্ন স্তর এ রকম, যেন কেউ তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করছে। সুদ সম্পর্কে এমন কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমনটা অন্য কোন গুনাহ সম্পর্কে হয়নি। অথচ গীবতকে সেই সুদের নিকৃষ্টতম স্তর সাব্যস্ত করা হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, কত মারাত্মক গুনাহ।

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া

এক বর্ণনায় আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় দু'জন স্ত্রী লোক রোজা অবস্থায় কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল, যার এক পর্যায়ে তারা অন্যের গীবত শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! দু'জন নারী রোজা রেখেছিল, এখন তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। পিপাসায়

---

৫০. আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৩৩ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৫৬৪

তারা মরণাপন্ন। সম্ভবত ওহী মারফত তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তারা কারও গীবতে লিপ্ত হয়েছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হল। তিনি দেখলেন বাস্তবিকই তারা মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তিনি এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন, তা আনা হলে তিনি তাদের এক মহিলাকে বললেন, এই পেয়ালায় বমি কর। সে বমি করতে শুরু করল।

দেখা গেল পেটের ভেতর থেকে রক্ত ও গোশতের টুকরা বের হয়ে আসছে। তারপর অন্যজনকে বমি করতে বললেন, সেও বমি করলে দেখা গেল তাতে রক্ত ও গোশতের টুকরা। সেই রক্ত ও গোশতের বমিতে পেয়ালাটি ভরে গেল। তারপর নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এসব হল তোমাদের ভাইবোনদের রক্ত ও গোশত, যা তোমরা রোজা অবস্থায় খেয়েছিলে।'[৫১]

অর্থাৎ তোমরা রোজা অবস্থায় জায়েয খাবার থেকে তো বিরত থেকেছ, কিন্তু হারাম খাবার অর্থাৎ মুসলিম ভাইবোনদের রক্ত-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকনি। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের পেট ভরে ফেলেছিলে আর সে কারণেই তোমাদের এই দশা হয়েছে। তারপর বললেন, সাবধান ! ভবিষ্যতে কখনও কারও গীবতে লিপ্ত হয়ো না।

এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মুর্তিমান করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গীবত আসলে কী জিনিস এবং তার পরিণাম কী হয়।

আসল কথা হচ্ছে আমাদের রুচিবোধ বিকৃত হয়ে গেছে এবং আমাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই গুনাহের কদর্যতা আমরা বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সুস্থ অনুভূতি ও শুদ্ধ রুচিবোধ দিয়েছেন তারা তা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে, এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা চাক্ষুস দেখিয়েও দেন।

গীবত ও একটি স্বপ্ন

বিখ্যাত তাবি'ঈ রিব'ঈ ইবন হিরাশ (রহঃ) নিজ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার আমি একটি মজলিসে হাজির হই। উপস্থিত লোকজন কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল। আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম। এক পর্যায়ে জনৈক ব্যক্তি

---

৫১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৩, সূরা হুজুরাত

সম্পর্কে কথা শুরু হয়ে গেল। তাতে তার গীবত করা হচ্ছিল। আমার খুব খারাপ লাগল যে, এখানে বসে আমরা একটা লোকের নিন্দা করছি। শেষে আমি মজলিস থেকে উঠে গেলাম। এর দ্বারা জানা গেল যে, কোন মজলিসে গীবত করা হলে প্রথমত উচিত তাতে বাধা দেওয়া আর সে ক্ষমতা না থাকলে দ্বিতীয় কর্তব্য নিজে তাতে শরীক না হওয়া এবং মজলিস থেকে উঠে যাওয়া। তো রিব'ঈ (রহঃ) বলেন, আমি মজলিস থেকে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মনে হল এখন হয়ত সেই লোকটি সম্পর্কে চর্চা শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার তাদের সাথে গিয়ে বসা যায়। আমি আবার সেখানে উপস্থিত হলাম। এবারও কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্ত কথাবার্তার পর ফের গীবত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এবার আমার হিম্মত আগের মত কাজ করল না। আমি মজলিস থেকে উঠতে পারলাম না। প্রথমে তো তারা যে পরচর্চা করছিল তা শুনেই যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত নিজেও তাদের সাথে তাল মেলালাম এবং গীবতের দু'এক বাক্য বলে ফেললাম।

মজলিস শেষে যখন বাড়ি ফিরলাম এবং রাতের বেলা যথারীতি শুয়ে পড়লাম, তখন এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, কৃষ্ণাঙ্গ এক ব্যক্তি একটি বড় পেয়ালায় করে আমার কাছে গোশত নিয়ে এসেছে। ভালোভাবে লক্ষ করে বুঝতে পারলাম তা শূকরের গোশত। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি বলল, এই শূকরের গোশত খাও। আমি বললাম, শুকরের গোশত কিভাবে খাব, আমি তো একজন মুসলিম ? সে বলল, না, এ গোশত তোমাকে খেতেই হবে। এই বলে সে জোরপূর্বক আমার মুখে গোশতের টুকরা ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আমি যতই বাধা দেই, সে ততই জোর করে। শেষ পর্যন্ত আমার বমি এসে গেল, কিন্তু সে নাছোড়, আমার মুখের ভেতর তা ঢোকাতেই থাকল। কষ্টে আমার দম বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা। এ অবস্থায়ই আমার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর যখন খাওয়ার সময় খেতে বসলাম, তখন স্বপ্নে দেখা সেই শূকরের মাংসের স্বাদ আমার হালাল খাদ্যের ভেতরও অনুভব করলাম। তিন দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলল। যখনই খেতে বসি খাদ্যের মধ্যে শূকর-মাংসের বিশ্রি স্বাদ পেতে থাকি। তিন দিন পর আমি এই দুর্ভোগ হতে মুক্তি পাই।

এ ঘটনার মাধ্যেমে আল্লাহ তা'আলা আমাকে গীবতের কদর্যতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। সামান্য একটু যে গীবত আমি করেছিলাম তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত শূকর-মাংসের বিস্বাদ আমাকে ভোগ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

হারাম খাদ্যের জুলমাত

বস্তুত পরিবেশ-পরিস্থিতি কলুষিত হয়ে যাওয়ায় আমাদের অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই গুনাহের মন্দত্ব আমরা অনুভব করতে পারি না। হযরত মাওলানা ইয়া'কুব নানূতবী (রহঃ) বলতেন, একবার জনৈক ব্যক্তির দাওয়াতে দু-এক লোকমা খাবার খেয়ে ফেলেছিলাম। খাবার ছিল কিছুটা সন্দেহযুক্ত। অর্থাৎ হারাম হওয়ার খানিকটা সন্দেহ ছিল। সেই এক-দুই লোকমা খাদ্যের অন্ধকার আমি কয়েক মাস পর্যন্ত আমার কলবে অনুভব করতে থাকি। আমার অন্তরে একের পর এক অনুচিত চিন্তা-ভাবনা দেখা দিতে থাকে। এমনকি গুনাহ করারও ইচ্ছা অন্তরে জন্ম নিতে থাকে এবং গুনাহের প্রতি আগ্রহ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে থাকে।

এটাও গুনাহের আছর যে, তার কারণে অন্তরে জুলমাত ও অন্ধকার ছেয়ে যায় আর সেই অন্ধকারেরই কুফলস্বরূপ অন্যান্য গুনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং মানুষ সে দিকে পা বাড়ায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনুভূতিকে সুস্থ করে দিন। যা হোক গীবত একটি বিপজ্জনক গুনাহ। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যার অনুভূতি সুস্থ আছে, সে-ই এর ভয়াবহতা বুঝতে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে গীবতের অনুমতি আছে

আমরা শুরুতেই জেনে এসেছি গীবত কাকে বলে। বলা হয়েছে, কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলাকে গীবত বলে, যা জানতে পারলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাতে বাস্তবে সে কথা যতই সঠিক হোক। তবে আমাদের শরী'আত অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ। তাতে চতুর্দিকেই লক্ষ রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী শরী'আতে যেমন মানব স্বভাবের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তেমনি মানুষের বৈধ প্রয়োজন সমূহকেও স্পর্শ করা হয়েছে। এ কারণেই কয়েকটি বিষয়কে গীবতের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত তাকে গীবতই মনে হয়। অর্থাৎ মানব প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত থাকায় শরী'আত তার অনুমতি দিয়েছে।

অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য গীবত

উদাহরণত এক ব্যক্তি এমন একটা কাজ করছে, যা দ্বারা অন্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। যার ক্ষতি হওয়ার আশংকা সে তা জানে না। এ

অবস্থায় তাকে জানানো না হলে সে এই ব্যক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে যদি বলে দেওয়া হয়, আপনি অমুকের ব্যাপারে সাবধান থাকবেন, তবে তা জায়েয হবে। এতে গীবতের গুনাহ্ হবে না। খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় শেখানোর পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। লোকটি পথে থাকা অবস্থায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইশারা করে বললেন,

بِئْسَ اَخُوالْعَشِيْرَةِ

নিজ গোত্রের বড় মন্দ লোক সে।

হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি একটু সামলে সমঝে বসলাম। যেহেতু সে একজন খারাপ লোক। তাই সাবধান থাকা উচিত। ইত্যবসরে সে মজলিসে উপস্থিত হয়ে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ স্বভাবমত তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করলেন। তারপর সে যখন চলে গেল আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি বলেছিলেন, সে বড় মন্দ লোক। অথচ সামনে আসার পর তার সাথে ভালো ব্যবহার করলেন। কী নম্র-কোমল কথা বললেন ! ব্যাপার কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোন, সে বড় নিকৃষ্ট লোক, যার দুর্ব্যবহারের আশংকায় মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় ঠিক, কিন্তু তার সাথে নম্র আচরণ না করলে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করেছি।[৫২]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম লেখেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে বললেন, সে একজন মন্দ লোক ; বাহ্যত এটা গীবত বটে, যেহেতু পেছনে তার বদনাম করা হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা যেহেতু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) কে তার সম্পর্কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ভবিষ্যতে তিনি তার পক্ষ হতে ক্ষতির শিকার না হন, তাই এ গীবত জায়েয হয়েছিল।

---

৫২. বুখারী, হাদীছ নং ৫৫৭২ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৬৫ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২২৯৭৭

সুতরাং মানুষকে কারও ক্ষতি হতে রক্ষা করার লক্ষে তার দোষের কথা তার পেছনে বললে সেটা নিষিদ্ধ গীবতের মধ্যে পড়বে না এবং তাতে কোন গুনাহ হবে না।

বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা বলা ওয়াজিব ও অবশ্যকর্তব্য হয়ে যায়। উদাহরণত, আপনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন সে কারও উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও তাকে হত্যা করার পাঁয়তারা করছে। এ অবস্থায় আপনার কর্তব্য তার সম্পর্কে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেওয়া যে, সে তোমাকে খুন করার মতলব আঁটছে, তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। এই সতর্কীকরণ মোটেই নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয় ; বরং এটা করা জায়েয ও অবশ্যকর্তব্য।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে তার গীবত

একটি হাদীছে আছে, যার সহীহ মর্ম অনেকেই বোঝে না। হাদীছটি হল-

لَا غِيْبَةَ لِفَاسِقٍ وَلَا مُجَاهِرٍ

অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফাসিক ও প্রকাশ্যে গুনাহকারীর গীবত কোন গীবত নয়।[৫৩]

কেউ-কেউ এ হাদীছের অর্থ ভুল বোঝে। তারা মনে করে এর অর্থ, কেউ কোনও কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকলে তার পেছনে যা ইচ্ছা বলা যাবে এবং তার গীবতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে কেউ বিদ'আতে লিপ্ত থাকলে তার গীবত করাও জায়েয। অথচ হাদীছে একথা বোঝানো হয়নি। বরং এর অর্থ, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচার করে বেড়ায়, তবে সে যেই পাপে লিপ্ত থাকে, তা তার পেছনে বলা যাবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদ পান করে। এখন কেউ যদি তার পেছনে বলে সে একজন মদ্যপায়ী তবে তা নিষিদ্ধ গীবত নয়। কেননা প্রকাশ্যে মদ পান করার দ্বারা সে নিজেই তো প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে আমি মদ পান করি। কাজেই পেছনে কেউ তা বললে তার অসন্তুষ্টির কোন কারণ নেই। এবং সে অসন্তুষ্ট হবেও না। তাই এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু সে যে কাজ অন্যদের সামনে করছে না তা যদি কেউ পেছনে চর্চা করে তা অবশ্যই গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদ পান

---

৫৩. জামিউল-উসূল, ১খ, ৬৩০৩ ; হাদীছ নং ৬২১৯ ; কাশফুল-খাফা'-২খ, ৩৬৬ পৃ, হাদীছ নং ৩০৮১

করে বা ঘুস খায়, কিন্তু এমন কোনও পাপও সে করে থাকে, যা অন্য কেউ জানে না এবং অন্যদের সামনে সে তা করেও না। বরং সে তা গোপনেই করে থাকে এবং সে গুনাহটিও এমন যাতে অন্যের কোনও ক্ষতি নেই। তার এই গোপন গুনাহটির কথা পেছনে আলোচনা করলে তার খারাপ লাগবে। কাজেই তা করা জায়েয হবে না। করলে তা অবশ্যই গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাজেই ফাসেকের গীবত গীবতই নয়' এর অর্থ হল ফাসিক ব্যক্তি যে গুনাহ প্রকাশ্যে করছে সেই গুনাহের কথা তার পেছনে বললে সেটা গীবত নয়, কিন্তু তার অন্য কোন গোপন অপরাধ থাকলে তা পেছনে বলা অবশ্যই গীবত, যদি তা অন্যদের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

ফাসিক ও পাপী ব্যক্তির গীবত

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের দোষচর্চা করছিল। হযরত উমর (রাযি.)-এর পুত্র হযরত 'আব্দুল্লাহ (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করে বললেন, তুমি যে তার নিন্দা করছ এটা তো গীবত। তুমি মনে করো না যে, হাজ্জাজের তরবারী হাজারো লোকের রক্তে রঞ্জিত বলে তার গীবত জায়েয হয়ে গেছে। মনে রেখ যে সব লোককে সে না হক হত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে যেমন তার হিসাব নেওয়া হবে, তেমনি তোমরা যারা তার পেছনে বদনাম করছ, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বদনামের হিসাব দিতে হবে। কেননা, সে অন্যায় রক্তপাত করেছে বলে তোমাদের জন্য তার গীবত করা জায়েয হয়ে যায়নি। সুতরাং কেউ ফাসিক বা বিদ'আতী হলে পেছনে তার যত ইচ্ছা গীবত করা যাবে ব্যাপারটা কিন্তু এ রকম নয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যকর্তব্য।

জালেমের জুলুমের কথা পেছনে বলা গীবত নয়

শরী'আত আরও একটি ক্ষেত্রে গীবতের অনুমতি দিয়েছে। তা হল জালেমের জুলুম। কেউ যদি আপনার উপর জুলুম করে থাকে এবং আপনি সে কথা অন্যের সামনে উল্লেখ করেন এবং তাকে জানান যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে, তবে তা নিষিদ্ধ গীবতের মধ্যে পড়বে না এবং তাতে কোন গুনাহ হবে না। তাতে যে ব্যক্তিকে আপনি তা জানাচ্ছেন সে

তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতা রাখুক বা নাই রাখুক। উদাহরণত এক ব্যক্তি আপনার বাড়িতে চুরি করেছে। আপনি থানায় গিয়ে অভিযোগ করলেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার বাড়িতে চুরি করেছে। এই অভিযোগ করাটা যদিও তার পেছনে হয়েছে তবুও এটা গীবতের মধ্যে পড়বে না। কেননা, সে আপনার ক্ষতি করেছে, আপনার উপর জুলুম করেছে, আপনি থানার কাছে তার প্রতিকার চেয়েছেন। থানা তার প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেও। সুতরাং এটা কিছুতেই গীবত নয়।

এমনিভাবে আপনি এই চুরির ব্যাপারটা যদি এমন কাউকে জানান যে তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না, যেমন চুরির ঘটনাটি ঘটার পর কিছু লোক আপনার কাছে আসল এবং কিভাবে কি হল তা জানতে চাইল, আপনি তাদেরকে জানালেন যে, অমুক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে আপনার ঘরে সিঁধ কেটেছে এবং এই-এই মাল চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তো এক্ষেত্রেও যদিও চোরের পেছনেই আপনি এসব কথা বলছেন এবং যদিও উপস্থিত লোকেরা চুরির কোন প্রতিকার করতে পারবে না, তবুও এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং এতে কোন গুনাহ হবে না। কেননা এই বলার দ্বারা যদিও আপনি কোন প্রতিকার পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনার মনের কষ্ট কিছুটা হলেও তো লাঘব হচ্ছে এবং তাদের সমবেদনা দ্বারা আপনার মন কিছুটা হালকা হচ্ছে।

দেখুন শরী'আত আমাদের স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি কতটা আনুকুল্য দেখিয়েছে। এটা মানুষের একটা স্বভাব যে, তার প্রতি কোন জুলুম করা হলে সে তার সেই দুঃখের কাহিনী অন্যকে শোনাতে চায় এবং সমব্যাথীদের সামনে চোখের পানি ফেলে খানিকটা মনঃকষ্ট লাঘবের প্রয়াস পায়, তাতে তারা তার প্রতি কৃত জুলুমের কোন প্রতিকার করতে পারুক বা নাই পারুক। তাই শরী'আতও এর অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ

'মন্দ' কথার প্রচারণা আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র।'[৫৪]

অর্থাৎ কারও উপর জুলুম করা হলে সে নিজ জুলুমের কথা অন্যের সামনে প্রকাশ করতে পারে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা জায়েয।

---

৫৪. নিসা : ১৪৮

তো এসব হল ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা এসব ক্ষেত্রকে গীবতের আওতা থেকে বাইরে রেখেছেন। তাই এতে গীবতের গুনাহ নেই। কিন্তু এ ছাড়া আর যে সব আলাপ-আলোচনা আমরা বৈঠক-মজলিসে করে থাকি এবং খুব মজা নিয়ে পরচর্চায় লিপ্ত হই আর এভাবে আনন্দে সময় কাটাই, তা সবই গীবত। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজ জান-প্রাণের উপর দয়া করুন এবং গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। নিজ জবানকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ কষ্টের কাজ নয়। হিম্মত করে মুখে লাগাম লাগিয়ে নিন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সংকল্প ও হিম্মত

আমি আপনাদের সামনে গীবত সম্পর্কে আলোচনা করলাম, আপনারাও শুনলেন। কিন্তু কেবল বলা ও শোনার দ্বারা কিছু হয় না। কিছু হলে তা কেবল হিম্মত ও সংকল্প দ্বারাই হয়। যতক্ষণ হিম্মতের সাথে সামনে কদম বাড়ানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লক্ষে পৌছা সম্ভব নয়। সংকল্প করুন, ইনশাআল্লাহ আজ থেকে এই মুখ দিয়ে গীবতের কোন শব্দ উচ্চারণ করব না। যদি ভুলক্রমে কখনও কোন শব্দ বের হয়ে যায়, সংগে-সংগে তওবা করে নিন। গীবতের সঠিক প্রতিকার হল ক্ষমা চাওয়া। অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে তাকে গিয়ে ধরা যে ভাই ! আমি তোমার গীবত করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহর অনেক বান্দা এ কাজ করে থাকেন।

গীবতের প্রতিকার

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, কিছু লোক আমার কাছে এসে বলে, আমি আপনার গীবত করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি তাদের বলি, আমি ক্ষমা করে দেব, তবে একটা শর্ত আছে। শর্ত হল প্রথমে আমাকে বল, তুমি আমার সম্পর্কে কী বলেছিলে ? তা বললে ক্ষমা করে দেব।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, এর উদ্দেশ্য হল নিজেকে সংশোধন করা। কেননা, হতে পারে পেছনে আমার সম্পর্কে যা বলা হয় তা সত্য এবং বাস্তবিকই আমার মধ্যে সে দোষ আছে। তারা আমাকে জানালে সে দোষ আমার নজরে থাকবে। ফলে আল্লাহ চাহেন তো আমার তা থেকে বাঁচার তাওফীক লাভ হবে।

সুতরাং কখনও কারও গীবত হয়ে গেলে তার প্রতিকার এটিই যে, তার সামনে গিয়ে বলে দিন, ভাই, আমি আপনার গীবত করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। সত্য বটে এটা খুব সহজ কাজ নয়। গীবত করার পর সামনে গিয়ে বলা যে, আমি আপনার গীবত করেছি, এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। কিন্তু বলতে পারলে মনের উপর ছুরি চালিয়ে দেওয়া হবে, এটাই প্রকৃত এলাজ। দু'-চারবার এরূপ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে।

বুযুর্গানে দীন এর জন্য ব্যবস্থাও দিয়েছেন। যেমন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুখে কখনও অন্যের নিন্দা এসে গেলে সংগে-সংগে নিজের দোষসমূহের কথা চিন্তা কর। সম্পূর্ণ নির্দোষ কোনও লোক নেই। তোমার মধ্যেও অবশ্যই কোনও না কোনও দোষ আছে। ভাবতে থাক যে, আমার মধ্যেও তো এই-এই দোষ আছে। এ অবস্থায় আমি অন্যের বদনাম করি কিভাবে ? সেই সংগে গীবতের শাস্তির কথাও ভাব। একটা মাত্র কথা উচ্চারণ করব, অথচ আখিরাতে তার জন্য কতই না দুর্ভোগ পোহাতে হবে ! এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আও করা চাই যে, হে আল্লাহ ! আমাকে এই মসিবত থেকে নাজাত দিন। যখনই কোনও মজলিসে কারও সম্পর্কে আলোচনা উঠতে শুরু করে সংগে-সংগে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দু'আ কর, হে আল্লাহ ! এই যে অনুচিত আলোচনা উঠতে যাচ্ছে, এর থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আমি যাতে এতে জড়িয়ে না পরি।

গীবতের কাফফারা

একটি বর্ণনা আছে, সনদ (সূত্র)-এর দিক থেকে সেটি দুর্বল হলেও অর্থ বিচারে সঠিক। তাতে বলা হয়েছে, কখনও কারও গীবত হয়ে গেলে তার কাফফারা হল তার জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করা। মনে করুন আজ এক ব্যক্তির হুঁশ হল যে, সে এ যাবৎকাল উদাসিনতার মধ্যে ডুবে ছিল। ফলে তার দ্বারা বহু লোকের গীবত হয়ে গেছে। কার কার গীবত করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলাও সম্ভব নয়। এখন সে দৃঢ় সংকল্প করল, ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আর কারও গীবত করবে না। কিন্তু যাদের গীবত হয়ে গেছে তাদের কোথায় খুঁজে বেড়াবে এবং তাদের থেকে ক্ষমা লাভের কী উপায় হবে ? তো এর উপায় হল, তাদের জন্য দু'আ ও ইসতিগফার কর।[৫৫]

৫৫.মিশকাতুল-মাসাবীহ, ২খ, ৪১৫ পৃ, হাদীছ নং ৪৮৭৭

হুকূকুল ইবাদ নষ্ট করা হলে

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ'আলী থানভী (রহঃ) ও আমার পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) এ ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারা এ বিষয়ে চিঠি লিখে নিজেদের ভক্ত-অনুরক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, জানা নেই সারা জীবনে আপনার কত রকম হক আমার দ্বারা নষ্ট করা হয়েছে এবং কত রকম ভুল-ত্রুটি আমার দ্বারা হয়ে গেছে। আমি সাধারণভাবে সবগুলোর ব্যাপারে আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কী বিস্ময়কর আল্লাহভীতি ! আশা করা যায় এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত হুকূকুল-'ইবাদ ক্ষমা করিয়ে দেবেন।

যারা মারা গেছে অথবা জীবিত থাকলেও কোথায় আছে জানা নেই, কিংবা জানা থাকলে তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই, এ রকম কারও কোন হক নষ্ট করা হলে সেক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রদত্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, যার গীবত করা হয়েছিল বা যার কোন হক নষ্ট করা হয়েছিল, তার জন্য প্রাণভরে দু'আ কর, হে আল্লাহ ! আমি তার যে গীবত করেছিলাম, সে গীবতকে তার মর্যাদা বৃদ্ধির অছিলা বানিয়ে দিন এবং এর মাধ্যমে তাদের দীন ও দুনিয়ার উন্নতি দান করুন, সেই সংগে তাদের জন্য ইসতিগফারও কর যে, হে আল্লাহ ! তাদের জীবনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিন। এটা প্রতিকারের এক উত্তম ব্যবস্থা।

আমরাও যদি এ জাতীয় চিঠি লিখে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পাঠিয়ে দেই তাতে সমস্যা কোথায় ? এতে কি আমি নীচ হয়ে যাব, আমার মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে ? সে রকম কিছুই হবে না, অথচ অসম্ভব নয় এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার ক্ষমা লাভের উপায় করে দেবেন।

ক্ষমা চাওয়া-ও ক্ষমা করার ফযীলত

হাদীছ শরীফে আছে কেউ যদি কারও কাছে ক্ষমা চায় ও সত্যিকার ভাবে অনুতপ্ত হয় আর তার ক্ষমাপ্রার্থনা ও লজ্জা-অনুতাপ দেখে সেই ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা যেদিন ক্ষমালাভের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি হবে সেই কিয়ামতের দিন এই ক্ষমাকারীকেও ক্ষমা করে দেবেন। পক্ষান্তরে কেউ যদি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই লোক তাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ তা'আলা বলে দেন

যে, যে দিন ক্ষমালাভের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি হবে, সেই কিয়ামতের দিন আমিও ওকে ক্ষমা করব না। আমার বান্দাকে যখন তুমি ক্ষমা করছ না, তখন তোমাকে ক্ষমা করা যায় কিভাবে ? সুতরাং ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। কেউ লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমা চেয়ে সে নিজ দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছে। সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে, তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করুক বা নাই করুক। কাজেই বান্দার হক নষ্ট করা হলে সে ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনায় কুণ্ঠ বোধ করা উচিত নয়। বরং সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরও উচিত খুশিমনে ক্ষমা করে দেওয়া।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকর্তৃক ক্ষমা চাওয়া

আমি আপনি কোন হিসাবের মধ্যে আসি আর কোন কাতারেই বা পড়ি ? এ কাজ তো খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও করেছেন। একবার তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, আজ আমি নিজেকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করছি। আমার দ্বারা যদি কেউ কোন কষ্ট পেয়ে থাকে বা আমি কারও জানমালের কোন ক্ষতি করে থাকি, তবে আজ আমি তোমাদের সামনে এই যে দাঁড়ানো আছি। কেউ প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিতে পার। আর যদি ক্ষমা করতে রাজি থাকে তাও করে দিক, যাতে কিয়ামতের দিন আমার উপর তোমাদের কারও কোনও হক বাকি না থাকে।

ভাবুন তো দেখি ! দোজাহানের বাদশা, মানুষের মহাকল্যাণ সাধক ও সকলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, যার একটি শ্বাসের বিনিময়ে সমস্ত সাহাবী তাদের প্রাণ দিতে পারাকে মহা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন এবং তা দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন, তিনিই কিনা বলছেন, আমি কাউকে মেরে থাকলে বা কোনও রকম কষ্ট দিয়ে থাকলে সে আজ আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক। পরক্ষণেই ঘটল মহা কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা। সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখল এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেছেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! একবার আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। আমি তার বদলা নিতে চাই। রহমতের নবী বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না ; বরং খুশি মনে বললেন, এসো, তার বদলা নিয়ে যাও। আমার কোমরে আঘাত কর।

সাহাবী ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসলেন এসে প্রিয়নবীর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি যখন আমাকে

মেরেছিলেন আমার কোমরে কাপড় ছিল না, কিন্তু আপনার কোমর যে কাপড়ে ঢাকা ? এ অবস্থায় বদলা নিলে তো সমান-সমান হবে না। নবীজি তখন কোমরের কাপড় উঠিয়ে ধরলেন। তা ধরতেই সাহাবী আশ্চর্য প্রতিশোধ নিলেন। তিনি পেছন থেকে পবিত্র কোমরে ঝুঁকে পড়লেন এবং খাতামুন-নাবিয়্যীনের পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত নবুওয়াতী মোহরে ঠোঁট লাগালেন। তারপর পরমপ্রাপ্তির আনন্দে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই সুযোগ লাভের আশাতেই আমি ওরকম গুস্তাখী করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।[৫৬]

মোদ্দাকথা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বদলা দানের জন্য নিজেকে সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করে দিয়েছেন। আপনি আমি কোন ছার। আপনি আমিও যদি চিঠিমারফত সম্পৃক্তজনদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই, তাতে কী এমন ইজ্জত নষ্ট হবে ? বরং আসা করা যায় এই অছিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। নববী সুন্নতের অনুসরণ করার নিয়তে এ কাজ করলে এরই বরকতে আমাদের চরম কামিয়াবী লাভ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

ইসলামের একটি মূলনীতি

দেখুন ইসলামের একটা মূলনীতি হল- নিজের জন্য তাই পসন্দ করবে যা অন্যের জন্য পসন্দ কর এবং অন্যের জন্য তাই পসন্দ করবে যা নিজের জন্য পসন্দ কর। এমনিভাবে যা নিজের জন্য অপসন্দ তা অন্যের জন্যও অপসন্দ করবে। এ মূলনীতিটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষাদান করেছেন। এবার বলুন তো, কেউ যদি আড়ালে আপনার বদনাম করে, তবে আপনার কেমন লাগবে ? আপনার কি তা ভালো লাগবে, না খারাপ লাগবে? নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। যদি খারাপই লাগে এবং নিজের জন্য তা পসন্দ না করেন তবে এই একই কাজ আপনার ভাইয়ের জন্য পসন্দ করছেন কিভাবে ? কেন এই দ্বিমুখী নীতি ? নিজের জন্য এক রকম অন্যের জন্য আরেক রকম-এটা কেমন রীতি। একেই তো মুনাফিকী বলে। দেখা যাচ্ছে গীবতের মধ্যে মুনাফিকীও থাকে। যদি এসব বিষয় চিন্তা করেন এবং এর জন্য আখিরাতে যে আযাবের ব্যবস্থা আছে তাও ভাবতে থাকেন, তবে ইনশাআল্লাহ গীবত করার অভ্যাস দিন-দিন কমতে থাকবে।

---

৫৬. মাজমাউস-যাওয়াইদ, ৯খ, ২৭পৃ.

গীবত থেকে বাঁচার সহজ পথ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এ পর্যন্ত বলতেন যে, গীবত থেকে বাঁচার সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হল অন্যের সম্পর্কে কোনও রকম আলোচনা না করা। তার প্রশংসার করারও দরকার নেই, দুর্নাম করারও দরকার নেই। কেননা, শয়তান বড় খবিস। তুমি যখন কারও প্রশংসা করে বলবে, অমুক বড় ভালো মানুষ, তার এই গুণ আছে, ওই গুণ আছে, তখন মাথায় তো এটাই থাকবে যে, আমি তার কোন গীবত করছি না, প্রশংসাই করছি, তখন শয়তান সেই প্রশংসার মধ্যে এমন একটা বাক্য জুড়ে দেবে, যদ্দরুন সবটা প্রশংসা দুর্নামে পরিণত হয়ে যাবে, যেমন প্রশংসা এক পর্যায়ে বলে ফেললে, অমুক ব্যক্তি মানুষ তো বড় ভালো, কিন্তু তার মধ্যে এই একটা ব্যাপারও আছে, ব্যস এক 'কিন্তু' শব্দ সব প্রশংসায় পানি ঢেলে দিল। এর পর আলোচনাটাই চলে যাবে গীবতের দিকে। এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, অন্যের সম্পর্কে আলোচনারই দরকার নেই। তার গুণকীর্তনও করতে যেও না, দোষ বর্ণনাও নয়। অহেতুক আলোচনায় লিপ্ত হয়ে গুনাহের পথ তৈরী করার কী দরকার। একান্ত যদি কারও প্রশংসায় লিপ্ত হয়েই পড়, তবে খুব সতর্ক থাক, যাতে শয়তান ভুল পথে টেনে নিতে না পারে।

নিজ দোষের প্রতি নজর দাও

ভাই, অন্যের বদনাম কী করবে, নিজ দোষের কি অন্ত আছে ? নিজের দোষসমূহের দিকে দৃষ্টি ফেরাও, সেসব নিয়ে চিন্তা কর। অন্যের মধ্যে কোনও দোষ থাকলে সে কারণে তোমাকে তো শাস্তি পেতে হবে না। তার দোষ-গুণের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার পেলে সেই পাবে। কাজেই তার যা আছে তা নিয়ে সে-ই থাকুক এবং তার হিসাবও আল্লাহ তা'আলাই নিন। তোমাকে তোমার নিজ কর্মফলই ভোগ করতে হবে। ভালো হলে ভালো ফল পাবে আর মন্দ হলে মন্দ। কাজেই চিন্তা সে নিয়েই কর।

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

'পর কে নিয়ে চিন্তা ছাড়, আপন পরিণতি ভাব', নিজের দিকে ধ্যান দাও এবং নিজ দোষ-ত্রুটি লক্ষ কর। মানুষ নিজ সম্পর্কে যখন গাফিল হয়ে যায় এবং নিজ দোষ-ত্রুটি ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে তখনই সে অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজে। নিজ দোষ-ত্রুটির মাথায় থাকলে কেউ কখনও অন্যের দোষে নজর দিতে পারে না। ফলে অন্যের দোষ চর্চারও কোন অবকাশ তার হয় না। সম্রাট বাহাদুর শাহ জুফার বড় চমৎকার বলেছেন-

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر   رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر   تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

নিজ অবস্থা সম্পর্কে কোন সচেতনতা ছিল না যখন,
তখন তো বেড়াতাম খুঁজে অন্যের যত দোষ-গুণ,
নজর পড়ল যেই না নিজ দোষের উপর,
অমনি আড়াল হয়ে গেল অন্যের যত দোষ।

আল্লাহ তা'আলা নিজ ফজল ও করমে আমাদের অন্তরে সচেতনতা দান করুন। তাওফীক দিন নিজ দোষ দেখার। নিজের প্রতি ধ্যান না থাকাটাই সব অনর্থের মূল। আমাকে যে আমারই কবরে শুইতে হবে সেই খেয়াল নেই। আল্লাহ তা'আলার সামনে যে আমাকে নিজ কর্মেরই জবাব দিতে হবে সেই ভাবনা নেই। তাই কখনও এর বদনাম করি কখনও ওর বদনাম। কার মধ্যে কী দোষ আছে কেবল তাই খুঁজে বেড়াই। দিনরাত কেবল এই একই ধান্ধা। আল্লাহর ওয়াস্তে এর থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করুন।

আমরা যেই সমাজে বাস করছি এবং যেই সময়টা পার করছি, তার ভেতর থেকে এ কাজ যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও সত্য যে, তা অসম্ভব নয়। অসম্ভব হলে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে হারাম করতেন না। হারাম এ জন্যই করেছেন যে, তা পরিহার করা মানুষের এখতিয়ারাধীন। মজলিসের আলোচনা যদি গীবতের দিকে ছোটে তবে লাগাম টেনে ধরুন এবং আলোচনার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিন। আর যদি কখনও গীবত হয়েই যায়, সংগে-সংগে ইসতিগফার করুন এবং ভবিষ্যতে তা পরিহার করে চলার জন্য নতুন সংকল্পে আবদ্ধ হোন।

গীবতই সব অনর্থের মূল

মনে রাখতে হবে, গীবত বড় নিকৃষ্ট জিনিস। এটা এক অনর্থ সৃষ্টিকারী আচরণ। এর ফলে পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ দেখা দেয় এবং ঐক্য ও সম্প্রীতি নষ্ট হয়। বর্তমান সমাজে যে অবস্থা বিরাজ করছে-তার জন্য এই গীবতই বহুলাংশে দায়ী। কেউ যদি মদ পান করে, তবে দীনের সাথে যার সামান্যতম সম্পর্কও আছে, সেও তাকে খারাপ নজরে দেখবে এবং ভাববে এই লোকটা একটা মন্দ কাজে লিপ্ত আছে। এবং যে ব্যক্তি মদ পান করে, সে নিজেও মনে মনে ভাবে আমি একটা খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করেছি এবং

একটি কঠিন পাপে লিপ্ত আছি। কিন্তু যে ব্যক্তি গীবত করে তার সম্পর্কে মনে এ রকম খারাপ ধারণা জন্মায় না এবং গীবতকারী নিজেও মনে করে না যে, আমি একটা কঠিন গুনাহে লিপ্ত আছি। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে গীবতের কদর্যতা মানুষের বোধ-অনুভবে এখনও পর্যন্ত ভালোভাবে বসতে পারেনি এবং এটা যে একটা হারাম কাজ ও কঠিন গুনাহ সেই বিশ্বাসও অন্তরে বদ্ধমূল হয়নি। নয়ত উভয় পাপের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মদ্যপানকে খারাপ মনে করলে গীবতকেও খারাপ মনে করতে হবে এবং উভয়টাকেই সমান ঘৃণার চোখে দেখতে হবে। তাই প্রথম কাজ হল অন্তরে গীবতের কদর্যতাকে বদ্ধমূল করা এবং এটা যে কী বিপজ্জনক রোগ সেই অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত করে তোলা।

ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা

গীবত কেবল মুখেই নয়, ইশারায় করা যেতে পারে এবং সেটাও মৌখিক গীবতের মতই হারাম। একবার উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। কথায় কথায় অপর উম্মুল-মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রাযি.)-এর কথা উঠে গেল। তিনি একটু খর্বাকৃতির ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) হাতের ইশারায় বোঝালেন যে, তিনি একজন ছোট-খাটো মানুষ। মুখে বললেন না যে, বেঁটে বা বামন। তাও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করলেন, হে 'আয়েশা ! তুমি এমন একটা কাজ করলে যে, এর বিষ ও বদবু যদি সাগরে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে গোটা সাগরের পানি বিষাক্ত ও পুঁতিগন্ধময় হয়ে যাবে। চিন্তা করে দেখুন, গীবতের একটা ইশারাকে পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা গুরুতর সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সারা জাহানের ধন-দৌলতও যদি আমাকে দেওয়া হয়, তার বিনিময়েও আমি কারও এমন অনুকরণ করতে প্রস্তুত নই, যা দ্বারা অন্যকে ব্যঙ্গ করা হয় বা তার কোন মন্দ দিক প্রকাশ করা হয়।[৫৭]

গীবত পরিহারে বিশেষ মনোযোগ দিন

আজকাল তো অনুকরণ করতে পারাটা একটা রসাত্মক শিল্পে পরিণত হয়ে গেছে। অন্যের হুবহু অনুকরণ করে দেখাতে পারলে তাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে

---

৫৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪২৬ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২৩২ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৮১৬

দেখা হয়। মুগ্ধ হয়ে বলা হয়, দেখেছ কী অনুকরণদক্ষ লোক ! অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, সারা জাহানের ধন-সম্পদের বিনিময়েও আমি কারও অনুকরণ করে দেখাতে রাজি নই। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, তাঁর দৃষ্টিতে এটা কত মন্দ ও গর্হিত কাজ ছিল। এবং তিনি কত গুরুত্বের সাথে এর থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য তাকিদ করেছেন। কিন্তু আমাদের যে কী হয়েছে, আমরা মদ পান ও ব্যভিচারকে গর্হিত মনে করলেও গীবত করাকে কিছু গর্হিত কাজ মনে করছি না ; বরং একে মায়ের দুধের মত মজাদার বানিয়ে ফেলেছি। যে কারণে এমন কোন মজলিস পাওয়া যাবে না, যেখানে এ মজা ভোগ করা হয় না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত থেকে বাঁচার উপায় হল এর কদর্যতাকে মাথায় বসিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ ! গীবত যে বড় কঠিন গুনাহ, আমি এর থেকে বেঁচে থাকতে চাচ্ছি, কিন্তু বৈঠক-জলসায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে যখন কথাবার্তা বলি, তাতে কারও না কারও গীবতও হয়ে যায়। হে আল্লাহ ! আমি সংকল্প করছি, ভবিষ্যতে আর কখনও কারও গীবত করব না, কিন্তু আপনার তাওফীক ও সাহায্য ছাড়া এ সংকল্পে অবিচল থাকা সম্ভব নয়। হে আল্লাহ ! নিজ দয়ায় আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে হিম্মত দিন এবং তাওফীক দিন যাতে এ সংকল্পে স্থির থাকতে পারি। এই দু'আর পর আজই কাজ শুরু করে দিন।

গীবত পরিহারের সংকল্প

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ করার সংকল্প না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ হয় না, হতে পারে না। অন্যদিকে শয়তান যে কোন ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মনের ভেতর টালবাহানা জন্মায়। আজ নয় কাল শুরু করব-এর চক্করে ফেলে দেয়। ফলে ভালো কাজের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা গড়িমসি করি। প্রতিদিনই বলি, ঠিক আছে কাল করব। কালকের দিনটি যখন আসে, কোন ওযর দাঁড়িয়ে যায়, ফের বলি, আচ্ছা কাল করব, এভাবে দিন চলে যায়, কিন্তু সেই 'কাল' আর আসেই না। কাজেই কালের চক্রে না পড়ে যে কাজ করার তা আজই করে ফেলুন। কেননা, কালকের জন্য ফেলে রাখলে তা আর কখনওই করা হবে না।

একবার ভাবুন, কারও আয়-উপার্জন না হলে সে তার জন্য অস্থির হবে, কি হবে না ? কেউ ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়লে তা পরিশোধের জন্য পেরেশান হবে, কি হবে না? কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কি নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, না আরোগ্য লাভের জন্য উতলা হয়? তাই যদি হয়, তবে এই যে একটা মন্দ অভ্যাস ছাড়তে পারছি না বা ছাড়ছি না, এর জন্য কেন অস্থিরতা নেই? মনে অস্থিরতা পয়দা করুন। তারপর দু'রাকআত সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, হে আল্লাহ ! আমি এই অসৎ গুণ হতে নিষ্কৃতি চাই। নিজ রহমতে আমাকে রক্ষা করুন। ভবিষ্যতে আমি আর কারও গীবত না করার সংকল্প করছি। এতে অবিচলিত থাকার তাওফীক দিন। এই দু'আ করার পর কাজে লেগে যান। প্রয়োজনে কিছু বিধিনিষেধও নিজের উপর আরোপ করুন।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, এতে কাজ না হলে নিজের উপর জরিমানা আরোপ করুন। উদাহরণত সংকল্প করুন, কখনও কারও গীবত হয়ে গেলে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ব বা এত টাকা সদকা করব। এভাবে চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ ক্রমান্বয়ে এ রোগ কমতে থাকবে এবং একদিন এর থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি লাভ হবে। তবে প্রথমে এর জন্য অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে হবে, রোগী যেমন রোগমুক্তির জন্য অস্থির হয়, সেই রকম অস্থিরতা। তা এ কারণে যে গীবতের অভ্যাসটাও একটা রোগ ; বরং দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক রোগ। কেননা, এ রোগ মানুষের আখিরাত ধ্বংস করে এবং তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সুতরাং নিজেও এর থেকে বেঁচে থাকুন এবং পরিবারের লোকজনকেও বাঁচিয়ে রাখুন। মহিলাদের মধ্যে এ রোগ মহামারির মত ছেয়ে আছে। দু'চারজন মহিলা একত্র হলে সেখানে কারও না কারও সম্পর্কে কথা উঠবেই। গীবত তাদের কথাবার্তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা যদি এ আলোচনাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং এ অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে তবে ঘরের সকলেরই সংশোধন হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও আমল করার তাওফীক দিন এবং আপনাদেরকেও। আমীন।

চুগলখোরী একটি কঠিন গুনাহ

গীবতেরই পাশাপাশি আরেকটি গুনাহ হল চুগলখোরী। বরং এটা আরও বেশি ভয়ানক। আরবীতে একে বলে নামীমা (نميمة)। চুগলখোরী শব্দ দ্বারা

'নামীমা'-এর পুরোপুরি অর্থ আদায় হয় না। নামীমা হল, কারও কোন দোষের কথা অন্যের সামনে এই উদ্দেশ্যে বলা যে, এর ফলে সে তার ক্ষতি করবে ও তাকে কষ্ট দেবে আর এটা তাকে আনন্দ দেবে অর্থাৎ সে যার বিরুদ্ধে বলল তার ক্ষতি হওয়াতে সে আনন্দ পাবে। যে দোষের কথাটি বলা হল তা তার মধ্যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সর্বাবস্থায়ই উদ্দেশ্য হল তার ক্ষতি করা এবং ক্ষতি হওয়ায় আনন্দ পাওয়া। এটাই নামীমা।

চুগলখোরী গীবত অপেক্ষাও নিকৃষ্ট

কুরআন ও হাদীছে এ কাজের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। এটা গীবত অপেক্ষাও মারাত্মক। কেননা, গীবতে নিয়ত খারাপ থাকা শর্ত নয়। অর্থাৎ যার গীবত করা হয় তার ক্ষতি হোক গীবতে সেই কামনা নাও থাকতে পারে, কিন্তু চুগলখোরীতে তা অবশ্যই থাকে। তাই এতে দ্বিগুণ গুনাহ – গীবতের গুনাহ এবং অন্য মুসলিমের কষ্ট ও ক্ষতি কামনার গুনাহ। এই দ্বিবিধ গুনাহের কারণে কুরআন- হাদীছে এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কুরআন মাজীদে ঘোরতর কাফেরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে-

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ

'পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।'[৫৮]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

'চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৫৯]

চুগলখোরকে কাত্তাত (قتات)ও বলে।

কবর আযাবের দু'টি কারণ

প্রসিদ্ধ এক হাদীছে আছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায়

৫৮.কলাম : ১১

৫৯.বুখারী, হাদীছ নং ৫৫৯৬ ; মুসলিম, হাদীছ নং ১৫২ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৪৯ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২২৮ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২২১৬৩

দু'টি কবর পড়ল। সেদিকে ইশারা করে তিনি বললেন, এদের দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সে শাস্তি তাঁর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কবর আযাব বড় কঠিন জিনিস। অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কবরের ভেতর যে শাস্তি দেওয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তা মানুষের অগোচরে রাখেন। কেননা, সে আযাবের শব্দ মানুষ শুনতে পেলে কেউ জীবিত থাকত না এবং জীবনে কেউ কোন কাজ করতে পারত না। কাজেই এটা তার দয়া যে, আমাদের কাছে তা গোপন রাখছেন। হাঁ, কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনও বান্দার কাছে তা প্রকাশও করে থাকেন।

যা হোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রকাশ পেল যে, কবরে তাদের দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ করে বললেন, তোমরা কি জান তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কী কারণে? তারপর নিজেই বললেন, তাদেরকে এমন দু'টি কাজের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যা থেকে বেঁচে থাকা কিছু কঠিন ছিল না। চাইলে সহজেই তা থেকে বাঁচতে পারত। কিন্তু তারা সেই চেষ্টা করেনি, ফলে এখন শাস্তি পাচ্ছে। একটি কারণ হল, তাদের একজন প্রস্রাবের ছিটা হতে সাবধান থাকত না। হয়ত এমন জায়গায় প্রস্রাব করত, যেখান থেকে তার ছিটা এসে গায়ে লেগে যেত। বিশেষত সেকালে উট ও ছাগল চরানোর খুব প্রচলন ছিল। সর্বদা পশুর সাথে থাকতে হত। ফলে তার প্রস্রাবও অনেক সময় গায়ে লেগে যেত। সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন না করার কারণেই কবরে শাস্তি হচ্ছে।[৬০]

প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকুন

আল-হামদুলিল্লাহ ! আমাদের দীন অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ। এতে পবিত্রতার নিয়ম-কানূনও পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকাল এক্ষেত্রেও উম্মতের অবস্থা রীতিমত ভাবিয়ে তোলার মত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাহ্যিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাকে তো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শর'ঈ পবিত্রতার প্রতি বিশেষ লক্ষ নেই এবং তার বিধানাবলীর প্রতিও তেমন মনোযোগ নেই। পেশাবপায়খানাগুলো এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে যে, তাতে প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচা অত্যন্ত কঠিন।

---

৬০. বুখারী, হাদীছ নং ২১১ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৩৯ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ৬৫ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩১ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১৯ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৪১

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

'তোমরা প্রস্রাব থেকে বাঁচ। কেননা আকছার কবরের আযাব এ কারণেই হয়।'[৬১]

প্রস্রাবের ছিটা-ফোটা শরীরে বা কাপড়ে যাতে লাগতে না পারে, সে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

চুগলখোরী পরিহার করে চলুন

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার কারণ চুগলখোরী। সে মানুষের নামে চুগলখোরী করে বেড়াত। এটাকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবর আযাবের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই এ কাজ গীবত অপেক্ষাও বেশি কঠিন। কেননা, এতে উদ্দেশ্য থাকে খারাপ। ইচ্ছা থাকে অন্যের কাছে বদনাম গেয়ে কারও ক্ষতিসাধন করা এবং তাকে কষ্টদানের ব্যবস্থা করা।

গোপন কথা প্রকাশ করাও চুগলী

'ইহয়াউল-উলূম'-গ্রন্থে ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, অন্যের কোন গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়াও চুগলীর অন্তর্ভুক্ত। কেউ চায় না তার গোপন বিষয় ফাঁস হয়ে যাক, বিষয়টা ভালো না মন্দ তা বিবেচ্য নয়। ভালো ব্যাপারও গোপন রাখার ইচ্ছা থাকতে পারে। উদাহরণত একজন লোক বেশ সম্পদশালী, সে তার সম্পদের কথা অন্যদের কাছে গোপন রাখতে চায়। তার কী পরিমাণ সম্পদ আছে তা কেউ জেনে ফেলুক এটা তার ইচ্ছা নয়। আপনি কোনও উপায়ে জেনে ফেললেন যে, তার কাছে এত-এত পরিমাণ সম্পদ আছে, এখন আপনি যদি তা অন্যদের কাছে গেয়ে বেড়ান এবং মানুষকে জানিয়ে দেন যে, সে এই পরিমাণ অর্থের মালিক, তবে আপনি তার গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই ফাঁস করে দেওয়াটাও চুগলখোরী এবং এটা সম্পূর্ণ হারাম।

কিংবা এক ব্যক্তি তার পারিবারিক বিষয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখেছে। কোনওভাবে আপনি সেই পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলেছেন।

৬১.কানযুল-উম্মাল, ৯খ, ৩৪৫, হাদীছ নং ২৬৩৬৫ ; জামিউল-উসূল, হাদীছ নং ১১০০৪, ১১খ, ৩৭৩ ; দারাকুতনী, হাদীছ নং ৪৬৯. ২খ, ২১পৃ, ; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১খ, ৮৪, হাদীছ নং ২৫৮

এখন যদি আপনি তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেন তবে তা হবে চুগলখোরী। অনুরূপ মানুষের যে কোনও গোপন বিষয় বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করাটা চুগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ

'মজলিস আমানতের সাথে সম্পৃক্ত।'[৬২]

অর্থাৎ মজলিসে যে সব কথা হয় তাও আমানত। মজলিসে কোনও একজন আপনাকে গোপনীয়তা রক্ষাকারী ভেবে একটা কথা বলল। এখন আপনি যদি মজলিস থেকে বের হয়ে সে কথা অন্যকে বলে দেন তবে তা আমানতের খেয়ানত হবে। সেই সংগে এটা চুগলীর মধ্যেও পড়ে।

মুখের দু'টি মারাত্মক গুনাহ

যা হোক আমরা মুখ দিয়ে যে সব গুনাহ করি তার মধ্যে গীবত ও চুগলখোরী সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। আজ এ দু'টো সম্পর্কে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। এ দু'টো যে কত গুরুতর আলোচনায় বর্ণিত হাদীছ দ্বারা আপনারা তা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, এ দু'টো যত গুরুতর, বর্তমানে আমাদের মধ্যে এর প্রতি উদাসীনতাও তত বেশি। ঘরে-বাইরে সর্বত্র সমানে এ দু'টো চলছে। জবান চলছে কাঁচির মত। থামার কোনও চেষ্টা নেই। থামানোরও নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে জিহবায় লাগাম পরিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম মোতাবেক তাকে চালানোর ফিকির করুন। তা না করার দরুন আজ ঘরে-ঘরে অশান্তি। পরস্পরে ঝগড়া-ফাসাদ। আপনজনদের মধ্যে শত্রুতা। আল্লাহ তা'আলাই জানেন এর ফলে কত রকমের গুনাহ ও কত প্রকারের ফ্যাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে। আর আখিরাতে এর জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তা তো আপন স্থানে রয়েছেই। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে এর মন্দত্ব ও কদর্যতা বোঝার তাওফীক দিন এবং আজকের আলোচনা অনুযায়ী আমল করতে সাহায্য করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮০-১০৭

৬২.আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪২২৬ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৪১৬৬

গীবত ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

গীবত একটি কঠিন ব্যাধি। এখন তো এটা মহামারির রূপ নিয়েছে। সকলেই কম-বেশি এতে আক্রান্ত। এমন লোক খুঁজে পাওয়া ভার যে এতে জড়িত নয়। অথচ এটা এমনই মারাত্মক গুনাহ যে, এর মত কঠিন শব্দ কুরআন মাজীদে, অন্য কোনও গুনাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

'তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো তা ঘৃণাই করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।'[৬৩]

এ আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। বিষয়টা কত ন্যাক্কারজনক চিন্তা করুন। একে মানুষের গোশত, তাও যে-কোনও মানুষ নয়, নিজ ভাই, তদুপরি সেই ভাই মৃত। যার মধ্যে মনুষ্যত্বের একটা বিন্দুও অবশিষ্ট আছে, তার পক্ষে এরূপ কাজ করা সম্ভব নয়, কার্যে পরিণত করা তো দূরের কথা, চিন্তা করাই সম্ভব নয়। অথচ কুরআন মজীদ বলছে, গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ারই নামান্তর। সুতরাং এটা যে কত বড় কবীরা গুনাহ তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

---

৬৩. হুজুরাত : ১২

গীবতের গুরুতরতা

গীবত বা পরনিন্দা করা সম্পূর্ণ হারাম। এটা মদপান করা শূকরের গোশত খাওয়া, চুরি করা, ডাকাতি করা ইত্যাদিরই মত কবীরা গুনাহ্; বরং তদপেক্ষাও মারাত্মক। কেননা মদপান ও শূকরের গোশত খাওয়ার সম্পর্ক হক্কুল্লাহ'র সাথে। কেউ যদি মদপান করে বা শূকরের গোশত খায়, তবে সে অপরাধ তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বান্দার হকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফলে কখনও খাটি মনে তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু গীবতের ব্যাপারটা তা নয়। এর সম্পর্ক হক্কুল 'ইবাদের সাথে। হক্কুল 'ইবাদের নিয়ম হক্কুল্লাহর মত নয়। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার পক্ষ হতে ক্ষমা করা না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। যত নামায-রোযা করুক এবং যতই তাওবা-ইসতিগফার করুক তা ক্ষমা হওয়ার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নিজের হক তো ক্ষমা করে দেব, কিন্তু তোমাদের কেউ যদি অন্যের জানমালের কোন ক্ষতি করে, তার মান-সম্মানের উপর আঘাত করে কিংবা অন্য কোনওভাবে তার কোন হক নষ্ট করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বান্দা তা ক্ষমা না করবে, বা তার হক আদায় করে দেবে, ততক্ষণ আমি ক্ষমা করব না। হক্কুল- 'ইবাদের ব্যাপারটা এমনই মারাত্মক কিন্তু আমরা একে খুবই মামুলি ব্যাপার মনে করি, যেন নাকের উপর মাছি বসল আর আঙ্গুল নেড়ে উড়িয়ে দিলাম। মনে রাখতে হবে গীবতের ব্যাপারটা এমন তুচ্ছ নয়। এর সম্পর্ক হক্কুল- 'ইবাদের সাথে। তাই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

গীবত কাকে বলে?

গীবত অর্থ কারও পেছনে তার নিন্দা করা অর্থাৎ তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে। এটা গুরুতর গুনাহ। গুনাহ আমরা নিশ্চিন্তে করে যাচ্ছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরস্পরে যে সব কথা বলি লক্ষ করে দেখুন তার মধ্যে গীবত থাকে কি না। থাকে বলার জন্য গবেষণা করার দরকার হয় না। আর এর থেকে ব্যতিক্রম লোক খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কেউ কেউ এমন আছে, যে সহজে স্বীকার করতে চায় না যে, গীবত করি। সাফাই দেওয়ার জন্য বলে, আমি তো একথা তার মুখের উপর বলতে পারব। বোঝাতে চায় যে কথা মুখের উপর বলা যায়, সে কথা পেছনে বললে গীবত হয় না। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মুখের উপর বলতে পারা না পারা কোন বিষয় নয়। কথাটি যদি তার অসন্তুষ্টির কারণ হয় তবে তা অবশ্যই

গীবত। এরূপ কথা সামনে বলতে পারলেও তা গীবত থাকবে। সুতরাং কারও পেছনে যদি আপনি তার সম্পর্কে কোন অপ্রীতিকর কথা বলেন, তবে আপনি তার গীবত ও কবীরা গুনাহ করলেন এবং আপনি মৃত ভাইয়ের গোশত খেয়ে ফেললেন। (নাউযুবিল্লাহ)

গীবত ও অপবাদের পার্থক্য

হাদীছ শরীফে আছে, এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কী? তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কোন কথা বল, যা সে পসন্দ করে না, তবে তাই গীবত। সাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবেই তো তুমি তার গীবত করলে। অর্থাৎ তার মধ্যে বাস্তবিকই যে দোষ আছে, সেটা তার অগোচরে বললেই গীবত করা হয় ও তাতে কবীরা গুনাহ হয়। পক্ষান্তরে সে দোষ যদি তার মধ্যে না থাকে, বরং তুমি মিছামিছি তার নামে তা বলে থাক, তবে তো তা অপবাদ। এতে গীবতের গুনাহ তো আছেই, সেই সঙ্গে মিথ্যা বলার গুনাহও যুক্ত থাকে। কাজেই এর পাপ দ্বিগুণ।[৬৪]

একজন লোকের একটা দোষ আছে। আপনি এক মজলিসে সেটা উল্লেখ করলেন। হয়ত বললেন, অমুক লোকটি বড় মিথ্যুক। বাস্তবিকই সে মিথ্যা বলে। তা সত্ত্বেও তার অগোচরে যে বললেন, সে একজন মিথ্যাবাদী, এটাই গীবত এই গীবত করে আপনি গুনাহগার হলেন, যদি মিথ্যুক বলাটা তার কাছে অপ্রীতিকর হয়। পক্ষান্তরে সে যদি বাস্তবে মিথ্যাবাদী না হয় আর আপনি তার অগোচরে তাকে মিথ্যাবাদী বলেন, তবে আপনি দু'টো গুনাহ করলেন। গীবত করার গুনাহ এবং অপবাদ দেওয়ার গুনাহ। কাজেই নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখুন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর সাহায্যেই গীবতসহ সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

জনৈক প্রফেসর সাহেবের পর্যালোচনা

একবার আমি গীবত সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখলে সেটি এক ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর সাহেবের নজরে আসল। তিনি সেটি পড়ার পর

---

৬৪. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬৯০; তিরমিযী, হাদীন নং ১৮৫৭; আবু দাউদ হাদীছ নং ৪২৩১; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৬২৫; দারিমী, হাদীছ নং ২৫৯৮

আমার কাছে চিঠি লিখলেন। তাতে বললেন, আপনি গীবত সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তাতে বলেছেন, এটি একটি কবীরা গুনাহ এবং হারাম ও নাজায়েয কাজ। আপনি নানাভাবে এর মন্দত্ব তুলে ধরেছেন এবং একে একটি মারাত্মক নিন্দনীয় কাজ সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু আমি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গীবতকে জীবন থেকে ছাটাই করা সম্ভব নয়। কেননা গীবতবিহীন জীবনের মজা কোথায়? যে জীবনে গীবত নেই তা বিলকুল নিরানন্দ।

আমরা যখন দু'চারজন লোক কোথাও একত্র হই এবং কোনও কথাবার্তায় লিপ্ত হই, তখন সে কথাবার্তায় গীবত তো থাকতেই হবে। নইলে কথা চলবে কোন্ বিষয়ে? যা চলবে তা কেবল আল্লাহ আল্লাহ যিক্‌র। তাতে না থাকবে কোনও আনন্দ-ফূর্তি, না বিনোদন ও মাধুর্য। আপনি এ সম্পর্কে যে লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এর যে নিন্দা করেছেন এর অর্থ হল আপনার মতে মানব-জীবনে আনন্দ-ফূর্তির কোন স্থান নেই। সকলের উচিত এসব ঝেড়ে ফেলে সম্পূর্ণ শুষ্ক জীবন-যাপন করা, যেই জীবনের সুধা ও মাধুর্য বলতে কিছু থাকবে না।

তিনি যেহেতু একজন প্রফেসর, তাই নিজ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী তিনি এই বলে চিঠি শেষ করলেন যে, আমার মোটেই বুঝে আসছে না মানুষ সর্বদা যেই কাজে লিপ্ত এবং যা ছাড়া জীবনের কোন সুধা থাকে না, ইসলাম সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে? আমি তার চিঠির উত্তরে লিখেছিলাম, আপনি যে বলছেন, গীবত না থাকলে জীবনের আনন্দই শেষ হয়ে যাবে, তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গীবত না করলে যদি আপনার জীবনের মাধুর্য শুকিয়ে যায়, তবে অপর যে ব্যক্তি আপনার গীবত করছে, তার সম্পর্কে আপনি কী বলবেন: আপনি যখন জানতে পারবেন, অমুক ব্যক্তি অমুক মজলিসে এবং অমুকে অমুক মজলিসে আপনার গীবত করে করে জীবনে রস সিঞ্চন করছে, তখনও কি আপনি জীবনের মাধুর্য উপভোগ করবেন, না অন্য কোন অবস্থা হবে?

নিজের ও অন্যদের জন্য অভিন্ন নীতি হোক

বস্তুত প্রত্যেকে কেবল নিজের আনন্দটাই দেখে। একথা কম লোকেই চিন্তা করে যে, আমি অন্যের সাথে যে ব্যবহার করছি, অন্যেও যদি আমার সাথে সেই রকম ব্যবহার করে, তখন আমার কাছে কেমন লাগবে? তখনও কি আমি আনন্দ বোধ করব, না বিষাদে মন ভরে যাবে? হাদীছ শরীফে নবী

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে এমনই এক ব্যবস্থা দান করেছেন, যা কেবল একজন নবীর পক্ষেই সম্ভব, অন্যদের সাধ্যাতীত। এ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হলে সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। এটাই পারস্পারিক কলহ-বিবাদ থেকে মুক্তির প্রকৃষ্ট দাওয়াই। আমরা সে দাওয়াই ভুলে গেছি বলেই সবরকম অন্যায়-অনাচার জন্ম নিচ্ছে। নববী জবানীতে প্রদত্ত সে ব্যবস্থাটি হল–

أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

'মানুষের জন্য তাই পসন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ কর এবং তাদের জন্য তাই অপসন্দ করবে যা নিজের জন্য অপসন্দ কর।' [৬৫]

আমরা এ নীতির অনুসরণ আদৌ করছি কি? আমরা তো দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করছি। নিজের জন্য এক নীতি, অন্যদের জন্য আরেক। নিজের বেলায় একটা ভালোবাসি, অন্যদের বেলায় আরেকটা। এটাই সামাজিক সব অনর্থের মূল। এ হাদীছ নির্দেশনা দিচ্ছে, প্রতিটি ব্যাপারে লক্ষ করে দেখ অন্যের সাথে যে ব্যবহার করছ, তুমি যদি তার জায়গায় হতে আর ওই ব্যবহার তোমার সাথে করা হত, তখন তোমার কাছে কেমন লাগত। প্রতিটি কাজ করার আগে এরূপ চিন্তা করা হলে কখনও অন্যের হক নষ্ট হবে না, অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হবে না এবং কারও অধিকার পদদলিত করা হবে না।

কাজেই গীবত করার সময়ও এ নীতিকে সামনে রাখুন। চিন্তা করুন যে, যার গীবত করা হচ্ছে, আপনি তার স্থানে হলে আর যেসব বদনাম করা হচ্ছে তা আপনার সম্পর্কে করা হলে আপনি বিষয়টাকে কিভাবে নিতেন। আপনার কি তা আদৌ ভালো লাগত। নিশ্চয়ই লাগত না। তা যদি ভালো নাই লাগে, তবে অন্যের কি করে ভালো লাগতে পারে? আর পেছনের যে আলোচনা কারও কাছে ভালো লাগে না সেটাই তো গীবত। এর থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

যারা বলে গীবত পরিহার করে চলা যায় না, তাদেরকে বলব, গীবত তো ইচ্ছাকৃতই করা হয়। যে কাজ ইচ্ছাকৃত করা হয় তা তো ইচ্ছা ও

---

৬৫. বুখারী, হাদীছ নং ১২; মুসলিম, হাদীছ নং ৬৪; তিরমিযী, হাদীছ নং ২২২৭; নাসাঈ হাদীছ নং ৪৯৩০; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৫; আহমাদ, হাদীছ নং ২১১১৩; দারিমী, হাদীছ নং ২৬৬৩

এখতিয়ারের বাইরের জিনিস নয়; সম্পূর্ণরূপেই এখতিয়ারাধীন। বলা বাহুল্য এখতিয়ারাধীন জিনিস থেকে বেঁচে থাকাও এখতিয়ারাধীনই। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই তা পরিহার করে চলা যায়। তাই পরিহার করা অবশ্যকর্তব্য।

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত অনুমোদিত

হ্যাঁ কয়েকটি ক্ষেত্র এমনও আছে, যেখানে শরী'আত গীবত করার অনুমতি দিয়েছে। যেমন কোন মুসলিমকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর ইচ্ছা থাকলে সেক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয। উদাহরণত, এক ব্যক্তি আপনার কাছে এসে জানাল, অমুক ব্যক্তি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে লোকটি কেমন? এখন আপনার দৃষ্টিতে যদি তার মধ্যে এমন কোন আপত্তিকর বিষয় থেকে থাকে, যা বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়ে থাকে, তবে এক্ষেত্রে আপনার উচিত তাকে সে বিষয়টা জানানো। যাতে তার মেয়ে ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। এক্ষেত্রেও যদি অন্যের পেছনে নিন্দা করা হচ্ছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তা গীবতের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তবুও শরীআত এটাকে জায়েয রেখেছে।

কিংবা এক ব্যক্তি প্রতারক। সে মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা নেয়। আপনি যদি মানুষকে তার সম্পর্কে সাবধান করেন এবং বলে দেন যে, তার সাথে যেন সতর্কতার সাথে লেনদেন করে, কেননা তার লেনদেন স্বচ্ছ নয়, তবে এটাও নিষিদ্ধ গীবতের মধ্যে পড়বে না, যেহেতু এর দ্বারা অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোই উদ্দেশ্য। সুতরাং যেক্ষেত্রে অন্যকে সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা অন্যকে দুনিয়া বা আখিরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা উদ্দেশ্য থাকে, সে ক্ষেত্রে অন্যের দোষ বর্ণনা দুষণীয় নয় এবং তা নিষিদ্ধ গীবতেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা করা জায়েয।

ফাসেক ও পাপী ব্যক্তির গীবত

সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ যে, ফাসেক ও পাপী ব্যক্তির গীবত করা জায়েয। কিন্তু সাধারণভাবে এ কথা সঠিক নয়। বরং নেককার লোকের গীবত যেমন জায়েয নয়, তেমনি বদকারেরও জায়েয নয়। কেউ কোনও গুনাহ প্রকাশ্যে করলে এবং তা এমন নির্লজ্জভাবে যে, সে জন্য তাকে ভালোমন্দ যাই বলা হোক না কেন তার কোনও পরওয়া সে করে না, নির্দিষ্ট সেই গুনাহের কথা তার অনুপস্থিতিতে বলা জায়েয। উদাহরণত এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে মদ পান করে এবং তা সকলকে জানিয়েই করে, এখন আপনি যদি তার আড়ালে

বলেন যে, অমুক ব্যক্তি মদ খায়, তবে তা জায়েয হবে। কেননা আপনার এ বলাতে সে কোন কষ্ট পাবে না। সে নিজেই তো জানিয়ে বেড়াচ্ছে যে, আমি মদ খাই। তাই এটা নিষিদ্ধ গীবতের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যে গুনাহ প্রকাশ্যে নয়, বরং গোপনে করে এবং সেই গুনাহের সাথে যুক্ত করে নাম প্রচার হোক এটা তার পসন্দ নয়, সে রকম প্রচারণায় সে দুঃখিত হবে, তার এই গুনাহের কথা তার অগোচরে বলাবলি করলে তা কিছুতেই জায়েয হবে না, যদিও ঘটনা সত্য। কেননা এটা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং সে কারণে হারাম। তাই মুখে লাগাম পরাতে হবে। নয়ত তা আপনাকে গীবতের গুনাহে লিপ্ত করবে। মনে রাখতে হবে, গীবত নিজে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি অন্যের গীবত শোনাও সম্পূর্ণ নাজায়েয।

অন্যের সম্পর্কে আলোচনা না করাই শ্রেয়

এ কারণেই হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, সতর্কতা এটাই যে, অন্যের সম্পর্কে আলোচনাই করো না। তার ভালোটাও বলার দরকার নেই, মন্দটাও নয়। কেননা অন্যের ভালোটা নিয়ে আলোচনা করবে তো এক পর্যায়ে শয়তান তার মধ্যে কী দোষ আছে, সেই দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে। শেষে বলবে, ভাই লোক তো খুব ভালো, কিন্তু তার মধ্যে এই দোষও খানিকটা আছে। তারচে' এটাই ভালো যে, অন্যকে নিয়ে আলোচনাই করো না।

নিজের চিন্তাতেই থাকুন

অন্যের সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনই বা কিসের? চিন্তা করার মত বিষয় কি নিজের মধ্যে কম আছে? সেদিকেই নজর রাখুন–

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

'পরকে নিয়ে ভাবছ কেন, নিজের পরিণাম কি হয় দেখ।'

যার নিজ দোষের প্রতি নজর থাকে, তার অন্যের দোষ খোঁজার অবকাশ কোথায়? যে নিজেই অসুস্থ, যে নিজেই পেট ব্যাথায় আক্রান্ত, অন্যের রোগ চিন্তা তার পক্ষে সম্ভব কি? সুতরাং প্রয়োজন নিজের দিকে নজর দেওয়া। যে ব্যক্তি নিজের দিকে নজর রাখে, খুঁজে বেড়ায় আমার মধ্যে কী দোষ আছে, সেই দোষের প্রতিকার কিভাবে হবে, কি উপায়ে আমার আত্মশুদ্ধি লাভ হবে এবং কোন্ উপায়ে আত্মিক রোগসমূহ থেকে মুক্তি পাব, তার দ্বারা অন্যের গীবত হওয়া সম্ভব নয়। সে কিছুতেই পরচর্চায় লিপ্ত হতে পারে না।

শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জুফর বড় সুন্দর বলেছেন–

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر   رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر   تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

ছিলাম না যবে আপন হাল সম্পর্কে সচেতন, খুঁজে ফিরেছি কেবল পরের দোষ-গুণ। সহসা যখন নজর পড়ল আপন দোষের প্রতি, তখন আর এ চোখে থাকল না কোনও লোকই মন্দ।

কেননা যখন নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ল আর দেখতে পেলাম কত রকমের অসদ্গুণ আমার মধ্যে বিদ্যমান, তখন মনে হল আমিই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বদলোক। আমার চেয়ে খারাপ কোন মানুষ কোথাও নেই। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে আপন দোষের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো ও সেগুলোকে সংশোধন করার তাওফীক দান করুন।

গীবতের একটি ব্যবহারিক চিকিৎসা

এবার গীবত সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) প্রদত্ত ব্যবস্থা ও নির্দেশনার ব্যাখ্যা পেশ করছি। তিনি বলেন।

মালিক অর্থাৎ আল্লাহকে যে পেতে চায়, তার সামনে কেউ কারও গীবত করলে বা অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হলে (তার প্রথম কর্তব্য তাতে বাধা দেওয়া) আর তাতে তার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে সেখান থেকে উঠে যাওয়াই (দ্বিতীয়) কর্তব্য। এতে সেই গীবতকারীর মনে কষ্ট লাগলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। কেননা অন্যের মন রক্ষার চেয়ে নিজের দ্বীনরক্ষা বেশি জরুরি। স্বাভাবিকভাবে ওঠা সম্ভব না হলে অন্য কোন বাহানায় উঠে যাবে। অথবা ইচ্ছাকৃত অন্য কোনও আলোচনা শুরু করে দেবে, যাতে সেই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।[৬৬]

একটু আগেই বলা হয়েছে, গীবত যেমন নিজে করা নাজায়েয তেমনি অন্যের গীবত শোনাও নাজায়েয। প্রশ্ন হচ্ছে কোনও মজলিসে গীবত শুরু হয়ে গেলে তখন করণীয় কী? এরই উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে বাধা দেবে। তার দুটি পন্থা হতে পারে। (ক) সরাসরি বলে দেবে যে, দেখ এভাবে অন্যের সমালোচনা ঠিক নয়। এটা গীবত, এটা বাদ দিয়ে অন্য কথা বল, (খ) এরূপ সরাসরি বলতে না পারলে

---

৬৬. আনফাসে 'ঈসা, পৃ. ১৪৯

আলোচ্য বিষয় বদলে দেবে। নিজের পক্ষ থেকেই অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দেবে, যাতে সেই কিস্‌সা খতম হয়ে যায়। যার সেই ক্ষমতাও নেই তার কর্তব্য মজলিস থেকে উঠে যাওয়া। অন্ততপক্ষে নিজেকে তো বাঁচানো গেল।

কে কি মনে করল সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না

অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) মূলনীতি বলে দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে গীবতকারীর মনঃকষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। কেননা নিজের দীন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা আরও বেশি জরুরি। বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা এই দ্বিমুখী প্রান্তিকতার শিকার আমরা সব ক্ষেত্রেই। একদিকে তো হক্কুল-ইবাদের কোনও মূল্যই আমরা দেই না। যে যেভাবে পারি অন্যের হক পদদলিত করি, তা জানমালের হক হোক বা ইজ্জত-আবরুর হক। অন্যদিকে ক্ষেত্রবিশেষে হক্কুল-ইবাদের গুরুত্ব দিতে গিয়েও এমন অন্ধ হয়ে পড়ি যে, তার জন্য শরীআতের অন্যান্য ফরয কাজসমূহে অবহেলা করতেও দ্বিধাবোধ করি না।

ওয়াক্‌ত মত নামায পড়া ফরয

এর উদাহরণ দেওয়া যায় জনৈক ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে। তার স্ত্রী আমাকে জানান যে এমনিতে তো আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। কিন্তু ক্লিনিকে কর্মরত থাকার সময় নামায পড়েন না। আমি তাকে নামাযের সময়ে নামায আদায় করে নিতে বললে তিনি উত্তর দেন, আমি তো মানুষের সেবা করছি। এটা হক্কুল 'ইবাদ' রোগী চিকিৎসার অপেক্ষায় বসে আছে আর আমি নামাযে দাঁড়াব? তিনি ডিউটির পুরোটা সময় এভাবে পার করেন। তারপর বাসায় ফিরে আসর, মাগরিব ও ইশার নামায এক সাথে আদায় করে নেন। তাঁর কথা হল আমি মানবসেবা করছি। মানবসেবার কাজ করতে গিয়ে নামায কাযা হলে কোন ক্ষতি নেই।

ভাই মানবসেবা অতি উত্তম কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা তো তোমার উপর নামাযের মত ফরযে আইন নয়। তা ছাড়া মানবসেবার সাথে নামাযের কোনও বিরোধও নেই। আসরের চার রাক'আত ফরয পড়ার পর আবার রোগী দেখা শুরু করলে এমন কী ক্ষতি হয়ে যাবে? আসলে নামায কাযা করানোর জন্য নফস ও শয়তান মানবসেবাকে বাহানারূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এসবই প্রান্তিকতা এ একদেশদর্শিতা, দীনের সঠিক বুঝ না থাকার

কারণেই এসব হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত থানভী (রহ.) বলেন, অন্যের মন রক্ষার খাতিরে নিজের দীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নয়। কাজেই গীবতকালে বাধা দিলে গীবতকারী মনে কষ্ট পাবে কিংবা মজলিস থেকে উঠে গেলে সে আহত হবে, এসব চিন্তা একদম বাদ দিয়ে দিন। গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার ফলে কেউ মনে কষ্ট পেলে তা পেতে দিন। অন্যের মন রক্ষা করা কেবল ততক্ষণই কর্তব্য যতক্ষণ তা বৈধতার সীমারেখার মধ্যে থাকে। সেই সীমার ভেতরে আপনার দ্বারা যাতে কারও মনে আঘাত না লাগে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখুন। কিন্তু অন্যের মনরক্ষা করতে গিয়ে যদি গুনাহে লিপ্ত হতে হয় তবে সে মনরক্ষার কোন বৈধতা নেই। গুনাহ থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। সে জন্য কেউ মনে কষ্ট পেলে পাক এবং সে মনঃকষ্টকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করুন।

পরের দুনিয়ার জন্য যে নিজ আখিরাত নষ্ট করে

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থে নিজ আখিরাত নষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দুনিয়ায় সেই অন্য ব্যক্তির আধিপত্য দান করেন। ফলে যার জন্য সে নিজ আখিরাত বরবাদ করেছিল সেই ব্যক্তি তার দুনিয়াও বরবাদ করে দেয়। এটা একটা পরীক্ষিত বিষয়। দেখা যায়, যে ব্যক্তি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভোগ-বিলাসিতার জন্য অবৈধ উপার্জনে লিপ্ত হয়, তার মাথার উপর সেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই এমনভাবে চেপে বসে যে, তাদের উৎপাতে তার সব আরাম হারাম হয়ে যায়। তা তো হারাম হবেই, যেহেতু সে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে নাখোশ করেছিল এবং তাদের পার্থিব স্বার্থে নিজ আখিরাত বরবাদ করেছিল। সুতরাং সাবধান, অন্যের মনরক্ষার খাতিরে যেন নিজের দীন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রয়োজন দৃঢ় মনোবলের

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয়ে যায় এমন কাজে কোন মাখলুকের আনুগত্য করার সুযোগ নেই।'[৬৭]

---

৬৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১০৪১

কাজেই গীবত করা যেহেতু নাফরমানীর কাজ, যা করলে আল্লাহ তা'আলা নাখোশ হন, তাই তার জন্য কোন মানুষের মনরক্ষার প্রয়োজন নেই এবং তা করার কোন বৈধতাও নেই। মনে রাখতে হবে, কোনও কাজই হিম্মত ও দৃঢ় মনোবল ছাড়া হয় না। সব কাজেই কিছু না কিছু কষ্ট-ক্লেশ করতেই হয়। যে-কোনও ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল কেবল শ্রম-সাধনার পরই পাওয়া যায়। এখন আপনি যদি বিশ্বাস করেন গীবত করা মন্দ কাজ ও কঠিন গুনাহ, সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করেন যে, এর দ্বারা আখিরাত বরবাদ হয়, তবে এর থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে শ্রম-সাধনা করতেই হবে। আপনি যখন হিম্মত করে কাজে লেগে পড়বেন তখন আল্লাহ তা'আলাও আপনাকে সাহায্য করবেন। ফলে এই গুরুতর পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যাবে।

গীবত কখন নাজায়েয?

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করল,

কেউ যদি অন্তরংগতার কারণে কারও সম্পর্কে এমন কোনও কথা বলে, যা আপাতদৃষ্টিতে তার পক্ষে মনঃক্ষুণ্নতার কারণ হলেও অন্তরংগতা বা রসিকতা হিসেবে বলার কারণে মনঃক্ষুণ্নতার দিকে লক্ষ থাকে না। (এরূপ কথাও কি নিষিদ্ধ গীবত ও নাজায়েয হবে?)[৬৮]

প্রশ্নকর্তা বোঝাতে চাচ্ছিল, কোনও কোনও লোকের সাথে গভীর হৃদ্যতা থাকায় তাদের সাথে খোলামেলা কথাবার্তা বলা হয়, রসিকতা করা হয় ও সহজ-সরল আচরণ করা হয়। এরূপ কারও সম্পর্কে যদি তার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কথা বলা হয়, যা আপাতদৃষ্টিতে গীবতই হয়ে থাকে এবং তা অন্য কারও সম্পর্কে বলা হলে সে তাকে সহজভাবে নেবে না, বরং পেছনে সমালোচনা করা হচ্ছে ভেবে মনে কষ্টই পাবে, কিন্তু এখানে যেহেতু অন্তরঙ্গতা আছে আনন্দ-ফূর্তি ও রসিকতার সম্পর্ক আছে, তাই সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে এমনটা চিন্তা করা হয় না। এক্ষেত্রে কি সে রকম কথা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং সে কারণে তা নাজায়েয হবে?

হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

"যেহেতু তা মনঃক্ষুণ্নতার কারণ, তাই যেভাবেই বলা হোক না কেন নাজায়েযই হবে। এমনকি সে মনঃক্ষুণ্ন হবে কি না তা নিয়ে যদি সন্দেহও

---

৬৮. আনফাসে ঈসা : পৃ. ১৪৯

থাকে, তবুও তা পরিত্যাজ্য। অবশ্য মনে কষ্ট পাবে না বলে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলে তখন আর তা গীবতের মধ্যে পড়বে না।"

অর্থাৎ আমি যার সম্পর্কে বলছি সে আমার এসব কথা শুনলে যে মনে কষ্ট পাবে না এ ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত, যেহেতু তার সাথে আমার সম্পর্ক এরকমই, তখন তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উদাহরণত, আপনি আপনার কোন বন্ধুকে একবার কথা প্রসঙ্গে বলে দিলেন, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ। পরে কোন মজলিসে তার সম্পর্কে কথা উঠল আর তখন আপনি বলে উঠলেন, আরে, ওই অকৃতজ্ঞের কথার কি মূল্য আছে? এই অকৃতজ্ঞ শব্দটা এমন যে, তৃতীয় কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলে তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হবে, কিন্তু বন্ধুতে-বন্ধুতে এ জাতীয় শব্দ হর-হামেশাই ব্যবহৃত হয় এবং তাতে কেউ কিছু মনে করে না। এই কিছু মনে না করার ব্যাপারটা যদি নিশ্চিত হয় অর্থাৎ যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, আমার একথা বন্ধুটি শুনলে এটাকে সহজভাবেই নেবে, মন খারাপ করবে না, তবে এটা গীবতের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু সেই নিশ্চয়তা যদি না থাকে, বরং মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং না পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তখন একে নাজায়েযই গণ্য করতে হবে।

যে রসিকতা জায়েয নয়

মানুষের মেজাজ-মরজি একরকম হয় না, যে কারণে কোনও কোনও বন্ধু তো রসিকতাকে সহজভাবেই নেয়, তাই তার সাথে যে কোনও রকম হাসি-তামাশা করা চলে। অপরদিকে কিছু ক্ষ্যাপাটে প্রকৃতির লোক আছে, যারা রঙ্গ-রসিকতাকে সহজে বরদাশত করতে পারে না। রসিকতা করলে তারা ক্ষেপে যায়, তারা এসব পসন্দ করে না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা সে দিকে লক্ষ করে না। তারা মজা নেওয়ার জন্য তাদের সাথে আরও বেশি তামাশা করে। তাতে তারা তো মজা পায়, কিন্তু যাকে নিয়ে মজা করে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করে এবং সেজন্য মনে কষ্ট পায়। বন্ধুদের মনে রাখতে হবে, তারা যদিও সরল মনে ও রসিকতাচ্ছলে তাকে সেসব কথা বলছে, কিন্তু সে যেহেতু তা বরদাশত করতে পারছে না, উল্টো মনে কষ্ট পাচ্ছে, তাই এরকম হাসি-তামাশা তার সাথে জায়েয হবে না। কেননা কোন মুসলিমের মনে আঘাত করা কোনওক্রমেই জায়েয নয়।

হ্যাঁ, যার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সরলমনের এই পরিহাসকে খারাপ মনে করবে না; বরং সে এতে আনন্দই বোধ করবে, তার ক্ষেত্রে সামনে ও

পেছনে সর্বাবস্থায় এরূপ কথা বলা জায়েয হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিষয়টা তিন প্রকার–

(ক) মনে কষ্ট পাবে বলে নিশ্চিত থাকা; (খ) মনে কষ্ট পাওয়ার সন্দেহ থাকা এবং (গ) কষ্ট পাবে না বলে নিশ্চিত থাকা। প্রথম দুই অবস্থায় এরূপ কথা বলা জায়েয নয় এবং তৃতীয় অবস্থায় জায়েয। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচার হিম্মত ও তাওফীক দান করুন। আমীন।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

গীবত থেকে বাঁচার জন্য হযরত থানভী (রহ.) অত্যন্ত মূল্যবান এক ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

চিন্তা-ভাবনা না করে কোনও কথা বিলকুল বলবে না। একথা সত্য যে, চিন্তা করার ব্যাপারটা সব সময় মনে থাকবে না, কিন্তু চিন্তা যে করতে হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখলে অধিকাংশ সময়ই মনে থাকবে। আর নিয়মিত চর্চা করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। তারপর আর ভুল হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে কথা বলার আগে কী চিন্তা করবে? চিন্তা করবে এই যে, আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তাতে গুনাহ হবে না তো? ইনশাআল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা অনেক কিছুরই সংশোধন হয়ে যাবে।[৬৯]

অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। যাই বলবে চিন্তা করে বলবে, চিন্তা করবে যে, আমি মুখে যে কথা উচ্চারণ করতে যাচ্ছি তা আমাকে নাফরমানীতে লিপ্ত করবে না তো এবং সে কারণে আমি গুনাহগার হয়ে যাব না তো? ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেন–

قُلْ خَيْرًا وَإِلَّا فَاصْمُتْ

'হয় ভালো কথা বল, নয়ত চুপ থাক।'

ফযূল ও পাপ কথা বলে বেড়ানো অপেক্ষা নীরব থাকা হাজার গুণ শ্রেয়, যেহেতু সেসব কথার পরিণাম জাহান্নামের শাস্তিভোগ।

যে জিনিষ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

৬৯. আনফাসে 'ঈসা, পৃ. ১৪৯

'মানুষের মুখ দিয়ে যে সব কথা উচ্চারিত হয়, তাই তো মানুষকে অধঃমুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।'[৭০]

মুখ হল এক স্বয়ংক্রিয় মেশিন। আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে এটা মানুষকে দান করেছেন। জন্মের পর থেকে এটা চলতে শুরু করেছে। মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকবে। এতে তেল-মবিল দিতে হয় না। সার্ভিসিংয়ের দরকার হয় না এবং কোনও রকম মেরামত করতে হয় না। একদম নিখরচায় এটা কাজ করে যাচ্ছে। তাও এমন অনায়াসে যে, মনে একটা কথা জাগল আর তা বলার ইচ্ছা হল, এমনি তা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। এত বড় এক নি'আমত আমরা ভোগ করে যাচ্ছি, অথচ এর কোন কদর আমাদের কাছে নেই। যেহেতু জন্ম থেকেই লাভ করেছি, অনবরত কাজ করে যাচ্ছে এবং কোনও রকম খরচ ও মেহনত করতে হয় না, তাই এ নি'আমতের কোন মূল্য আমাদের চোখে নেই।

জবানের মূল্য

জবান যে কী মূল্যবান সম্পদ, তা যাদের বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন। কী যন্ত্রণাই না তারা ভোগ করছে! প্যারালাইসিসে যারা বাকশক্তি হারিয়েছে, তারা কথা বলতে চায়, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতাকে কিছু জানাতে চায়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মনের কথা প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু বাকশক্তি নেই, কিছুই বলতে পারে না। কখনও কখনও মনের দুঃখে মাথা পিটায়। মনে আক্ষেপ সে যা চায় তা বোঝাতে পারছে না। এরূপ অবস্থায়ই বুঝে আসে এ জবানের কী মূল্য এবং বাকশক্তি কতবড় নি'আমত!

আল্লাহ না করুন, আমাদের কারও জবান যদি দু মিনিটের জন্য বন্দ হয়ে যায়, বলার শক্তি না থাকে আর এ অবস্থায় কেউ বলে, বিপুল অর্থব্যয় ছাড়া তুমি বাকশক্তি ফিরে পাবে না, তবে সে লাখ-লাখ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সে ভাববে, যত টাকা খরচ হয় হোক, আমি কথা বলার শক্তি তো ফিরে পাই! সেই অমূল্য জবান আমরা বিনামূল্যে লাভ করেছি। কোন কদর করছি না। কাঁচির মত চলছে। যত্রতত্র ব্যবহার করছি। হালাল-হারামের কোন ভেদাভেদ নেই। কোন চিন্তা নেই কখন কোন্ কথা এই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছি।

---

৭০. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৪১; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৯৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১০০৮

দু'টি মহান বাক্য

শরী'আতের দাবী, মানুষ এ সরকারী যন্ত্র ভালো কাজে ব্যবহার করবে। মুফতে পাওয়া এ সম্পদের অপব্যবহার করবে না। একে হারাম থেকে রক্ষা করে কল্যাণকর কাজে লাগাবে। মানুষ ইচ্ছা করলে জবান দিয়ে মহা কল্যাণ লাভ করতে পারে। হাদীছ শরীফে আছে, একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে যে 'দাঁড়িপাল্লা' দিয়ে আমল মাপা হবে, তার অর্ধেক ভরে যায়। বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীছে আছে–

كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ

দুটি বাক্য দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, মুখে অতি সহজ এবং দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী। তা হল সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আজীম'।[৭১]

মোটকথা, মানুষ মুখের সঠিক ব্যবহার করলে সে পুণ্যের স্তুপ গড়তে পারে এবং পারে জান্নাতের রাশিরাশি নি'আমত সংগ্রহ করতে। তাই চলাফেরা ওঠাবসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর দ্বারা জিহ্বাকে সতেজ-সজীব রাখা উচিত। হাদীছ শরীফে আছে, একবার এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী? তিনি উত্তর দিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখা।[৭২]

সুতরাং চলাফেরা উঠাবসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতে থাকলে আমলনামায় পুণ্যযোগ হতে থাকবে এবং যোগ হতে হতে পুণ্যের মহাস্তুপ গড়ে ওঠবে আর এভাবে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে পুরস্কার ও প্রতিদানের অফুরন্ত ভাণ্ডার নসীব হবে।

যা দ্বারা ইসলামে প্রবেশ করা হয়

এই জবানই তো মানুষকে কুফুর থেকে মুক্ত করে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সত্তর বছরের কাফেরকে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ঈমানের তাওফীক

---

৭১. বুখারী, হাদীছ নং ৫৯২৭ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৮৬০; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৮৯; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৭৯৬; আহমাদ, হাদীছ নং ৬৮৭০

৭২. তিরমিযী হাদীছ নং ৩৭২০

দান করেন আর সে মুখে উচ্চারণ করে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার- রাসূলুল্লাহ' (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)। ব্যস সত্তর বছরের কুফ্‌রী কার্যক্রমের কারণে যেই জাহান্নামের তলদেশ তার জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছিল, এই কালিমায়ে তায়্যিবার উচ্চারণ দ্বারা তা থেকে মুক্তি পেয়ে সে এখন জান্নাতুল-ফিরদাওসের শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল। এই যে সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে গেল, তা এই জবানের বদৌলতেই তো? আল্লাহ তা'আলা এমনই শক্তি এর ভেতর নিহিত রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, এক ব্যক্তি সারটা জীবন কুফ্‌র পাপাচার ও দুষ্কর্মের ভেতর কাটিয়েছে, তারপর শেষ জীবনে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, ফলে সে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এরপর আর কিছু করার সুযোগ তার হয়নি। কালেমা পাঠের পরপরই তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। ভাবুন তো ব্যাপারটা! এই মৃত্যু যদি খানিকটা আগে হয়ে যেত, কালেমা পাঠের পূর্ব মুহূর্তেই যদি তার প্রাণবায়ু উড়ে যেত, তবে তাকে সোজা জাহান্নামে চলে যেতে হত, কিন্তু কালেমা পাঠের মাধ্যমে সেই পরিণতি থেকে সে বেঁচে গেছে। কালেমা পাঠের পরে মৃত্যু হওয়ায় সে সোজা জান্নাতে পৌঁছে গেছে। এভাবে কালেমা শরীফের উচ্চারণ তাকে জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের করে জান্নাতুল-ফিরদাউসের উচ্চতম ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

জিহ্বার উপকার-অপকার দু'টোই বিপুল

সুতরাং ইচ্ছা করলে জিহ্বা দ্বারা আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহ করতে পারেন। কত রকমের পুণ্য এর দ্বারা অর্জন করা যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। ইচ্ছা হলে কুরআন তিলাওয়াত করুন, যিক্‌র করুন, তাসবীহ পাঠ করুন, আল-হামদুলিল্লাহ যপুন, শুক্‌র আদায় করুন, প্রীতিকর কথা বলে মুসলিম ভাইয়ের মনোরঞ্জন করুন এবং এরূপ আরও অজস্র পুণ্যের কাজ আছে, যা মুখের দ্বারা সাধিত হয় এবং এর মাধ্যমে আখিরাতের বিপুল পুঁজি সঞ্চিত হয়। মুসলিম ভাইয়ের মনোরঞ্জন কিছু তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ভালো কথা দ্বারা কাউকে খুশি করলে তাতে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়।

অপরদিকে জবানের অপব্যবহারও অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস, এর ক্ষতিও বিপুল। যেমন পূর্বে হাদীছ শোনানো হয়েছে যে, মানুষ তার জিহ্বা দ্বারা যা, কিছু অর্জন করে তার কারণেই তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করা

হবে। মানুষ এই মুখ দিয়ে মিথ্যা বলছে, গীবত করছে, অন্যের মনে আঘাত করছে, অশ্লীল কথা বলছে, আরও কত কি! এসবই মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছাবে। দেখা যাচ্ছে জবানের উপকারও বিশাল এবং ক্ষতিও বিরাট। তাই ভেবেচিন্তে কথা বলাই নিরাপদ। এ কারণেই হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যখনই কোন কথা বলবে, আগে চিন্তা করবে, সে কথা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছাবে, না জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর নিয়ম

হযরত ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, কেউ যখন তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, তিনি কখনও-কখনও দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকতেন, কোন উত্তর দিতেন না। একবার কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত এতক্ষণ হয়ে গেল কোন উত্তর দিলেন না, কোনও কথাই বলছেন না, ব্যাপার কী? তিনি বললেন–

حَتّٰى اَعْرِفَ اَنَّ الْفَضْلَ فِى السُّكُوْتِ اَوْ فِى الْكَلَامِ

'আমি নীরব থাকছি ভেবে দেখার জন্য যে, উত্তম কোনটা, কিছু বলা, না চুপ থাকা?'

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মাপজোখ করছেন যে, এখন আমি যা বলব তা আমার পক্ষে উপকারী হবে, না ক্ষতিকর। আগে মেপে নেওয়া, তারপর বলা। উপকারী সাব্যস্ত বলে বলা, নয়ত চুপ থাকা। জবান ব্যবহারের জন্য এটাই উত্তম পন্থা, এতেই নিরাপত্তা।

জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি আমাকে দু'টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয় তা দেই। জিনিস দু'টি কী? একটি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু অর্থাৎ জবান। নিশ্চয়তা দেবে যে, এর অপব্যবহার করবে না। দ্বিতীয়টি হল দুই উরুর মধ্যবর্তী জিনিস, অর্থাৎ লজ্জাস্থান। এরও অপব্যবহার করবে না। এই দুই জিনিসের হেফাজত যে ব্যক্তি করতে সক্ষম হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জান্নাতের জিম্মাদার।

সুতরাং খুব সতর্ক থাকা দরকার মুফতে পেয়েছি বলে সরকারী মাল ইচ্ছামত ব্যবহার কর, সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কাচির মত চালাও, থামার নাম নেই, যা মুখে আসে বল, কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই, এসব ঠিক নয়, বরং যে-কোনও কথা বলার আগে ভালোভাবে চিন্তা করে নেওয়া উচিত যে, একথা আমার জন্য উপকারী, না ক্ষতিকর।

দু'জন শিক্ষার্থী ও ফযুল কথা

দিল্লীতে হযরত মির্যা মাজহার জানে জানা (রহ.) নামে একজন উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। খুবই নাজুক স্বভাবের ছিলেন। এ সম্পর্কে বহু ঘটনা আছে। একবার আফগানিস্তানের বলখ থেকে দু'জন লোক তাঁর কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য আসল। তারা সেখান থেকেই তাঁর বুযুর্গীর সুখ্যাতি শুনেছিল এবং তাতে তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তাই মনস্থির করে ফেলেছিল তাঁর কাছে মুরীদ হবে। বলখ থেকে দিল্লী কম দূরের পথ নয়, কিন্তু মুরীদ হওয়ার উদ্দীপনায় পথের দূরত্ব তাদের কাছে কোন বাধা মনে হয়নি। হযরত মির্যা সাহেব (রহ.) যে মসজিদে নামায পড়তেন তারা এসে সেখানে উপস্থিত হল। তখন নামাযেরও সময় হয়ে যাচ্ছিল। তাই তারা হাওযে ওযূ করতে বসে গেল। তারা ওযূ করছিল আর হাওয নিয়ে পরস্পরে কথা বলছিল। একজন প্রশ্ন করল, হাওয কোন্‌টি বড়– এইটি, না আমাদের বলখের জামে মসজিদের? অপরজন বলল, এটিই বড়। প্রশ্নকর্তা বলল, না বলখেরটি। পরস্পরে এই নিয়ে বাহাস চলছিল। ঠিক এ সময়ে হযরত মির্যা সাহেব (রহ.) সে পথে মসজিদে আসছিলেন। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন। নামাযের পর তারা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হল এবং সবিনয়ে জানাল, আমরা বলখ থেকে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে? তারা বলল, আপনার হাতে বায়'আতের আশায়। হযরত মির্যা সাহেব (রহ.) বললেন, বায়'আতের জন্য এসেছেন ভালো কথা, কিন্তু হাওয কোনটি বড় তার মীমাংসা কি হয়ে গেছে? একথা শুনে তো তারা লজ্জায় একশেষ। আমাদের এই ফালতু আলাপ হযরত শুনে ফেলেছেন! কেউ কোন কথা বলল না। শেষে হযরত বললেন, এখনও যদি তার মীমাংসা না হয়ে থাকে, তবে একটা কাজ করুন। বায়'আতের ব্যাপারটা পরেই হোক। তার আগে আপনারা বলখে চলে যান। গিয়ে সেই হাওযটি মাপুন। তারপর আবার এখানে চলে আসুন এবং এই হাওযটি মাপুন। এভাবে আগে ফয়সালা করে নিন হাওয কোনটি বড়, কোনটি ছোট। তারপর বায়'আত হোন। কেননা, আপনাদের কথাবার্তা

দ্বারা বোঝা গেছে, যে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, তার সঠিক জ্ঞান আপনাদের কারও নেই। সেই সঙ্গে নেই সতর্কতাও। একজন মাপজোখ ছাড়াই দাবি করে বসেছেন হাওয এইটি বড়। দ্বিতীয়জনও একইভাবে দাবি করেছেন ওইটি বড়। এভাবে না জেনে একটা বিষয়ে বাহাস শুরু করে দিয়েছেন। এর দ্বারা জানা গেল আপনাদের স্বভাবে সতর্কতা নেই। দ্বিতীয়ত জানা গেল, আপনারা ফযূল কথাবার্তায় অভ্যস্ত। যদি জানাও থাকত ঠিক কোনটা বড়, তাতে দুনিয়া বা আখিরাতের কী ফায়দা হাসিল হত? কাজেই এ আলোচনা ফালতু নয় তো কী? সুতরাং আপনারা বলখ চলে যান এবং হাউজটা মেপে আসুন। তার আগে আমি বায়'আত করব না।

চিকিৎসার উপকারিতা

আগের দিনে তো চিকিৎসা এভাবেই করা হত, কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাকে অত্যন্ত শক্ত ও তিক্ত মনে করা হয়। তা যতই তিক্ত হোক নিশ্চিত করেই বলা যায় তাদের সারা জীবনের জন্য এই এক চিকিৎসাই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর পর আর তারা না জেনে কোন কথা বলবে কিংবা নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হবে তা ভাবাই যায় না। যা হোক এককালে এভাবেও চিকিৎসা করা হত। কেবল যিক্‌র ও তাসবীহ বলে দেওয়া আর বসে বসে ওজীফা আদায় করাকেই যথেষ্ট মনে করা হত না। কেবল ওজীফা পাঠ দ্বারাই কামেল বুযুর্গ হয়ে যাবে এরূপ ধারণা সেকালে ছিলই না। বরং এভাবে দলাই-মারাই করা হত আর এর ফলশ্রুতিতে তাদের ইসলাহ ও আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ হত।

কঠিন চিকিৎসা সম্পর্কে আপত্তি ও তার উত্তর

এ ঘটনা বর্ণনার পর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সেই শিক্ষার্থীরা তো বড় জোর একটা ভুল কাজ করেছিল। ভুল-চুক না হলে তাদের আসারই বা কি প্রয়োজন ছিল? তারা এসেছিল নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধন করতে। আগে থেকে কামেল হয়ে থাকলে, জবানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং চিন্তা-ভাবনা নিজ শাসনে থাকলে শায়খের কাছে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কাজেই এই ক্রটির কারণে শায়খ তাদের বায়'আত করতে অস্বীকার করলেন কেন? প্রথমে বায়'আত করে নিতেন, তারপর চিকিৎসা করতেন, সেটাই তো যুক্তিযুক্ত ছিল।

হযরত থানভী (রহ.)-এর জবাব দেন যে, এখানে দু'টো বিষয় আছে। (এক) এই অস্বীকৃতি দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল, কিছু বিষয়ের প্রতি সালেক

ও মুরীদের প্রথম থেকেই লক্ষ থাকা দরকার। প্রথমে যদি বড়-বড় ও স্থূল বিষয়াদির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকে, তবেই মুরীদের পক্ষে শায়খ দ্বারা উপকার লাভ সম্ভব হয়। হ্যাঁ যে সব জিনিস সূক্ষ্ম ও গভীর সাধারণত মুরীদের দৃষ্টি সেদিকে যায় না। শায়খ দ্বারা সে গুলোকেই সংশোধন করাতে হয়। তো শায়খ এস্থলে বায়'আত করতে অস্বীকার এ জন্যই করেছেন যে, এখনও পর্যন্ত স্থূল ভুল-ত্রুটির দিকেও তাদের লক্ষ যায় নি, যে কারণে তারা বায়'আতের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

(দুই) দ্বিতীয়ত কার সাথে কী আচরণ করতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই শায়খের অন্তরে জাগ্রত করা হয়। একেক জনের এলাজ ও চিকিৎসা একেক রকম হয়ে থাকে। কারও চিকিৎসা করতে হয় থাপ্পর মেরে কারও চিকিৎসা করতে হয় ধমক দিয়ে, কারও হয় আদর-স্নেহ দিয়ে, কারও হয় চুঁশব্দ করে এবং কারও হয় কেবল দৃষ্টিপাত দ্বারা। এখন কার জন্য কোন পন্থা উপযোগী তা আল্লাহ তা'আলাই শায়খের অন্তরে উদ্রিক্ত করেন। অন্যে দেখে মনে করে শায়খ তার সাথে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, কিন্তু প্রকৃত রহস্য থাকে তার অগোচর। সে জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা এরই মধ্যে তার সংশোধন নিহিত রেখেছেন।

আমার মহান পিতা (রহ.)-এর নিয়ম

আমি আমার মহান পিতা (রহ.)-এর মধ্যেও এ ব্যাপারটা বারবার লক্ষ করেছি। এমনিতে তো তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। রাগ করতেন না বললেই চলে। যে- কারও সাথে তার ব্যবহার ছিল কোমল ও বিনীত। কিন্তু কখনও কখনও এমনও হত যে, হঠাৎ কারও উপর তুচ্ছ কোন ব্যাপারে খুব রেগে গেলেন। স্থূলদর্শীদের কাছে তা বেখাপ্পা মনে হত। তাদের ধারণায় লোকটার উপর বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের অন্তরে এই বোধ জাগিয়ে দেন যে, কখন কার প্রতি কী আচরণ করতে হবে। অন্যরা তা বুঝতে পারে না বলেই ভুল ধারণা করে।

তাঁর এরকম একটা ঘটনা শুনুন। একবার একজন খ্যাতিমান উচ্চ শিক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে। কথাবার্তা শুরু হল। কিন্তু তিনি হয়ত দু'তিনটি বাক্যই বলতে পেরেছিলেন, এরই মধ্যে আব্বাজী (রহ.) তাকে কঠিনভাবে তিরস্কার করতে শুরু করে দিলেন। আমি স্তম্ভিত। আজ পর্যন্ত তাকে এমন কঠিনভাবে কাউকে ধমকাতে দেখিনি। এমন কি তিনি তাকে এ পর্যন্তও বললেন যে, 'এখান থেকে বের হও'। এভাবে তিনি

তাকে অফিস থেকে বের করে দিলেন। অদ্যাবধি আমি এমন দৃশ্য দেখিনি। আমি ভাবলাম, ইয়া আল্লাহ! এই লোক তো বিগড়ে যাবে। কারণ সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, কোর্ট-প্যান্ট পরিহিত ভদ্রলোক। দাড়ি আছে নামমাত্র। আব্বাজী (রহ.) তাকে যেভাবে ধমকিয়েছেন, তাতে সে চিরতরে দূরে সরে যাবে। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি নিজেই একদিন আমাকে বলেছে, মুফ্তী সাহেবের সেই ধমক আমার জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। সেই ধমক আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে, তাতে আমার চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু একদম বদলে যায়।

যা হোক, কার সাথে কখন কী আচরণ করতে হবে, তা আল্লাহ তা'আলাই তাঁর নেক বান্দাদের অন্তরে ঢেলে দেন। কাজেই কোন আল্লাহ ওয়ালাকে যদি দেখেন কাউকে ধমকাচ্ছেন, কাউকে শাসন করছেন ও কাউকে স্নেহ করছেন, তবে সাবধান কোনওরকম কুধারণাকে মনে ঠাই দেবেন না। কেননা প্রকৃত দাতা তো আল্লাহ তা'আলাই, তিনিই সমস্ত কল্যাণ ও উপকারের উৎস। শায়খ মাধ্যমমাত্র। আল্লাহ তা'আলাই অলক্ষ্যে শায়খকে বুঝিয়ে দেন কার জন্য ইসলাহের কোন পদ্ধতি সমীচীন। সকলকে একই ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয় না। তাই আল্লাহওয়ালাদের কর্মপন্থায় কখনও আপত্তি করা উচিত নয়।

কাজেই হযরত মির্যা মাজহার জানে জানা' (রহ.) যে সেই দুই শিক্ষার্থীকে বলখ ফেরত গিয়ে সেখানকার হাওয মেপে আসার শাস্তি দিলেন, এটা নিজ ইচ্ছামত দেননি। আল্লাহ তা'আলাই তাঁর অন্তরে এ ব্যবস্থা উদ্‌গত করছিলেন। একবার যখন ধাক্কা লেগে যাবে তা সারা জীবনের জন্য উপকার দেবে। উপকার ঠিকই দিয়েছিল। হযরত মির্যা সাহেব (রহ.)-এর দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যে, জবানের ব্যবহারে সতর্ককতা অবলম্বন জরুরি।

প্রথমে চিন্তা কর, তারপর বল

সতর্কতা কিভাবে অবলম্বন করা যাবে? হযরত থানভী (রহ.) সে সম্পর্কে বলেন, প্রথমে চিন্তা করবে, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি তা সঠিক কিনা। এতে কোন সীমালংঘন নেই তো? কোন রকম মিথ্যার মিশেল বা অতিরঞ্জন কিংবা অসতর্কতা হয়ে যাচ্ছে না তো?

আমরা আজকাল এসব চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি। আর এরই থেকে যতসব ঝগড়া-বিবাদ ও অনর্থ-অশান্তির উৎপত্তি। কোনও একজন না জেনে-শুনে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই একটা কথা বলে দিল। সে ঠিক বলেছে না বেঠিক, প্রকৃত ঘটনা স্মরণ রাখতে পেরেছে না ভুলে গেছে তার কোন খবর নেই।

বলে দিল আর তাই নিয়ে সকলে লেগে পড়ল। শুরু হয়ে গেল আত্মকলহ ও পরিবারে-পরিবারে দ্বন্দ্ব। কাজেই প্রথমে চিন্তা করুন আসলে ব্যাপারটা কী ছিল, কী বলা হয়েছিল এবং কী পরিমাণে বলা হয়েছিল, তারপর কোথাও সেটা বলতে হলে সেই পরিমাণেই বলুন যতটুকু প্রথম বক্তা বলেছিল। নিজের পক্ষ হতে একটি কথাও যেন যোগ করা না হয়।

হযরত থানভী (রহ.) বলছেন, জবান তো সর্বক্ষণই চলছে, তা বলতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। থামার কোন নাম নেই। এ অবস্থায় সর্বক্ষণ চিন্তা করবেই বা কিভাবে? এর জবাব হচ্ছে, যে কোনও কাজ অনুশীলন দ্বারাই আয়ত্ত করা যায়। তাই অনুশীলন করতে হবে। প্রথম দিকে তো চিন্তা করার কথা খেয়ালই হবে না। কিন্তু চিন্তা করার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ক্রমে অভ্যাস গড়ে উঠবে। প্রথম দিকে চিন্তা করা ভুলে গেলে অসুবিধা নেই। পরে যখনই মনে পড়বে চিন্তা করে নেবে। আবারও ভুলবে, আবারও মনে পড়বে। এভাবে দিন যেতে থাকবে আর অভ্যাসও গড়তে থাকবে। শেষে একদিন আসবে যখন ব্যাপারটা আয়ত্তে এসে যাবে। তখন চিন্তার জন্য বিশেষ যত্নের দরকার হবে না; চিন্তা আপনা-আপনিই এসে যাবে এবং তখন যে কথাই বলা হবে সঠিকই বলা হবে। গীবত, মিথ্যা কথা, অপ্রীতিকর কথা প্রভৃতি মৌখিক সব গুনাহ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এটাই।

গীবতকে জায়েয বানানোর জন্য মনের যুক্তি

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)- কে লিখেছিল, আমার নফস (মন) আমাকে যুক্তি দেখায়, তোমারও তো লোকে গীবত করে থাকে। কিয়ামতের দিন যখন এ জন্য ধরা হবে, তখন গীবতকারীদের থেকে যে পুণ্য তোমার অর্জিত হবে, তাই তোমার পক্ষ থেকে তুমি যাদের গীবত করেছিলে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে (ফলে তোমার নিজ পুণ্য কিছু কমবে না)।[৭৩]

হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কারও গীবত করে তার পুণ্য সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হয়। আমার মাথায় যুক্তি দাঁড়িয়ে গেছে যে, আমি যেমন মানুষের গীবত করি, তেমনি মানুষও আমার গীবত করে। যারা আমার গীবত করে আমি তাদের পুণ্য লাভ করি আর আমি যাদের গীবত করি, আমার পুণ্য তারা পেয়ে যায়। কাজেই ব্যাপারটা সমান-সমান হয়ে যায়। এ নিয়ে বিশেষ চিন্তার কিছু নেই।

---

৭৩. আনফাসে ঈসা : পৃ. ১৫০

যুক্তির জবাব

এর উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, প্রথম কথা হল, অন্যদের থেকে যে পুণ্য পাওয়া যাবে, প্রতিকারের জন্য যে তাই যথেষ্ট হবে এর তো কোন প্রমাণ নেই। এমনও তো হতে পারে, অন্যদের থেকে পাওয়া পুণ্য তোমারই থেকে যাবে আর তোমার স্বোপার্জিত পুণ্য হকদারদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তুমি আটকা পড়ে যাবে। কেননা নাজাতের জন্য অন্যদের থেকে পাওয়া পুণ্য হয়ত যথেষ্ট হবে না। দ্বিতীয়ত তুমি যা পাবে আর যা অন্যকে দেবে তা সমপরিমাণ হবে বলেই বা নিশ্চিত হও কী করে? এমনও তো হতে পারে যে, তুমি পাবে কম আর তোমার থেকে যা নেওয়া হবে তা বেশি। এ অবস্থায় পুরোপুরি প্রতিকার কিভাবে হবে?[৭৪]

অর্থাৎ গীবতকারীদের থেকে যে পুণ্য তোমার অর্জিত হয়েছে ঠিক তাই যে তুমি যাদের গীবত করেছ তাদের কাছে যাবে এর প্রমাণ কী? এমনও তো হতে পারে যে, তোমার নামায তোমার রোযা, তোমার তিলাওয়াত ও যিক্‌র ইত্যাদির সবটা সওয়াব তুমি যাদের গীবত করেছ তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আর অন্যদের সওয়াব তোমার কাছে চলে আসবে। তাছাড়া উভয় সওয়াব সমান-সমান হওয়ারও কোনও প্রমাণ নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ সওয়াব তোমাকে দেওয়া হবে, ঠিক সেই পরিমাণই যে তোমার থেকে নেওয়া হবে তা নাও হতে পারে; বরং এটাও সম্ভব যে তুমি পাবে কম আর তোমার থেকে নেওয়া হবে বেশি।

এসব শয়তানী যুক্তি

এসব কুযুক্তি ও অপব্যাখ্যা শয়তানই যোগায়। মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করার জন্যই সে প্ররোচনা দেয়, এই-এই কর, তাহলে আটকা পড়বে না।

আখিরাতে যখন সওয়াব ও পুণ্যের ব্যাপারটা সামনে আসবে আর নিজের কামাই করা সব পুণ্য অন্যের কাছে বলে যাবে। তখনই টের পাওয়া যাবে এটা শয়তানের কতবড় ধোঁকা ছিল। জীবনে কত নেক কাজই করা হয়েছিল। নামায পড়া হয়েছিল, রোযা রাখা হয়েছিল, তিলাওয়াত করা হয়েছিল, পবিত্র রমযান কুরআন নিয়েই কেটেছিল, ই'তিকাফ করার তাওফীক লাভ হয়েছিল, সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করা হয়েছিল, সে সব কই গেল! সবই যে অন্যদের হাতে চলে গেল! আহা আমার পুণ্যের ভাণ্ডার একদম শূন্য? তখন

---

৭৪. আনফাসে ঈসা : পৃ. ১৫০

যে আক্ষেপ ও দুঃখ হবে তার তো কোন প্রতিকার নেই। কাজেই আখিরাতে হিসাব সমান-সমান হবে– এ জাতীয় চিন্তা মারাত্মক ধোঁকা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন– আমীন।

দরকার হিম্মত ও পরিণাম চিন্তা

অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গীবত একটি ইচ্ছাধীন কাজ। এর থেকে বাঁচার উপায় হল অন্তরে হিম্মত জাগ্রত করা ও পরিণাম চিন্তা করা। এর জন্য সহায়ক ব্যবস্থা এই হতে পারে যে, একবার গীবত হয়ে গেলে এক বেলা অনাহার থাকবে।[৭৫]

অর্থাৎ যে- কেউ গীবত করে সে তা নিজ ইচ্ছাক্রমেই করে। গীবত ইচ্ছার অতীত জিনিস নয় যে, তা অনিচ্ছাতেই হয়ে যায়। ইচ্ছাতীত বিষয় হলে এটা হারাম হত না। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন জিনিসকে হারাম করেননি, যা থেকে বাঁচা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। ইরশাদ হয়েছে–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ মানুষের উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।'[৭৬]

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গীবত থেকে মানুষ ইচ্ছা করলেই বাঁচতে পারে, যেহেতু এটা ইচ্ছাধীন বিষয়। অবশ্য এর জন্য হিম্মতের দরকার আছে। দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হতে হবে যে, এ গুনাহ আমি আর করব না। মুখ থেকে কখনও গলত কথা বের করব না। সর্বদা মুখের হেফাজত করে চলব। সেই সঙ্গে দরকার এর গুনাহ ও শাস্তির কথা মাথায় রাখা। অর্থাৎ এটা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। এর পরিণামে নিজের নেকী অন্যের হাতে চলে যায়। এই চিন্তা-চেতনা অন্তরে জাগ্রত রাখলে ইনশাআল্লাহ এর থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যাবে।

গীবতের কারণে নিজেকে শাস্তিদান

হযরত থানভী (রহ.) গীবত থেকে বাচার জন্য নিজের প্রতি দণ্ডারোপকে সহায়ক বলেছেন। অর্থাৎ স্থির করে নেবে যে, ভবিষ্যতে কখনও গীবত হয়ে

---

৭৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৫০ পৃ.

[76]৭৬. বাকারা : ২৮৬

গেলে নিজেকে শাস্তি দেব। অন্যত্র তিনি বলেন, শাস্তিদানে পরিমিতিবোধের পরিচয় দিতে হবে। অর্থাৎ শাস্তি এমন লঘু হলে চলবে না যাকে মানুষ গ্রাহ্যই করে না। আমার মহান পিতা (রহ.) ঘটনা শোনাতেন যে, যখন 'আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেক ছাত্রকে অবশ্যই জামাতে নামায পড়তে হবে। কারও জামাত ছুটে গেলে প্রতি নামাযের জন্য দু' আনা পয়সা জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু এ জরিমানা এতটাই হালকা ছিল যে, জামাতে অবহেলাকারীরা এর কোন পরওয়া করত না। কোনও কোনও ছাত্র শুরুতেই সারা মাসের জরিমানা একত্রে জমা দিয়ে দিত। অর্থাৎ জরিমানা লঘু হওয়ায় তাদের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। কাজেই জরিমানা অন্ততপক্ষে এতটুকু পরিমাণ হতে হবে যা আদায় করতে কিছুটা কষ্ট হবে। আবার এত বেশি ভারীও হওয়া উচিত নয়, যা বহন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে দু'টোই হাত ছাড়া হবে। গাফেল ব্যক্তি যথারীতি গাফলতিই করে যাবে, আমলে মনোযোগী হবে না। আবার জরিমানাও দেবে না। কাজেই জরিমানা হতে হবে মাঝামাঝি পরিমাণে।

গীবত হয়ে গেলে নিজেকে অনাহারে রাখা

জরিমানার বিষয়টাও সকলের জন্য অভিন্ন হবে না। কেননা একই জরিমানা সকলের জন্য ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। সুতরাং অর্থদণ্ড উপকার হবে কেবল তাদেরই জন্য, যাদের পক্ষে দান-খয়রাত করা কঠিন। তারা যদি নিজের উপর জরিমানা আরোপ করে যে, আর কখনও আমার দ্বারা এরূপ কাজ হয়ে গেলে এই পরিমাণ টাকা সদকা করব, তবে সেই সদকার ভয়ে তারা সংশ্লিষ্ট কর্মটি হতে বিরত থাকবে, যেহেতু সদাকা দিলে নফস ও মন শাস্তি পায়। অপরদিকে যারা টাকা-পয়সার কোন হিসাব করে না, তাদের জন্য এ জরিমানায় কোন কাজ হবে না। তাদের উচিত এমন কোন জরিমানা স্থির করা যাতে মন কষ্ট পায়। হযরত থানভী (রহ.) এ স্থলে পরামর্শ দিয়েছেন যে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে, আর কখনও গীবত হয়ে গেলে এক বেলা না খেয়ে থাকব – অনশন করব।

আজকাল লোকে অনশন ধর্মঘটকে উল্টো কাজে ব্যবহার করছে। যখন অন্যের উপর চাপ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়, তখন অনশন ধর্মঘট করে। সংকল্প থাকে, সে ব্যক্তি চাপ গ্রহণ না করলে না খেয়ে মারা যাবে। এরূপ অনশন জায়েয নয়। হযরত থানভী (রহ.) যে অনশনের পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা অন্যের উপর নয়; বরং নিজের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। অর্থাৎ একবার গীবত

হয়ে গেলে এই লক্ষে অনশন করবে যাতে ভবিষ্যতে আর কখনও গীবত না হয়। নফসকে ভয় দেখাবে যে, ফের গীবত করলে এরকম অনশনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটা খুবই কার্যকর ব্যবস্থা। মানুষ এটা গ্রহণ করলে অল্পদিনের মধ্যেই সুফল পেতে পারে। নফসের উপর যখন অনাহারের কষ্ট পড়তে থাকবে, তখন এক পর্যায়ে গীবত ছেড়েই দেবে।

অন্যের দোষ প্রকাশ প্রসঙ্গ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, 'যে সব লোক কবীরা গুনাহে লিপ্ত তাদের দোষ প্রকাশ করলে তা কি গীবত হবে, না হবে না? নফস ও মন যুক্তি দাঁড় করায় যে, এরূপ লোকের দোষ প্রকাশ না হলে তো মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত হবে। অথচ মুসলিমদেরকে অন্যের ধোঁকা থেকে রক্ষা করা জরুরি।[৭৭]

অর্থাৎ যে সব লোক সম্পর্কে আমরা জানি যে, তাদের মধ্যে ওই-ওই দোষ আছে, তাদের সে সব দোষ সম্পর্কে মানুষের জানা থাকা দরকার। যাতে তারা তার দ্বারা প্রতারিত না হয়। তো আমরা এরূপ লোকের গীবত করব, কি করব না? যে ব্যক্তি এ প্রশ্ন করেছিল, সে ছিল একজন নবীন সালেক। অর্থাৎ সে আধ্যাত্মিকতার পথে একজন নবাগত। নিজেকে সংশোধন করার জন্য কেবলই এসেছে। শুরু অবস্থাতেই সে এই প্রশ্ন করে।

হযরত থানভী (রহ.) উত্তরে লেখেন,

এ প্রশ্ন মুনতাহী অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাধনাপথের শেষ পর্যায়ে আছে, তার উপযুক্ত, মুবতাদী অর্থাৎ যে কেবল যাত্রা সূচনা করছে তার উচিত জায়েয গীবত থেকেও বিরত থাকা।[৭৮]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাহী কার্যক্রমের কেবল সূচনা করেছে, নিজেকে সংশোধন করার পথে যার যাত্রা সবে শুরু, এখন তার দরকার নিজেকে গঠন করা। এ পর্যায়ে জায়েয গীবতেও লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়।

এ কথাটিই হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানূতবী (রহ.) একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, কোন মোড়ানো কাগজ যদি তুমি সোজা করতে চাও, তবে তাকে সোজা ধরে যতই চাপাচাপি কর না কেন কিছুতেই সোজা হবে না। তা সোজা করার একমাত্র উপায় হল উল্টো দিকে মুড়িয়ে দেওয়া।

৭৭.আনফাসে 'ঈসা : ১৫০

৭৮. আনফাসে ঈসা : ১৫০

কিছুক্ষণ উল্টো দিকে মুড়িয়ে রেখে ছেড়ে দাও, দেখবে একদম সোজা হয়ে গেছে। মানবমনও এরূপ উল্টো দিকে মোড়ানো আছে। সে অবৈধ গীবতে অভ্যস্ত হয়ে আছে। সে অভ্যাস সোজাসুজি ছাড়ানো যাবে না। এর জন্য দরকার বিপরীত দিকে মোড়ানো। তাকে প্রথম দিকে বৈধ গীবত থেকেও বিরত রাখতে হবে। এর দ্বারা সে সোজা হবে এবং এক পর্যায়ে শুধরে যাবে। পরে আর সে কখনও অবৈধ গীবতে লিপ্ত হবে না, যা হবে তা বৈধটাই হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন।

মানসিক প্রতিক্রিয়া বশে কোন কাজ করা

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-কে লিখেছিল,

কেউ যদি অহেতুক আমার গীবত করে, তবে তা জানতে পারলে তার প্রতি অন্তরে মলিনতা দেখা দেয়, এমনকি উত্তেজনাও সৃষ্টি হয়ে যায়।[৭৯]

অর্থাৎ যখন জানতে পারি অমুক ব্যক্তি পেছনে আমার বদনাম করেছে, তখন মনে মনে তার প্রতি অপ্রসন্ন হই, এমনকি রেগেও যাই। একথা জানানো দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল, তার মনের এ প্রতিক্রিয়া সঠিক কিনা তা বুঝে নেওয়া। সঠিক হলে তো ভালো, অন্যথায় বিষয়টা যদি সংশোধনযোগ্য হয়, তবে কিভাবে তার প্রতিকার হতে পারে তা জানা ও সে অনুযায়ী কাজ করা। হযরত থানভী (রহ.) উত্তরে লেখেন।

'এ উভয় অবস্থায়ই অন্যের কাজ ও আচরণের 'প্রতিক্রিয়া'। প্রতিক্রিয়া নিজ এখতিয়ারের বাইরের জিনিস। ইচ্ছা ও এখতিয়ারের অতীত বিষয় নিন্দনীয় নয় এবং তাতে কোন গুনাহও নেই। অবশ্য সে প্রতিক্রিয়া বশে সেই ব্যক্তির গীবত করা বা তাকে কোনওভাবে কষ্ট দেওয়াটা 'ক্রিয়া'। আর ক্রিয়া ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। ইচ্ছাধীন কোনও কোনও বিষয় নিন্দনীয় হয় এবং তাতে গুনাহও হয়। কাজেই অন্তরে কখনও এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে সে অনুযায়ী যাতে কোন কাজ না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তার অপসারণের জন্য দু'আ করতে হবে যে, ইয়া আল্লাহ! আমার অন্তর থেকে এসব চিন্তাভাবনা দূর করে দিন, যাতে এ প্রতিক্রিয়া অন্যায় ক্রিয়ায় পর্যবসিত না হয়। সেই সঙ্গে নিজ দোষ ও গুনাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, যাতে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আমি আরও

৭৯. আনফাসে 'ঈসা; পৃ. ১৫০

বেশি দুর্নামের উপযুক্ত। আরও নজর দিতে হবে 'ক্রিয়া'র পরিণামের উপর, যাতে প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কোন দুষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার স্পৃহাই খতম হয়ে যায়। এক সপ্তাহ পর ফের নিজ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন।[৮০]

এতে হযরত থানভী (রহ.) একটি মূলনীতি ও তা অনুসরণের পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। অতি সংক্ষেপে বিষয়টার প্রকৃত অবস্থা তিনি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি এ স্থলে যা বলেছেন তা খুবই মূল্যবান ও অত্যন্ত কাজের কথা।

তিনি বলছেন, মনের ভেতর আপনা-আপনি কোন মন্দ কাজের ভাবনা এসে যাওয়াটা কোন দোষের নয়। কেননা এতে মানুষের ইচ্ছা শক্তির কোন ভূমিকা নেই। এটা ইচ্ছাতীত জিনিস। তাই এতে কোন গুনাহ নেই এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন ধর-পাকড় নেই। তাতে এ ভাবনাটা যত গুরুতর বিষয়েরই হোক না কেন। অর্থাৎ আপনা-আপনি যদি কুফ্‌র ও শিরকী কোন চিন্তাও অন্তরে জাগ্রত হয় তা নিন্দনীয় নয়। কেননা তা যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয় তাই এতে কোন গুনাহ ও শাস্তি নেই এবং এ কারণে সে নিন্দাযোগ্যও হবে না।

মানসিক প্রতিক্রিয়া গুনাহ নয়

এমনিভাবে কারও কোনও কথা বা কাজের দরুণ অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অর্থাৎ মনের ভেতর অবস্থার যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাও গুনাহ নয়। পরিভাষায় একে 'ইনফি'আল' বলে। ইনফি'আল অর্থ অন্যের কোন আছর ও প্রভাব গ্রহণ করার ফলে অন্তরে কোন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। যেমন কেউ গালি দিলে মনে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়, উত্তেজনা দেখা দেয়, কেন সে আমাকে ও আমার বংশকে গালি দিল এ জন্য রাগ ওঠে। এই রাগ ও উত্তেজনাকে ইনফি'আল বলে। এটা ইচ্ছাতীত ব্যাপার। মানুষের স্বভাবের ভেতরই এটা থাকে। তাই এতে কোন গুনাহ নেই।

প্রতিক্রিয়াকে কার্যে পরিণত করা গুনাহ

কোনও কোনও আল্লাহওয়ালা নফসকে এমনভাবে দমন করে থাকেন যে, তাদের রাগ আসেই না। কেউ ভালো-মন্দ যাই বলুক না কেন, তাতে তাদের কোন ভাবান্তর হয় না। মনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। তারা আল্লাহ

৮০.আনফাসে 'ঈসা' পৃ. ১৫০

তা'আলার বিশিষ্ট বান্দা। সাধনার মাধ্যমে তারা তাদের নফসকে সম্পূর্ণরূপে দমন করে ফেলেন। তারা হয়ে যান সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয়।

কিন্তু এ স্থলে কথা হচ্ছে সাধারণদের নিয়ে। সাধারণ একজন লোককে ভালোমন্দ কিছু বলা হলে বা গালি দেওয়া হলে তার অন্তরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ প্রতিক্রিয়া কোনও গুনাহ্ নয়। এর জন্য কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না, নিন্দা করা হবে না এবং পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখার পর যদি তার প্রকাশও ঘটায়, যেমন আপনাকে কেউ খবীস বললে জবাবে বলে দিলেন, তুই খবীস, তোর বাপও খবীস। এভাবে অন্তরে যে, রাগ দেখা দিয়েছিল তাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে সীমালংঘন করলেন, তো এটা অবশ্যই দোষের। কেবল রাগ সৃষ্টি হওয়াটা দোষের ছিল না। মনে মলিনতা দেখা দেওয়া কোনও গুনাহ্ ছিল না, এমন কি সেই মলিনতা ও রাগের বশবর্তীতে সমপরিমাণ বদলা নিলেও কোন অন্যায় হত না, কিন্তু প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যখন এক ইঞ্চি সামনে চলে গেলেন, তখন পাকড়াওয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। মানুষ রাগ অনুযায়ী কাজ করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমার মধ্যে থাকতে পারে না। বাড়াবাড়ি হয়েই যায়। এই বাড়াবাড়ি করে ফেলাটা বিপদজ্জনক। কেননা এতে মানুষের ইচ্ছার ভূমিকা থাকে। আর ইচ্ছাধীন কাজের জন্য আখিরাতে ধরা পড়তে হবে।

ক্ষমা করা-ই নিরাপদ

উদাহরণত কেউ যদি আপনাকে ঘুষি মারে আর আপনি বদলা নিতে চান, তবে কিভাবে নেবেন, নিতে তো হবে সমান-সমান। বেশি নয় একটুও। সে যেই ওজনের ঘুষি মেরেছিল আপনাকেও সমওজনেরই মারতে হবে। তা যাতে সমওজনেরই হয়, বেশি না হয় সেজন্য তো উভয় ঘুষিকে বাটখাড়া দিতে মাপতে হবে। অন্যথায় সমান-সমান করা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। এ কারণেই আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে কেউ মারলে তারা প্রতিশোধ নিতে যান না। তারা ক্ষমা করাকেই নিরাপদ মনে করেন। কেননা সামান্য পরিমাণও বেশি হয়ে গেলে সেজন্য ধরা খেতে হবে।

বুযুর্গেদের বিভিন্ন রঙ

হযরত থানভী (রহ.) 'আরওয়াহে ছালাছা'- নামক কিতাবে একটা ঘটনা লিখেছেন। এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বলল, হযরত, শুনেছি বুযুর্গদের বিভিন্ন রঙ (ধরন-ধারণ) হয়ে থাকে। একজনের এক রঙ,

অন্যজনের অন্য রঙ, তা সে রঙের বিভিন্নতা কীরকম আমি দেখতে চাই। বুযুর্গ বললেন, ভাই কোন্ চক্করে তুমি পড়ে গেলে? রাখ এসব! কিন্তু সে লোক নাছোড়। পীড়াপীড়ি করতে থাকল যে, তাকে তা জানতেই হবে। শেষে বুযুর্গ বললেন। ঠিক আছে, তুমি অমুক গ্রামে যাও। সেখানে মসজিদে তিনজন বুযুর্গকে পাবে। তারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল। তুমি গিয়ে পেছন থেকে তাদের প্রত্যেককে একটা করে ঘুষি মারবে। তারপর কী প্রতিক্রিয়া হল এসে আমাকে জানাবে। কথামত লোকটি সেই গ্রামে গেল এবং এক-এক করে তিনও বুযুর্গকে তিনটি ঘুষি মারল।

ফিরে আসলে বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাই, কী ঘটল বল। সে বলল, আজব ঘটনা ঘটেছে। আমি যখন প্রথম বুযুর্গকে ঘুষি মারলাম তিনি ফিরেও তাকালেন না। যথারীতি আপন যিকিরে মশগুল থাকলেন। যখন দ্বিতীয়জনকে মারলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকেও একটা ঘুষি লাগিয়ে দিলেন। তৃতীয়জনকে মারার পর দেখা গেল অন্য আচরণ। তিনি উঠে আমার হাত টিপতে শুরু করলেন এবং বললেন, ভাই আপনার ব্যথা লাগেনি তো? ঘটনা শোনার পর বুযুর্গ বললেন, তুমি যে বুযুর্গদের রংয়ের বৈচিত্র দেখতে চাচ্ছিলে, এটাই হল সেই জিনিস। একই আচরণের বিপরীতে তুমি তিনজনের ধরন তিন রকম পেলে। একেই বুযুর্গদের রংয়ের পার্থক্য বলে।

প্রথম বুযুর্গের রং ছিল এই যে, তিনি চিন্তা করেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার যিকরে রত আছি। এ অবস্থায় কোনও লোক আমাকে মেরে থাকলে তাতে কী এসে যায়। কে মেরেছে; কেন মেরেছে, যদি তা ফিরে দেখতে যাই এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চাই, তাতে আমার লাভ কী? উল্টো সময় নষ্ট এবং যে কাজে রত আছি তাতে ব্যাঘাত। তারচে' আপন কাজে লেগে থাকি সেই ভালো। এ জন্যই তিনি ফিরেও দেখেননি কে মেরেছে। এই ছিল এক রং।

যেই বুযুর্গ ঘুরে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছেন তার আরেক রং। আচ্ছা বল তো তিনি কি তোমার মত সমান জোরেই ঘুষি মেরেছেন না তার বেশি? সে বলল, না, আমি যেমন জোরে মেরেছিলাম তেমনই। তিনি বললেন, এটাই তার রং। তিনি চিন্তা করেছেন আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ নিতে অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই আমি তা নিয়ে নেই। অনেক সময় প্রতিশোধ নেওয়াটাও আল্লাহওয়ালাদের পক্ষ হতে মমতা হয়ে থাকে। কেননা

ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সবর আঘাতকারীদের পক্ষে অশুভ পরিণাম বয়ে আনে। কেননা হাদীছ শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَنْ عَادَىٰ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

'যে ব্যক্তি আমার কোনও ওলীকে কষ্ট দেয়, তার জন্য আমার পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা।'[৮১]

অনস্বীকার্য, বান্দার প্রতিশোধ অপেক্ষা আল্লাহর শাস্তি অনেক বেশি কঠিন হয়ে থাকে। সেই কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই বুযুর্গগণ অনেক সময় প্রতিশোধ নিয়ে নেন। এটা তাদের মমতা বৈকি! তো এই বুযুর্গ সে কারণেই বদলা নিয়েছেন। এটা ছিল দ্বিতীয় রং।

তৃতীয় বুযুর্গ চিন্তা করেছেন, আমার আর কী ব্যথা লেগেছে, আমাকে ঘুষি মেরে সেও কি ব্যথা পায়নি? এ চিন্তাতেই তিনি উঠে তার হাত টিপতে শুরু করেছেন। এটা তৃতীয় রং।

আরয করছিলাম, অন্যের দুর্ব্যবহারে রাগ উঠলে বা অন্তরে মলিনতা জন্ম নিলে তাতে দোষ নেই এবং তা কোন গুনাহও নয়, তবে সেই রাগের বশবর্তীতে যদি প্রতিশোধ নিতে যান এবাং তাতে সীমালংঘন করে ফেলেন, তাতে অবশ্যই গুনাহ হবে এবং সেজন্য আপনাকে জবাবদিহী করতে হবে। তাই বলা হচ্ছে, প্রতিশোধ নিতেই যাবেন না; বরং ক্ষমা করেই দিন। তাতে নিজেকে ঝুঁকিতেও ফেলা হল না আবার সবর ও ক্ষমার জন্য সওয়াবও পাবেন।

মানসিক প্রতিক্রিয়াকে স্থায়ী হতে দেওয়া ঠিক নয়

অন্যের আচরণে অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে তো কোন দোষ নেই এবং তার জন্য পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু সে প্রতিক্রিয়াকে অন্তরে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেওয়া উচিত নয়। কেননা তা অন্তরে গেড়ে বসলে এক পর্যায়ে তা গুনাহে লিপ্ত করেই ছাড়ে। হাসাদ ও পরশ্রীকাতরতার ব্যাপারটাও এরকমই। উদাহরণত আপনি একজনকে আপনার চোখের সামনে বাড়-বাড়ন্ত হতে দেখছেন। তা দেখে অন্তরে এই ভাব জাগল যে, সে তো আমাকে ছাড়িয়ে গেল। আমি যদি তাকে পেছনে ফেলতে পারতাম! আহা তার টাকা-পয়সা কত বেড়ে গেছে! তার বাড়িটাও আমার বাড়ির চেয়ে বড়।

---

৮১. জামি'উল উলূম ওয়াল-হিকাম, ১২, ৩৫৭ পৃ. মা'আরিজুল কবূল ৩খ, ১০০১ পৃ.

তার গাড়িটাও বেশি দামী। চারদিকে তার প্রশংসা। আমার চেয়ে লোকে তারই প্রশংসা বেশি করে। তার স্থানে আমি থাকলে কত ভাল হত। এর সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভাবনাও জাগল যে, যদি তার এ অবস্থা খতম হয়ে যেত আর আমি এসবের অধিকারী হতে পারতাম! এসব হল মনের কল্পনা এ পর্যন্ত তো অবৈধতার কিছু নেই।

কিন্তু মনের এ ভাব যদি স্থায়িত্ব পায়, তবে এক পর্যায়ে এই ভাবনা অনুযায়ী কাজও হয়ে যায়। এমন কিছু সে করে ফেলে যা পরিষ্কার বলে দেয় যে, সে তার অকল্যাণ কামনা করছে। যেমন সে হয়ত তার জন্য বদদু'আ করল যে, হে আল্লাহ তার এসব নি'আমত যেন খোয়া যায়। অথবা তার ক্ষতি হয়ে যায়, এমন কোন ব্যবস্থা নিল বা মানুষের অন্তর থেকে যাতে তার মান-সম্ভ্রম ঘুচে যায় এজন্য তাদের সামনে তার কোন বদনাম করে দিল কিংবা মনের ঝাল মেটানোর জন্য অন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করল। এসব দ্বারা মনের হিংসাকে বাস্তবায়ন করা হয়। এই বাস্তবায়ন করাটাই হারাম। না হয়, মনের ভেতর এসব ভাবনা-কল্পনা দেখা দেওয়াটা হারাম ছিল না। হারাম হল তখনই, যখন অন্তরে তা দানা বাঁধল এবং সেই মোতাবেক কোন কাজ করে ফেলল।

অনিচ্ছাজনিত ভাবনার প্রতিকার

অন্তরে অনিচ্ছাজনিত যেসব ভাবনা জাগে, তা পরশ্রীকাতরতা হোক বা মলিনতা হোক কিংবা ক্রোধ, পরিণামে যেহেতু তা পাপে লিপ্ত করার আশংকা থাকে, তাই তারও প্রতিকার জরুরি। প্রতিকার না করলে তা এক পর্যায়ে তোমাকে অধঃপতিত করতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে।

তা এর প্রতিকার কী? প্রতিকার হল প্রথমে এসব ভাবনাকে মন্দ জ্ঞান করা। চিন্তা করা যে, এই যে ভাবনা আমার অন্তরে জাগছে এটা ভালো নয়। একে অন্তরে ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়। যেমন, অমুকের সম্পদ ধ্বংস হোক, আমি সম্পদশালী হয়ে যাই, এ চিন্তা খুব খারাপ, আমার একে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অথবা অমুকের প্রতি যে আমার মনে মলিনতা দেখা দিয়েছে, তাকে মন্দ লোক বলে ধারণা হচ্ছে, এটাও ঠিক নয়, এটা পরিত্যাজ্য। এই চিন্তা হল প্রতিকারের প্রথম কাজ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্তব্য নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দেওয়া। চিন্তা করা যে, আমার মধ্যে তো বাস্তবিকই অনেক দোষ। সে আমার সম্পর্কে যে গীবত করেছে, তাতে তো একটা দোষের কথাই বলেছে, অথচ আমার দোষ-ত্রুটি আরও অনেক বেশি। সে হিসেবে তো আমি অনেক বেশি দুর্নামের উপযুক্ত।

সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমার ভেতর এই যেসব ভাবনা জাগছে, তা দূর করে দিন, পাছে আমি এমন কোন কাজ করে বসি, যা বাস্তবিকই হারাম আর তার পরিণামে আমি ধ্বংস হয়ে যাই। এভাবে অন্তর থেকে এসব ভাবনার অবসান ঘটাতে হবে। অন্যথায় তা অন্তরে দানা বাঁধতে থাকবে এবং কখনও না কখনও তা আপনাকে পাপকর্মে লিপ্ত করবে। সুতরাং এ জাতীয় ভাবনাকে মন্দ গণ্য করুন এবং একে দূর করার চেষ্টা করুন।

যদি অন্যের প্রতি হাসাদ দেখা দেয় তবে এমন কৌশল অবলম্বন করুন, যা হাসাদের দাবি ও চাহিদার পরিপন্থী হয়, যেমন মনের ইচ্ছা সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক, কিন্তু আপনি মনকে শক্ত করে তার জন্য দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! তাকে ইজ্জত-সম্মান দান করুন। কিংবা মনের ইচ্ছা লোকে তার দুর্নাম করুক এবং তাদের চোখে সে হীন সাব্যস্ত হোক, কিন্তু আপনি দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে জনপ্রিয় বানিয়ে দিন। যখন মুখে এসব দু'আ উচ্চারিত হবে, তখন ও দিকে মনের উপর করাত চলতে থাকবে। তা চলুক। মনের এ জাতীয় রোগের চিকিৎসা করাতে চেরাই করার দ্বারাই হয়।

অনুরূপ অন্যের প্রতি মন খারাপ হলে, মনে মলিনতা দেখা দিলে তারও প্রতিকার হল, মনের এ অবস্থাকে খারাপ গণ্য করা।

শাস্তির কথা কল্পনা করাও ফলদায়ক

হযরত থানভী (রহ.) শেষে বলেন, প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী যে কাজ হবে তার শাস্তির কথা চিন্তা করবে। অর্থাৎ ভাববে, আমার অন্তরে তার প্রতি যে মলিনতা দেখা দিচ্ছে, এটা যদি দানা বাঁধতে থাকে এবং এর পরিণামে কোন গুনাহ করে বসি, যেমন গীবতে লিপ্ত হওয়া, অকল্যাণ চাওয়া ইত্যাদি, তবে সে জন্য তো আমাকে শাস্তি পেতে হবে আর সে শাস্তি কতই না কঠিন!

শাস্তির কথা চিন্তা করবে এ জন্য যে, এর ফলে প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কাজ করার স্পৃহা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল সেটা দুর্বল হয়ে যাবে।

সপ্তাহান্তে অবস্থা জানিও

সবশেষে বলেন, এক সপ্তাহ পর আমাকে তোমার অবস্থা অবহিত করো। তা এজন্য যে, চিকিৎসক তার চিকিৎসায় ফলাফলের দিকেও নজর রাখেন। সুফল পাওয়া গেলে তো ভালো, অন্যথায় ওষুধ বদলে দেন। অনেক সময়

ওষুধের মাত্রা বৃদ্ধি করলেও সুফল পাওয়া যায়। তাই শায়খের নিকট থেকে মাত্র একবার নির্দেশনা নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া ঠিক নয়।

হযরত (রহ.) এ স্থলে যে ব্যবস্থা দিয়েছেন মূলনীতি হিসেবে তো তা সঠিক, কিন্তু একই ব্যবস্থা যে সকলের জন্য সমান কার্যকর হবে এমন কোনও কথা নেই। ব্যক্তিভেদে অনেক সময় ব্যবস্থায় পার্থক্য করতে হয়। কাজেই তিনি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন কারও কারও জন্য তা যথেষ্ট হলেও অন্য কারও জন্য বাড়তি চিকিৎসারও দরকার হতে পারে। কাজেই এই ব্যবস্থা পড়ে কেউ যেন মনে না করে, মূলনীতি পেয়ে গেছি, ব্যস এখন আমি নিজেও এটা প্রয়োগ করতে পারব। এখন আর শায়খের দরকার হবে না। আমি নিজেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারব।

হযরত (রহ.) বলেন, ব্যাপারটা এরকম নয় আদৌ। এরপরও শায়খের দরকার আছে। এই একটা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেই ক্ষান্ত হয়ে যেও না। সপ্তাহান্তে শায়খকে জানিও চিকিৎসার ফলাফল কী হয়েছে। তারপর শায়খই সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসা যথেষ্ট হয়েছে কি না এবং এতটুকুতেই পরিপূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে, না আরও ওষুধের দরকার হবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

গীবত ক্ষমা করানোর উপায়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কারও গীবত হয়ে গেলে ইস্‌তিগফারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়াও জরুরি। তবে গীবতে কী বলা হয়েছে তা তাকে সবিস্তারে জানানোর দরকার নেই। তাতে তার কষ্ট আরও বাড়বে। কাজেই সংক্ষেপে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি যা বলেছি বা শুনেছি তা ক্ষমা করে দিন।[৮২]

হযরত (রহ.)-এর মাধ্যমে গীবত ক্ষমা করানোর উপায় বাতলে দিয়েছেন। এ প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগে যে, কারও গীবত হয়ে গেলে সে ব্যাপারে ক্ষমাপ্রাপ্তির উপায় কী?

গীবতের সম্পর্ক হক্কুল-'ইবাদের সাথে। গীবত দ্বারা অন্য মুসলিমের হক পদদলিত করা হয়, তার মান-সম্মানে আঘাত করা হয়। হক্কুল-'ইবাদ নষ্ট করা হলে তা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ না যেই ব্যক্তির হক

---

৮২. আনফাসে 'ঈসা', ১৫১ পৃ.

নষ্ট করা হয়েছে, সে নিজে ক্ষমা করবে। কাজেই আপনার দ্বারা যদি কারও দৈহিক বা আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে কিংবা কারও ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করে থাকেন, তবে সে ব্যাপারে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য কেবল ইসতিগফার যথেষ্ট নয়। বরং যার ক্ষতি করা হয়েছে, তার কাছ থেকেও ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে।

হক্কুল-'ইবাদ বড় কঠিন জিনিস

যে সব গুনাহের সম্পর্ক হক্কুল্লাহর সাথে, যেমন মদপান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি, এর জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির উপায় হল তাওবা করা। অর্থাৎ যে গুনাহ হয়ে গেছে তার জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়া, খাটি মনে ওয়াদা করা যে ভবিষ্যতে আর কখনও এ গুনাহে লিপ্ত হব না আর আল্লাহ তা'আলার কাছে কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ এরূপ গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। কিন্তু হক্কুল-'ইবাদের যে গুনাহ, তার ক্ষমা কেবল এতটুকুর দ্বারাই হয় না। তার জন্য শর্ত হল সেই ব্যক্তির থেকেও ক্ষমা লাভ করা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে। সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত এরূপ গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। গীবত এ জাতীয়ই একটি গুনাহ। কারও গীবত করার পর যদি বসে বসে তাওবা করে যে, হে আল্লাহ! আমি যে গীবত করেছি তজ্জন্য আপনার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন, তবে কেবল এতটুকুর দ্বারা তা ক্ষমা হয়ে যায় না। বরং গীবত যার করা হয়েছে আগে তার ক্ষমা করতে হবে। সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত তা ক্ষমা হবে না। এ কারণেই হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, কারও গীবত হয়ে গেলে তওবা- ইস্তিগফার করার সঙ্গে-সঙ্গে যার গীবত করা হয়েছে সেই ব্যক্তির কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

গীবতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া জরুরি নয়

তারপর বলেন, 'কিন্তু গীবতে কী বলা হয়েছে তা বিস্তারিত বলতে গেলে তাতে তাকে কষ্টই দেওয়া হবে।

উদাহরণত, তাকে যদি বলা হয়, আমি অমুক দিন আপনার গীবত করেছি এবং তাতে আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, এতে তার কষ্ট পাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই বিস্তারিত বলে ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। বরং সংক্ষেপে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি যা বলেছি, শুনেছি সব ক্ষমা করে দিন। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কত সহজ উপায় করে দিয়েছেন।

'যা বলেছি, শুনেছি সব ক্ষমা করে দিন'- এটা আমাদের বুযুর্গদের চালু করা অত্যন্ত সারগর্ভ একটা বাক্য। বুঝ হওয়ার পর থেকে তাদের মুখে এ বাক্যটি শুনে আসছি। দু'চারজন লোক একত্রে কিছুদিন থাকার পর যখন পরস্পর বিদায় গ্রহণ করে, তখন একে অন্যকে লক্ষ করে বলে, ভাই, আমার বলা-শোনা সব ক্ষমা করে দিও। দু'চারজন সফরে বা দেশে একত্রে কিছুদিন থাকলে একের দ্বারা অন্যের কিছু না কিছু হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বিদায়ের আগে হক মাফ করিয়ে নেওয়া চাই। সেই সময় মাফ না করিয়ে যদি বিদায় নেয়, তারপর কখনও মনে পড়ে যে, আমার দ্বারা অমুকের অমুক হক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তখন মাফ করানোর জন্য তাকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে? আদৌ জানা নেই তার আর দেখা মিলবে কি না এবং ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ হবে, কি হবে না? কাজেই দেরি না করে বিদায় বেলাই ক্ষমা করিয়ে নেওয়া চাই। বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক। গীবতও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর দ্বারা ক্ষমা করানো হলেই গীবতও আপনা-আপনিই ক্ষমা হয়ে যাবে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর নিয়ম

আমি হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই (রহ.)-এর কাছে শুনেছি যে, হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, কেউ যখন আমাকে বলে, আমি আপনার গীবত করেছি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি তাকে বলি, ক্ষমা তো অবশ্যই করব, কিন্তু তার আগে বল, তুমি আমার সম্পর্কে কি কি কথা বলেছ। বলা বাহুল্য হকদারের জিজ্ঞেস করার পূর্ণ অধিকার আছে যে, কী গীবত করেছ। তিনি বলেন, এটা জিজ্ঞেস করার ফায়দা হল, কখনও কখনও গীবত সত্যও হয়ে থাকে। গীবতে যে সব ভুল কথাই হবে তা অনিবার্য নয়। জিজ্ঞেস করে নিলে সত্য বের হয়ে আসে এবং নিজের দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় এর দ্বারা আপনার সম্পর্কে মানুষের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন কী তাও জানা হয়ে যায়। যারা আশে-পাশে থাকে তারা তো প্রশংসাই করবে, আপনাকে সর্বদা ভালোই বলবে, কিন্তু পেছনে লোকে আপনার সম্পর্কে কী বলে, তারা আপনাকে কেমন মনে করে, তাও জানার দরকার আছে। এরও ফায়দা আছে। কেননা সকলে যদি প্রশংসাই করে, তাতে অন্তরে নিজের সম্পর্কে সুধারণা সৃষ্টি হয় ও অহমিকা জন্ম নেয়। সকলেই আমার প্রশংসা করে। তাহলে তো আমার মধ্যে অনেক গুণ আছে এবং আমি অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছি। তা না হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে কেন? এভাবে অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি হয়ে যায়।

এই অহমিকা দূর করার জন্য পেছনে লোকে কি বলে জানা প্রয়োজন। তারা কী বলছে, কেমন ভাবছে এবং কেমন ধারণা পোষণ করছে তা জানতে পারলে অহমিকার চিকিৎসা হয়ে যায়। তাই হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমার কাছে কেউ ক্ষমা চাইতে আসলে আমি তাকে বলি, ক্ষমা তো অবশ্যই করব, কিন্তু তার আগে বল, কী গীবত করেছিলে? তা বললেই ক্ষমা করব।

সকলের কাছেই সাধারণভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত

প্রশ্ন হচ্ছে, ক্ষমা কার কার কাছে চাব? আগে তো এদিকে লক্ষ ছিল না, কতজনের গীবত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। এখন কি চিন্তা করে করে তাদের তালিকা তৈরি করব এবং তারপর এক একজনের কাছে ক্ষমা চাব? আমার মহান পিতা (রহ.) বলতেন, ভাই জান্নাত তো এত সস্তা নয়। তা পেতে হলে হক যাদের নষ্ট করা হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে। কাজেই নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আরও যত সম্পৃক্তজন আছে, সকলের তালিকা তৈরি করে নাও এবং তারপর তাদের কাছে ক্ষমা চাও।

নবীজির ক্ষমা প্রার্থনা

আপনি-আমি আর কোন কাতারের লোক। আমাদের সকলের আদর্শ হযরত মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছেন যে, আমার কাছে কারও কোনও হক থেকে গেলে সে আমার থেকে তা আদায় করে নিক, দৈহিক হক হলে বদলা নিয়ে নিক অথবা ক্ষমা করে দিক। তাঁর কথায় এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একদিন আপনি আমার কোমরে মেরেছিলেন। আমার সেই হক বাকি রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যদি তোমাকে মেরে থাকি তবে তোমার হক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। তুমিও আমার কোমরে মেরে দাও। সাহাবী কাছে আসলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন মেরেছিলেন, আমার কোমরে কোন কাপড় ছিল না। আপনার কোমর তো কাপড়ে ঢাকা। তিনি কোমর থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। সাহাবী সাথে সাথে ঝুঁকে পড়লেন এবং তাঁর নবুওয়াতী মোহরে চুম্বন করলেন। এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[৮৩]

কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য তো কারও জানা ছিল না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো প্রতিশোধ নেওয়ারই সুযোগ করে দিয়েছিলেন,

---

৮৩. মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯ খ, ২৭ পৃ.

কেউ যদি মিথ্যা প্রতিশোধ নিতে চাইত তারও জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকলে, আখিরাতের চিন্তা ও হিসাব-নিকাশের জন্য দাঁড়ানোর ফিকির থাকলে মানুষের সামনে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে যদি লাঞ্ছনারও শিকার হতে হয়, তাও অতি তুচ্ছ মনে হয়। নফস ও শয়তান আমাদের অন্তরে যতসব ফালতু মানসিকতা বদ্ধমূল করে দিয়েছে। আমরা মনে করি ক্ষমা চাইলে মান-সম্মান সব শেষ হয়ে যাবে, নাক কাটা যাবে ও মানুষ হাসাহাসি করবে। আমাদের তো লক্ষ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচা ও তাঁর গজব থেকে আত্মরক্ষা করা। সেজন্য যত বেইজ্জতই হতে হয় তাতে কি এসে যায়। আমরা তার জন্য প্রস্তুতই থাকব।

আমার মহান পিতার ক্ষমা প্রার্থনা

আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহ.) যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সেই সময়কার কথা। একবার চেতনা ফিরে আসলে তিনি সর্বপ্রথম যে কথা আমাকে বলেছিলেন, তা হল—

'যত লোকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তাদের সকলের কাছে আমার পক্ষ থেকে একটি চিঠি পাঠাও। লিখে দাও যে, আমার কাছে যদি কারও কোন হক থেকে যায়, কারও গীবত করে থাকি বা কারও সাথে কোন মন্দ আচরণ করে থাকি, সে যেন তার বদলা নিয়ে নেয়, অথবা ক্ষমা করে দেয়।

নির্দেশ মত আমি একখানি পত্র লিখি এবং তালাফী মা ফাতা (যা কিছু অনাদায় আছে, তার প্রতিকার) নামে প্রথমে 'আল-বালাগ' পত্রিকায় ছেপে দেই। তারপর হ্যান্ডবিল আকারেও ছেপে তাঁর সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সকলের কাছে পাঠিয়ে দেই।

যা হোক হক্কুল ইবাদের প্রতিকার কেবল মৌখিক তাওবা দ্বারা হয় না এবং এতটুকুতেই তা ক্ষমা হয়ে যায় না। বরং হকদারের পক্ষ থেকেও ক্ষমা করানো জরুরি। গীবত করলে বান্দার হকই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত হয়ে গেছে তার কাছেও ক্ষমা চাওয়া অবশ্য কর্তব্য।

কারও গীবত হয়ে গেলে তার প্রশংসা করুন

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, সেই সঙ্গে এটাও জরুরি যে, যাদের সামনে গীবত করা হয়েছিল এখন তাদের সামনে সেই ব্যক্তির প্রশংসা করুন এবং আগের কথা যে ভুল ছিল তা বুঝিয়ে দিন।[৮৪]

---

৮৪. আনফাসে ঈসা, পৃ. ১৫১

কেননা আপনি তার কাছে তো ক্ষমা চাইলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা-ইস্‌তিগফার করে সম্পর্ক ঠিক করে নিলেন, কিন্তু গীবত দ্বারা মানুষের অন্তরে তার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন, তা তো যথারীতি রয়ে গেল, তারও প্রতিকার অপরিহার্য। সে জন্য এখন তার প্রশংসা করুন এবং আগের কথা ভুল প্রমাণ করে দিন। তাদেরকে বলুন আমি আগে তার সম্পর্কে যা বলেছিলাম সঠিক ছিল না।

তারপর তিনি বলেন–

সে কথা যদি ভুল না হয়ে সঠিক হয়ে থাকে, তবে বলে দিন, ভাই! সেই কথার ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে খারাপ মনে করো না। কেননা আমার নিজেরও সেই কথার উপর আস্থা নেই। এটা একটা কৌশলী বাক্য হবে। কেননা ওহী ছাড়া সত্য কথার উপরও তো পরিপূর্ণ বিশ্বাস হতে পারে না।'[৮৫]

অর্থাৎ গীবতকালে যদি কারও সত্যিকারের দোষের কথা বলা হয়, আর গীবত তো সত্যও হয়ে থাকে, তবে তো এখন একথা বলা যাবে না যে, সে কথা সঠিক ছিল না। কেননা তা বললে তো মিথ্যা বলা হবে। এ ক্ষেত্রে বলে দিন যে, আমার সেই কথার উপর বিশ্বাস রেখে তুমি অমুক সম্পর্কে কুধারণা করো না। কেননা আমার নিজেরও এখন সেই কথার উপর বিশ্বাস নেই। কেননা সত্যকথার উপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস ওহী ছাড়া সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য চাই প্রত্যক্ষকরণ বা ওহী। এ ছাড়া শতভাগ বিশ্বাসের অন্য কোন উপায় নেই। কাজেই একথা বলতে কোন দোষ নেই যে, এখন সেই কথার উপর আমার নিজের বিশ্বাস ও আস্থা নেই। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা সেই গীবতের প্রতিকার হয়ে যাবে।

যার গীবত করা হয়েছে তার মৃত্যু হলে

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যার গীবত করা হয়েছে, সেই ব্যক্তি যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে এখন ক্ষমালাভের উপায় হল তার জন্য দু'আ ও ইস্‌তিগফার করতে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত মন সাক্ষ্য না দেবে যে, এখন সে রাজি-খুশী হয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ আমল চালিয়ে যাবে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে তার জীবদ্দশায় তো ক্ষমা চাওয়া হয়নি, মৃত্যুর পর হুঁশ হয়েছে যে, গীবত দ্বারা আমি তার যে হক নষ্ট করেছি,

---

৮৫. আনফাসে 'ঈসা, ১৫১ পৃ.

তা তো মাফ করানো হল না। এখন মাফ করানোর উপায় কী? উপায় হল তার জন্য দু'আ করতে থাকা এবং তার দ্বারা যে সব গুনাহ হয়ে গেছে সে জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাওয়া যে, হে আল্লাহ! তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। এ আমল যথারীতি চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না মন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এখন রাজি-খুশি হয়ে গেছে।

মোটকথা, হুকুকুল-'ইবাদের বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন। বান্দা যতক্ষণ ক্ষমা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ক্ষমা হয় না। যার হক নষ্ট করা হয় তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে যায়। তবে কোনও অবস্থায়ই হতাশার কোনও কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার দুয়ার কোনও অবস্থায়ই এমনভাবে বন্ধ করে দেন না যে, তারপর আর ক্ষমা লাভের কোনও সুযোগ থাকে না।

নিরানব্বইটি হত্যার পর তাওবা

বুখারী শরীফে একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি এক-এক করে নিরানব্বইজন লোককে খুন করেছে। অবশেষে তার হুঁশ হয় এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করতে প্রস্তুত হয়। সে একজন রাহিব (আশ্রামবাসী দরবেশ)-এর কাছে গিয়ে বলল, আমি নিরানব্বই লোককে খুন করেছি। আমার জন্য কি তাওবা-ইস্তিগফারের কোন উপায় আছে? রাহিব বলল, না, তোমার জন্য তাওবার কোন পথ নেই। তুমি সোজা জাহান্নামে চলে যাবে। সোজা কথা, তুমি নিরানব্বইটি খুন করেছ! তোমার এত বড় পাপ কেবল তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে মনে করেছ? তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত নিহতদের ওয়ারিশদের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ না করবে ততক্ষণ তোমার ক্ষমা নেই। আর নিহতদের ওয়ারিশগণ কে কোথায় আছে জানবে কি করে আর কি করেই বা তাদের থেকে ক্ষমা নেবে। কাজেই সোজা কথা তোমার জন্য ক্ষমার কোন পথ নেই। তোমাকে জাহান্নামেই যেতে হবে। একথা শুনে সে বলল, তাই, আমার জন্য তাওবার কোন রাস্তা নেই? তবে নিরানব্বইটি তো হয়েছেই, আর একটি বাকি থাকবে কেন? এই বলে সে ওই রাহিবকেও হত্যা করল। এভাবে শত সংখ্যা পূরণ করল।

তারপর সে আরেকজন রাহিবের কাছে গেল। তার কাছে পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করল এবং নিরানব্বইয়ের পর সেই একশ' পূরণের কথাও জানাল। তারপর বলল, বলুন, আমার জন্য কি তাওবা-ইস্তিগফারের কোনও পথ খোলা আছে?

রাহিব বলল, হাঁ, এখনও তোমার জন্য তাওবা-ইস্তিগফারের পথ খোলা আছে। তুমি এক কাজ কর। অমুক গ্রামে চলে যাও। সেখানে কিছু নেককার লোক বাস করে। তুমি তাদের সাহচর্য গ্রহণ কর।

তিনি তাকে নেককার লোকদের সাহচর্যে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেননা অসৎ লোকদের সাহচর্য ত্যাগ করে সৎ লোকদের সংগ গ্রহণ করলে পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং সেই খুনী লোকটি তাওবা-ইস্তিগফার করে সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। তার সংকল্প এখন থেকে সে তার জীবন বদলে ফেলবে। আর কোনও গুনাহ করবে না। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর ভেতরই জীবন অতিবাহিত করবে। আল্লাহ তা'আলার শরীআত মোতাবেক জীবন পরিচালিত করবে এবং বাকি জীবনটা নেককার লোকদের সঙ্গেই কাটাবে।

লোকটি চলতে থাকল, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারল না। তার আগেই জানকবজকারী ফিরিশতাদের কাছে হুকুম এসে গেল যে, তার জান কবজ করে নাও। কেননা তার আয়ু শেষ হয়ে গেছে সুতরাং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মৃত্যুর পর তার রূহ কোথায় নেওয়া হবে সে নিয়ে ফিরিশতাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফিরিশতাগণ বলল, এ ব্যক্তি তাওবা করে পাক-পবিত্র হয়ে গেছে। সে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে শোধরানোর জন্য নেককার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। কাজেই আমরাই তার রূহ নিয়ে যাব। অন্যদিকে আযাবের ফিরিশতাগণ বলল, সে একজন ঘোর পাপী। একশ'জন লোককে হত্যা করেছে। সারাটা জীবন পাপের মধ্যে কাটিয়েছে। সুতরাং তার রূহ আমরাই নিয়ে যাব। তাকে নিয়ে শাস্তি দেব। তাদের মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ চলতে থাকল। শেষে আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দিলেন, তোমরা একটা কাজ কর, সে যেই গ্রাম ছেড়ে এসেছে এবং যেই গ্রামের দিকে যাচ্ছিল – মেপে দেখে দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশি কাছে। তারা সবটা পথ মাপল। দেখা গেল যেই গ্রামের দিকে যাচ্ছিল সেটা বেশি কাছে। মৃত্যুকালে সে সেইদিকে কয়েক হাত এগিয়ে ছিল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, দেখ আমার বান্দা তাওবা-ইসতিগফার করে নিজ এলাকা ছেড়ে দিয়েছিল এবং নেক জীবন-যাপনের লক্ষে নেককারদের গ্রামে যাচ্ছিল, এমনকি সে তাদেরই বেশি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এহেন অবস্থায় তার সাথে পাপী সুলভ নয়, বরং মাগফিরাত ও ক্ষমারই আচরণ করা চাই। সুতরাং তাকে ক্ষমাই করে দেওয়া হল।[৮৬]

---

৮৬. বুখারী, হাদীছ নং ৩২১১; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৯৬৭; ইবন মাজা, হাদীছ নং ২৬১২; আহমাদ, হাদীছ নং ১০৭২৭

হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই

সুতরাং হতাশার কোনও কারণ নেই। হক্কুল-'ইবাদ নষ্ট হওয়ার পর হকদার ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেলে একথা ভাবা ঠিক নয় যে, এখন আর ক্ষমা পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ব্যাপার আদৌ সে রকম নয়। প্রথমে সচেতন থাকুন যাতে কোনও বান্দার কোনও হক নষ্ট করা না হয়। বরং তা যথাযথভাবে আদায়ের চেষ্টা করুন। তারপরও যদি কারও কোনও হক নষ্ট হয়ে যায়, তবে যথাশীঘ্র তা মাফ করিয়ে নিন। যদি মাফ করানোর কোনও সুযোগ পাওয়া না যায়, তাতেও নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। এ অবস্থায়ও ক্ষমাপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। সেই ব্যক্তির জন্য ইস্তিগফার করতে থাকুন এবং দু'আ করুন হে আল্লাহ! আমার দ্বারা যার কোনও হক পদদলিত হয়েছে আপনি নিজ দয়ায় তাদেরকে আমার প্রতি রাজি-খুশি করে দিন। হে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। দু'আ করতে থাকুন, যতদিন না মন সাক্ষ্য দেয় যে, এখন তারা খুশি হয়ে গেছে।

আমাদের হযরত থানভী (রহ.)-এর শিক্ষায় হতাশার কোন পথ রাখা হয়নি। তার শিক্ষাই হল–

سوئے نا امیدی مرو امیدہا است
سوئے تا تاریکی مرو خورشیدہا است

'হতাশাকে মনে জায়গা দিও না, এ পথে কেবল আশা আর আশা। যেও না অন্ধকারের দিকে, এ পথে কেবল আলোই আলো।

হযরত (রহ.) হতাশা ও অন্ধকারের দিকে যেতেই দেন না। তিনি আলো ও আশার পথ দেখিয়ে দেন। বলেন, এই কর, ওই কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবেন, সব সংকট মোচন করে দেবেন এবং সর্বপ্রকার রোগ থেকে নিরাময় দান করবেন। অবস্থা যাই হোক না কেন প্রতিকারের কোনও না কোনও ব্যবস্থা আছেই।

কুফ্র ও শির্‌ক থেকে তাওবা

দেখুন কুফ্র ও শির্‌ক অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জগতে আর কিছুই নেই। এ অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হল, আমি এ গুনাহ

ক্ষমা করব না। এ ছাড়া অন্যসব গুনাহ ক্ষমা করে দেব। কিন্তু সেই কুফ্‌র ও শিরক থেকেও তো তাওবার পথ খোলা রেখেছেন। সত্তর বছরের একজন কাফের যদি তার কুফ্‌র ও শিরক থেকে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

শয়তানের প্রতারণা

কাজেই হক্কুল-ইবাদের বিষয়টা যদিও কঠিন কিন্তু তারপরও সে ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। শয়তান মানুষের অন্তরে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করে। সে এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, দেখ, তুই কিন্তু গুনাহ করে মরদুদ ও অভিশপ্ত হয়ে গেছিস। তোর ক্ষমার কোনও পথ নেই। জাহান্নামই তোর ঠিকানা। কাজেই শুধু-শুধু চেষ্টা করে লাভ কী। তারচে' নিজ মর্জিমত চল। ফূর্তি কর, মজা লোট, যত ইচ্ছা গুনাহ করতে থাক। এভাবে শয়তান হতাশার ফাঁদে ফেলে আরও বেশি গুনাহে লিপ্ত করে। দেখা যাচ্ছে হাতাশাও শয়তানের একটা ফাঁদ। এ কারণেই হতাশাকে মনে একদম স্থান দেওয়া উচিত নয়। হতাশ হওয়া মুমিনের কাজই নয়। যত বড় গুনাহই হয়ে যাক না কেন, তা আল্লাহ তা'আলার রহমত অপেক্ষা তো বড় হতে পারে পারে না। তাঁর রহমতে ক্ষমাপ্রাপ্তির একটা না একটা উপায় লাভ হবেই।

আবূ নাওয়াসের ঘটনা

আবূ নাওয়াস নামে আরবে এক প্রসিদ্ধ কবি ছিল। স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিল। যে সব কবি সব রকম পাপাচারে লিপ্ত থাকত, আবূ নাওয়াসও তাদের একজন। সারাটা জীবন পাপকর্মেই কাটিয়েছে। মদ্যপান তো ছিলই। মৃত্যুর পর তার সাথে স্বপ্নযোগে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে তাকে জিজ্ঞেস করল আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কী রকম ব্যবহার করেছেন? সে বলল, কী বলব ভাই! মৃত্যুকালে যা ভয় পেয়েছিলাম! জীবনভর মজা লুটে বেড়িয়েছি, আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন সাক্ষাত হবে, না জানি কি কঠিন শাস্তি তখন আমাকে দেওয়া হয়! বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলাম। এই দুশ্চিন্তার ভেতর আমি তিনটি শ্লোক তৈরি করি এবং তারই ওছিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দেন। স্বপ্নে কবি তাকে শ্লোক তিনটি শুনিয়ে দেয়। বড় চমৎকার এক কবিতা। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে কবিরাও তাদের কবিতায় অনেক মূল্যবান কথা বলে ফেলেন।

কবিতাটি নিম্নরূপ–

يَا رَبِّ اِنْ عَظُمَتْ ذُنُوْبِيْ كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ عَفْوَكَ اَعْظَمُ

اِنْ كَانَ لَا يَرْجُوْكَ اِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوْذُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُجْرِمُ

وَمَدَدْتُ يَدِيْ اِلَيْكَ تَضَرُّعًا فَلَئِنْ رَدَدْتَ يَدِيْ فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

প্রভু হে! যদিও গুনাহ আমার বিপুল বেশুমার, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তোমার ক্ষমা তারচে' অনেক বড়।

যদি কেবল নেককার বান্দারাই তোমার রহমতের আশা করতে পারে, তবে বল, অপরাধী বান্দা কার আশ্রয় নেবে, তারা যাবে কার দুয়ারে? বিনয় কাতরভাবে হে মালিক, হাত বাড়ালাম তোমার কাছে, এখন তুমি যদি ফিরিয়ে দাও, তবে বল, আর কে দয়া করবে?

বিদায় বেলার কবিতা। তিনি একথাগুলো বলছিলেন আর ইহলোক ছেড়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলাই জানেন তখন তার মনের অবস্থা কী ছিল। ছাড়পত্র দিয়েই দিলেন। যা, এই কবিতার দৌলতে তোকে ক্ষমা করে দিলাম। এ কবিতাটি আবূ নাওয়াসের লিখিত পাণ্ডুলিপিতে ছিল না। থাকার অবকাশও ছিল না। কারণ, এটি তো বলেইছিলেন জীবনের একদম শেষ মুহূর্তে। দুনিয়া থেকে যেতে যেতে। তাই পাণ্ডুলিপিতে লেখার অবকাশই পাননি, তাই স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেন যে, আমি এই কবিতা বলেছিলাম। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছিল, সে স্বপ্নেরই বরাতে আবূ নাওয়াসের দীওয়ান (কাব্য সংকলন)-এ লিখে দিয়েছেন।[৮৭]

বাহ্যিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিও না

এ কারণেই বুযুর্গানে দীন বলেন, কোনও ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে সে জান্নাতী, না জাহান্নামী এই ফয়সালা দিয়ে বসো না। কে জানে কার কোন আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে পসন্দ হয়ে যায় বা কার মৃত্যু কোন আমলের উপর হয় আর সে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন, ফলে সে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আমি নগদে প্রত্যেক মুসলিমকে এবং সম্ভাব্য পর্যায়ে প্রত্যেক অমুসলিমকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করি। সম্ভাব্য পর্যায়ে

---

৮৭. মুখতাসারু তারীখি দিমাশক, ২খ, ৪২২ পৃ.; বাহজাতুল-মাজালিস, ১খ ২৫৫ পৃ.

দ্বারা বোঝাচ্ছেন, হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের তাওফীক দেবেন এবং তারপর সে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। কাজেই বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে যে যেমনই হোক না কেন, তাকে কখনও ঘৃণার চোখে দেখ না। হ্যাঁ মন্দ কাজ করলে সেই কাজকে ঘৃণা কর এবং বল, মদ্যপান একটা নিকৃষ্ট কাজ, চুরি করা একটা খারাপ কাজ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যক্তিকে ঘৃণা কিছুতেই নয়। কেননা এমন তো হতেই পারে যে, আল্লাহ তাকে তাওবার তাওফীক দেবেন, ফলে সে ঈমান ও আমলে বহুদূর এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে দীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন।

যে সকল গীবত বৈধ

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, দীনী প্রয়োজন দেখা দিলে গীবতও বৈধ হয়ে যায়, যেমন মুহাদ্দিছগণ হাদীছ-বর্ণনাকারীদের (স্তর বিন্যাস করত, কোনও কোন বর্ণনাকারীর) সমালোচনা করেছেন। যদি দীনী কোনও প্রয়োজন না থাকে, বরং কেবল ইন্দ্রিয় পরবশতার কারণেই নিন্দা করা হয়ে থাকে, তবে সত্যিকারের দোষ বর্ণনাও নিষিদ্ধ গীবত সাব্যস্ত হবে আর যাচাই ছাড়া কোনও কথা বলা হলে তা অপবাদ গণ্য হবে। মিথ্যার ভিত্তি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার উপর নয়; বরং সত্য প্রমাণিত না হওয়ার উপর।

অর্থাৎ দীনী প্রযোজনে অন্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা জায়েয। মুহাদ্দিছগণের তো কাজই ছিল মানুষের অবস্থা যাচাই-বাছাই করে কে কোন্ পর্যায়ের রাবী (হাদীছ বর্ণনাকারী) তা নির্ণয় করা। কাজেই কেউ যদি তাদের কাছে কোনও রাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত যে, সে কোন্ পর্যায়ের, তবে কারও সম্পর্কে বলতেন সে যঈফ (দুর্বল), সে মিথ্যুক ইত্যাদি। এরূপ বলাটা তাদের দায়িত্ব ছিল। তা না বললে তারা গুনাহগার হতেন। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ সংরক্ষণ করার জন্য কোন্ রাবী কেমন তা জানা ও জানানো অবশ্যকর্তব্য ছিল। কাজেই এ গীবত ছিল দীনী প্রয়োজনে। তাই এটা জায়েয ছিল।

হযরত 'আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত 'আলী ইবনুল-মাদীনী (রহ.) একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিছ এবং জারহ ওয়া তা'দীল (রাবীর দোষ-গুণ নির্ণয়বিষয়ক শাস্ত্র)-এর ইমাম ছিলেন। কিন্তু তার পিতা হাদীছ বর্ণনায় পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল নিজ পিতা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? হাদীছ বর্ণনায় তিনি

শক্তিশালী, না দুর্বল? প্রথমে বললেন, আমার পিতা সম্পর্কে অন্য মুহাদ্দিছদেরকে জিজ্ঞেস করো। প্রশ্নকর্তা বলল, তার ব্যাপারে আমি আপনার মতটাই জানতে চাচ্ছি। এভাবে যখন সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল, শেষে তিনি মাথা নিচু করে বললেন–

هُوَ الدِّيْنُ اَنَّهُ ضَعِيْفٌ

'এটা তো দীনের ব্যাপার' তাই বলছি, তিনি হাদীছ বর্ণনায় দুর্বল।'[৮৮]

এটা যেহেতু দীনী বিষয় আর দীনী বিষয় গোপন করা যায় না। তা নিজ পিতার বিরুদ্ধেই যাক বা পুত্রের বিরুদ্ধে। সত্য বলতেই হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)-এর ঘটনা

সুনান আবূ দাউদ বা আবূ দাউদ শরীফ নামক প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের সংকলক ইমাম আবূ দাউদ হাদীছ শাস্ত্রের কত বড় পণ্ডিত ও সমাদৃত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তার পুত্র ছিলেন একজন য'ঈফ রাবী। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নিজ পুত্র সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উত্তরে বললেন,

لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ

'তার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করা বৈধ নয়।'[৮৯]

দেখতেই পাচ্ছেন মুহাদ্দিছগণ রাবীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় সে পিতা, না পুত্র না নিকটতম কোন আত্মীয় সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। কেননা এটা ছিল দীনের প্রয়োজন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মামলা। এ ক্ষেত্রে রাবীর কোন ত্রুটি থাকলে তা প্রকাশ করতেই হবে, সে যে-ই হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা মুহাদ্দিছ শ্রেণীকে সৃষ্টিই করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের মাধ্যমে হাদীছের হেফাজত হবে, তাদের দ্বারা এ সংক্রান্ত কাজ নেওয়া হবে। তো হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যেখানে দীনের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে গীবত করা কেবল জায়েযই নয়, বরং কখনও কখনও তা জরুরি হয়ে যায়।

---

৮৮. মীযানুল ই'তিদাল ২য় খণ্ড, ৪০১; লিসানুল মীযান, ৮ম খণ্ড, ৪৩০; কিতাবাতু আ'দাইল ইসলাম ওয়া মুনাকাশাতুহা ১ম খণ্ড, ৫০৩

৮৯. মীযানুল-ই'তিদাল, ২খ, ৪৩৩; লিসানুল-মীযান, ৪খ, ৩১; কিতাবাতু আ'দাইল- ইসলাম ওয়া মুনাকাশাতুহা, ১খ, ৫০৪

কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় গীবত করা হারাম

যদি দীনী প্রয়োজন না থাকে বরং কেবল কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়ই গীবত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বাস্তব দোষ বর্ণনাও হারাম।

কাজেই খতিয়ে দেখতে হবে, আমি যে কথা বলছি তা কি কোন দীনী প্রয়োজনের ভিত্তিতে বলছি, না নিজ খেয়াল-খুশীর বসে কেবল মজা পাওয়ার জন্য বলছি। বিচার করলে বোঝা যাবে আসলে বলছি– মজা পাওয়ার জন্য, কিন্তু তাকে জায়েয বানানোর জন্য মন কোন দীনী প্রয়োজনের ছল গ্রহণ করছে আর যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে যে, এটা তো ওই দীনী ফায়দার জন্য বলা হচ্ছে। তা যতই যুক্তি দেখাক, মনের ভেতরই ঢু মারলে দেখতে পাবে আসলে দীনী প্রয়োজন একটা বাহানামাত্র। যা বলা হচ্ছে কেবল কুপ্রবৃত্তির তাড়নাতেই বলা হচ্ছে। মজা পাওয়া ছাড়া এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ গীবত। তাতে যে কথা বলা হচ্ছে তা যত সঠিকই হোক এবং অনুসন্ধানে তার সত্যতা যত নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হোক। সর্বাবস্থায়ই তা হারাম ও নাজায়েয।

বিনা যাচাইয়ে নিন্দা করা অপবাদ

যে কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া বলা হবে তা সম্পূর্ণ অপবাদ কেননা মিথ্যা হওয়াটা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভর করে না বরং সত্য প্রমাণিত না হওয়ার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনও কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলেই যে সেটা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে ব্যাপারটা এমন নয়; বরং কোনও বিষয় যদি সত্য প্রমাণিত না হয় এবং তা সত্ত্বেও তা বর্ণনা করা হয়, তবে বর্ণনাকারীর পক্ষে তা মিথ্যাই। যেহেতু সে তা নিশ্চিতভাবে জেনে শুনে বলেনি। হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'কোনও ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা-কিছু শুনবে তাই বর্ণনা করবে।'[৯০]

সুতরাং আমরা যখন অন্যের গীবত করি, তখন শয়তান সবক পড়ায় যে, দেখ তুমি তার যে দোষ বর্ণনা করছ এটা কোনও গুনাহের কাজ নয়। কেননা এটা দীনী প্রয়োজন। অথচ সেখানে কোন দীনী প্রয়োজন থাকে না। যা থাকে

---

৯০. মুসলিম, হাদীছ নং ৬; আবূ দাউদ হাদীছ নং ৪৩৪০

তা কেবল নিজ খেয়াল-খুশী ও নফসের আগ্রহ। দীনী প্রয়োজন ও নফসের আগ্রহ এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা একটু কঠিনই। একজন কামেল শায়খই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তিনিই ধরতে পারেন যে, এই কাজটি দীনের প্রয়োজনে করা হচ্ছে, না নফসের চাহিদায়। শয়তান দীনী প্রয়োজনের বাহানায় গীবতে লিপ্ত করে দেয়। এরূপ গীবত বরং সুস্পষ্ট গীবত অপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক। কেননা এর মাধ্যমে সে আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিতে চায় যে, হে আল্লাহ! আমি যে গীবত করছি এটা তোমার দীনের স্বার্থেই করছি। কাজেই এর মধ্যে গীবতের গুনাহ তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দিতে চাওয়ার গুনাহও আছে। ভাবুন কী ভয়াবহ ব্যাপার! আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত ও দয়ায় আমাদের সকলকে গীবতের গুনাহ থেকে হেফাজত করুন– আমীন।

গীবতে প্রত্যক্ষ কষ্ট

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কে জানে মানুষ গীবতে যে কী মজা পায়! ক্ষণিকের জন্য নিজের মনকে খুশি করে নেয় ঠিক, কিন্তু যার গীবত করা হয় সে যখন জানতে পারে এবং এর ফলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তো সারাটা জীবনই তার ভোগান্তি পোহাতে হয়। আর অন্তরে যদি কিছুটাও বোধশক্তি থাকে, তবে গীবতের ফলে অন্তরে তৎক্ষণাৎ যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়, তার কষ্ট তো ভাষায় প্রকাশ করার নয়, কেউ টুটি টিপে ধরলে যেমনটা হয়।[৯১]

আমাদের স্বভাব নষ্ট ও বোধ-অনুভব খতম হয়ে গেছে। তাই নিরন্তর গুনাহ করছি, কিন্তু গুনাহের অন্ধকার অনুভব করছি না। আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তর স্বচ্ছ ও আলোকিত করে দেন, মামুলী গুনাহেও তারা অন্তরে ঘোর অন্ধকার অনুভব করেন। তাদের কাছে ছোট্ট ছোট গুনাহও এত বেশি ভারী মনে হয়। যেমন মাথার উপর পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

بر دل سالک ہزاراں غم بود گر ز باغ دل خلالے کم بود

মন বাগিচায় যদি একটা কণাও কম বোধ হয়, তবে মালিক (আল্লাহর পথের অভিযাত্রী)-এর অন্তরে হাজারও দুঃখ-কষ্ট ভেঙ্গে পড়ে।

---

৯১. আনফাসে 'ঈসা, ১৫২ পৃ.

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) সম্পর্কে হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.)-এর কোনও এক রচনায় পড়েছিলাম, একবার তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বসে আছেন। মনে হচ্ছিল তার উপর বিষাদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। কোনও এক শিষ্য কাছে গিয়ে বলল, হযরত! আপনার চোহারায় কষ্টের ছাপ চোখে পড়ছে। কোনও সমস্যা নেই তো? তিনি বললেন, হা কিছুটা দুঃখ আছে? জিজ্ঞেস করল কিসের দুঃখ? তখন দারুল-উলূম দেওবন্দে দস্তারবন্দী জলসা চলছিল। বললেন, আজ জলসায় কিছুটা ব্যস্ততা ছিল, যদ্দরুণ মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে দেখি, নামায শুরু হয়ে গেছে, তাকবীরে উলা ধরতে পারিনি। তারপরে বললেন, পঁয়ত্রিশ বছরে আজ এই প্রথম তাকবীরে উলা ছুটে গেল। ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। কেবল তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার অর্থ তিনি কিরাআত শুনেছেন, রুকূ' পেয়েছেন এবং প্রথম রাক'আতও পেয়েছেন, এমন কি বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাকবীরে উলাও পেয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপর মত অনুসারে তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার কারণে তার এতটা দুঃখ ও এ পরিমাণ বেদনা।

অন্যদিকে আমাদের অবস্থাও দেখুন। জামাত ছুটে যায়। অধিকাংশ নামাযীরই রাক'আত ছুটে যায় এবং সালামের পর অবশিষ্ট নামায একাকি পূর্ণ করে, কিন্তু এ জন্য কি আমাদের কোনও দুঃখ বোধ হয়? এর কারণ এ ছাড়া আর কি যে, আমরা অনুভূতিহীন হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করুন। আমাদের এই জড়ত্ব দূর করে দিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়া'কূব নানূতবী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়া'কূব নানূতবী (রহ.) বলেন, একবার সন্দেহযুক্ত একটি লোকমা খেয়ে ফেলা হয়েছিল। লোকমাটি হালাল, না হারাম সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। সেই লোকমাটির জুল্‌মাত এক মাস পর্যন্ত আমি অনুভব করতে থাকি। এই ছিল তাদের বোধ-অনুভবের সূক্ষ্মতা। আমাদের বোধশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। অনুভূতি ভোতা হয়ে গেছে। তাই গুনাহের কদর্যতা আমরা অনুভব করতে পারি না। মনে করি যেন একটা মাছি নাকের ডগায় বসল আর আঙ্গুলের নাড়ায় সেটি উড়িয়ে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই দুরবস্থা শুধরে দিন। আমীন।

গীবত দ্বারা কী অর্জন হয়?

যা হোক গীবত থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা করুন যে, গীবতের মধ্যে যে সময়টা ব্যয় করা হয় এবং এতে যে সুখ লাভ হয়, তার পরিণাম কী? এর দ্বারা আমাদের কী অর্জন হয়? বলাবাহুল্য অর্জন ও লাভ বলতে কিছুই নেই; উল্টো এর পরিণামে কঠিন গুনাহ কামাই হয় আর আখিরাত বরবাদ যায়। দুনিয়ায়ও লোকসান ছাড়া কোন লাভ নেই। কেননা যার গীবত করা হয়েছে সে যদি জানতে পারে আপনি তার সম্পর্কে কি কি বলেছেন, তাতে সে মনে কষ্ট পাবে। আপনার প্রতি তার অন্তরে ঘৃণা জন্মাবে ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। সেই শত্রুতার যের কোথায় গিয়ে পৌছায় তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

গীবতের পরিণামে আরও বহু গুনাহ

হুকূকুল-'ইবাদ সংক্রান্ত গুনাহের ক্ষেত্রে নিয়ম হল, মানুষ যখন এ জাতীয় গুনাহ একটা করে ফেলে তখন তার জেরে আরও দশটি অন্যায়ে জড়াতে হয়। গীবতের কথাটাই ধরুন, যার গীবত করা হয়, সে যখন জানতে পারে আর এসে জিজ্ঞেস করে তুমি আমার সম্পর্কে এই-এই কথা বলেছ? তখন সে স্বীকার করবে কি করবে না? করলে সে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ে যাবে আর যদি না করে তবে সরাসরি মিথ্যা বলবে, না ঘোরপ্যাঁচের আশ্রয়, নেবে। যদি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে আর এধার-ওধারের কথা বলে বাঁচার চেষ্টা করে, তবে সে ঠিকই ধরে ফেলবে যে, গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আর যদি অস্বীকার করে আর বলে না আমি এ কথা বলিনি, তবে গীবতের সাথে মিথ্যা বলার গুনাহও যোগ হল। সেই সঙ্গে যদি সেই ব্যক্তি বুঝে ফেলে, মিথ্যা বলা হয়েছে, তবে তার অন্তরে আরও বেশি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং শত্রুতা আরও বাড়বে। সুতরাং শুধু-শুধু এমন কাজ করতে যাওয়া কেন, যার পরিণামে পরস্পরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়? ফায়দা তো কিছু হয়ই না, উল্টো বিভিন্ন গুনাহ হয়, অন্তরে জুল্‌মাত দেখা দেয় এবং পরস্পরে শত্রুতা জন্মায়।

গীবতের আসল দাওয়াই বিনয়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গীবতেরও চিকিৎসা হল তাওয়াযূ ও বিনয়। তবে তাওয়াযূ একদিনে জন্ম নেয় না। তাই এ গুণ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। সে ব্যবস্থা হল, চিন্তা ভাবনা ছাড়া কোনও কথা না বলা, যাই বলবে ভেবে-চিন্তে বলবে। তাতে দিনে দিনে গীবতের মাত্রা কমে আসবে। এক সময় দেখা যাবে গীবত আর হয়ই না।

কখনও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোনও কথা বলা হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবার নিয়তে দু'রাক'আত নামায পড়ে নেবে।'[৯২]

অর্থাৎ মানুষের প্রথম চেষ্টা থাকবে যাতে গীবত বিলকূল না হয়। এর জন্য অন্তরে তাওয়াযূ অর্থাৎ বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্তরে তাওয়াযূ' না থাকার ফলেই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে করে ও অহংকারে লিপ্ত হয়, তখনই সে অন্যের গীবত করে ও পরের দোষ নিয়ে মাতামাতি করে। কারও নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে নজর থাকলে এবং নিজেকে শোধরানোর ফিকির থাকলে অন্যের দোষ দেখার মত ফুরসত তার থাকে কোথায়? সে তো নিজের ব্যথায় অস্থির থাকবে, আমার মধ্যে এই দোষ আছে, আমি এই ত্রুটিতে লিপ্ত, আমার সংশোধন কিভাবে হতে পারে, আমার এ রোগের প্রতিকার কী? সে তো এসব চিন্তায়ই সারা। অন্যের দোষ দেখে বেড়াবে কখন? হাঁ, অন্তরে যদি তাকাব্বুর থাকে, নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করে, নিজেকে শোধরানোর কোন চিন্তা না থাকে, তখন সে অন্যের ছিদ্রান্বেষণেই লিপ্ত থাকবে। অমুকের এই দোষ, অমুকের সেই দোষ, এসব নিয়েই সে থাকবে আর কখন কার কাছে এসব বলে বেড়াবে সেই সুযোগ খুঁজবে। সুতরাং গীবতের শিকড়ই হল অহংকার ও তাকাব্বুর। এ শিকড় উপড়ে ফেলতে পারলে মুখে কখনও কারও গীবত আসবেই না। সুতরাং গীবতের মূল এলাজ হল অন্তর থেকে তাকাব্বুর হটানো ও সেখানে তাওয়াযূ বসানো।

আমাদের বুযুর্গানে দীনের তাওয়াযূ'

একবার হযরত ডাক্তার হাফীজুল্লাহ সাহেব (রহ.) দারুল- 'উলূমে তাশরীফ আনেন, তার মুখে শুনেছি যে, হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মদ সাহেব (জামি'আ খায়রুল-মাদারিস মুলতান এর প্রতিষ্ঠাতা) বলতেন, আমি যখন হযরত থানভী (রহ.)-এর মজলিসে যেতাম, কোনও রকম অতিরঞ্জন ছাড়াই বলছি, তখন আমার মনে হত এই মজলিসে যত লোক আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি আমিই। সকলেই আমার চেয়ে উত্তম। বরং মনে হত এরাই তো মানুষ আর আমি একটা গরু।

পরে আমার চিন্তা হল আমার মনের এ অবস্থাটা সঠিক কিনা তা কি করে বুঝব। সুতরাং আমি 'জামিআ আশরাফিয়া লাহোর'-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত

৯২. আনফাসে 'ঈসা, ১৫২ পৃ.

মুফতী মুহাম্মদ হাসান সাহেব, (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। গিয়ে আরয করলাম যে, আমার মনের অবস্থা হল যখন হযরত থানভী (রহ.)-এর মজলিসে উপস্থিত হই তখন মনে হয় এ মজলিসে সর্বাপেক্ষা হীন ও নিকৃষ্ট আমিই। আমার চেয়ে নিম্নস্তরের কোন লোক এখানে নেই। একথা শুনে হযরত মুফ্‌তী সাহেব বলে উঠলেন, ভাই, এ অবস্থা তো আমারও। আমি যখন হযরতের মজলিসে উপস্থিত থাকি তখন অনুভব হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও দূরবস্থা সম্পন্ন। তাঁর কথা শুনে হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) বললেন, তাহলে তো দেখছি আপনার অবস্থাও আমারই মত। চলুন আমরা আমাদের এ অবস্থার কথা হযরতকে জানাই।

সুতরাং তারা উভয়ে হযরত থানভী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। এবং আরয করলেন, আমরা যখন আপনার মজলিসে বসি, তখন অনুভব হয় যে, এই মজলিসে যত লোক উপস্থিত আছে তারা সকলেই আমার চেয়ে উত্তম এবং আমরা সকলের অধম, সকলের চেয়ে হীন ও দুরবস্থাসম্পন্ন।

হযরত থানভী (রহ.) বললেন, কোনও চিন্তা করো না। আরে ভাই, আমার নিজের অবস্থাও তো এরকমই। যখন মজলিসে বসি, মনে হয়, এরা সকলেই আমার চেয়ে উত্তম, আমি সকলের নিচে।

গীবতের মূলোৎপাটন হয় তাওয়াযূ দ্বারা

তাওয়াযূ ও বিনয় অর্থ এ নয় যে, কেউ মুখে বলে দিল আমি একজন অকর্মন্য, আমি একজন অধম ইত্যাদি। বরং নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখা যে, নিজের দোষ-ত্রুটির বিপরীতে অন্যের দোষ-ত্রুটি চোখেই পড়বে না– এটাই প্রকৃত তাওয়াযূ, এটাই বিনয়। যে দিন অন্তরে এ গুণ জন্ম নেবে সেদিন থেকে ইনশাআল্লাহ গীবত ধারে কাছেও আসবে না। কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চেয়ে ক্ষুদ্র ভাবে এবং নিজ দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ রাখে সে অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখবে কখন? কাজেই গীবতের মূলোৎপাটন করতে চাইলে নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করুন।

নিজ দোষ-ত্রুটি স্মরণ রাখুন

নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করার উপায় হল নিজ দোষ-ত্রুটি চিন্তা করা ও সর্বদা তা স্মরণ রাখা। আমরা প্রত্যেকে নিজেকে বড় মনে করি। ভাবি

আমার মত কেউ নেই। আমি বড় জ্ঞানী। অনেক বড় মুত্তাকী, পরহেযগার। আমার অনেক টাকা-পয়সা। আমি সবল-স্বাস্থ্যবান। আমার চেহারা-সুরত অনেক ভালো। এভাবে একেকজন একেকটা জিনিস নিয়ে গর্বিত। এই গর্ব ও অহংকারণ মানুষকে ধ্বংস করছে।

মানুষ আসলে কী?

একবার এক যুবক জনৈক বুযুর্গকে লক্ষ করে বলল, আপনি জানেন আমি কে? বুযুর্গ বললেন, কেন জানব না? অবশ্যই জানি তুমি কে? চাও তো বলে দেই। তারপর বললেন–

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ وَاَنْتَ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

'তোমার শুরুটা হল নাপাক বীর্য, শেষটা পচা লাশ আর এ দু'য়ের মাঝখানে তুমি মলমূত্র বয়ে বেড়াচ্ছ।'

আল্লাহ তা'আলা মেহেরবান। তিনি মানবদেহের উপরে চামড়া বিছিয়ে তার সব দোষ ঢেকে দিয়েছেন। এ চামড়া সরিয়ে দিলে ভেতরে দেখা যাবে শুধু নাপাকী। তার রক্ত নাপাক, পেশাব-পায়খানা নাপাক কোথাও বা পুঁজ, তাও নাপাক। এতসব অপবিত্রতা মানুষের ভেতর। সে সর্বক্ষণ এগুলো বয়ে বেড়াচ্ছে। এই হল মানুষের স্বরূপ। তা সত্ত্বেও সে নিজেকে বড় মনে করে। এই বড়ত্ববোধই মানুষকে পরনিন্দায় প্ররোচিত করছে। কাজেই গীবত ও পরনিন্দার মূলোৎপাটন করতে চাইলে নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। বিনয় সৃষ্টি হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ কখনও মুখে কারও গীবত আসবে না। হ্যাঁ দীনী কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে ভিন্ন কথা।

সেক্ষেত্রে গীবত জায়েয। উদাহরণত কাউকে কারও ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চাইলে বলে দিন, অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সাবধান থেক। তার লেনদেন স্বচ্ছ নয়। এটা নিষিদ্ধ গীবত নয়। এতে গুনাহ নেই।

বিনয়ের জন্য শায়খের সাহচর্য

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দলাই-মলাই ছাড়া বিনয় সৃষ্টি হয় না। মানুষের মাথায় খন্নাস বাসা বেঁধে আছে। সে খন্নাস হল এই যে, মানুষ নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করে। নিজ চিন্তাকে নির্ভুল মনে করে। ভাবে আমি যা চিন্তা করি তাই সঠিক। অন্যের চিন্তা-ভাবনা সব ভুল। নিজেকে সঠিক মনে করার এ খন্নাস যতক্ষণ দূর না হবে ততক্ষণ আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। এটা দূর করতে

হলে নিজেকে এমন কারও হাতে সমর্পণ করতে হবে, যার কাছে পাওয়া যাবে ফানা হওয়ার তালিম। যেখানে ভাবনার গতি উল্টে যাবে। ভাববে, আমি যা চিন্তা করি তা ভুল, তিনি যা চিন্তা করেন তাই সঠিক। তাতে আমার চোখে তার চিন্তা-ভাবনা যতই বেঠিক মনে হোক না কেন। এমন কি দলীল-প্রমাণ ও স্পষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনারও পরিপন্থী মনে হোক না কেন। নিজেকে তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। বলতে হবে আমি সর্বাবস্থায় আপনার কথা মেনে চলব, তাতে সে কথা আমার বুঝ-বুদ্ধির যত বিপরীতই মনে হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে নিজ চিন্তা-ভাবনাকে বিলীন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকাব্বুর খতম হবে না এবং তাওয়াযূ জন্ম নেবে না।

হযরত শায়খুল-হাদীছ (রহ.)-এর নসীহত

আল্লাহ তা'আলা হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.)-কে আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমার মহান পিতা হযরত মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রহ.)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও আমার ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উছমানীকে সমবেদনা জানিয়ে দীর্ঘ একখানি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নসীহত করেন। তার মধ্যে একটা নসীহত ছিল এরকম 'আমি আমার বুযুর্গদের মুখে শুনেছি সাহেবযাদাত্বের শুয়োর (মন মস্তিষ্ক থেকে) বের হতে অনেক দিন লাগে'।

অর্থাৎ কোন বড় ব্যক্তির পুত্র হওয়ার কারণে মন-মস্তিষ্কে এক ধরনের খন্নাস জন্ম নেয়। তাকেই তিনি শুয়োর শব্দে ব্যক্ত করেছেন। এই খন্নাস হল অহমিকা। এ শুয়োর বের হয় অনেক দেরিতে। অর্থাৎ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা অল্পতেই হয়ে যায়, কিন্তু এ রোগের চিকিৎসায় সময় লাগে।

যা হোক হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.) সেই পত্রের মাধ্যমে এই রোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কিভাবে এর এলাজ হতে পারে সেই দিকে মনোযোগী হতে উৎসাহ দেন।

তারপর বলেন,

'কেউ যখন নিজেকে কারও সামনে ফানা করে দেয় এবং দলাই মলাই খায়, তারপরেই এ রোগ দূর হয়। এটা দূর না হওয়া পর্যন্ত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয় না।'

অনুরূপ জ্ঞানের শুয়োর আছে। তা হচ্ছে আমি জ্ঞানী, আমি একজন আলেম এই অহমিকা। এটাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটাও অনেক দেরিতে দূর

হয়। নিজেকে অন্য কারও সামনে ফানা করে না দেওয়া পর্যন্ত এটা বের হয় না। কারও মধ্যে এই দুই শুয়োর একত্র হয়ে গেলে তার তো মহা বিপদ। ইলম ও জ্ঞানও অর্জন করেছে আবার সাহেবজাদাত্বও আছে। এ দু'য়ের গৌরব যাকে পেয়ে বসে তার চিকিৎসা সহজ নয়। তাকে অবশ্যই কারও হাতে দলাই মলাই হতে হবে এবং নিজেকে তার পায়ে পিষ্ট করতে হবে। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو

কথা বলা ছাড়, ভাবের মানুষ হও। দলিত হয়ে যাও কোন কামেল ব্যক্তির পায়ে।

কামেল ব্যক্তির পায়ে দলিত পিষ্ট হওয়ার অর্থ হল নিজেকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং তিনি যখন যা বলেন করতে থাকা, তাতে তার কথা বুঝে আসুক বা নাই আসুক, এমনকি বোধ-বুদ্ধির পরিপন্থীই মনে হোক না কেন। সর্বাবস্থায় তার কথা এমনভাবে মেনে চলবে, যেন তোমাকে পা দ্বারা পিষ্ট করা হচ্ছে। এরকম না হওয়া পর্যন্ত মন-মস্তিষ্ক থেকে এ শুয়োর কখনও বের হওয়ার নয়। তাকাব্বুর ও অহংকার দূর হওয়ার নয়।

তাকাব্বুর যতদিন মন-মস্তিষ্কে সওয়ার থাকবে, ততদিন এর পাশাপাশি হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, গীবত, বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ সবই থাকবে। আর যখন এ ব্যাধি দূর হবে এবং বিনয় জন্ম নেবে তখন এসব রোগও চলে যাবে।

গীবতে জরিমানা

তবে তাওয়াযূ ও বিনয় রাতারাতি জন্ম নেয় না। এর জন্য মেহনত ও অনুশীলনের দরকার আছে। কামেল শায়খের সাহচর্য অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। তারপরেই এ গুণ অর্জিত হয়।

এ কারণেই হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তাওয়াযূ অর্জিত না হবে, ততদিন প্রতিটি কথা চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। যা মুখে আসবে তাই বলে ফেলবে না। তারপরও যদি কখনও গীবত হয়ে যায় তবে নিজের উপর জরিমানা আরোপ করবে। পূর্বে একটা জরিমানার কথা বলা হয়েছে। তা ছিল একবেলা না খেয়ে থাকা। এ স্থলে আরেক জরিমানার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেন যে, তাওবার নিয়তে দু'রাকআত নামায পড়ে নেবে। ইনশাআল্লাহ এভাবে ক্রমান্বয়ে রোগের অবসান ঘটবে।

কেবল আশা দিয়ে কিছু হয় না

দুনিয়ায় কোনও কাজই বিনা শ্রমে হয় না। কিছু না কিছু মেহনত করতেই হয়। কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কোনও কিছু অর্জিত হয় না।

آرزوؤں سے پھرا کرتی ہے تقدیریں کہیں

আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে কবে কোথায় ভাগ্যবদল হয়েছে? তা হওয়া কখনও সম্ভবও নয়। কোনও কিছু অর্জন করতে হলে মেহনত করতেই হবে।

হযরত থানভী (রহ.) এক দেহাতীর ঘটনা লিখেছেন যে, সে বসে বসে গ্রাম্য ভাষায় বলছিল, হত যদি এক কলসি দুধ আর হত এক জালা গুড়, সেই দুধে আঙ্গুল দিয়ে গুড় মিশিয়ে বেশ করে খেতাম। কেউ তার কাছে এসে বলল, তা হতে তো কোনও বাধা নেই, কিন্তু তোমার কাছে আছে কী? সে বলল, এই যে আঙ্গুল আছে। অর্থাৎ দুধ ও গুড় কিছুই নেই, কেবল আঙ্গুল আছে। সেই আঙ্গুলের সামর্থ্য নিয়েই তার এতটা আশা।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, ওই নির্বোধ লোকটা যেমন কেবল আঙ্গুলের পুঁজি নিয়ে এত বড় আশা করছে, তেমনি আমরাও ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির আশা নিয়ে বসে আছি, অথচ এর জন্য কোনও রকম প্রস্তুতি নেই অথচ কেবল আশা দিয়ে কিছুই হয় না। ভাই এটাও দেখুন যে, আপনার কোন মেহনত ও আমল আছে কি না। তা যদি না থাকে তবে প্রথমে সেই চেষ্টাই করুন। তবেই না এক সময় উদ্দেশ্য পূরণ হবে ও আশায় সফলতা আসবে।

প্রকৃত অক্ষম কে?

কাজেই কেবল আশা করলেই চলবে না যে, আমি যদি নেককার হয়ে যেতাম। আমি যদি মুত্তাকী হয়ে যেতাম! আমি যদি গীবত ছাড়তে পারতাম! আমি যদি সত্যবাদী হয়ে যেতাম ইত্যাদি।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ

'সেই ব্যক্তি অক্ষম, যে নিজেকে খেয়াল-খুশির অধীন বানিয়ে রেখেছে আর আল্লাহর প্রতি আশাবাদী হয়ে আছে (যে, তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। আমাকে ক্ষমা করবেন ও দয়া করবেন।'[৯৩]

---

৯৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩৮৩; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং ৪২৫০; আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৫০১

অর্থাৎ মনে যখন যা চায় তাই করে। মনের ইচ্ছামত চলে। মনের বিরুদ্ধে চলার চেষ্টা করে না। খেয়াল-খুশীকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন গরয বোধ করে না। তা সত্ত্বেও রহমত ও মাগফিরাতের আশা করে এবং মনে করে এভাবেই সে জান্নাতে চলে যাবে। এই ব্যক্তিই প্রকৃত অক্ষম। আশা তো থাকতেই হবে। কিন্তু কেবল আশাই যথেষ্ট নয়। চেষ্টাও করতে হবে। সামনে পা ফেলতে হবে। মেহনত ও সাধনার সাথে আমলে রত থাকতে হবে। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে, হে আল্লাহ! আমার যতটুকু সাধ্য ছিল তা করেছি। এখন একে পূর্ণ করা আপনার ব্যাপার। আপনি নিজ কুদরতে আমায় পূর্ণতা দান করুন। আমার চেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন।

একটু বলেই দেখুন না!

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান? না তা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা চান বান্দা আমার দিকে একটু অগ্রসর হোক। সামনে পা ফেলুক ও চলতে শুরু করুক। বান্দা যখন চলতে শুরু করবে তখন আমি নিজেই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসব। কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

'যারা আমার পথে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।'[১৪]

কাজেই দরকার একটু চেষ্টার। তা করেই দেখুন না!

হযরত থানভী (রহ.) একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি এভাবে বুঝিয়েছেন যে, একটা শিশু হাঁটা শিখছে। বাবারও ইচ্ছা ছেলে হাঁটতে শিখুক। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ডাকে, আব্বু এদিকে এসো! শিশু বাবার কাছে যেতে চায়, তাই সে দাঁড়িয়ে সেদিকে পা রাখে। যেই না আরেক পা এগিয়ে দিতে যায় অমনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম করে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছুটে যায় এবং শিশু ধরে ফেলে, তাকে কোলে তুলে নেয়। এরকমই কোন বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে চলতে শুরু করে ও পা বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার দিকে লক্ষ রাখেন। পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলে পড়তে দেন না। তাকে ধরে ফেলেন, পতন থেকে হেফাজত করেন।

একজন বাবা ও মাই যখন সন্তানের সাথে এরূপ ব্যবহার করে, তখন দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা, যিনি বাবা-মায়েরও সৃষ্টিকর্তা এবং

---

১৪. আনকাবূত : ৬৯

বাবা-মায়ের অন্তরে স্নেহ-মমতাও তিনিই দিয়েছেন, নিজ বান্দার প্রতি তাঁর ব্যবহার কী রকম হতে পারে? তিনি আদরের বান্দাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন? বস্তুত আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান বান্দা তাঁর পথে চলতে ইচ্ছুক এবং সে ইচ্ছা অনুযায়ী সে একটু চেষ্টাও করছে। অতঃপর তিনি নিজেই বান্দাকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেবেন।

গীবতের একটি চমৎকার ব্যবহারিক চিকিৎসা

অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) গীবত থেকে বাঁচার এক চমৎকার ব্যবহারিক চিকিৎসা দান করেছেন। ব্যবস্থাটি তিক্ত, কিন্তু খুবই কার্যকর। আল্লাহ তা'আলা কাউকে এ ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফীক দিলে অল্পদিনের মধ্যেই সে গীবতের রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন–

'গীবতের এক চমৎকার ব্যবহারিক চিকিৎসা হল এই যে, কারও গীবত করে ফেললে তার কাছে গিয়ে জানিয়ে দেবে যে, ভাই আমি আপনার গীবত করে ফেলেছি। নিয়মিত কিছুদিন এ ব্যবস্থা মেনে চললে ইনশাআল্লাহ এ রোগ বিলকুল খতম হয়ে যাবে।'[৯৫]

অর্থাৎ কখনও কারও গীবত করে ফেললে তাকে জানিয়ে দেবে যে, আজ আমি আপনার এই গীবত করে ফেলেছি। যখন তাকে একথা জানাবে তখন মনের উপর করাত চালু হয়ে যাবে, কিন্তু এই করাত চালু হওয়ার দ্বারাই রোগের অপারেশন হয়ে যাবে। কয়েকবার একাজ করতে পারলে ইনশাআল্লাহ রোগের শিকড় উপড়ে যাবে। তাছাড়া কেউ যখন অন্যের কাছে গিয়ে বলবে আমি আপনার এই নিন্দা করেছিলাম, তখন সেই ব্যক্তির অন্তর বিগলিত হবে। সে ভাববে লোকটি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। তা না হলে আমার কাছে এসে দোষ স্বীকার করত না। সুতরাং তাকে ক্ষমা করেই দেওয়া উচিত। অন্তর থেকে সে তাকে ক্ষমা করে দেবে। এভাবে গীবত দ্বারা যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয় এক্ষেত্রে তা সৃষ্টি হবে না আর ইতোমধ্যে কিছুটা হয়ে গিয়ে থাকলেও তা ঘুচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :
ইসলাহী মাজালিস ১ম খণ্ড, ১২১-২১২ পৃষ্ঠা

---

৯৫. আনফাসে 'ঈসা : ৫৩

অতিকথন ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

সূফিয়ায়ে কিরামের কাছে যখন কেউ নিজ ইসলাহের জন্য যেত, তারা তাকে দিয়ে চার ধরনের মুজাহাদা ও সাধনা করাতেন। (ক) আল্পাহার; (খ) অল্পকথন; (গ) অল্পনিদ্রা ও (ঘ) মানুষের সাথে অল্প মেলামেশা।

এই চার প্রকার মুজাহাদার ফলে তার স্বভাবে ভারসাম্য ও সংযম চলে আসত। ফলে খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, ঘুমানো ও মেলামেশা এ চারটি কাজে সে সংযমী হয়ে উঠত। যখন খাবার খেত সীমাতিরিক্ত খেত না, যখন কথা বলত প্রয়োজনের বেশি বলত না, সে ঘুমাতও প্রয়োজন পরিমাণ, তার বেশি নয় এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিত।

হালাল বিষয়সমূহ ছাড়ানো কেন?

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, এসব মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্রতার উদ্দেশ্য হল মনের চাহিদাকে সংযত ও ভারসাম্যমান করে তোলা। আমাদের ইচ্ছা ও চাহিদা যেহেতু অনিয়ন্ত্রিত, কোনও ক্ষেত্রে মাত্রা রক্ষা করতে পারি না, মন গুনাহের দিকে আকৃষ্ট, এর সংশোধন দরকার। দরকার চাহিদাকে সংযত করা ও প্রবৃত্তিতে ভারসাম্য আনা, আর সে জন্য কখনও কখনও হালাল জিনিসও বর্জন করতে হয়।

এক ব্যক্তি হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ তা'আলা যে সব জিনিস হালাল ও বৈধ করে দিয়েছেন, সূফি-সাধকগণ মুরীদদেরকে তা ছাড়তে বলেন কেন? আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন কেউ কি তা হারাম করার এখতিয়ার রাখে?

এর উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা এলাজ ও চিকিৎসা। তোমরা যখন চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারের কাছে যাও, তখন ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলে দেয়, তোমার ডায়াবেটিস হয়েছে, সাবধান

মিষ্টি খাবে না। দেখ, মিষ্টি খাওয়া হালাল, অথচ চিকিৎসক বারণ করছে মিষ্টি খাওয়া যাবে না। কেন বারণ করছে? এ জন্যই তো যে, তুমি অসুস্থ! মিষ্টি খেলে তোমার রোগ বেড়ে যাবে। চিকিৎসায় কোন কাজ হবে না। এক্ষেত্রে ডাক্তার মূলত হালাল খাদ্যকে হারাম করছে না; বরং চিকিৎসার্থে তা খেতে নিষেধ করেছে। এমনিভাবে শায়খ যখন মুরীদকে বলেন, কম বলবে, কম খাবে, কম ঘুমাবে এবং মানুষের সাথে মেলামেশাও কম করবে, তখন তার উদ্দেশ্য হালালকে হারাম করা নয় বরং চিকিৎসা করাই হয়ে থাকে। তিনি সাময়িকভাবে এসব জিনিস থেকে বিরত রেখে তোমার স্বভাবে ভারসাম্য আনতে চান এবং তোমাকে সংযমী বানাতে চান। কাজেই সুফিয়ায়ে কেরাম যেসব মুজাহাদা ও কৃচ্ছ্রতায় লিপ্ত করেন, তাতে আপত্তি তোলা উচিত নয়।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বিষয়টাকে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, এই যে একটা মোড়ানো কাগজ, তুমি যদি এটাকে সোজা করতে চাও সহজে সোজা হবে না। তুমি এটাকে টানটান করে ধর, তারপর ছেড়ে দাও, দেখবে যেই মোড়ানো সেই মোড়ানোই থেকে যাবে। এভাবে যত চেষ্টাই করনা কেন কোন ফল দেবে না। বাস্তবিকই যদি সোজা করতে চাও, তোমাকে অন্য পথ ধরতে হবে। তুমি এটিকে বিপরীত দিকে মুড়িয়ে দাও। তারপর ছেড়ে দাও, দেখতে সোজা হয়ে গেছে।

মোড়ানো নফস এভাবেই সোজা হয়

অনুরূপ আমাদের নফস ও প্রবৃত্তি গুনাহের দিকে মোড়ানো রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী ও গুনাহের দিকে ঝোঁকা আছে। এ কারণেই অন্তরে শুধু গুনাহের ইচ্ছা জাগে, নাফরমানীর প্রেরণা দেখা দেয়। এহেন নফসকে সোজা করতে চাইলে বিপরীত দিকে মোড়াতে হবে। এটাই তার চিকিৎসা। কাজেই প্রথমে কিছু কিছু জায়েয কাজ থেকে তাকে বিরত রাখ। কিছুদিন বিরত রাখা গেলে তার মধ্যে সংযম সৃষ্টি হবে এবং তার বক্রতা সোজা হয়ে যাবে। এ কারণেই কেউ সুফিয়ায়ে কিরামের কাছে গেলে তারা বলতেন, তুমি খাবার কম খাবে, কথা কম বলবে, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করবে এবং ঘুমাবেও কম। তুমি এই চারটি মুজাহাদা করতে থাক।

অল্পাহার ও অল্প ঘুমের হাকীকত

হযরত হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.) ছিলেন তরীকত ও সাধন পথের মুজাদ্দিদ ও একজন প্রজ্ঞাবান সংস্কারক। তিনি

বর্তমান কালের পরিবেশ-পরিস্থিতি চিন্তা করে বলেন, এখন অল্পহারের চিন্তা করো না; বরং আল্লাহ তাআলা যেমন সামর্থ্য দিয়েছেন সেই অনুযায়ী পানাহার কর। আমি তোমাদেরকে অল্পহারের মুজাহাদা করতে বলি না। এমনিভাবে অল্পঘুমের মুজাহাদাও নয়। কেননা আজকাল মানুষের শরীর আগের মত শক্তপোক্ত নয়। এখন যদি কম খাও কম ঘুমাও তবে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর অসুস্থ হয়ে পড়লে তো অল্প-বিস্তর ইবাদত-বন্দেগী যাই করছ, তাও আর করতে পারবে না। এ কারণেই আমি তোমাদের দ্বারা অল্পাহার ও অল্পনিদ্রার মুজাহাদা করাই না।

অবশ্য কম খানা ও কম ঘুমের অন্য একটা ব্যবস্থা তোমাদেরকে দিচ্ছি। এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সুফল পাবে। অল্পাহারের ব্যবস্থাটি এরকম, খানা খাওয়ার সময় প্রত্যেকেরই এক সময় এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যে আরও খাব কি না। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যখন দেখা দেবে তখন খানা ছেড়ে দেবে, বাড়তি আর খাবে না। এ নিয়মে খেলে ইনশাআল্লাহ তা'আলা অল্পাহারের বরকত হাসিল হয়ে যাবে এবং চিকিৎসরা যেমন বলে থাকেন, কখনও আহারজনিত অসুস্থতায় ভুগবে না।

এমনিভাবে কম ঘুমানোর যে মুজাহাদা আগেকার লোকে করত এখনও যদি সেই রকম করানো হয়, তবে আগের মত সুফল তো পাওয়া যাবেই না, উল্টো মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। আগে তো চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র এক ঘন্টা ঘুমের সুযোগ দেওয়া হত। আজকাল কেউ তা করলে পাগল হয়ে যাবে। মস্তিষ্কে গণ্ডগোল দেখা দেবে। ফলে অল্প-বিস্তর যে আমল হত, তাও আর করা সম্ভব হবে না।

এ কারণেই হযরত থানভী (রহ)- বলেন, এখন আর সে মুজাহাদা করা ঠিক হবে না, বরং নিজ স্বাস্থ্য অনুযায়ী স্থির করে নাও দৈনিক কত ঘন্টা ঘুমাবে। ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা যাই হোক। তবে আট ঘন্টার বেশি নয়। সময় স্থির করে নেওয়ার পর তার বেশি ঘুমাবে না। এখনকার জন্য এটাই অল্পনিদ্রা। হযরত থানভী (রহ.) বর্তমানকালের জন্য অল্পাহার ও অল্প নিদ্রার মুজাহাদা সম্পর্কে এরূপ পরামর্শ দিয়েছেন।

তরীকতের প্রথম কদম অল্পকথন

এ ছাড়া আরও দু'টি মুজাহাদা বা সাধনপন্থা আছে। একটি হল অল্প কথা বলা আর দ্বিতীয়টি অল্প মেলামেশা করা।

অল্পকথার মুজাহাদা খুবই জরুরি। নিজ জিহ্বাকে সংযত না করা পর্যন্ত কারও পক্ষে তরীকতের পথে অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। আমাদের মুখ কাঁচির মত চলছে। কোনও বাধা-বন্ধন নেই। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মুখে যা আসে অবাধে বলে দিচ্ছি। এ অবস্থা তরীকতের সাথে যায় না। কাজেই তরীকতের পথে প্রথম কদম হল নিজ রসনাকে সংযত করা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মুখে এই যে গোশতের টুকরা বসিয়ে দিয়েছেন, এটা এক বিরাট নি'আমত। জন্ম থেকে এ মেশিন কাজ শুরু করেছে, মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চালিয়ে যায়। এর পেছনে কোন খরচ নেই। না তেল-মবিল দরকার হয়, না সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন পড়ে। এর কোন ওভারহোলিংয়ের দরকার হয় না। এবং কোন পার্টস পরিবর্তনেরও প্রয়োজন পড়ে না। বিলকুল মুফ্ত কাজ করে যাচ্ছে। যেমন মুফ্ত পাওয়া গেছে, তেমনি নিঃখরচায় সার্ভিস দিচ্ছে।

এর কাজও কত সচ্ছন্দ ও স্বয়ংক্রিয়! মাথায় একটা ভাবনা জাগে, তা ব্যক্ত করতে ইচ্ছা হয়, অমনি মেশিন চলতে শুরু করে। মনের সে ভাবনা জবান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে আর মানুষ শুনতে পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা মস্তিষ্ক ও রসনার মধ্যে কি বিস্ময়কর যোগাযোগ স্থাপিত করে দিয়েছেন। আমার মাথায় যে ভাবনা আছে। তা শব্দে রূপায়িত হয়ে রসনার মাধ্যমে অন্যের মস্তিষ্কে পৌছে যায়। ভাবনাকে শব্দে রূপান্তরিত করার জন্য রসনার যে বহুমাত্রিক ভঙ্গি, তা কি আপনার নিজের সৃষ্টি? আপনিই কি স্থির করে নিয়েছেন যে, আমি আমার জিহ্বাকে এরূপ ভঙ্গি দেব ফলে এই হরফ উচ্চারিত হবে আর ওইরূপ ভঙ্গি দেব তো ওই হরফ উচ্চারিত হবে? এই শব্দ ও ভাষা, যা দ্বারা নিজ মনের ভাব প্রকাশ করেন, তা কি আপনিই সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি এবং তিনিই নিজ অপার শক্তি ও অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা প্রথমে মস্তিষ্ককে শিক্ষাদান করেছেন, তারপর জিহ্বাকে মস্তিষ্কের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে মস্তিষ্ক তাকে যখন যে নির্দেশনা দান করে সেইমত সে কাজ করতে থাকে, ফলে শব্দ ও ভাষা প্রকাশ লাভ করে।

মস্তিষ্ক ও রসনার মধ্যে যোগাযোগ

মস্তিষ্ক ও রসনার মধ্যে যদি ছেদ থাকত মানুষ মনোভাব প্রকাশের এ মহানি'আমত থেকে বঞ্চিত থাকত। মনে করুন মস্তিষ্কে একটা ভাবনা আসল, এখন তা মুখে প্রকাশ করতে হলে কোন বোতামে টিপ দিতে হবে। এর ফলে

মস্তিষ্ক ও রসনার মাঝে মুহূর্তের বিরতি যাবে। সেই বিরতির পরই হরফ ও শব্দ রূপ পাবে। যেমনটা মানবসৃষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহারে হয়ে থাকে। ভাবুন দেখি, মুখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে এরূপ যান্ত্রিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হলে কী মহা মসিবতই না ভুগতে হত। তখন আর কারও কথা বলতে হত না এবং কথা বলার দ্বারা দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে তার কিছুই ঘটানো সম্ভব হত না। আল্লাহ তা'আলা কতই না মেহেরবান। তিনি মুখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে এমনই যোগাযোগ স্থাপিত করে দিয়েছেন যে, একদিকে মস্তিষ্কে কোন ভাবনা জাগে অন্যদিকে তা মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায়। এর জন্য কোন বোতাম টিপতে হয় না এবং অন্য কোনও মেহনতও করতে হয় না।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ওয়েষ্ট ইন্ডিজের একটা দ্বীপের নাম বারবাডোম। একবার সেখানে সফর হয়েছিল। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার জিহ্বা আছে এবং তা রীতিমত নড়াচড়াও করেছে, কিন্তু কোন কথা বলতে পারছে না। তার কণ্ঠনালিতে এমন এক রোগ দেখা দিয়েছে, যদ্দরুন জিহ্বা নাড়াচড়া সত্ত্বেও কোনও শব্দ বের হচ্ছিল না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাকে একটি যন্ত্র দেওয়া হয়। সেটি সর্বদা তার হাতে থাকত। যখন সে কোনও কথা বলতে চাইত, সেটি তার কণ্ঠনালিতে সজোরে চেপে ধরত। যা বলতে চাইত সেই যন্ত্র দিয়ে বের হয়ে আসত। কিন্তু যে আওয়াজ বের হত সুখশ্রাব্য ছিল না। মনে হত কোন জন্তু আওয়াজ করছে। বাচ্চারাও শুনে হাসাহাসি করত। তবে এর মাধ্যমে সে কোনও মতে নিজের কথা অন্যকে বোঝাতে সক্ষম হত।

আমি তার যে কষ্ট ও অস্থিরতা দেখছিলাম তা ভোলার নয়। তার মাথায় যখন কোন কথা বলার ইচ্ছা জাগত সাথে সাথে বলতে পারত না। তা বলার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হত। সেটি লাগানোর পরই আওয়াজ বের হত, মাথায় কোন ভাবনা আসা ও মুখ দিয়ে তা বলার মাঝে যে ছেদ পড়ত সেই সময়টুকু বড় অস্থিরতার সাথেই তাকে পার করতে হত।

আমরা অগণ্য নি'আমতের মালিক

বিনা খরচ ও বিনা মেহনতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুফতে এসব নি'আমত আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। তাই আমাদের কাছে এর কোন কদর নেই। তিনি আমাদেরকে মুখ দিয়েছেন। তার ভেতর জিহ্বা বসিয়ে দিয়েছেন। তাকে বাকশক্তি দিয়েছেন। কণ্ঠনালিতে আওয়াজ দিয়েছেন।

মস্তিষ্কের সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত করে দিয়েছেন। যখন যে শব্দ বলতে চাই, সাথে সাথে বলতে পারি। তাই জবানের কোন মূল্য বুঝি না। আল্লাহ্ তা'আলা হেফাজত করুন, এর মধ্যে কোন একটিও যদি বিকল হয়ে যায়, কোনও একটিতেও যদি কোনওরূপ ত্রুটি দেখা দেয়, তখন বোঝা যাবে এটা কত বড় নি'আমত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অংশে, প্রতি জোড়ায়-জোড়ায় নি'আমতের এক একটা জগত গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এই রসনাও তার একটি।

এ নি'আমত যেন গুনাহের কাজে ব্যবহৃত না হয়

কুরআন মাজীদে বার বার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। তা দ্বারা এই অসংখ্য নি'আমতের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুধাবনেরই আহ্বান জানানো উদ্দেশ্য। এই যে সরকারি মেশিন মুখের ভেতর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহর কত বড়ই না দান আমরা এটি অবিরত ব্যবহার করছি। কখনও চিন্তা করারও গরজ বোধ করছি না কী নি'আমত তিনি দিয়েছেন। চিন্তা করুন। এর কদর বুঝুন। তো আল্লাহ যখন আমাদের কোনও রকম কষ্ট-শ্রম ও অর্থব্যয় ছাড়াই কেবল নিজ অনুগ্রহে এটা আমাদের দান করেছেন, তখন আমাদের কর্তব্য এর যথাযথ হেফাজত করা, সঠিক ব্যবহার করা এবং কোনও গুনাহের কাজে একে না লাগানো।

আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যম

এ যন্ত্রটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এর মাধ্যমে আখিরাতের বিপুল পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব। মুখে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলুন, তাতে আমলের তুলাদণ্ড পূর্ণ হয়ে যাবে। একবার আলহামদুলিল্লাহ বলুন, পুণ্যের স্তূপ গড়ে উঠবে। আল্লাহ তা'আলার যে-কোনও যিক্‌র দ্বারা জিহ্বাকে সজীব রাখতে পারলে রাশিরাশি পুণ্য সঞ্চয় হয়ে যাবে। আখিরাতের অকল্পনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করলে কতই না ছওয়াব! এক এক হরফে দশ-দশ নেকি। কেবল 'আলিফ-লাম-মীম' পড়লেই আমল নামায় ত্রিশ নেকি লিখে দেওয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলার রহমত দেখুন– এ মেশিন তিনিই দিয়েছেন। এর শক্তি তাঁরই দান। তিনিই শব্দ ও ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর তাওফীকেই মুখ দিয়ে তা উচ্চারিত হয়। এই কালামও তিনিই নাযিল করেছেন। পবিত্র কালাম কত বড়ই না নি'আমত। এর নাযিল কারাটাই এক বিশাল নি'আমত।

তারপর আবার বলা হচ্ছে, এর শব্দে-শব্দে তোমাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমার প্রদত্ত যন্ত্র দ্বারা যদি তুমি আমার নাযিলকৃত কালাম পড়, নেকিতে নেকিতে তোমার আমলনামা ভরে দেব। তাঁর রহমতের কি কোনও সীমা পরিসীমা আছে?

জবান জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

সুতরাং জবানের সঠিক ব্যবহার করুন। করতে পারলে এর মাধ্যমে আপনার জান্নাতের অট্টালিকা গড়ে উঠতে পারে। একে আল্লাহর যিকরে রত রাখুন। এ জবান আপনার আখিরাতের জীবন নির্মাণ করছে। আপনাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদানের আয়োজন করছে। সত্তর বছরের একজন কাফেরও যদি খাঁটি মনে উচ্চারণ করে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তবে সেই মুহূর্তে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে পৌছে যায়। ছোট্ট এই জবান কতবড় কাজই না করছে। মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করছে। তাকে জান্নাতে পৌছাচ্ছে। জান্নাতে পৌছার আসবাব সঞ্চয় করছে। আখিরাতের রাশি-রাশি নি'আমত সংগ্রহ করছে।

জবান জাহান্নামে যাওয়ারও কারণ

এই জবানের সৃষ্টিকর্তা ও এর মালিক আমাদের কাছে কেবল এতটুকুই চান যে, আমরা যেন এর সতর্ক ব্যবহার করি এবং কোনও গুনাহের কাজে একে না লাগাই। কেননা একে গুনাহের কাজে ব্যবহার করা হলে পরিণামে জাহান্নামে যেতে হবে। সে হিসেবে এরচে' বিপজ্জনক জিনিসও আর নেই।

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষকে জাহান্নামে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবে সর্বাপেক্ষা বেশি যে জিনিস, তা তার জিহ্বা।[৯৬]

এই রসনা মানুষকে অতি দ্রুত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেউ মিথ্যা বললে তার শাস্তি জাহান্নাম, গীবত করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, কারও মনে

৯৬. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৪১; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৯৬৩; আহমাদ, হাদীছ নং ২১০০৮

আঘাত দিয়ে কথা বললে তার শাস্তি জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলার বিধান-বিরোধী যে কথাই মুখ থেকে বের হবে তা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কাজেই আপনাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ-জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, এর অপব্যহার করো না। সাবধান থেক, কোন অনুচিত কথা যেন মুখ দিয়ে বের না হয়ে যায়।

জবান দিয়ে গীবত

কিন্তু মানুষ তা ভুলে যায়। তার মনে থাকে না যে, কি মহা নি'আমত আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছেন। চিন্তা করে না কে এটা দিয়েছেন এবং কি কাজের জন্য দিয়েছেন। তারই পরিণাম– সে দিবারাত্র সর্বক্ষণ জবানের নির্বিচার ব্যবহার করছে। মনে করে আমি ভালো কাজ করছি।

ধরে নিলাম জায়েয কাজেই ব্যবহার করছে। কিন্তু জায়েয কাজেও জবানের নিশ্চিন্ত ব্যবহার সর্বদা সুফল দেয় না। অনেক সময়ই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উদাহরণত আপনি আপনার পরিচিত এক ব্যক্তির প্রশংসা করছেন যে, সে বড় ভালো লোক। নিয়মিত নামায-রোযা করে। আপনি তো প্রশংসাই করছেন। কিন্তু মাঝখানে শয়তান একটু জোড়া লাগিয়ে দিল যে, এমনিতে লোকটি বেশ ভালো, কিন্তু একটু নির্বোধ কিসিমের। এই যে একটা কিন্তু শব্দ জুড়ে দিলো, এটা সব প্রশংসায় জল ঢেলে দিল। প্রশংসাকে গীবতে পরিণত করল। যে সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর।'[৯৭]

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখুন

মূলত মানুষ যখন কথা বেশি বলে, তখন জিহ্বা মাঝে মধ্যে পিছলে যায়। সর্বদা সীমার মধ্যে থাকতে পারে না। এ কারণেই সূফী-সাধকগণ বলেন, নিজ রসনা নিয়ন্ত্রণে রাখ আর সে লক্ষে কথাই কম বল। কথা কম বললে

৯৭.শুআবুল- ঈমান, ৫খ, ৩০৬, হাদীছ নং ৬৭৪১; কাশফুল-খাফা, ২খ, ৮১ পৃ. হাদীছ নং ১৮১২, কানযুল-'উম্মাল, ৩খ. ৫৮৬ পৃ হাদীছ নং ৮০২৬; মাজমা'উয-যাওয়াইদ, ৮ খ, ৯১ পৃ.

পিছলে যাওয়ার অবকাশই আসবে না। জবান স্লিপ এজন্যই কাটে যে, তা সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কাঁচির মত চলছে। কোনও বাধা নেই, কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। বুযুর্গানে দীনের সাহচর্য যারা পায়নি, তাদের মাথায় বাক সংযমের কোনও চিন্তাই আসে না। হাটে-বাজারে গিয়ে দেখুন কিভাবে মানুষ নির্বিচারে কথা বলছে। তাদের কেউ কি একটুও চিন্তা করে যে, জবানকে সংযত করা উচিত? কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই। অবিরাম বলে যাচ্ছে।

অপ্রয়োজনে কথা বলো না

এ অবস্থার বদল জরুরি। তা কিভাবে বদলানো যাবে? বদলানো যাবে মুখের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ দ্বারা। আর সেজন্যই সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, কথা কম বলো। কেবল প্রয়োজনের সময় বলো। প্রয়োজন না পড়লে বলো না। চুপ থাক। বুযুর্গানে দীন বলেন, প্রথমে কথাকে দাঁড়িপাল্লায় তোল। তারপর বলো। পরিমাপ করে কথা বলার অভ্যাস তখনই হতে পারে, যখন মানুষ প্রথমে কথা কম বলার অভ্যাস গড়বে। মনে কথা বলার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু বলার প্রযোজন আছে কি না চিন্তা করে দেখ। প্রয়োজন থাকলে বল। নয়ত চুপ থাক।

হযরত মিয়া সাহেবের ঘটনা

সায়্যিদ আসগার হুসায়ন সাহেব (রহ.) এক অসাধারণ বযুর্গ ছিলেন, তিনি মিয়া সাহেব নামে পরিচিত। তিনি আমার মহান পিতা মুফ্তী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর একজন উস্তায। আমরা তার বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা শুনেছি। আমার পিতার সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কে ছিল। আব্বাজী বলেন, আমি একবার তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তিনি আমাকে বললেন, মওলভী শফী'! আজ আমরা আরবীতে কথা বলব। আমি অবাক হলাম যে, সারা জীবনে কখনও আরবীতে বলেননি। বলার অভ্যাসও নেই এবং কখনও এর চর্চাও করেননি। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হযরত তা কেন? উত্তরে বললেন, আসল ব্যাপার হল, আমরা যখন নিজেদের ভাষায় কথা বলি, জবানের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যা ইচ্ছা বলতে থাকি। এর ফলে অতিকথনে লিপ্ত হয়ে যাই। আর আরবীর ভালো চর্চা না আমার আছে, না তোমার, তাই আরবীতে কথা বললে কেবল প্রয়োজনীয় কথাই বলা হবে এবং তাও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আরবীতে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা মুখে আসবেই না।

আমাদের দৃষ্টান্ত

অতঃপর হযরত মিয়া সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন, আমাদের দৃষ্টান্ত হল এমন কোনও ব্যক্তি, যে বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে বের হল। প্রথমদিকে সে যথেচ্ছ উড়াতে শুরু করে দিল। এটা কেনে, ওটা কেনে, যা দেখে তাই খায়। এক পর্যায়ে টাকা নিঃশেষ হতে চলল, হাতে সামান্যই অবশিষ্ট আছে। অথচ গন্তব্যস্থল এখনও বহু দূরে। এ অবস্থায় সে খুব সতর্ক হয়ে যাবে। সামান্য যাই আছে খুব চিন্তা-ভাবনা করে খরচ করবে, যাতে গন্তব্যস্থলে পৌছার আগেই পকেট খালি না হয়ে যায়।

জায়েয কথাও অপ্রয়োজনে বলব না

আমাদের অবস্থাও এরকমই। আমরা আমাদের জীবনের বৃহৎ অংশে জবানের নি'আমতকে উল্টা-পাল্টা খরচ করে ফেলেছি। অহেতুক নষ্ট করে ফেলেছি। খবর নেই জীবনের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে। তাই এখন একটু চেষ্টা করি যাতে ভবিষ্যতে এ নি'আমতের সঠিক ব্যবহার করতে পারি, আর কখনও এর অপচয় ও অপব্যবহার না হয়ে যায়। বস্তুত এটাই অল্পকথনের উদ্দেশ্য।

কথাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার পন্থা হল প্রথমে কথা খুব কমিয়ে দেওয়া। এমন কি বৈধ কথাও অপ্রয়োজনে না বলা। ক্রমে যখন অল্প বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং স্বভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় মুখ থেকে যে কথাই বের হবে তা সঠিকই বের হবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে বের হবে।

স্বভাবে যখন ভারসাম্য এসে যায় এবং ব্যক্তি মিতবাক্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন জবান থেকে যে শব্দই বের হয় তা যথার্থরূপে একদম মাপমত বের হয়। এক সুতা এদিক-ওদিক হয় না, কোনও রকম অতিরঞ্জন হয় না। কারও প্রশংসা করা হলে তাতে মাত্রা হারায় না এবং উচিৎ নিন্দার ক্ষেত্রেও সীমালংঘন হয় না।

নতুন প্রজন্মের তো কোনও ভাষায়ই দখল নেই

কেউ কেউ হযরত থানভী (রহ.)-এর লেখা পড়ে মন্তব্য করে যে, তিনি খুব কঠিন-কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন, যদ্দরুন কখনও কখনও তার বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, হযরত (রহ.) যে সময়ে

এসব কিতাব লিখেছেন বা এসব বক্তব্য দিয়েছেন, তখনকার মানুষের অবস্থা আজকালকার মত ছিল না। বর্তমান প্রজন্মের ভেতর বহু লোক এমনভাবে গড়ে উঠছে যে, কোনও ভাষাতেই তাদের দখল নেই। তারা বাংলা আরবী উর্দু, ইংরেজি কোনও ভাষাই ভালো জানে না। এখনকার গ্রাজুয়েট ও এম. এ. পাশ লোকে কথা বলে জগাখিচুরি ভাষায়। উচ্চারণ ভুল করে। শব্দ প্রয়োগ জানে না। বাক্য কি বলছে তার খবর নেই। আমার কাছে ভালো-ভালো শিক্ষিত লোকের এমন চিঠিও আসে, যার ছত্রে-ছত্রে ভুল। এভাবে যে প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, তারা কোনও ভাষাই বিশুদ্ধভাবে জানে না। আল্লাহ তা'আলা রহম করুন।

তো যে যমানায় হযরত থানভী (রহ.) লেখাজোখা করতেন ও বয়ান দিতেন, তখন তো আম-সাধারণও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিল, সেকালের মডেল পাশ লোকদের চিঠিপত্র খুলে দেখুন, তারা তাতে এমন বহু আরবী শব্দ ব্যবহার করত, যা ইদানিংকার বি. এ, এম. এ পাশ লোকেও বুঝতে পারে না। এখন কেউ যদি বলে, আজ এক জেয়াফতে আমার দাওয়াত ছিল, তবে অন্য লোক বলবে, তুমি বাংলা বলছ, না আরবী? যদি বলে, আজ এক ফাংশনে আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে, তবে বলবে, হ্যাঁ এই তো বাংলা হল। এমনই আমাদের দশা। যেন জেয়াফত ও দাওয়াত শব্দ বাংলায় অপাঙক্তেয় ও কঠিন, কিন্তু ফাংশন ও ইনভায়েট বেশ সহজ ও শোভনীয়। এ কারণেই লোকে বলতে শুরু করেছে, হযরত থানভী (রহ.)-এর বয়ান ও লেখায় খুব কঠিন-কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ভাষা অত্যন্ত মাপাজোখা হয়ে থাকে। শিক্ষিত লোক তার বক্তব্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখবে তা এমনই পরিমিত যে, কোথাও কোনও বাড়তি শব্দ নেই, আবার প্রয়োজনীয় শব্দের ঘাটতিও নেই। এ কারণেও নিজ বক্তব্যকে সীমারেখার মধ্যে রাখার জন্য অনেক সময় তাকে কঠিন শব্দও ব্যবহার করতে হয়, যখন পরিমাপমত কোন সহজ শব্দ খুঁজে পাওয়া না যায়। এভাবে কথাকে সীমার ভেতর রাখার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান থাকেন।

হযরত থানভী (রহ.)-এর একটি বাণী

আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)-এর একটা বাণী মাঝে-মধ্যেই শোনাতেন। তিনি বলেন, 'খোদরায়ী (স্বমতচারিতা) অনেক বড় মসিবত'। অর্থাৎ সর্বদা নিজ মতের উপর

অস্থাশীল থাকা, কেবল নিজ মতের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এক কঠিন আপদ। গুরুত্বপূর্ণ সব কাজেই প্রথমে পরামর্শ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, নিয়মতান্ত্রিক বড় কেউ যতক্ষণ থাকে, তার সাথে মশোয়ারা করো। দেখুন তিনি এমন বলেননি যে, যতক্ষণ বড় কেউ থাকে, ততক্ষণ তার সাথে মশোয়ারা করো। বরং 'নিয়মতান্ত্রিক' শব্দও যোগ করেছেন। অতঃপর নিজেই এ শব্দ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেন, নিয়মতান্ত্রিক বড়' এই জন্য বলেছি যে, প্রকৃত বড় কে তা তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান সেই, যে বেশি মুত্তাকী।'[৯৮]

আল্লাহ তা'আলা যাকে ক্ষমা করেন, তিনি যার প্রতি খুশি হন, বড় তো সেই। কেবল বয়সে বড় বা পদ ও সম্পর্কে বড় হলেই সে প্রকৃত বড় হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। হাঁ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী কাউকে বড় ও কাউকে ছোট বানিয়ে দিয়েছেন। সেটা কেবলই পার্থিব ব্যাপার, যেমন পুত্র অপেক্ষা পিতা এবং ছাত্র অপেক্ষা শিক্ষক বড়। এ দৃষ্টিতেই হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক বড় কেউ থাকে, ততক্ষণ তার সাথে পরামর্শ করবে। আর সে রকম বড় কেউ না থাকলে সমপর্যায়ের লোকের সাথে পরামর্শ করবে আর তাও না থাকলে নিজের চেয়ে যারা ছোট তাদের সাথেই পরামর্শ করবে।

স্বভাবে ভারসাম্য থাকলেই মুখে এমন কথা আসে

আমি-আপনি যদি কাউকে এ কথা বলি, তখন কেবল এতটুকুই বলি যে, বড়দের সাথে পরামর্শ করো। কিন্তু হযরত থানভী (রহ.)-এর মুখ থেকে কথাটি এভাবে আসেনি। কেননা অন্যকে বড় বললে তা تزكية على الله বা খোদার উপর খোদকারি হয়ে যায়। কেননা প্রকৃত বড় কে তা তো আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাই তিনি একটা শব্দ যোগ করে বলেছেন, নিয়মতান্ত্রিক বড়দের সাথে পরামর্শ করো।' আল্লাহ তা'আলা যখন কারও স্বভাবে ভারসাম্য ও সংযম দান করেন, তখন তার মুখ ও কলম থেকে যে শব্দই বের

---

৯৮. হুজুরাত : ১৩

হয়, তা যথার্থই বের হয়। এক সুতা এদিক-ওদিক হয় না। কিন্তু আমাদের সে রকম হয় না। আমরা যখন লিখি আবেগে উচ্ছ্বসিত হই। তাই লেখায় বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যখন বলি তাতেও একই অবস্থা। তা হওয়া উচিত নয়। এজন্য ভেবে-চিন্তেই লেখা বা বলা উচিত।

বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি, সে দিকে নজর রাখুন

এ লক্ষে সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, কথা কম বলো। কেউ তরীকতের পথে যাত্রা শুরু করলে প্রথমেই তাকে এ কাজ করতে হয়। কথা কম বলতে হয়। সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

'যে-কোনও ইচ্ছাধীন কথা বা কাজ কোনও না কোনও উদ্দেশ্যেই নিষ্পন্ন হয়। কাজেই প্রতিটি কথা ও কাজের শুরুতে চিন্তা করতে হবে এর উদ্দেশ্য কী? যে কথা বা কাজের কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, তা ফযূল। যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু তা উপকারী না হয়, তাও ফযূল। আর উদ্দেশ্য যদি হয় ক্ষতিকর, সে ক্ষতি নিজের হোক বা অন্যের, তবে সে কথা ও কাজ ক্ষতিকরই গণ্য হবে।'[৯৯]

অর্থাৎ– যখনই কোন কথা বল, মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে নাও যে, আমি যে কথা বলতে যাচ্ছি তার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, শরীআত মোতাবেক হয়, তবে তা বলো। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি সঠিক না হয় এবং শরী'আত মোতাবেক না হয় কিংবা সে কথার দুনিয়াবী বা পরকালীন কোন ফায়দা না থাকে, তবে তা ফযূল ও নিরর্থক কথা। সুতরাং অহেতুক নিজ রসনাকে সে কথায় লিপ্ত করো না। বরং থেমে যাও ও সে কথা ছেড়ে দাও। এটা রাতারাতি হবে না। এর জন্য অনুশীলন ও সাধনার দরকার আছে। স্থির করে নাও যে, মুখের গলদ ব্যবহার করব না; বরং এ ব্যাপারে সংযমী হবে এবং জবানকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কেউ যখন আল্লাহর জন্য নিজের কাজকর্ম সংশোধনে বদ্ধপরিকর হয়, এবং সে লক্ষে কাজ শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

হযরত থানভী (রহ.) এ আয়াতের তরজমা করেন, 'যারা আমার পথে চেষ্টা করে আমি তাদের হাত ধরে আমার পথে চালিয়ে নেই।'[১০০]

---

৯৯. আনফাসে 'ঈসা, পৃ. ১৮৬

১০০. আনকাবূত : ৬৯

তিনি বলেন, এখানে 'হিদায়াত' দ্বারা 'পথ দেখানো' নয়; বরং 'গন্তব্যস্থলে পৌছানো' বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হাত ধরে লক্ষস্থলে পৌছে দেওয়া। তবে এর জন্য ইচ্ছা করতে হবে এবং সামনে পা ফেলতে হবে। অতঃপর কী করতে হবে তা তিনিই বুঝিয়ে দেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করছিলেন। মক্কাবাসীদের ঘোষণা ছিল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। চিন্তা করে দেখুন আজও একশ' উটের কত দাম! সে কালে তো অন্য কোনও জানবাহন ছিল না।

মরুভূমির দেশে এটাই ছিল পথিকজনের একমাত্র বাহন। তখন এর দাম কত বেশি হয়ে থাকবে! এত বড় পুরস্কারের ঘোষণা। চারদিকে টিকটিকি পড়ে গিয়েছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যেভাবে সম্ভব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন। পথিমধ্যে পুরানো এক পরিচিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। সে অন্য অঞ্চলের লোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) একজন ব্যবসায়ী এবং জনপ্রিয় লোক ছিলেন, যে কারণে মানুষজনের সাথে তার অনেক চেনাজানা ছিল। যা হোক সেই ব্যক্তি তাঁর দেখা পেয়ে খুব খুশি হল। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথে ইনি কে? সে যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত না তাই এ জিজ্ঞাসা। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) পরিষ্কার জানাতে পারতেন ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্ কিন্তু তাতে বিপদের আশংকা ছিল। কারণ তাঁর মাধ্যমে এ সংবাদ শত্রু পর্যন্ত পৌছাতে পারত। কিন্তু উত্তর তো একটা দিতে হবে। সে সরাসরিই জানতে চাচ্ছিল। অন্য কিছু বললে মিথ্যা হয়ে যাবে। তিনি তো সিদ্দীকে আকবার– মহান সত্যনিষ্ঠ। মিথ্যা বলা তো দূরের কথা, মিথ্যা বলা কল্পনাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মনে মনে দু'আ করে থাকবেন, যাতে তিনি এ সঙ্কট থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য আসল। তিনি উত্তর দিলেন, "তিনি একজন পথ প্রদর্শক। আমাকে পথ দেখান।" কী তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর! তিনি তো পথপ্রদর্শকই! মানবতার

মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারী। হযরত সিদ্দীকে আকবার সেটাই জানাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা মনে করেছে তিনি যে পথে চলছেন তা তার অচেনা। তাই পথ চেনে এমন একজনকে সঙ্গে নিয়েছেন। ব্যস তার দিক থেকে আর কোন আশংকা থাকল না। তা সে যা-ই বুঝুক তিনি তো আর মিথ্যা বলেননি! সত্যই বলেছেন এবং তাতে একটা শব্দও সীমার বাইরে যায়নি। কেউ যখন নিজেকে আল্লাহ তা'আলার তাবেদার বানিয়ে দেয়, তখন কোথায় কি বলতে হবে তার নির্দেশনা তাঁর পক্ষ থেকেই পাওয়া যায়।

মিথ্যা পরিহার ও হযরত নানূতবী (রহ.)

বিশ্বখ্যাত দারুল-উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর ঘটনা। তিনি ১৮৫৭ খৃ. এর স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে যায়। সরকার প্রতিটি চৌরাস্তায় ফাঁসি লটকিয়ে রেখেছিল। আসামী ধরতে পারলেই তাতে ঝুঁলিয়ে দিত। সুতরাং পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তিনি দেওবন্দের ছাত্তা মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তার পরিধানে ছিল লুঙ্গি ও মামুলি জামা। দেখলে কারও মনে হত না তিনি একজন বড় 'আলেম। পুলিশের লোক খুঁজতে খুঁজতে ছাত্তা মসজিদে পৌছে গেল। তাদের তো ধারণা ছিল এত নাম-ডাক ওয়ালা মানুষ নিশ্চয়ই বড় কোন আলেম হবেন এবং খুব দামী পোশাক-আশাক হবে আর তাঁর শানই হবে অন্য রকমের। কিন্তু হযরত মাওলানা (রহ.) তো লুঙ্গি পরে মসজিদের ভেতর বসা ছিলেন। তারা ভাবতেও পারেনি ইনিই হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.)। ভাবছিল মসজিদের কোন খাদমে হবে। কাজেই তাকেই জিজ্ঞেস করল, মাওলানা কাসেম সাহেব কে? হযরত মাওলানা (রহ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খানিকটা সরে গিয়ে বললেন, এইমাত্র তো এখানে ছিলেন। যদি বলতেন, আমিই কাসেম, তবে তো গ্রেপ্তার হতে হবে। আবার মিথ্যা বলাও সম্ভব নয়। উভয় সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করলেন। মাথায় এমন এক উত্তরই পয়দা হয়ে গেল যা একদম মিথ্যা ছিল না। আবার গ্রেপ্তারও হতে হল না। সত্য বটে, খানিকটা আগে তিনি তো ইশারায় দেখানো সেই স্থানেই ছিলেন। পুলিশ মনে করল তিনি মসজিদ থেকে কোথাও সরে পড়েছেন, কাজেই তারা এদিক-ওদিক খুঁজে দেখার জন্য ওয়াপস চলে গেল।

মিথ্যা পরিহার ও হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে 'আদালতে হাজির করা হয়। মেজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখার অভিযোগ আছে। বলুন, আপনার কাছে কি অস্ত্র আছে? বস্তুত তাঁর কাছে অস্ত্র ছিলও। তিনি তা মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন যদি বলেন অস্ত্র নেই মিথ্যা বলা হয়, যদি স্বীকার করেন আছে, তবে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। অথচ এরূপ বিপজ্জনক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলারও অনুমতি আছে। কিন্তু তারপরও তিনি তা বলতে প্রস্তুত ছিলেন না। হযরতের হাতে তাসবীহ ছিল। তিনি সেই তাসবীহ উঁচিয়ে ধরে বললেন, আমার কাছে এই আছে। এই কথাবার্তা চলছিল। এমনি মুহূর্তে সেখানে এক দেহাতি উপস্থিত। মেজিস্ট্রেটকে লক্ষ করে বলল, তোমরা এই কাকে ধরে এনেছ। ইনি তো আমাদের মসজিদের মুআজ্জিন। মেজিস্ট্রেট যখন দেখল তিনি হাতে তাসবীহ ঘোরাচ্ছেন আবার দেহাতিও বলছে, তিনি একজন মুআজ্জিন, অগত্যা তাকে খালাস দিয়ে দিল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য হয়।

সারকথা, কেউ যখন সংকল্প করে ফেলে, আমি আল্লাহ প্রদত্ত এ মেশিনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করব, আল্লাহ তা'আলার মরজি মোতাবেক ব্যবহার করব, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্যও পাওয়া যায়। কাজেই নিজের পক্ষ থেকে সংকল্প করুন এবং কাজ শুরু করে দিন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাহায্য লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ আলোচনা অনুযায়ী কাজ করার তাওফীক দিন– আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :
ইসলাহী মাজালিস ৫ম খণ্ড, ৪৮-৭২ পৃষ্ঠা

ওয়াসওয়াসা ও তার এলাজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

'আনফাসে 'ঈসা' শীর্ষক গ্রন্থখানি বহু বিষয় সম্বলিত একখানি পূর্ণাঙ্গ রচনা। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে হযরত থানভী (রহ.)-এর বহু বাণী ও বক্তব্য এতে সন্নিবেশিত। এটি আগাগোড়া পড়ে ব্যাখ্যাদান করা সহজ কাজ নয়। তাই কোন নির্বাচিত অংশ পড়ে তার ব্যাখ্যা পেশ করছি, যাতে বিশেষ দরকারি কথাগুলো সামনে এসে যায়।

ওয়াসওয়াসার প্রতিকার হল ভ্রুক্ষেপ না করা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, ওয়াসওয়াসার একমাত্র এলাজ হল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। এই ভ্রুক্ষেপ না করা বা অগ্রাহ্য করাকে যে এলাজ হিসেবে গ্রহণ করবে তা একে গৌন উদ্দেশ্য মনে করে নয়; বরং একে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করবে, তাতে এর ফলে ওয়াসওয়াসা দূর হোক বা নাই হোক। এমনিভাবে স্বস্তিকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করবে না। বরং মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যে, সারা জীবন যদি এর চেয়েও বেশি কষ্ট পোহাতে হয় তা বরণ করে নেব। কেননা, তাও মাহবুব (পরম প্রিয়)-এর দান। কেননা তা যেমন গুনাহ নয়, তেমনি নয় ইচ্ছাধীন বিষয়। আর এরকম প্রতিটি জিনিসই নি'আমত। বান্দার বন্দেগী ও আবদিয়াত হল–

بدرد وصاف ترا حکم نیست دم در کش

کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطافست

এ সুরা স্বচ্ছ না মলিন সেদিকে লক্ষ করা তোমার কাজ নয়

বরং সাকী যাই পরিবেশন করে তা অনেক বড় দান।

এ শ্লোকটি মাঝে-মাঝে পড়বে।[১০১]

---

১০১. আনফাসে 'ঈসা, ৯০ পৃ.

ওয়াসওয়াসামুক্ত নয় কেউ

হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ বাণীতে ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে প্রতিকার দান করেছেন। মানুষের অন্তরে এ ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা দেয়। বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকম খটকা ও সংশয়-সন্দেহ জাগে। কখনও কখনও এমন কঠিন ওয়াসওয়াসাও দেখা দেয়, যদ্দরুন মানুষ ভাবে এর ফলে আমি কাফের হয়ে যাইনি তো? এমন কোন লোক কদাপি থাকবে, যার অন্তরে ওয়াসওয়াসা ও মন্দ ভাবনা জাগে না। প্রায় সকলেরই অন্তরে তা জাগে এবং এ কারণে মানুষ চিন্তিত হয়, বিশেষত যারা দীনের পথে সদ্য চলতে শুরু করেছে, তাদের অন্তরে নানা ওয়াসওয়াসা দেখা দেয় এবং সেজন্য তারা পেরেশান হয়।

যার আত্মসংশোধনের কোনও চিন্তা নেই, দীনের পথে চলার কোন ইচ্ছা নেই, দিনরাত পার্থিব ব্যতিব্যস্ততায় ডুবে আছে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তার মনে কোন ওয়াসওয়াসা আসে না।

পক্ষান্তরে যারা দ্বীনের পথে চলে রকমারি ওয়াসওয়াসা ও কুচিন্তা তাদেরকে পেরেশান করে তোলে। অনেক সময় এমন-এমন ধারণা উঁকি মারে তখন সন্দেহ জাগে আমার ঈমান ঠিক আছে কি না। কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা আসে, কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুচিন্তা দেখা দেয়, কখনও সন্দেহ দেখা দেয় কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে এবং কখনও শরী'আতের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে। এরূপ ক্ষেত্রে সঠিক দিক-নির্দেশনা না পেলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গোমরাহীর পথে চলতে শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন।

হযরত থানভী (রহ.) এসব ওয়াসওয়াসার ক্ষতি থেকে বাঁচার যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তা হল, ওয়াসওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপই করো না। এটাই তার একমাত্র প্রতিকার। ওয়াসওয়াসা আসে তো আসতে দাও। তার কোনও পরওয়া করো না। মনে কি চিন্তা জাগল, কি কুধারণা দেখা দিল সেদিকে বিলকুল লক্ষ করো না।

ওয়াসওয়াসা ঈমানের আলামত

মনে রাখতে হবে, ওয়াসওয়াসা আসা ঈমানেরই আলামত। হাদীছ শরীফে আছে, একবার জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কখনও কখনও আমার অন্তরে এমন-এমন খেয়াল ও কল্পনা জাগে, যা মুখে আনার চেয়ে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে হয়। তা আমি কী করব?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ

এটা তো সুস্পষ্ট ঈমানের আলামত।'[১০২]

অর্থাৎ যার অন্তরে ঈমান আছে, কেবল তারই তো এমন ওয়াসওয়াসা দেখা দিতে পারে। যে ব্যক্তি কাফের কিংবা যে ব্যক্তি সর্বদা পাপাচারে ডুবে থাকে তার এরূপ সংশয়-সন্দেহ জাগবে কেন?

চোর আসে কোন্ ঘরে?

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এ হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যে ঘরে সম্পদ আছে, চোর তো কেবল সেই ঘরেই আসবে! যেখানে কোন অর্থ-সম্পদ নেই চোর সেখানে ঢুকতে যাবে কেন? কাজেই অন্তরে শয়তান নামক চোর তো এজন্যই আসে যে, তার জানা আছে এ অন্তরে সম্পদ আছে, ঈমানের মহা দৌলত আছে। পক্ষান্তরে যে অন্তরে ঈমান নেই, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস নেই, সেখানে শয়তান ঢোকার প্রয়োজন বোধ করে না। কাজেই ওয়াসওয়াসা ও সংশয়-সন্দেহ দেখা দিলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার শুক্র আদায় কর যে, আল-হামদু লিল্লাহ্! ঈমান আছে, অন্যথায় এসব ভাবনা দেখা দিত না। ঈমান থাকার প্রমাণ এই যে, অন্তরে সংশয়-সন্দেহ দেখা দিলে আপনি অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়েন, এগুলোকে আপনি খারাপ মনে করেন। ঈমান না থাকলে পেরেশান হবেন কেন? ঈমান না থাকলে আপনি ওয়াসওয়াসকে খারাপ মনে করবেন কেন? কেনই বা এ কারণে মনে কষ্ট বোধ হবে? বোঝা গেল অন্তরে ঈমান আছে।

ওয়াসওয়াসা আসে কেন?

ওয়াসওয়াসার কারণে অন্তরে যে পেরেশানী দেখা দেয়, সেজন্য কুরআন মাজীদের একটি সান্ত্বনাদায়ক বাক্য ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা আসে, তা মূলত শয়তানের কান কথা (কুমন্ত্রণা)। সে মূলত এর দ্বারা মু'মিনদেরকে দুঃখ দিতে চায়। কিন্তু সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।'[১০৩]

---

১০২. মুসলিম, হাদীছ নং ১৮৮; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৪৪৭; আহমাদ, হাদীছ নং ৯৩১৭

১০৩.মুজাদালা : ১০

সুতরাং যখনই অন্তরে কোনও কুমন্ত্রণা জাগে তখন ভাববে এটা তো ঈমানের আলামত। শয়তান তার লাইনে চেষ্টা করছে। তাকে বলে দাও, ঠিক আছে, তুই তোর পথে চেষ্টা কর, আমিও আমার ভাবে চেষ্টা করছি। এই বলে সেই ওয়াসওয়াসাকে অবজ্ঞা ও অগ্রাহ্য কর। তার পরিবর্তে যদি সেদিকে মনোযোগ দাও আর ভাবতে যাক, কেন এসব কুমন্ত্রণা জাগে, এটা কি উপায়ে দূর করা যাবে, এখন আমি কী করি, তবে তোমাকে এরই মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। নিজ আমলে মনোযোগী হওয়া ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলার অবকাশ হবে না। ফলে শয়তানের উদ্দেশ্যই পূরণ হবে।

ওয়াসওয়াসার দৃষ্টান্ত

হযরত থানভী (রহ.) বিষয়টাকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে খোলাসা করেছেন। তিনি বলেন, অন্তরে যে সব ভাবনা-কল্পনা জাগে তার দৃষ্টান্ত এরকম যে, এক ব্যক্তির কাছে বাদশার নিকট থেকে ডাক আসল যে, আজ অমুক সময়ে তুমি দরবারে উপস্থিত থেক। আমি তোমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেব, সেই সঙ্গে তোমাকে পুরস্কৃতও করব। লোকটি প্রস্তুত হয়ে রাজদরবারে উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। একটু চলতেই শুনতে পেল ডানদিকে কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে, অনুরূপ বামদিকেও। ওদিকে তাকে সময়মত রাজদরবারে পৌছাতে হবে। এবার বলুন বোধ-বুদ্ধির দাবি কী? সে কি কুকুর থামানোর চেষ্টা করবে? কুকুরকে ধাওয়া করে সময় নষ্ট করবে? সে যদি কুকুর তাড়ানোর ধান্ধায় লেগে পড়ে তবে তো নিশ্চিত যে, সময়মত দরবারে পৌছানো যাবে না। তার দরকারি সময়টা কুকুরই নিয়ে নিয়েছে। কাজেই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে কুকুরকে ঘেউ-ঘেউ করতে দাও এবং নিজের পথে চলতে থাক। কিভাবে সময়মত গন্তব্যস্থলে পৌছা যাবে সেই চেষ্টা কর। এতেই তোমার সফলতা। তুমি যদি কুকুরের পেছন লেগে পড়, তার ঘেউ-ঘেউ থামানোর চেষ্টা কর তবে দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য হারাবে। পথ চলা বৃথা যাবে।

অনুরূপ তুমি যে ইবাদত-বন্দেগী করছ, এটা মূলত আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরা। তুমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরা দেওয়ার চেষ্টা করছ। এ সময়ে অন্তরে যে সব সংশয়-সন্দেহ ও কুচিন্তা উঁকি মারে তা মূলত কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। তুমি যদি সেদিকে মনোযোগ দাও, ঘেউ-ঘেউ থামানোর চেষ্টা কর এবং তোমার ধ্যান-মন তাতে নিবদ্ধ কর, তবে তাতে শয়তানেরই উদ্দেশ্য পূরণ হবে। তুমি দরবারের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

ওয়াসওয়াসার সময় আপন কাজে লিপ্ত থাকুন

কাজেই ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার প্রতিকার কেবল এটাই যে, সেদিকে একদম ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। ভ্রুক্ষেপ না করার অর্থ এই ফিকিরে না পড়া যে, অন্তরে কি ওয়াসওয়াসা আসছে, কি কুমন্ত্রণা দেখা দিচ্ছে? এসব কেন আসছে? কিভাবে এসব রোধ করা যাবে? ইত্যাদি। বরং আপন কাজে লেগে থাকুন। মনে করুন নামাযের সময় হয়েছে, আপনাকে নামায পড়তে হবে। এ সময় অন্তরে নানা ধারণা-কল্পনা জাগছে, আপনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নামাযে রত হয়ে পড়ুন। কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে, ওদিকে এ সময় অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। আপনি তা অগ্রাহ্য করে কুরআন তিলাওয়াতে লেগে যান। এমনিভাবে যখন যে কাজের সময় হয সেই কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ুন আর তখন মনে যেসব চিন্তা-ভাবনা যাগে তা অগ্রাহ্য করে কুরআন তিলাওয়াতে লেগে যান। এমনিভাবে যখন যে কাজের সময় হয় সেই কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ুন আর তখন মনে যেসব চিন্তা-ভাবনা যাগে তা অগ্রাহ্য করুন। সেই চিন্তা-ভাবনাকে কিছুতেই নিজ কাজে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেবেন না। এটাই একমাত্র প্রতিকার। এর দ্বারাই ওয়াসওয়াসার ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে। এর বিপরীতে আপনি যদি ওয়াসওয়াসার পেছনে লেগে পড়েন এবং একে তাড়ানোর যোগার-যন্ত্র শুরু করে দেন, তবে ওয়াসওয়াসার এলাজ তো হবেই না, উল্টো আপনি নিজেই তার শিকার হয়ে যাবেন।

ওয়াসওয়াসার আরেক এলাজ

আমার মহান পিতা (রহ.) বলতেন, কোথাও আঁধার ঘিরে ধরলে তার প্রতিকার এটা নয় যে, তুমি সেই অন্ধকারের পেছনে লেগে পড়বে এবং তা তাড়ানোর জন্য রণ প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। এর দ্বারা কখনও অন্ধকার দূর হবে না। অন্ধকার তাড়ানোর একমাত্র উপায় হল বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া। সেই বাতির আলো যেখানে যেখানে পৌছবে সেখান থেকে অন্ধকার আপনিই পালাবে। বস্তুত শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণাও এক রকম অন্ধকার, বরং সেটাই প্রকৃত অন্ধকার, এ অন্ধকারও তাড়ানোর পথ এটা নয় যে, তুমি তার পেছনে লেগে পড়বে এবং তার সাথে রণহুংকার দেবে। বরং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আল্লাহ তা'আলার যিকর ও 'ইবাদত-বন্দেগীর চেরাগ জ্বালিয়ে দাও, দেখবে সকল ওয়াসওয়াসা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে।

অন্য চিন্তায় মন দাও

কারও যদি ওয়াসওয়াসা খুব বেশি পরিমাণে দেখা দেয়, তার সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, তথাপি তা তাড়ানোর ফিকির না করাই ভালো। কেননা তা যতবেশি তাড়াতে চাবে ততবেশি গেড়ে বসবে। বরং তার কর্তব্য নিজেকে অন্য কোনও কাজে লাগিয়ে দেওয়া বা অন্য কোনও চিন্তায় মন দেওয়া। কেননা দর্শনের একটা নিয়ম হল–

اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ اِلٰى شَيْئَيْنِ فِيْ اٰنٍ وَاحِدٍ

মন একই সময় দুই জিনিসে যুক্ত হতে পারে না।' কাজেই মনে ওয়াসওয়াসা দেখা দিলে তাকে অন্য চিন্তায় মশগুল করে দাও বা অন্য কাজে লিপ্ত করে দাও। এতে ওয়াসওয়াসা আপনিই দূর হয়ে যাবে।

ওয়াসওয়াসা দূর করার কোনও ওজীফা নেই

সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ বাণীতে প্রথম কথা বলেছেন, 'ওয়াসওয়াসার একমাত্র এলাজ হল তাকে অগ্রাহ্য করা'। লোকে বলে, আমার মনে নানা-কুমন্ত্রণা দেখা দেয়, কোনও ওজীফা বলে দিন যাতে তা আর দেখা না দেয়। হযরত (রহ.) বলেছেন, এর কোনও ওজীফা নেই। কোনও এলাজ নেই। উপায় কেবল এটাই– সেদিক ভ্রূক্ষেপ করো না।

ওষুধ নয়, নিরাময়ই উদ্দেশ্য

অতঃপর তিনি একটা সূক্ষ্ম কথা বলেছেন, 'এই অগ্রাহ্য করাকে যে এলাজ হিসেবে গ্রহণ করবে তা গৌণ উদ্দেশ্য মনে করে নয়। বরং একে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করবে। তাতে এর ফলে ওয়াসওয়াসা দূর হোক বা নাই হোক।' অর্থাৎ আমি যে বললাম 'ওয়াসওয়াসার এলাজ হল ওয়াসওয়াসাকে অগ্রাহ্য করা'। এই অগ্রাহ্য করাকে গৌণ মনে করো না; বরং মুখ্য মনে করবে। কেননা গৌণ উদ্দেশ্য মনে করলে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, এটা অবলম্বনের পর এর দ্বারা নিরাময় লাভ হল কি না সেই ফিকিরেই লেগে পড়বে।

দেখুন কেউ যখন কোন রোগের কারণে ওষুধ সেবন করে, তখন সেই ওষুধ কি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়? তা হয় না। বরং উদ্দেশ্য থাকে তার মাধ্যমে নিরাময় লাভ করা যেহেতু ওষুধ ছাড়া সাধারণত নিরাময় লাভ হয় না। এ দৃষ্টিতে ওষুধও মকসুদ, কিন্তু সরাসরি নয়, পরোক্ষভাবে। ওষুধ পরোক্ষ উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে লোকে ওষুধ খাওয়ার পরই কখন নিরাময় লাভ হবে সেই অপেক্ষায় থাকে। কাজেই কেউ যদি কোন রোগের কারণে একদিন

ওষুধ খায়, কিন্তু কোনও সুফল না পায়, তারপর দ্বিতীয় দিন খায় তাতেও সুফল না পায়, তারপর তৃতীয় দিন খায়, কিন্তু তাও সুফল না পায়, তখন সে হতাশ হয়ে ওষুধ ছেড়ে দেয় এবং অন্য কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। কেননা তার উদ্দেশ্য ওষুধ সেবন নয় বরং নিরাময় লাভ করাই ছিল। যখন ওষুধে তা লাভ হচ্ছিল না, তখন আর তা খাবে কেন? তাই ছেড়ে দিয়েছে।

অগ্রাহ্য করার এলাজ স্বয়ং মুখ্য উদ্দেশ্য

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এটাই ওয়াসওয়াসার এলাজ, ওয়াসওয়াসার দিকে একদম ভ্রুক্ষেপ করো না। আরোগ্য লাভের পরওয়া না করে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাক। কেননা এলাজ গৌন উদ্দেশ্য নয়; বরং মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা তুমি একদিন, দু'দিন, তিনদিন পর্যন্ত আমল করার পরও যদি দেখ ওয়াসওয়াসা বন্ধ হয়নি, তবে তুমি বলবে ব্যবস্থাটাই ভুল। আসলে তো ভুল নয়; বরং এটা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। ব্যবস্থাগ্রহণ সত্ত্বেও ওয়াসওয়াসা জাগলে ব্যবস্থাকে অকার্যকর মনে করো না। কেননা এ ব্যবস্থা স্বয়ংই মকসুদ। কাজেই এটা ছেড়ে দিও না; বরং এ অনুযায়ী কাজ করতে থাক, তাতে জীবন ভরও যদি ওয়াসওয়াসা আসতে থাকে আসতে দাও। ওদিকে ধ্যান দিও না। প্রতিটি ওয়াসওয়াসাকেই অগ্রাহ্য করে যাও। সারাটা জীবন এভাবে চলতে থাক। ব্যস এটাই এলাজ।

স্বস্তিলাভ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়

তিনি আরও একটা সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, স্বস্তিলাভকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করো না। অর্থাৎ তুমি যে ওয়াসওয়াসা ও সংশয়-সন্দেহ দূর করার ফিকির করছ, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় স্বস্তিলাভ করা অর্থাৎ ওয়াসওয়াসার কারণে যে মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা ভোগ করতে হয়, এলাজের মাধ্যমে তা দূর করে আরাম পাওয়া, তবে এটা সঠিক উদ্দেশ্য হল না। কেননা আসলে তো এলাজই মূল উদ্দেশ্য। সংশয়-সন্দেহের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে অন্য কোনও কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। তার পরিবর্তে স্বস্তি ও আরামকে উদ্দেশ্য বানালে তো সেই ইন্দ্রিয়সুখকেই মকসুদ বানানো হল।

আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাক

ওয়াসওয়াসাকে অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও যদি তা নিয়ন্তর আসতেই থাকে এবং তাতে অস্থিরতা ও কষ্ট-ক্লেশ বোধ হয়, তবে সেজন্য আক্ষেপ করো না; বরং

সেই কষ্ট-ক্লেশেও খুশি থাক। কেননা সেটাই আল্লাহর ফয়সালা। তিনি যদি চান আমি সারাটা জীবন ওয়াসাওয়াসায় আক্রান্ত থাকি এবং এ যন্ত্রণা যথারীতি আসতেই থাকে, তবে আমার আর করার কি আছে? আমার ওয়াসওয়াসায় লিপ্ত থাকাতেই যদি তিনি খুশি থাকেন, তবে আমিও খুশি।

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

না বিরহ ভালো, না মিলন ভালো
বন্ধু যে হালে রাখেন, সে হালই ভালো।

কাজেই ওয়াসওয়াসা কেন আসে সেজন্য আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি এর কষ্ট ক্লেশকে খুশি মনে মেনে নেব।

بدرد وصاف ترا حکم نیست دم در کش
کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطافست

"শরাব মলিন না স্বচ্ছ, তা দিয়ে তোমার যায় কি আসে?
সাকী যাই ঢেলে দেয় তোমার জন্য তা অশেষ কৃপা।

এর মধ্যে কী হিকমত ও কী কল্যাণ নিহিত আছে তা তোমার জানা থাকুক বা নাই থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার জন্য তিনি যে হিস্যা নির্দিষ্ট করেছেন, যে হাল ও অবস্থাকে তিনি তোমার জন্য পসন্দ করেছেন তোমার পক্ষে তাই তার করম ও কৃপা। তাতে খুশি থাকাই তোমার কর্তব্য।

তোমার পক্ষে এটাই সমীচীন

অনেকের অভিযোগ, অমুকের তো বিলকুল কোন ওয়াসওয়াসা আসে না। বড়ই স্বস্তিতে থাকে, কোনও পেরেশানি নেই। অমুক শায়খের সাথে তার সম্পর্ক। তার হাতে বায়'আত। কত ভালো আছে সে। অন্যদিকে আমার হরদম ওয়াসওয়াসা। কত কি সংশয়-সন্দেহ অন্তরে জাগে। কত কুমন্ত্রণায় ভুগি। তা আমার ভাগে কি এটাই ছিল?

মনে রাখতে হবে, এ জাতীয় কথা অধৈর্যের পরিচায়ক। ভায়া! তোমার পক্ষে যা সমীচীন ছিল তাই তোমাকে দেওয়া হয়েছে, আর তার পক্ষে যা সমীচীন ছিল তাকেও তাই দেওয়া হয়েছে। তোমার পক্ষে ওটাই আল্লাহ তা'আলার করম ও কৃপা আর তার জন্য এইটা কৃপা। তার জন্য ওতে কল্যাণ

নিহিত আর তোমার পক্ষে এতে। তুমি তোমার এহালে সবর করতে পারলে তুমি প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হবে এবং আল্লাহ তা'আলাই জানেন এর ফলে তোমার মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে।

সুতরাং অন্যের দিকে তাকিও না যে, সে কী পাচ্ছে। তুমি যা পাচ্ছ তা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ সঠিক। আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল-হাই (রহ.) এ মর্মের একটা বয়েত পড়তেন। তিনি বলেন,

مجھکو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی

میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ

কার পেয়ালায় কতটুকু আছে তাতে আমার যায় কি আসে?

আমার পাত্রে তো আছে, পানশালায় যা কিছু সার!

সবরের প্রতিদান তো আছেই

মোদ্দাকথা, যা করণীয় তাই করে যাও। ইচ্ছাতীত যে সব ভাবনা-কল্পনা অন্তরে দেখা দেয় সেদিকে ফিরেও তাকিও না। আর সে জন্য যে কষ্ট-ক্লেশ বোধ হয়, সে ব্যাপারে, চিন্তা করো যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে। এটা তার ফয়সালা। এটা তাকদীর ও নিয়তি। আমি এতে খুশি। এর ফলে এক দিকে তুমি ওয়াসওয়াসার ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। অন্যদিকে যে কষ্ট-ক্লেশ হয় সে জন্য সওয়াব ও পুণ্যের অধিকারী হয়ে যাবে এবং তোমার মর্যাদা অনেক উঁচুতে পৌছে যাবে। কাজেই ওয়াসওয়াসায় শুধু ফায়দাই ফায়দা। এতে কোন ক্ষতি নেই। তাছাড়া তুমি তখন বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যা-কিছু স্থির করেছেন আমি তাতে খুশি তখন "রিযা বিল-কাযা" (নিয়তিতে সন্তুষ্টি)-এর সওয়াবও তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে। সেই সাথে সবরের প্রতিদান তো আছেই।

দুনিয়ায় কষ্ট-ক্লেশ থাকবেই

মনে রাখতে হবে, ইহজগতে পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি কখনওই লাভ করা সম্ভব নয়। তাতে এর জন্য যত চেষ্টাই করা হোক। বড়-বড় রাজা-বাদশা, আমীর উমারা' কারও নসীবেই এটা নেই। কেননা দুনিয়া পূর্ণাঙ্গ শান্তির জায়গাই নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাসৃজনে তিনটি জগত সৃষ্টি করেছেন। একটি জগত মহাশান্তির। যেখানে দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্র নেই। সেটি হচ্ছে জান্নাত। আরেকটি মহাযন্ত্রণার সেখানে সুখ-শান্তির নাম-নিশানাও নেই।

তার নাম জাহান্নাম। তৃতীয়টি ইহজগত, যেখানে আপনি-আমি জীবন যাপন করছি। এখানে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। এখানে নির্জলা কোন সুখ নেই। সুখের সাথে দুঃখের মিশ্রণ আছে। এখানকার কোনও আনন্দই নিষ্কন্টক নয়। যে-কোনও আনন্দের সাথে বেদনার কাঁটা যুক্ত আছে। সুতরাং কেউ যদি ইহজীবনে নির্জলা সুখের অতিবাহন চায় তা কেবল অসম্ভব কল্পনাই হবে। আমাকে কোনওরূপ বেদনা স্পর্শ না করুন, কোনও আঘাত আমার দেহ মনে না লাগুক এই যদি কারও স্বপ্ন হয়ে তবে সে স্বপ্ন কোনও দিন পূরণ হওয়ার নয়। যতবড় ধনী হোক, যতবড় শাসক হোক, যত বড় বিদ্বান হোক কিংবা হোক যতবড় বুদ্ধিমান, নিষ্কন্টক সুখের জীবন এই ইহজগতে যে কখনও ভোগ করতে পারবে না। এদের যে কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমার কি কখনও কোনও কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে? কাউকেই পাবে না যে বলবে, আমি কোনও দিন কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইনি। কিছু না কিছু কষ্ট এবং কিছু না কিছু দুঃখ আমাকে ভুগতেই হয়েছে।

সুতরাং ইহজগতে কষ্ট-ক্লেশ যখন অনিবার্য, তখন তুমি চাইলে তাতে সবরও করতে পার এবং চাইলে সবর নাও করতে পার। সবর করলেও দুঃখ থাকবে আর না করলে থাকবে। অধৈর্য দ্বারা কখনও দুঃখ-কষ্ট তাড়াতে পারবে না। তাতে কেবল অস্থিরতাই বাড়বে। পক্ষান্তরে যদি ধৈর্য ধর, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় রাজি হয়ে যাও এবং বলে দাও, তাঁর পক্ষ থেকে যেসব দুঃখ-কষ্ট আসছে, আমি তাতে খুশি, তবে দুঃখ সম্পূর্ণ না ঘুচলেও কিছু না কিছু মানসিক শান্তি অবশ্যই পাবে। সেই সঙ্গে আল্লাহ প্রদত্ত সুসংবাদেরও উপযুক্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

'সবরকারীদেরকে তো তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে বেশুমার।'[১০৪]

সুতরাং ইহলোকে যতটা স্বস্তি রিযা বিল-কাযা' বা 'নিয়তিতে সন্তুষ্টি' দ্বারা লাভ হতে পারে অতটা আর কোন পন্থায়ই লাভ করা সম্ভব নয়।

হযরত বাহ্লূল (রহ.)-এর ঘটনা

বিখ্যাত মাজযূব (আল্লাহ প্রেমে আত্মহারা) হযরত বাহ্লূল (রহ.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, কি খবর, কেমন আছেন? তিনি বললেন, খুব ভালো। বড় সুখে আছি। লোকে জিজ্ঞেস করল, কিভাবে, কেমন সুখ

১০৪. যুমার : ১০

পাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, আরে মিয়া! দুনিয়ায় যার ইচ্ছার বিপরীতে কিছু ঘটে না, তার সুখ সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস করছ? আমার অবস্থা তো এরকমই। দুনিয়ায় যা-কিছু হয় আমার ইচ্ছা মোতাবেকই হয়। লোকে বলল, হযরত দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন কোনও লোক আসেনি, যার ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটে না। এমনকি নবী-রাসূলগণের ইচ্ছার বিপরীতও অনেক কিছু ঘটত। আপনি এতটা উঁচুতে কিভাবে পৌছে গেলেন যে, আপনার ইচ্ছার বিপরীত কিছুই ঘটে না? তিনি বললেন, আসল কথা হচ্ছে, আমি নিজ ইচ্ছা-অভিরুচিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার ভেতর লীন করে দিয়েছি। আল্লাহর যা মর্জি, আমারও তাই মর্জি। তিনি যা চান আমি তাই-ই চাই। বলা বাহুল্য বিশ্ব-ভুবনে কোনও কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিপরীতে ঘটে না, তখন বলতেই হবে আমার ইচ্ছার বিপরীতেও ঘটে না। তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে আমাকে এমন সুখ ও প্রশান্তি দান করেছেন।

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকাতেই সুখ নিহিত

যা হোক 'রিযা বিল-কাযা' অর্থাৎ নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই যত সুখ। সুখের এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। চাইলে এ পথে সুখ আহরণ কর, নয়ত সুখের সন্ধানে জীবনভর ছটফট করতে থাক। তা ছটফটই করতে পারবে। সুখ কিছুতেই মিলবে না।

মোদ্দাকথা হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ বাণীতে শিক্ষা দেন যে, ওয়াসওয়াসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা সত্ত্বেও যদি ওয়াসওয়াসা দূর না হয়; বরং যথাবৎ তা আসতেই থাকে, তবে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। বরং সে অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। চিন্তা করবে, আমার আল্লাহ যখন ওয়াসওয়াসাকেই আমার ভাগ্যে রেখেছেন, তখন এতে আমার কোনও অভিযোগ নেই। আমি এতে খুশি। হাঁ, সেই ওয়াসওয়াসার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকেও সঠিক বুঝ দান করুন এবং এ অনুযায়ী আমলের তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ৪র্থ খণ্ড, ৩১-৪৮ পৃষ্ঠা

কুধারণা ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত (পেছনে নিন্দা) করো না।'[১০৫]

অন্যের সম্পর্কে মন্দ কিছু অনুমান করা বা কুধারণা করা এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা অতি কঠিন গুনাহ। কিন্তু আমরা একে গুনাহ মনে করছি না। অথচ কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় এসব নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা একে অন্যের সম্পর্কে অনুমান করো না অর্থাৎ কুধারণা পোষণ করো না। সুতরাং এর দ্বারা কুধারণা করা হারাম হয়ে গেল। আরও বলা হয়েছে, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না, পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়িও না। সুতরাং কুধারণাও হারাম। কারও সামনে অন্যের কোনও বিষয় এসে গেলে তার কর্তব্য বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে নেওয়া এবং তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা। হাদীছ শরীফে আছে–

ظُنُّوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا

'মু'মিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করো।'[১০৬]

অহেতুক অন্যের সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা কেন? অমুকের দ্বারা হয়ত এই কাজ হয়েছে, হয়ত এই উদ্দেশ্যে করেছে, কি যেন তার মতলব! এসবই কুধারণা।

---

১০৫. হুজুরাত : ১২

১০৬. আল-উরফুশ শাযী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২২

আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

'কোনও কোনও ধারণা অবশ্যই গুনাহ।'

কাজেই অহেতুক অনুমান ও কুধারণা করা হারাম। কুরআন ও হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায়ই এটা নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই এর হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা হরদম এতে লিপ্ত থাকছি। আর এরই থেকে সামাজিক নানা অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে। পরস্পরের মনোমালিন্য, ও দ্বন্দ্ব-কলহের জন্য প্রধানত পারস্পরিক কুধারণা ও ছিদ্রান্বেষণই দায়ী। এ দু'টি গুনাহই যত অশান্তি ও ফিতনার মূল।

আমাদের সমাজবাস্তবতা

আমাদের সমাজ এ দু'টি রোগে ভয়াবহভাবে আক্রান্ত। প্রত্যেকে অন্যের সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে একটা অনুমান দাঁড় করিয়ে নেয়। তারপর নিজ অন্তরে তা দানা বাঁধতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তা তার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। যেন সে একজন অনুমানকারী মাত্র নয়; বরং একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সে নিজ চোখে তাকে সেইমত কাজ করতে দেখেছে। সামান্য কোন কথা কানে আসতেই আমরা তার ভিত্তিতে নানা কল্পনার প্রাসাদ রচনা করি। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বলতে শুরু করি, সে 'হয়ত' এরূপ করেছেন। পরে 'হয়ত'-টুকুও লুপ্ত হয়ে যায়। বলি, নিশ্চয়ই সে এরূপ করেছে।

উদ্ধৃত আয়াতটির কৌতূহলোদ্দীপক ক্রমবিন্যাস

ইমাম কুরতুবী (রহ.) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহকে বড় চমৎকার ক্রমবিন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে বলেছেন–

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ

'তোমরা বহুবিধ অনুমান পরিহার কর'।

অর্থাৎ অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করো না। কোনও বিষয়ের আভাস-ইঙ্গিত পেয়েই বিনা যাচাইয়ে কারও সম্পর্কে ধারণা করো না যে, সে এই কাজ করেছে। এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ।

এ নির্দেশ শুনে যে ব্যক্তি কুধারণা করতে অভ্যস্ত সে বলতে পারে, বেশ কথা, আপনি কুধারণা করতে নিষেধ করেছেন, যদ্দরুন যাচাই-বাছাই ছাড়া আমি অন্যের সম্পর্কে কোন অনুমান স্থির করতে পারব না, তাহলে আমাকে এই অনুমতি দেওয়া হোক যে, আমি অনুসন্ধান করে দেখি সে ওই কাজটি করেছে কিনা বা ওই অপরাধে সে অপরাধী কিনা। তদন্তে যদি সাব্যস্ত হয় তার মধ্যে ওই দোষ আছে তবেই আমি বলব, নইলে নিবৃত্ত থাকব। কিন্তু না, শরী'আত তাকে সেই অনুমতিও দেয়নি। কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ে এ আয়াত হুকুম দিচ্ছে– 'এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না'। অর্থাৎ কারও সম্পর্কে কোন কিছুর আভাস পেয়ে যে তুমি তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করবে এবং অনুসন্ধান করে দেখবে তার মধ্যে সেই দোষ আছে কি না, তারও অনুমতি নেই। এটাও তোমার জন্য জায়েয নয়। তোমার কি দায় ঠেকেছে যে সে দোষ করেছে কিনা তার তদন্ত চালাবে? এই অহেতুক খোঁড়াখুঁড়ির কী অধিকার তোমার আছে?

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

পরকে নিয়ে ভাবছ সদা, আপন দশার খোঁজ রাখ কি?

সে যা-কিছু করছে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাকে তার জবাব দিতে হবে না, সে নিজেই তার জবাব দেবে। কাজেই তা অনুসন্ধানের কি দরকার তোমার পড়েছে? তোমার কর্তব্য নিজ অবস্থার খোঁজ রাখা এবং নিজেকে সংশোধন করতে সচেষ্ট থাকা।

এ বিষয়ে হাদীছ শরীফে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوْا

'তোমরা একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং গুপ্তানুসন্ধান করো না।'[১০৭]

এখানে একটি শব্দ হল تجسس (তাজাস্‌সুস)। অন্যটি تحسس (তাহাস্‌সুস)। 'তাজাস্‌সুস' অর্থ, অন্যের দোষ-ত্রুটি জানার ধান্দায় থাকা, তা যে পন্থায়ই হোক। আর তাহাস্‌সুস অর্থ চুপিসারে অন্যের গুপ্ত বিষয় জানার

---

১০৭. বুখারী, হাদীছ নং ৪৭৪৭; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৬৪৬; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪২৭১; আহমাদ, হাদীছ নং ৭৫২০

চেষ্টা করা। বিষয়টা যার, সে তো তা কিভাবে গোপন রাখা যায় সেই চেষ্টা করে, আর অপর ব্যক্তি উপায় খোঁজে কিভাবে তা শোনা বা জানা যায়। এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় কাজকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

তা কেন হারাম? হারাম এ কারণে যে, তাজাস্‌সুস ও তাহাস্‌সুস বা ছিদ্রান্বেষণ ও গুপ্তানুসন্ধান দ্বারা বোঝা যায় লোকটি নিজ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উদাসীন। নিজ দোষের দিকে নজর থাকলে কেউ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে পারে না। যার নিজের পেটে ব্যথ্যা এবং সেই ব্যথায় অস্থির ও কাতর, সে অন্যের সর্দি আছে কিনা সেই চিন্তা করতে পারে কি? সে কি খুঁজে বেড়াতে পারে কার-কার কাশি আছে? তা আদৌ পারে না, যেহেতু সে নিজ বেদনায় ব্যাকুল। যতক্ষণ তার সেই বেদনার উপশম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের দিকে ফিরে তাকাবে না।

নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দিন

আমাদের দৃষ্টি যদি নিজ-নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে থাকে এবং কিভাবে তার সংশোধন হতে পারে, আর সংশোধন না হলে পরিণতি কী দাঁড়াবে এবং আখিরাতে কী গতি হবে সেই চিন্তাও থাকে, তবে অন্যের দোষ-ত্রুটির দিকে নজরই যাবে না। শেষ মুগল বাদাশাহ বাহাদুর শাহ যুফার বলেন–

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب وہنر
پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

ছিল না যবে আপন দোষের কোনই খবর
খুঁজিয়া ফিরেছি কার ভেতর কি দোষ-গুণ আছে
যেই না দিনু আপন যতেক দোষে নজর
দৃষ্টি থেকে গেল সবার ময়লা মুছে।

অর্থাৎ যতক্ষণ নিজ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম, আমার ভেতর কি কি দোষ আছে সে সম্পর্কে বেখবর ছিলাম। ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িয়েছি। কখনও এর দোষ দেখেছি, কখনও ওর দোষ। আর এভাবে অন্যদেরকে খারাপ মনে করেছি। কিন্তু যখন নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর ফেরালাম আর একরাশ দোষের ময়লায় নিজেকে মলিন দেখতে পেলাম, তখন আর আমার চোখে কেউ মন্দ থাকল না। এখন দেখি আমি নেহাত মন্দ, সকলের চেয়ে খারাপ।

হযরত থানভী (রহ.)-এর অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে নিজ দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করার তাওফীক দিয়েছেন, তাদের চোখে দুনিয়ার সকলকেই ভালো মনে হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ.)কে দেখুন, যিনি ছিলেন এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ধর্মীয় সংস্কারক) তিনি নিজের সম্পর্কে বলছেন,

'আমি দুনিয়ার সকল মুসলিমকে তাদের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী এবং সকল অমুসলিমকে ভবিষ্যত বিবেচনায় নিজের চেয়ে উত্তম মনে করি।'

অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম তো এই মুহূর্তেও আমার তুলনায় ভালো আর সমস্ত অমুসলিমকেও ভবিষ্যত সম্ভাবনা হিসেবে আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করি। কেননা হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনও ঈমানের তাওফীক দেবেন। ফলে আমল-আখলাকে সে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। তাই তাকেও আমি আমার চেয়ে উত্তম গণ্য করি। এত বড় ব্যক্তির যখন এই অবস্থা, তখন আমি আপনি কোন্ গণনায় আসি? আল্লাহ তা'আলা যাকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন, যে নিজ দোষ দেখে এবং তা নিয়ে চিন্তা করে সে সারা জাহানকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে। সে অন্যের দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়ে না।

সুতরাং নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন। কোন্ পথে চলছেন, কী আমল করছেন তা ভাবুন। নিজের ভেতর কি কি দোষ আছে তা দেখুন এবং তা দূর করার চেষ্টা করুন। অন্যদের নিয়ে চিন্তা করা, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা, তাদের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়ানো, অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করা এবং তাদের গীবত ও নিন্দা করা সম্পূর্ণ হারাম ও অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। এর দ্বারা আমরা নিজের দুনিয়া নষ্ট করছি, আখিরাতও বরবাদ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফয্ল ও করমে আমাদের সকলকে এসব দোষ থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফীক দিন– আমীন!

কোন্ কুধারণা খারাপ

যা হোক এই কুধারণা ও ছিদ্রান্বেষণ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'কুধারণা সৃষ্টি হয় অহংকার থেকে। কুধারণা সেটাই খারাপ, যা নিজের ইচ্ছায় অন্তরে আনা হয়। যে কুধারণা আপনা-আপনি দেখা দেয়, তা নিন্দনীয় নয় – যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুযায়ী কাজ করা না হয়। সে অনুযায়ী কাজ করার অর্থ হল ধারণাটিকে দৃঢ়বিশ্বাস বানিয়ে নেওয়া বা মুখে কারও সামনে তা প্রকাশ করা। কুধারণা অনুযায়ী কাজ করা না হলে সে কুধারণার

জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না এবং তা কোনওরূপ ক্ষতিকরও নয়'।[১০৮]

কারও কোন আচরণ দেখে যদি তার সম্পর্কে আপনার মনে কোনও সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং ধারণা জন্মায় যে, সে হয়ত অমুক মন্দ কাজটি করেছে, তবে দেখতে হবে এই ধারণাটি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, না আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা মনে স্থান দিয়েছেন। আপনা-আপনি সৃষ্টি হলে তা নিন্দনীয় নয় এবং তাতে কোনও গুনাহ নেই, যেহেতু তাতে ইচ্ছা এখতিয়ারের কোনও ভূমিকা নেই।

অন্যের কাজকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখুন

উদাহরণত রমাযনুল-মুবারকে কাউকে দিনের বেলা হোটেল থেকে বের হতে দেখলেন। এ অবস্থায় ধারণা জন্মাতে পারে লোকটি হয়ত রোজা রাখেনি, হোটেল থেকে কিছু খেয়ে বের হয়েছে। আপনা-আপনি এরূপ ধারণা জন্মানোতে কোন দোষ ও গুনাহ নেই। তবে এরূপ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইতিবাচক চিন্তা করা চাই, যেমন এ কথা ভাবা যে, সে হয়ত তার কোনও অসুস্থ লোকের জন্য খাবার নিতে এসেছিল অথবা কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য হোটেলে প্রবেশ করেছিল ইত্যাদি। যেহেতু এগুলো অবাস্তব কল্পনা নয়; বরং এরও সম্ভাবনা আছে। তাই এরূপ চিন্তা করাই সমীচীন। এর বিপরীত অনুসন্ধান ও খোঁড়াখুঁড়িতে লিপ্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই এবং আমরা সেজন্য আদিষ্টও নই। মোটকথা যেসব ভাবনা আপনিই জন্ম নেয় তা গুনাহ নয়। সেজন্য আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং এরূপ ভাবনা দূষণীয় নয়।

যে কুধারণা হারাম

পক্ষান্তরে অন্তরে যে ধারণা আপনিই সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিকে যদি নিজের পক্ষ থেকে দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত করে নেন, তবে তা অবশ্যই দূষণীয় ও গর্হিত কাজ হবে। যেমন এই উদাহরণে আপনি বিশ্বাস করে নিলেন যে, লোকটি রোজা রাখেনি। সে খাওয়ার জন্যই হোটেলে ঢুকেছিল এবং খাওয়া দাওয়া করেই বের হয়েছে। এর বিপরীত সম্ভাবনাও যে আছে, সে দিকে আপনি লক্ষ করলেন না; বরং বিষয়টাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখলেন। তারপর আবার

---

১০৮. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৩

এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করতেও শুরু করে দিলেন। বলতে থাকলেন, আমি অমুককে রোযার দিনে খানা খেতে দেখেছি। সে রোজা রাখেনি। অথচ আপনি তাকে খেতে দেখেননি; বরং হোটেল থেকে কেবল বের হতেই দেখেছেন। আপনি বর্ণনায় একটু রং চড়ালেন। এমনভাবে বললেন, যেন নিজ চোখে তাকে খেতে দেখেছেন এবং শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে জানালেন, সে রোযা রাখেনি। এ জাতীয় কুধারণা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয।

নিন্দনীয় কুধারণা সেটাই, যা নিজের পক্ষ থেকে তৈরি করে নেওয়া হয়। যে সব ধারণা আপনিই জন্ম নেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনুযায়ী কাজ করা না হবে, ততক্ষণ তাতে কোন দোষ নেই। সে অনুযায়ী কাজ করার অর্থ হল, তাকে দৃঢ়বিশ্বাসে পরিণত করা অথবা মুখে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা।

কুধারণার দু'টি স্তর

বোঝা গেল, কুধারণার দু'টি স্তর আছে। প্রথম স্তর অনিচ্ছাজনিত, অর্থাৎ নিজ ইচ্ছা-এখতিয়ারের কোনও ভূমিকা ছাড়াই অন্তরে কারও সম্পর্কে কোনও মন্দ ধারণা জন্ম নেওয়া। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। দ্বিতীয় স্তর ইচ্ছাকৃত কুধারণা। তা হচ্ছে সেই কুধারণা, যা প্রথমে তো আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরে আপনি তাতে নিজ ইচ্ছা সংযোগ করলেন। আপনি সেটি নিয়ে লেগে পড়লেন এবং তার বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক উদ্ভাবন করে তাকে বিশ্বাসের স্তরে নিয়ে গেলেন বা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কুধারণার এই দ্বিতীয় স্তর হারাম। এটা গুনাহ। এর থেকে বেঁচে থাকা অবশ্যকর্তব্য।

অহংকার থেকেই উৎপত্তি

হযরত থানভী (রহ.) কুধারণা থেকে বাঁচার উপায় শেখান যে, কারও অন্তরে কুধারণা জন্মালে তার উচিত নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দেওয়া, যেহেতু এর উৎপত্তি হয় অহংকার থেকে।[১০৯]

এই হল কুধারণার এলাজ। অর্থাৎ অন্যের সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা জন্ম নিলে, যদিও তা ইচ্ছাকৃত নয় এবং সে কারণে গুনাহও নয় তবুও অন্তরে তা দানা বাঁধতে দেওয়া উচিত নয়। বেশিক্ষণ অন্তরে জিইয়ে রাখলে এক পর্যায়ে

১০৯. আনফাসে 'ঈসা, ১৫৩

তা গুনাহে লিপ্ত করে ছাড়বে। হয় তা বিশ্বাস জন্মিয়ে দেবে অথবা অন্যের সামনে তার চর্চায় লিপ্ত করবে। অতএব তা অন্তরে জমতে না দিয়ে তার প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া উচিত।

এর দৃষ্টান্ত হল এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কোথাও তা ছিটকে পড়লে সঙ্গে-সঙ্গে নিভিয়ে ফেলা উচিত। নেভানো না হলে ক্রমে তা বাড়তে থাকবে এবং এক পর্যায়ে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠে নাগালে যা-কিছু পায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। অনুরূপ অনিচ্ছাজনিত কুধারণার ব্যাপারেও অবহেলা করতে নেই। যথাশীঘ্র তা নিভিয়ে ফেলা উচিত। অর্থাৎ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। তার প্রতিকার হল নিজ দোষ-ক্রটির দিকে নজর দেওয়া। চিন্তা করা যে, আমার মধ্যেও তো এই-এই দোষ আছে। এ অবস্থায় অন্যের দোষ দেখি কি করে? আমার অবস্থাই তো কত খারাপ, এ অবস্থায় অন্যের সম্পর্কে কুধারণার সুযোগ কই? এভাবে নিজ দোষ-ক্রটির ত্বত্ত্ব তালাশ নিতে থাকলে এ রোগ আস্তে-আস্তে নির্মূল হয়ে যাবে।

ছিদ্রানুসন্ধান ও কুধারণার পরিণতি গীবত

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কুধারণা, ছিদ্রানুসন্ধান ও গীবত-এ সবগুলোরই উৎপত্তি অহংকার থেকে। অহংকারীর মতলব সম্পূর্ণতা পায় গীবত দ্বারা। কুধারণা ও ছিদ্রান্বেষণ হল তার প্রারম্ভিক কাজ। যে ব্যক্তি কুধারণা করে ও অন্যের দোষ সন্ধানে লিপ্ত হয়, কিন্তু গীবত না করে, তার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। আর তা পূরণ না হলে কুধারণা ও দোষসন্ধান ছেড়ে দেবে। সুতরাং এ ত্রয়ের মধ্যে গীবত সর্বাপেক্ষা গুরুতর।[১১০]

অর্থাৎ কুধারণা, ছিদ্রান্বেষণ ও গীবত– তিনটিই কঠিন বালাই। কিন্তু তিনওটির উৎপত্তি অন্য একটি বালাই থেকে যা আরও গুরুত্বর। সেটি হল অহংকার – নিজেকে বড় মনে করা। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে করে তখনই সে অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করে। কুধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়লে সে অন্যের দোষ-ক্রটি খুঁজতে শুরু করে। অতঃপর সেই সব দোষ অন্যের সামনে উল্লেখ করতে থাকে তথা গীবত ও পরচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। দেখা গেল, তিনটির মধ্যে লক্ষবস্তু হল গীবত। অহংকারী ব্যক্তি গীবত করে খুব মজা পায়। সেই মজা পাওয়ার প্রাথমিক পর্ব হিসেবে সে কুধারণা ও ছিদ্রাম্বষণকে হাতিয়ার বানায়। অবচেতনে ভাবে, কুধারণা ও ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হলে এক পর্যায়ে গীবত করার সুযোগ পাব। কাজেই কুধারণা করা ও

---

১১০. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৩ পৃ.

দোষ সন্ধানে লিপ্ত হওয়া গীবতের প্রারম্ভিক কাজ। দোষ সন্ধান দ্বারা প্রকৃত কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ফলে অন্যের কাছে তা গেয়ে বেড়ানোর সুযোগ হয়। এমনিভাবে কুধারণা দ্বারাও অন্যের ক্রটি সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায় অতঃপর তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। তো গীবতই হল উভয়ের পরিণতি এবং সেটিই অহংকারী ব্যক্তির লক্ষবস্তু। এরূপ লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন যে, কুধারণা করে এবং দোষক্রটিও খুঁজে বেড়ায় অথচ কারও গীবত করে না। তা না করবে কি করে, যখন কুধারণা ও দোষ সন্ধান করছেই গীবতের মজা লোটার জন্য? গীবতই তো মুখ্য উদ্দেশ্য, কুধারণা ও ছিদ্রাণ্বেষণ তার হাতিয়ার মাত্র। কাজেই মনে রাখতে হবে এসব রোগ-বালাইয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও ভয়ানক রোগ হল গীবত। তাই এরই চিকিৎসায় অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। গীবত থেকে মুক্ত হতে পারলে কুধারণা ও ছিদ্রাম্বেষণের রোগ অতি সহজেই সেরে যাবে।

কুধারণার গুনাহ

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গুনাহ তো হয় সেই স্তরের কুধারণায় যা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় ও দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌছায়। পক্ষান্তরে যে কুধারণা অন্তরে পরিপক্ক হয় না, তাতে কোনও গুনাহ নেই এবং তা ক্ষতিকরও নয়। তবে চিকিৎসা তারও জরুরি। চিকিৎসা হল নিজ দোষ-ক্রটিতে নজর দেওয়া। চিকিৎসার পরও কোন আছর বাকি থাকলে তাতে ক্ষতি নেই।[১১১]

অর্থাৎ কুধারণাকে যখন বিশ্বাসে পরিণত করা হয়, তখনই গুনাহ হয়। তাতে যদি বিশ্বাস করা না হয়; বরং কেবল সম্ভাবনার স্তরে তা অন্তরে ঠাই পায়, তাতে কোন গুনাহ নেই। যেমন কারও সম্পর্কে ধারণা হল, সম্ভবত সে এই খারাপ কাজটি করেছে, এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভাবনা। তাই এটা গুনাহের কারণ নয়। পূর্ব বর্ণিত উদাহরণেই লক্ষ করুন। রমাযানে দিনের বেলা হোটেল থেকে বের হচ্ছে দেখে লোকটি সম্পর্কে ধারণা হল, সে হয়ত রোযা রাখেনি। কিন্তু ধারণাতেই শেষ। একে বিশ্বাসে পরিণত করা হল না। তো এ ধারণা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এরও চিকিৎসার প্রয়োজন রযেছে। কেননা পরিণামে এটা ক্ষতিকর হতে পারে। এটা এখন পর্যন্ত স্ফূলিঙ্গের পর্যায়ে আছে। শিখায় পরিণত হয়নি। কিন্তু অবহেলা করলে এক পর্যায়ে শিখায় পরিণত হয়ে আপনাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। তা এর চিকিৎসা

---

১১১. আনফাসে ঈসা : ১৫৪

কী? চিকিৎসা হল নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দেওয়া। তা দিলে এটা আর বৃদ্ধি পাবে না; বরং শুরুতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ তারপরও কিছু আছর থাকতে পারে। অল্প-বিস্তর কুধারণা তারপরও দেখা দিতে পারে। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। ইচ্ছার বাইরে হওয়ায় তাতে কোনও গুনাহও নেই। কাজেই সে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

কুধারণা দোষ সন্ধান ও গীবতের তিনটি এলাজ

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কুধারণা, দোষ সন্ধান ও গীবতের চিকিৎসা হল তাওয়াযু' ও বিনয় অবলম্বন করা। অন্তর থেকে তাকাব্বুর ও অহমিকা বের করে দাও। আসল রোগ যতক্ষণ পর্যন্ত দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাও, ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর জরিমানা আরোপ কর এবং কুধারণার সময় মনোযাগকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও যিক্‌রের দিকে ঘুরিয়ে দাও।[১১২]

হযরত (রহ.) তাঁর এ বাণীতে দু'টি ব্যবস্থা দান করেছেন। একটি স্থায়ী ব্যবস্থা, অন্যটি সাময়িক ও তাৎক্ষণিক। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবেও তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন।

(এক) চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগানো। অর্থাৎ কথা বলার আগে চিন্তা কর এ কথাটি বলা উচিত, কি উচিত নয়, এটি বলব, কি বলব না? প্রথমে ভাব তারপর বল।

(দুই) ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর জরিমানা আরোপ। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা সত্ত্বেও গীবত হয়ে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা-পয়সা সদকা করে দাও।

(তিন) কুধারণাকালে নিজ মনোযোগকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও যিকরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর ঘটনা

কেউ যখন ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-কে কোনও বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, তিনি প্রথমে নীরব থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন না। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হযরত! লোকে আপনাকে কোনও বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন, এর কারণ কী?

---

১১২. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৪ পৃ.

তিনি বললেন,

حَتّٰى اَعْرِفَ اَنَّ الْفَضْلَ فِى السُّكُوْتِ اَوْ فِى الْكَلَامِ

'এটা জানার জন্য যে, চুপ থাকা উত্তম, না কথা বলা।'

আমার কাছে এটা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চুপ থাকি আর ভাবি। এটা মূলত এই প্রবচণেরই অনুসরণ যে, 'প্রথমে ভাব, তারপর বল'।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রহ.) কর্তৃক জিহ্বাকে শাস্তিদান

বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিকি (রাযি.) বসে বসে নিজ জিহ্বা মোচড়াচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হল, হযরত! আপনি এরূপ করছেন কেন? উত্তর দিলেন,

اِنَّ هٰذَا اَوْرَدَنِىَ الْمَوَارِدَ

'এই জিহ্বা আমাকে বহু ধ্বংসঘাটায় নিক্ষেপ করেছে।'[১১৩]

এটা কার কথা? মহান সিদ্দীক (রাযি.)-এর। সিদ্দীক কাকে বলে? সিদ্দীক হন নবীর দর্পণ। নবীর প্রতিচ্ছবি। তিনি বলছেন, এই জিহ্বা আমাকে ধ্বংসমুখে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা যাকে সচেতনতা দান করেন তিনি নিজ জিহ্বার ব্যাপারে এমনই সতর্কতা অবলম্বন করেন। কথা বলেন চিন্তা করে, মেপে-মেপে। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার করলে নিঃসন্দেহে এটা অনেক ভালো জিনিস। কিন্তু ভুল ব্যবহার করলে এর মত ক্ষতিকর আর কিছু নেই। এই জিহ্বাই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায় আবার এটাই মানুষকে জাহান্নামে পৌছায়। খাঁটি বিশ্বাসে নিষ্ঠার সাথে যে ব্যক্তি তার জবানে উচ্চারণ করে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে চলে যায়। আবার কোনও মুসলিম তার মুখে কুফরী কথা বললে সে সোজা জাহান্নামে পৌছে যায়। হাদীছ শরীফে আছে, মানুষ তার জবানের কৃতকর্মের কারণে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১১৪]

---

১১৩. মুআত্তা মালিক, হাদীছ নং ১৫৬৭

১১৪. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৫৪১; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৯৬৩ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২১০০৮

সুতরাং জবানের নির্বিচার ব্যবহার ছেড়ে দিন। যা মুখে আসে বলে দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। বলার আগে চিন্তার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আগে ভাবুন যা বলতে যাচ্ছি তা আমার ধ্বংসের কারণ হবে না তো?

নীরব থাকার সাধনা

আমার মহান পিতা হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শফী' (রহ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করত। খুব বেশি কথা বলত, এসেই কথা বলা শুরু করত আর থামার নাম করত না। আব্বাজী (রহ.) সহ্য করতেন। কিছুদিন গত হলে একদিন সে বলল, হযরত! আমি আপনার হাতে বায়'আত হতে চাই। আপনার সাথে এসলাহী (আত্মসংশোধনমূলক) সম্পর্ক গড়তে চাই। আব্বাজী (রহ.) বললেন, সেরকম ইচ্ছা থাকলে প্রথমে মুখে তালা লাগাতে হবে। জিহ্বা তো কাঁচির মত চলছে। এটা থামাতে হবে। ব্যস এটাই আপনার ওযীফা ও প্রতিকার। এরপর সে যখন মজলিসে আসত খামুশ বসে থাকত, আর এরই মাধ্যমে তার সারাটা জীবনের এসলাহ হয়ে যায়।

গীবতের উপর জরিমানা

কাজেই কথা বলার আগে চিন্তাকে কাজে লাগান। ভেবে দেখুন যা বলতে যাচ্ছেন, তা গীবত বা মিথ্যা নয় তো? তা কি জায়েয, না নাজায়েয, হালাল, না হারাম? প্রথমে ভাবুন, তারপর বলুন।

চিন্তা-ভাবনা ও তাওবা-ইস্‌তিগফার সত্ত্বেও যদি ত্রুটি হয়ে যায় এবং কারও গীবত করে ফেলেন, তবে নিজের উপর জরিমানা আরোপ করুন। স্থির করে নিন, কখনও কারও গীবত করে ফেললে এত টাকা সদকা করব। টাকার অংক খুব বেশি বা অতি কম না হয়। এ পরিমাণ হওয়া চাই, যা আদায় করতে কিছুটা কষ্ট হবে। বেশি কম হয়ে গেলে আলিগড় কলেজের পরিণাম দাঁড়াবে।

নামায ছুটে যাওয়ার কারণে জরিমানা

আলিগড় কলেজের নিয়ম ছিল সমস্ত ছাত্রকে অবশ্যই মসজিদে নামায পড়তে হবে। এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেলে চার আনা পরিমাণ জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। পরিমাণটা খুবই হালকা ছিল। ফলে ধনী ঘরের ছাত্ররা মাসের শুরুতেই সারা মাসের জরিমানা একত্রে অগ্রিম দিয়ে দিত। তারপর স্বাধীন, যখন যেভাবে ইচ্ছা নামায পড়। জরিমানাটা বেশি কম হলে পরিণাম এমনই

হয়। কাজেই জরিমানার অংক এমন হওয়া চাই, যা আদায় কিছুটা কষ্টসাধ্য অথবা জরিমানা হিসেবে নফল নামাযও স্থির করা যেতে পারে। উদাহরণত, একবার কারও গীবত হয়ে গেলে চার রাক'আত নফল নামায আদায় করব। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এর সুফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করবেন।

আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণে মনোযোগী হোন

তৃতীয় এলাজ হল আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র ও স্মরণে মনোযোগী হওয়া। কখনও অন্যের সম্পর্কে কুধারণা এসে গেলে নিজ মনোযোগকে সেদিক থেকে ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করুন, ইসতিগফার পড়ুন, কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ুন এবং তাসবীহ-তাহ্‌লীলে লিপ্ত হোন।

অন্তরে বিনয় সৃষ্টি করুন

যা হোক এগুলো ছিল সাময়িক ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। স্থায়ী ও আসল চিকিৎসা হল অন্তরে তাওয়াযূ' জন্মানো। পূর্বেই বলা হয়েছে এসব রোগ মূলত তাকাব্বুর থেকেই জন্ম নেয়। অন্তরে বিনয়ের অভাবেই এগুলো দেখা দেয়। অন্তরে যদি থাকে আত্মম্ভরিতা– আমি যা বলছি ঠিক বলছি, আমি যা চিন্তা করি সেটাই সঠিক, আমি অনেক বুদ্ধিমান, অনেক বড় জ্ঞানী এবং উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী-পরহেযগার, তবে অন্যের সম্পর্কে উচ্চধারণা আসবে কোত্থেকে? এসব ভাবনাই তো মানব মনে কুধারণা সৃষ্টি করে এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণে উৎসাহ যোগায় আর পরিণামে গীবতে লিপ্ত করে। কাজেই এসব রোগের আসল চিকিৎসা হল অন্তরে 'বিনয়' সৃষ্টি করা।

নিজের হাকীকত চিন্তা করুন

অন্তরে তাওয়াযূ' কিভাবে জন্মানো যাবে? এর জন্য কোনও শায়খের হাতে হাত রাখতে হবে। শায়খের সামনে দলিত হওয়া ছাড়া কোনও কিছুই অর্জিত হয় না। শায়খের সাথে লেপটে থাকুন, তার ধমক ও তিরস্কার খেতে থাকুন, তার চোখ রাঙানি ও শাসন বরদাশত করে যান, নিজ রুচি-অভিরুচির বিপরীত হলেও অম্লান বদনে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন, তাহলে ইনশাআল্লাহ ক্রমান্বয়ে অন্তরে তাওয়াযূ সৃষ্টি হতে থাকবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত শায়খ না পাওয়া যায় বা তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ অন্তত পক্ষে এতটুকু কাজ করুন যে, নিজের হাকীকতকে সামনে নিয়ে আসুন। ভাবুন-আমার মধ্যে অহংকার করার মত কী আছে? যা-কিছুই আছে, তা তো আল্লাহ তা'আলারই দান। স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকলে তা তাঁরই দান। রূপ ও সৌন্দর্য থাকলে তাও তিনিই দিয়েছেন, কিছুটা জ্ঞান-বিদ্যা থাকলে তা তাঁরই মেহেরবানী টাকা-পয়সা থাকলে তাও তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকেই লাভ হয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা কেড়েও নিতে পারেন। একজন স্বাস্থ্যবান ও বিত্তবানকে আল্লাহ তা'আলা যখনই চান ভগ্নস্বাস্থ্য ও কপর্দকশূন্য করে দিতে পারেন।

এক ব্যক্তির বলবত্তা,পরিশেষে চরম দুর্বলতা

আমার এক প্রিয়পাত্র ছিল। ইন্তিকাল হয়ে গেছে। গায়ে প্রচণ্ড জোর ছিল। বড়-বড় বরফের চাই এক ঘুষিতে ভেঙ্গে ফেলত। তরমুজ ছুরি দিয়ে কাটত না। দু'হাতে চাপ দিত আর ভেঙ্গে যেত। শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি দেখতে গেলাম। অবাক হয়ে দেখি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। হাত একটু উপরে তুলবে সেই শক্তিটুকুও নেই। মনে মনে বললাম, এই তো সেই 'হামেদ' যে ঘুষি মেরে বরফের চাই ভেঙ্গে ফেলত, আর এখন কিনা সে নিজের হাত নিজে তুলতে পারে না। এই তো মানুষ! সে কিসের উপর অহমিকা দেখায়?

ইলম ও জ্ঞান নিয়ে বড়াই করো না

ইল্‌ম শেখার পর কারও কারও মনে গৌরব সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি একজন বড় 'আলেম, আমি অনেক জানি! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা তার ইলম কেড়ে নিতে পারেন। কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা দেখিয়েও দেন। কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে যায়, কিন্তু মাথায় কোনও লেখা আসেই না। ভেবে পায় না কী লিখবে। অথচ লেখার কতই না গর্ব! একজন বড় কলামিষ্ট হিসেবে কত দেমাক! এমনও ঘটে যে, নিজের নাম লেখার সময় বানানের প্যাঁচ লেগে যায় যে, কোন অক্ষরে লেখা হবে এবং স্বরচিহ্নই বা কোন্‌টা ব্যবহার করা হবে! কাজেই মানুষ কী নিয়ে বড়াই করবে? কোন্ জিনিসের দম্ভ দেখাবে? কিসের উপর তার ভরসা? তার যা কিছু সবই আল্লাহ তা'আলার দান। তিনি যখন ইচ্ছা কেড়েও নিতে পারেন। যে দিন অন্তরে এই চিন্তা

জমাট বাঁধবে, নিজ বড়ত্বের ধারণা ঘুরে যাবে এবং আমি কিছুই নই, অতি তুচ্ছ ও অকর্মন্য-এই বোধ অন্তরে বসে যাবে, ইনশাআল্লাহ সেদিন তাওয়াযুও সৃষ্টি হয়ে যাবে, অন্তরে বিনয় ও নম্রতা বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

আড়াল থেকে কথা শোনা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আড়াল থেকে কারও কথা শোনার চেষ্টা করাও তাজাস্সুস ও ছিদ্রান্বেষনের অন্তর্ভুক্ত। আড়ালে বসা থাকলে মুখে বলে দেওয়া উচিত যে, আমি এখানে বসা আছি। অথবা আড়ালে না থেকে সামনে গিয়েই বসবে। মোটকথা যে-কোনওভাবে নিজ উপস্থিতির কথা জানান দিয়ে দেবে।[১১৫]

মনে করুন দু'জন লোক পরস্পরে কথা বলছে। আপনি গিয়ে আড়াল থেকে তাদের কথা শুনতে শুরু করলেন। এটা সম্পূর্ণ হারাম ও গুনাহ। এটা নিষিদ্ধ তাজাস্সুস বা ছিদ্রান্বেষণের শামিল। কাজেই যে ব্যক্তি আড়ালে বসা থাকে, তার কর্তব্য যারা কথা বলছে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যে, আমি এখানে আড়ালে বসা আছি, যাতে তারা তাদের কোন গোপন কথা না বলে। অথবা সে তাদের সামনে গিয়ে বসবে।

আজকাল আমাদের সমাজে সব কাজই উল্টো চলছে। এরূপ ক্ষেত্রে লোকে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করে এবং আলাপকারীরা যাতে তার উপস্থিতি টের না পায় সেই কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে আড়ালে বসে তাদের কথা শুনতে থাকে। মনে রাখতে হবে, এটাও গোয়েন্দাগিরি ও ছিদ্রান্বেষণের অন্তর্ভুক্ত। তাই হারাম ও নাজায়েয। নৈতিকতার দাবি ছিল নিজ উপস্থিতির কথা তাদের জানিয়ে দেওয়া, যাতে তারা সাবধানে কথা বলে।

দ্বন্দ্ব-কলহের মূল কারণ

আমাদের শরী'আত আমাদেরকে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিয়েছে, যা মেনে চললে আপসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টিই হবে না এবং সমাজে কোন ফ্যাসাদ ও অশান্তি দেখা দেবে না। সমাজে যত অশান্তি ও ফিৎনা-ফ্যাসাদ তা শরী'আতের এ শিক্ষা না মানারই ফল। শরী'আত মূলত এ শিক্ষা দ্বারা ঝগড়া-ফাসাদের দরজায় পাহারা বসাতে চেয়েছিল, যাতে

---

১১৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৪

আমরা আমরা তা অনুসরণ করি এবং সব রকম বিবাদ থেকে বেঁচে যাই। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন।

لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ

'কোনও মজলিসে তিনজন লোক থাকলে, তাদের একজনকে বাদ রেখে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না।'[১১৬]

এভাবে দু'জনে কানাকানি করা জায়েয নয়। এর কারণ কী? কারণ এই যে, এর ফলে তৃতীয় ব্যক্তি ভাববে তারা আমাকে আপন ভাবছে না। তারা হয়ত আমার বিরুদ্ধেই কিছু বলছে, তাই আমাকে শোনাতে চাচ্ছে না। এতে তার মন ভেঙ্গে যাবে এবং পরিণামে বিদ্বেষ জন্মাবে। এ জন্যই দু'জনে আলাদা হয়ে কথা বলা নিষেধ।

যদি আগে থেকেই দু'জনে কথা বলায় লিপ্ত থাকে,তবে তৃতীয় ব্যক্তির সেখানে যাওয়াই উচিত নয়। যাতে তাদের আলাপে ব্যাঘাত না ঘটে। তারা নিজেরা আলাপ করছে, করতে থাকুক। অহেতুক মাঝখানে ঢুকে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কেন?

এসব কিছুই প্রয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু আমরা একে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছি না। আমরা বিশেষ কয়েকটি জিনিসকেই দীন মনে করছি। নামায-রোযা কর, ব্যস দীনদার হয়ে গেলে। দীনকে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। জীবন-যাপনের যে আদব-কেতা ও রীতি-নীতি মহানবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা সেগুলোকে দীন থেকে খারিজ করে দিয়েছি। অথচ তাও তাঁরই শিক্ষা এবং দীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ফোনে আড়ি পাতা

টেলিফোনে আড়িপাতার বিষয়টাও এর মধ্যে আসে। আপনি টেলিফোন করার জন্য রিসিভার তুললে, কানে লাগিয়ে দেখলেন দু'জন লোকের মধ্যে কথা চলছে, সেই আওয়াজ আপনি শুনতে পাচ্ছেন। আপনার ফোনের সাথে অন্য কারও লাইন জুড়ে গেছে। এখন আপনি তাদের আলাপচারিতা শুনতে শুরু করে দিলেন, অথচ তাদের সে ফোনালাপ শোনা আপনার জন্য জায়েয

---

১১৬. বুখারী, হাদীছ নং ৫৮১৪; মুসলিম, হাদীছ নং ৪০৫২; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৭৫১; ইবনে মাজা, হাদীছ নং ৩৭৬৫

নয়। আপনার উচিত ফোন বন্ধ করে দেওয়া। তা না করে যদি শুনতে থাকেন, তবে তা তাজাস্‌সুসের মধ্যে পড়ে যাবে এবং আপনি ছিদ্রান্বেষণের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবেন।

অন্যের চিঠি পড়া

অনুরূপ অন্যের চিঠি পড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। যে-কোনওভাবে অন্যের চিঠি আপনার হাতে পড়ে গেল। আপনি বিনা অনুমতিতে তা পড়তে পারেন না। পড়লে তা তাজাস্‌সুস ও ছিদ্রান্বেষণরূপে গণ্য হবে এবং সে কারণে নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ হবে।

তাজাস্‌সুসের বৈধ রূপ

অনেক সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তাজাস্‌সুস্ বা গোয়েন্দাগিরি জরুরি হয়ে যায়। কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি অন্যদের কাজকর্মে নজরদারি না করলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক তার অধীনস্থ কোন বিভাগে কোন ষড়যন্ত্র বা শৃংখলবিরোধী কাজ হচ্ছে কি না, যা গোটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ধ্বংস বয়ে আনতে পারে, সে ব্যাপারে নজরদারি চালালে কোন দোষ নেই। এটা নিষিদ্ধ তাজাস্‌সুসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তো এ লক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা জায়েয।

হযরত 'উমর (রাযি.)-এর একটি ঘটনা

হযরত 'উমর ফারুক (রাযি.) রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারার অলি-গলিতে টহল দিতেন। এক রাতে তিনি শুনতে পেলেন একটি বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ আসছে, সেই সঙ্গে কিছু গ্লাস নাড়াচাড়ার শব্দও। ভাবলেন এ বাড়িতে হয়ত সূরা পানের আসর চলছে, সঙ্গে গানবাজনাও। কিছুক্ষণ তা দাঁড়িয়ে শুনতে থাকলেন। তারপর দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন ঠিকই সূরাপান চলছে এবং গানবাজনাও হচ্ছে। তিনি তাদের হাতেনাতে ধরে ফেললেন। জলসার কর্তা ব্যক্তিটি খুব হুঁশিয়ার ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করলেন কেন? হযরত 'উমর ফারুক (রাযি.) বললেন, তোমরা মদ্যপান করছিলে এবং গান বাজনায়ও লিপ্ত ছিলে। সেই অপরাধে তোমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লোকটি বলল, আমরা তো একটা অপরাধই করছিলাম, আপনি যে কয়েকটি করলেন? তিনি বললেন, সে

কি? সে বলল, একটি অপরাধ হল, আপনি গোয়েন্দগিরি করেছেন, আমাদের দোষ খুঁজে বেড়িয়েছেন, ভেতরে কী হচ্ছে তা অনুসন্ধান করেছেন। এটা গুনাহের কাজ। দ্বিতীয় অপরাধ করেছেন অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকে। কারও ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা জায়েয নয়। এটাও গুনাহ। তৃতীয় অপরাধ হল দেওয়াল টপকে ঢোকা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

'তোমরা ঘরে ঢুকবে তার দরজা দিয়ে।'[১১৭]

এভাবে আপনি তিন তিনটি অপরাধ করেছেন, আমরা তো করছিলাম একটিমাত্র।

হযরত 'উমর ফারুক (রাযি.) তার একথা শুনে সচকিত হয়ে গেলেন। তিনি তিনটি অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। বললেন, বাস্তবিকই আমার দ্বারা এসব অপরাধ হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।[১১৮]

আমাদের মত কেউ হলে তাকে দুই থাপ্পর মেরে বলত, হতভাগা! একে অপরাধ করছ, আবার আমার উপর আপত্তি? চুরির উপর সিনাজুরি? কিন্তু তাঁরা তো সাহাবী। সূচিশুদ্ধ তাদের মন। তিনি চিন্তা করলেন, অভিযোগ যেহেতু আমার নিজের সম্পর্কে, তাই রদ না করে খতিয়ে দেখা দরকার এর মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা আছে কি না। থাকলে তার প্রতিকার করা উচিত। সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌তিগফার করলেন।

সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত

অতঃপর হযরত 'উমর (রা) বিষয়টা সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে তুললেন বললেন, লোকটি আমাকে এই এই কথা বলেছে। আমি নাকি তিনটি গুনাহ করেছি। তা বাস্তবিকই কি আমি তাজাস্‌সুসের অপরাধ করেছি। এভাবে অনুসন্ধান চালানোতে কি আমি ছিদ্রান্বেষণের গুনাহ করে ফেলেছি? আর দেওয়াল টপকে ঘরের ভেতর ঢোকা কি আমার জন্য জায়েয হয়েছিল? সাহাবায়ে কিরামের সে মজলিস আলোচনা-পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত দিল, কোনও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যদি আশঙ্কা দেখা দেয়, তা জনগণের মধ্যে

---

১১৭. বাকারা : ১৮৯

১১৮. কানযুল উম্মাল, ২/১৬৭

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে এবং সমাজে তার কুফল ছড়িয়ে পড়তে পারে, তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য তাতে নজরদারি করা এবং বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করা, এমনকি তা দেওয়াল টপকে হলেও জায়েয হবে।

কিন্তু অপরাধটি যদি একান্তই ব্যক্তিগত হয় এবং তা দ্বারা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে এরূপ গুপ্তচরগিরি জায়েয হবে না। যেমন কোনও লোক নিজ গৃহে গোপনে কোন অপরাধ করছে, যার ক্ষতি কেবল তার মধ্যেই সীমিত, সমাজে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা নেই, এক্ষেত্রে সরকারি নজরদারি জায়েয নয়। আমাদের ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন্ কোন্ অবস্থায় তাজাস্‌সুস জায়েয এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় জায়েয নয় তার বিশদ ব্যাখ্যা তারা প্রদান করেছেন।

ইমাম খাস্‌সাফ (রহ.) এর 'আদাবুল-কাযা' নামে একখানি গ্রন্থ আছে, যার ভাষ্য রচনা করেছেন "আল্লামা সাদরুশ-শাহীদ (রহ.)। তাতে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। তিনি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নজরদারি জায়েয এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জায়েয নয়, সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এ কথার উপর যে, যে অপরাধ সমাজে কুপ্রভাব বিস্তার করবে বলে আশঙ্কা হয় সে ব্যাপারে সরকারি বা কর্তৃপক্ষের নজরদারি জায়েয। সেক্ষেত্রে দেওয়াল টপকানো, অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ সবই বৈধ। আর যে অপরাধ কেবলই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজে তার কুপ্রভাব পড়ার আশংকা নেই, তাতে কর্তৃপক্ষের নজরদারি জায়েয নয়। দারুল-উলূম করাচির কিছু দায়-দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত আছে, যে কারণে কিছুটা নজরদারি আমাকেও করতে হয়। ছাত্রাবাসে কী অবস্থা চলছে, ছাত্রগণ শৃঙ্খলবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়ছে কি না, সেই খোঁজখবর আমাকে রাখতে হয়। তবে এটা তখনই জায়েয, যখন কোন ব্যাপক অনিষ্টের আশংকা থাকে। অন্যথায় নীরবতাই শ্রেয়।

জাগ্রত থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এমনিভাবে এক ব্যক্তি শুয়ে পড়েছে। অন্যরা মনে করছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই তারা তাদের নিজস্ব কোনও বিষয়ে আলাপ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সে ঘুমায়নি। তার উচিত তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যে, সে সজাগ আছে। অবশ্য তাদের আলাপ যদি তারই সম্পর্কে হয় এবং তারা তার ক্ষতি করতে চায়, তবে আঁড়ি পেতে তাদের কথা শোনা জায়েয হবে।[১১৯]

---

১১৯. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৪ পৃ.

আজকাল উল্টা কারবার চলছে। জাগ্রত ব্যক্তি এমন ভান ধরে যেন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উদ্দেশ্য তাদের যাবতীয় গোপন বিষয় জেনে ফেলা আর পরে নিজ কৃতিত্ব জাহির করা যে, তোমরা যা কিছু বলেছ আমি টের পেয়ে গেছি। অথচ শরী'আত এর কোন বৈধতা দেয়নি। জাগ্রত ব্যক্তির কর্তব্য জেগে থাকার কথা অন্যদের জানিয়ে দেওয়া। এটা শরী'আতের হুকুম। অবশ্য তাদের কথাবার্তা যদি তারই বিরুদ্ধে হয় এবং তার ক্ষতি করার জন্য কোন পাঁয়তারা চালায় তবে ঘুমের ভান ধরে সেসব কথা শুনে ফেলা এবং নিজেকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার অনুমতি আছে। এটা অবশ্যই জায়েয।

ভাষা জানা থাকার কথাও জানিয়ে দেবে

অতঃপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, দু'জন লোক আরবী বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। তৃতীয় একজন সেখানে উপস্থিত আছে। তারও সেই ভাষা জানা আছে, কিন্তু তাদের সে খবর নেই। এ ক্ষেত্রে তার উচিত জানিয়ে দেওয়া যে, আমিও আরবী বা ইংরেজি বুঝি।[১২০] যাতে তারা অসাবধানতাবশত তাদের কোনও গোপন কথা ফাঁস করে না দেয়। বোঝানো উদ্দেশ্য কেউ যেমন নিজে গোয়েন্দাগিরি করবে না তেমনি গোয়েন্দাবৃত্তির প্রেক্ষাপটও রচনা করবে না এমনকি অন্যদেরকে এমন বিভ্রান্তিতেও ফেলবে না, যদ্দরুন তারা তাকে অজ্ঞ বা অসচেতন ভেবে নিজেদের কোন গোপন কথা বলে ফেলবে আর ফাকতালে সে তা জেনে ফেলবে।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

হযরত থানভী (রহ.)-এর মুরীদানের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন, যিনি এমনিতে ইংরেজি শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু হযরত (রহ.)-এর সাহচর্যে আসার পর তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যায়। দীনদার ও আলেমদের মত বেশভূষা, মুখে দাড়ি, লম্বা জামা ইত্যাদি। একবার রেলে সফর করছিলেন। কাছেই দু'জন লোক বসা। তারাও ইংরেজি জানত। তার বেশভূষা দেখে ভেবেছিল মৌলভী মানুষ ইংরেজি জানবে কোত্থেকে। কাজেই তারা ইংরেজি ভাষায় তারই সম্পর্কে আলাপ শুরু করে দিল। ইংরেজিতে বলার উদ্দেশ্য তার কাছে লুকানো। মোল্লা মানুষ, ইংরেজি তো বুঝবে না।

---

১২০. আনফাসে 'ঈসা, ১৫৪ পৃ.

তারা কথা শুরু করতেই তিনি বুঝে ফেললেন, তারা তার কাছে কথা লুকাতে চাচ্ছে আর সে কারণেই ইংরেজিতে বলা। তিনি ভাবলেন, এখন যদি বসে বসে তাদের কথা শুনতে থাকি, তা নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী হবে। তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমিও ইংরেজি জানি। সুতরাং তিনি তাদের বললেন, আমি ইংরেজি বুঝি। আপনারা আমার কাছে লুকাতে চাইলে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করুন। এই ধোঁকায় পড়বেন না যে, আমি ইংরেজি বুঝি না। আপনারা বললে আমি উঠে অন্যত্র চলে যেতে পারি। তাতে আপনাদের সুবিধা হবে। একান্তে বসে আলাপ চালিয়ে যেতে পারবেন।

যা হোক সেই বুযুর্গ চিন্তা করেছিলেন, এই দুইজন ভাবছে আমি ইংরেজি জানি না। তাই আমার উপস্থিতিতে এ ভাষায় কথা বললে কোন সমস্যা হবে না। এখন আমি যদি নীরব বসে থাকি তা তাজাস্সুসের মধ্যে পড়ে যাবে। তা এই ভাবনা তার মনে কেন জেগেছিল? জাগার কারণ তিনি থানাভবনে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। হযরত থানভী (রহ.)-এর সাহচর্য লাভ হয়েছিল। নয়ত আজকাল কত লোকই তো এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু কারও অন্তরে কি এই ভাবনা জাগে যে, আমি আলাপকারীদের জানিয়ে দেই, তোমরা যে ভাষায় কথা বলছ তা কিন্তু আমারও জানা আছে। কেউ তা জানালেও নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করার জন্য জানাবে। ভাবখানা থাকবে, দেখ আমাকে মূর্খ মনে করো না। ওই ভাষা আমিও বেশ জানি। তাজাস্সুসের গুনাহ থেকে বাঁচার লক্ষে জানাবে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। বরং আজকাল তো চুপিসারে কথা শুনে ফেলাকে কৃতিত্বই গণ্য করা হয়। পরে গর্বভরে বলা হয় তোমরা তো আমার কাছে লুকাতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখ তোমরা যা-যা বলেছ কেমন সব জেনে ফেললাম।

বস্তুত এসব বিষয়ে লক্ষ রাখাও দীনের অংশ, অথচ আমরা একে দীন থেকে খারিজ করে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে সচেতনতা দান করেন তার এসব কথা ঠিকই বুঝে আসে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ১ম খণ্ড, ২১৫-২৪৬ পৃষ্ঠা

রাগ ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

কয়েক বছর যাবৎ রমযানুল-মুবারকে জুহ্রের নামাযের পর হযরত থানভী (রহ.)-এর 'আনফাসে 'ঈসা'-গ্রন্থখানির তালীম চলছে। এখন চলছে মন্দ প্রবণতাসমূহের আলোচনা। তার ভেতর একটা প্রবণতা হল ক্রোধ ও উত্তেজনা। আজকের আলোচনা সে সম্পর্কেই। সুফিয়ায়ে কিরাম ক্রোধকে উম্মুল আমরায' বা সর্বরোগের মূল সাব্যস্ত করেছেন্ অর্থাৎ এমনই এক রোগ, যা থেকে আরও বহু রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নানা রকম গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যেমন রাগে দিশাহারা হয়ে গালাগালি করা হয়, অশ্লীল কথা বলা হয়, আরও বেশি রেগে গেলে মারধর করা হয় এবং তাতে অনেক সীমালঙ্ঘনও করা হয়।

রাগের সাথে আরও যা যুক্ত হয়ে পড়ে

মানুষ অন্যের উপর রাগ করে সাধারণত তখনই, যখন নিজেকে তারচে' উত্তম মনে করে। নিজেকে ছোট ও হীন মনে করলে কখনও অন্যের উপর রাগ আসবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে রাগের সাথে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার রোগ যুক্ত থাকে। কখনও কখনও এর সাথে বিদ্বেষও জুড়ে যায়। এরূপ আরও বহু আত্মিক রোগ-ব্যাধি ক্রোধের সাথে সহাবস্থান করে। এ কারণেই সুফিয়ায়ে কিরামের কাছে কেউ এসলাহের জন্য আসলে তারা সর্বপ্রথম এই রাগেরই চিকিৎসা করতেন।

দুটি মজ্জাগত বিষয়

মানব স্বভাবে দু'টি মৌলিক রিপু আছে। একটি ক্রোধ, অন্যটি কাম। কাম বা চাহিদা আবার দু'রকম। উদরের চাহিদা ও যৌন চাহিদা। লক্ষ করলে দেখা যাবে দুনিয়ায় যত পাপ পঙ্কিলতা এ রিপু দু'টিই তার মূল। এ কারণেই সূফিয়ায়ে কিরাম সর্বপ্রথম ক্রোধের চিকিৎসা করতেন। কেননা, ক্রোধ

নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষ অজস্র গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং নানা রকম বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংক্ষিপ্ত নসীহত

একবার জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করলেন–

عِظْ وَاَوْجِزْ

'আমাকে নসীহত করুন এবং তা সংক্ষিপ্তাকারে করুন'।

তার এ কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হলেন না যে, কি আশ্চর্য উপদেশও চাচ্ছে আবার শর্তও জুড়ে দিচ্ছে তা লম্বা হতে পারবে না। সংক্ষেপ কথা বলতে হবে! বোঝা গেল উপদেশপ্রার্থী যদি বলে আমাকে সংক্ষেপে নসীহত করুন, তা দূষণীয় নয়। কাজেই এতে রাগ করা যাবে না। কেননা এটা তার হক' সে যদি উপদেশ চায় আর তার সময় কম থাকে, তবে সে সংক্ষেপ করার কথা বলতেই পারে। এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য সংক্ষেপেই নসীহত করা। তার বদলে আপনি যদি দীর্ঘ ওয়াজ শুরু করে দেন আর দুই আড়াই ঘন্টা তাকে আটকে রাখেন, তাতে তার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তার হয়ত ট্রেন ধরার ছিল, বা কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ না রাখায় নসীহত প্রার্থনা করাটা তার জন্য মসীবতের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তার মাথায় যখন ট্রেন ধারার চাপ, তখন বসে বসে আপনার দীর্ঘ ওয়াজ সে কিইবা শুনবে, কিইবা বুঝবে আর কিইবা আমল করবে? কাজেই উপদেশদাতার কর্তব্য শ্রোতার অবস্থা বিবেচনায় রাখা ও সমজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া। এ হাদীছে শ্রোতা তো নিজেই বলে দিয়েছে, আমার কাছে সময় কম, তাই আমাকে সংক্ষেপে নসীহত করুন।

রাগ করো না

সুতরাং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষেপেই নসীহত করলেন, বললেন, لَا تَغْضَبْ 'রাগ করো না'[১২১] এর দ্বারা বোঝা যায় রাগই সকল অনিষ্টের উৎস। যে কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

১২১. বুখারী, হাদীছ নং ৫৬৫১ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৪৩; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৩৮৯।

সাল্লাম হাজারও দোষ-ক্রটি, কুস্বভাব ও দুষ্কর্মের মধ্য হতে কেবল 'ক্রোধ'-কে বেছে নিয়েছেন। তিনি চাইলে বলতে পারতেন, মিথ্যা বলো না, গীবত করোনা, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, ইত্যাদি। এসব কিছু ছেড়ে তিনি বলেছেন 'রাগ করো না'। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, রাগ অত্যন্ত খারাপ জিনিস, এটি সমস্ত গুনাহের মূল। এতে যে আক্রান্ত হয়ে যায়, সে বহুবিধ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

রাগ একটি প্রয়োজনীয় গুণও বটে

তবে রাগ সর্বাবস্থায়ই মন্দ নয়। কখনও কখনও এর প্রয়োজনও পড়ে। রাগ বিলকুল না থাকলে মানুষ প্রাণরক্ষাও করতে পারে না। মনে করুন কোন শত্রু আপনার উপর হামলা চালাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি আপনার রাগ না ওঠে তবে পরিণতি কী দাঁড়াবে? আপনি তো মার খেতে খেতে মরেই যাবেন। এক্ষেত্রে প্রাণরক্ষা করতে হলে রাগের ব্যবহার করতেই হবে।

জনৈক বাহাদুর ব্যক্তির ঘটনা

আমার মহান পিতা একটি ঘটনা শোনাতেন। এক ব্যক্তি খুব বাহাদুর ছিল। উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সব কাজই চাকর দিয়ে করতে অভ্যস্ত ছিল। নিজ হাতে কিছু করত না। একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখল ঘরের মধ্যে বাঁদর ঢুকে পড়েছে। একটা বাঁদর তার কোট তুলে নিয়েছে। আরেকটি নিয়েছে তার প্যান্ট এবং আরেকটির কাছে তার হ্যাট। বীর পুরুষটি বিছানায় শুয়ে এসব তামাশা দেখছিল আর ডাক ছেড়ে বলছিল, আরে কোনও পুরুষ আছে কি, এই বাঁদরগুলো তাড়িয়ে দিক না। ইতেমোধ্যে তার এক বন্ধু এসে উপস্থিত। সে এ অবস্থা দেখে বলল, তুমিও তো একজন পুরুষ! একথায় সে বলে উঠল, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আমিও তো পুরুষ বটে। এই বলেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল এবং বাঁদরগুলোর পেছনে দৌড় লাগল। কিন্তু এর মধ্যে বড় দেরি হয়ে গেছে। বাদরের দল তার পোষাক-আশাক নিয়ে সেই কখন বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কাজেই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পরিস্থিতি দেখতে থাকা, আর কোনওরূপ প্রতিরোধ না করে নিজেকে ক্ষতির মুখে ছেড়ে দেওয়া– এটাও কোন প্রশংসনীয় কাজ নয়; বরং এটা মানব স্বভাবের পরিপন্থী। স্বভাবের চাহিদা হল যে– কোনও আক্রমণের সামনে রুখে দাঁড়ানো এবং ক্ষোভ ও ক্রোধের সাথে তা প্রতিহত করা।

ক্ষেত্র বিশেষে রাগ 'ইবাদতও বটে

কাজেই রাগ সর্বার্থে খারাপ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয়ও বটে, বরং কখনও কখনও তা ইবাদতেও পরিণত হয়। উদাহরণত কেউ যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবী করে (নাউযুবিল্লাহ), আর কোনও মুসলিম তাতে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ না হয়, তবে এটা তো তার চরম অপদার্থতা ও নির্লজ্জতা। এক্ষেত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করাই 'ইবাদত। সুতরাং মনে রাখতে হবে ক্রোধমাত্রই দোষের নয়; বরং বহুক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সঠিক ও উত্তম বরং অবশ্যকর্তব্যও হয়ে যায়। আবার বহুক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অন্যায় এবং কখনও গুনাহও বটে।

সালেক বা আধ্যাত্মিকতার পথযাত্রী প্রথম দিকে রাগ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে

তবে আত্মাশুদ্ধির লক্ষে কোনও মুরীদ যখন কোন শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তখন তাকে প্রথম যে সবক দেওয়া হয়, তার একটা অংশ হল- তুমি এখন কারও সাথে বিলকূল রাগ করবে না। কেননা কোথায় রাগ করা উচিত এবং কোথায় অনুচিত তার মধ্যে প্রভেদ করার যোগ্যতা তোমার নেই। অনুশীলনের মাধ্যমে তোমাকে প্রথমে সে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেজন্যই এখন তোমার কাজ হল একদম রাগ না করা। একে মুজাহাদা বলা হয়ে থাকে। এর মানে কোন নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচার লক্ষে চোরাপথ বন্ধ করার জন্য বৈধ কাজও পরিহার করা। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানূতবী (রহ.) মুজাহাদাকে বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, কোন মোচড়ানো কাগজকে যদি স্বাভাবিকভাবে সোজা করতে চাও তা কিছুতেই সোজা হবে না। তা সোজা করার উপায় হল উল্টো দিকে মুড়িয়ে দেওয়া। উল্টোদিকে মোড়ানোর পর সেটি ছেড়ে দাও, দেখবে একদম সোজা হয়ে গেছে।

নফসকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও

এমনিভাবে আমাদের নফস ও মনও গুনাহের দিকে ঘুরে আছে। তাকে সোজা করতে চাইলে স্বাভাবিকভাবে পারবে না। এজন্য তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাকে দিয়ে কিছু বৈধ কাজও ছাড়িয়ে দাও। বৈধ কাজ ছাড়তে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। এরই নাম মুজাহাদা। এই মুজাহাদার জন্যই সূফিয়াযে কিরাম বলেন, শুরুদিকে একদম

রাগ করো না। এর ফলে একটা সময় এমন আসবে, যখন রাগ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। তারপর যখন রাগ করবে তা সঠিক জায়গায়ই করা হবে। ভুল জায়গায় করা হবে না। ন্যায় ও অনুচিত রাগ করা হবে না। যা হোক এই রাগের প্রতিকার সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) কিছু ব্যবস্থা দান করেছেন। আমরা তার সামান্য ব্যাখ্যা পেশ করছি।

রাগের প্রথম এলাজ-আপন দোষচিন্তা

হযরত থানভী (রহ.) রাগের প্রথম এলাজ দান করেছেন এই যে, জোরপূর্বক ক্রোধ সংবরণ করত: নিজ দোষ-ক্রটি চিন্তা করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ উত্তেজনা হ্রাস পাবে।'[১২২]

একজনে হযরত (রহ.)-এর কাছে চিঠিতে লিখেছিল, আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তুচ্ছ-তুচ্ছ কারণে রাগ উঠে যায়। হযরত (রহ.) তার প্রতিকার দিয়েছেন, যখন রাগ উঠতে শুরু করে এবং কোনও বিষয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়, তখন কষ্ট করে হলেও রাগ সংযত করুন এবং নিজ দোষ-ক্রটি চিন্তা করতে থাকুন। কেননা রাগের ভেতর কিছুটা আত্মম্ভরিতার ব্যাপারও থাকে। অন্যকে তুচ্ছ ও নিজেকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয় বলেই রাগ ওঠে। কাজেই তার প্রতিকার হল নিজ ক্রটি-বিচ্যুতির দিকে নজর দেওয়া। চিন্তা করবে যে, আমার মধ্যে অনেক দোষ-ক্রটি আছে। এই রাগের ব্যাপারটাও তার একটা। আমি ভালো হলে এতটা তীব্র রাগ দেখা দিত না। এভাবে নিজ দোষ-ক্রটি নিয়ে ভাবতে থাকলে রাগের তীব্রতা কমে যাবে। তবে এর জন্য ফিকির থাকা অপরিহার্য। যার এই ফিকিরই নেই যে, আমার কী পরিমাণ রাগ উঠেছে, রাগের বশে আমার মুখ থেকে কি কঠিন কঠিন কথা বের হয়ে গেছে, কতটা অনুচিত কাজ আমার দ্বারা হয়ে গেছে, তার এ রোগ তো কোনও দিন ভালো হওয়ার নয়।

যা হোক রাগের এলাজ হল নিজের ভেতর ফিকির জন্মানো। কারও মধ্যে যখন ফিকির ও চিন্তা জন্ম নেয় তখন চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থাই দেওয়া হবে তা তার পক্ষে ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায় কোনও চেষ্টাই কাজে আসার নয়। এজন্যই হযরত (রহ.) বলেন, রাগ উঠলে নিজ দোষ-ক্রটি চিন্তা করতে থাকুন, ইনশাআল্লাহ রাগ কমে যাবে।

---

১২২. আনফাসে 'ঈসা : ১৭০

দ্বিতীয় এলাজ যার উপর রাগ উঠেছে তার থেকে দূরে সরে যাওয়া

হযরত থানভী (রহ.) রাগের দ্বিতীয় প্রতিকার বলেছেন, 'যার উপর রাগ ওঠে, তৎক্ষণাৎ নিজে তার থেকে দূরে সরে যাওয়া অথবা তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, যখন যেমন সুবিধা হয়।'[১২৩]

রাগের বৈশিষ্ট্যই হল, যার উপর রাগ ওঠে তার কাছে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে করে রাগ আরও বেড়ে যায়। যতক্ষণ সে চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ উত্তেজনা বাড়তে থাকে, যদ্দরুন তার উপস্থিতিতে রাগ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্যই হযরত রহ. পরামর্শ দিয়েছেন, যার উপর রাগ উঠেছে শীঘ্র তার থেকে দূরে সরে যাও বা তাকেই দূরে চলে যেতে বল।" এতে আস্তে-আস্তে রাগ প্রশমিত হতে থাকবে।

খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই এ ব্যবস্থা প্রমাণিত আছে। তিনি এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত ওয়াহ্শী (রা)-কে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন। হযরত ওয়াহ্শী (রাযি.) উহুদের যুদ্ধে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামাযা (রাযি.)-কে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলামগ্রহণের তাওফীক দান করেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আমার সামনে বসবে না। তুমি সামনে আসলে প্রিয় চাচার প্রতি শোক তাজা হয়ে ওঠে। পরিণামে রাগ ওঠার আশংকা থাকে।'[১২৪] এরই ভিত্তিতে হযরত থানভী (রহ.) পরামর্শ দিয়েছেন, যার উপর রাগ ওঠে তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

রাগের অবস্থায় শাস্তি দিও না

এমনিভাবে নিজের চেয়ে ছোট কারও উপর বৈধ রাগ দেখা দিলে সেই রাগের অবস্থায় তাকে কিছুতেই শাস্তি দেবে না। হয়ত নিজ সন্তান বা ছাত্রের উপর তার অসংগত কোন আচরণে রাগ উঠেছে। ক্রুদ্ধাবস্থায় মানুষের মন-মেজাজের ভারসাম্য থাকে না। এ অবস্থায় শাস্তি দিলে সীমালংঘণ হয়ে যায়। কাজেই এই রাগ নিয়ে কিছুতেই তাকে বকবে না বা শাস্তি দেবে না। বরং অপেক্ষা করবে। রাগ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত মামলা স্থগিত রাখবে। পরে যখন

---

১২৩. আনফাসে 'ঈসা : ১৭০

১২৪. হায়াতুস সাহাবা, ১খ, ৭০, ৮১ পৃ.

মন মেজায ঠাণ্ডা হবে, উত্তেজনা কমে যাবে, তখন তাকে কাছে ডাকবে। প্রথমে তাকে তার কি ভুল হয়েছে তা জানাবে। তারপর প্রয়োজন মনে হলে ধমক বা শাস্তি দেবে। এই ধমক ও শাস্তি যেহেতু রাগ ও উত্তেজনার সাথে হয়নি, তাই তা সীমার মধ্যে থাকবে, বাড়াবাড়ি হবে না।

তৃতীয় এলাজ-আল্লাহর শাস্তি চিন্তা করা

হযরত থানভী (রহ.) রাগের তৃতীয় প্রতিকার বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার আযাবের কথা স্মরণ করবে।'[১২৫]

এ ব্যবস্থাও হাদীছ শরীফ থেকে গৃহীত। একবার হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) তাঁর গোলামকে ধমকাচ্ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন,

لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

"গোলামটির উপর তোমার যা ক্ষমতা, তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা তারচে' অনেক বেশি ক্ষমতাবান।"[১২৬]

অর্থাৎ তুমি যে এ গোলামটিকে শাস্তি দিচ্ছ, একটু চিন্তা করে দেখ, তুমিও যদি আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও আযাবের কবলে পড়ে যাও তখন কী দশা হবে! এভাবে আল্লাহ তা'আলার আযাবের কথা স্মরণ করলে উত্তেজনা কমে আসে এবং রাগের আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তারপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, নিজ পাপরাশির কথা স্মরণ কর এবং সেজন্য বেশি-বেশি ইস্‌তিগফারে রত হও'।

এটা প্রথমোক্ত এলাজেরই অংশ, যাতে নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। যা হোক, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) তার এ বাণীতে ক্রোধের তিনটি প্রতিকার বাতলে দিয়েছেন। রাগের সময় কেউ এর অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ সে রাগ তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

---

১২৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৭০ পৃ.

১২৬. মুসলিম, হাদীছ নং ৩১৩৬; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৮৭১; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৪৯২; আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৪৬৭। প্রকাশ থাকে যে, এই বরাতগ্রন্থসমূহে এ ঘটনাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে নয়; বরং হযরত আবূ মাস'উদ আনসারী (রাযি.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তার আসল নাম 'উকবা ইবন 'আমর।

রাগের চাহিদানুপাতে কাজ করো না

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখল, 'কেউ আপনাকে কিছু বললে বা কোন আপত্তি করলে আমার শরীরে আগুন ধরে যায়।

হযরত (রহ.) উত্তরে লেখেন, 'তবে সেই রাগের বশবর্তীতে প্রতিশোধ গ্রহণের পেছনে পড়বে না, এমন কি মুখের দ্বারাও নয়।'[১২৭]

অর্থাৎ রাগ উঠলে উঠুক, কিন্তু রাগের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করো না এবং প্রতিশোধ নিতে যেও না। এমন কি মুখের দ্বারাও প্রতিশোধ নেওয়ার ফিকির করো না।'

ক্ষমা করাই শ্রেয়

শরী'আত ক্ষেত্রবিশেষে রাগ করার অনুমতি দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে রাগ করা জায়েয। যেমন সীমার ভেতর থেকে প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু জীবন গঠন ও আত্মশুদ্ধির লক্ষে এবং প্রতিশোধগ্রহণে যাতে সীমালংঘন না হয় সেই প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রথমে এই মুজাহাদা করানো হয় যে, মুরীদকে বৈধ প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও বিরত রাখা হয়। সীমার ভেতর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তো জায়েয, কিন্তু রাগের বশবর্তীতে সেটাও করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। মোটকথা রাগের চাহিদানুসারে অবৈধ তো নয়ই, বৈধ কাজও করতে যাবে না। বরং ক্ষমা করে দেবে। ক্ষমা করাই শ্রেয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে (তারাই মুত্তাকী ও সৎকর্ম পরায়ণ)। আল্লাহ সৎকর্মপরায়নদের ভালোবাসেন'।[১২৮]

সুতরাং ক্ষমা করা আল্লাহ তা'আলার খুব পসন্দ। এর ফযীলত অনেক। তাই মুরীদকে শুরু দিকে সবক দেওয়া হয় যে, কিছুতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না বরং ধৈর্য ধারণ করবে এবং যারা দুর্ব্যবহার করবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবে। এর ফলে সবরের সওয়াব তো পাবেই সেই সঙ্গে ক্ষমা করার জন্যও পৃথক সওয়াবের অধিকারী হবে।

---

১২৭. আনফাসে 'ঈসা, ১৭০ পৃ.

১২৮. আলে-ইমরান : ১৩৪

বুযুর্গানে দীনের বিবিধ রূপ

'আরওয়াহে ছালাছা'- গ্রন্থে হযরত থানভী (রহ.) ঘটনা লিখেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি তার শায়খকে বলল, হযরত! আমি শুনেছি ওলী-বুযুর্গদের রং ও রূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচিবোধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আমার বড় সাধ সেই বৈচিত্র্য দেখি। শায়খ প্রথমে বললেন, এটা আবার কোন চক্করে পড়ে গেলে? ছাড় এসব! আপন কাজে লেগে থাক। কিন্তু সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল। তাকে তা দেখতেই হবে। শেষে তিনি বললেন, দিল্লীতে কুত্‌বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মাজারের কাছে যে ছোট মসজিদ আছে সেখানে চলে যাও। মসজিদের ভেতর তিনজন লোককে দেখবে যিক্‌রে রত আছে। তুমি গিয়ে তাদের প্রত্যেককে পেছন থেকে একটা ঘুষি মারবে। এতে তাদের যে প্রতিক্রিয়া হয় তা এসে আমাকে জানাবে।

কথামত লোকটি সেই মসজিদে চলে গেল। দেখল, ঠিকই তিনজন লোক বসে-বসে যিক্‌র করছে। সে প্রথমে একজনকে পেছন দিক থেকে ঘুষি মারল। কিন্তু সে নির্বিকার। কে মারল, কেন মারল ফিরেও দেখল না; বরং আপন কাজেই মশগুল থাকল। তারপর দ্বিতীয়জনের কাছে গেল এবং একইভাবে তাকেও একটা ঘুষি মারল। ঘুষি মারতেই সেই বুযুর্গ উঠে দাঁড়াল এবং তাকেও অনুরূপ একটা ঘুষি লাগিয়ে দিল। তারপর আবার আগের মত যিক্‌রে মশগুল হয়ে গেল। তারপর যখন তৃতীয়জনকে মারল, সে উঠে তার হাত ধরে টিপতে লাগল আর বলল, ভাই ব্যথা লাগেনি তো?

প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সময় নষ্ট করা কেন?

তারপর সেই ব্যক্তি শায়খের কাছে ফিরে গেল এবং পূর্ণ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল। বলল, আমার সাথে বড় অদ্ভুত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমজনকে ঘুষি মারলে তিনি ফিরেও তাকালেন না। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী করছিলেন? সে জানাল, যিক্‌র করছিল। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, ঘুষি মারার পর কী করলেন? বলল, যথাবৎ যিক্‌রেই মশগুল থাকলেন। শায়খ বললেন, ব্যাপার এই যে, তিনি চিন্তা করলেন, যে ব্যক্তি আমাকে ঘুষি মেরেছে, তা তো মেরেছেই। এখন তো আর তা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। যে ব্যথা পাওয়ার তা পাওয়া হয়ে গেছে। অহেতুক প্রতিশোধ নিতে গেলে সেই ব্যথাও আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, উল্টো সময়ের অপচয়। অন্যকে কষ্ট দিয়ে কেন তা অপচয় করতে যাব। প্রতিশোধ নিতে যে সময় নষ্ট হবে, তা যদি যিক্‌রে ব্যয় করি তাতে আমার অর্জন হবে বিপুল। অনেক সওয়াব ও পুণ্য হাসিল হবে। প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে এটাই

তো শ্রেয়। এই চিন্তা করে তিনি প্রতিশোধের দিকে গেলেনই না; বরং আপন কাজেই লেগে থাকলেন।

সমপরিমাণ বদলা

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে বদলা নিয়েছে, আচ্ছা বল তো, তুমি যতটা জোরে ঘুষি মেরেছিলে, তিনি কি সেই পরিমাণ জোরেই মেরেছেন, না তার বেশি? সে বলল, সমান জোরেই মেরেছেন। শায়খ বললেন, ইনি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শরী'আতেরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

'তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে সেই পরিমাণেই নেবে, যে পরিমাণ কষ্ট তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আর যদি সবর কর, তাহলে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম।'[১২৯]

তিনি যে প্রতিশোধ নিয়েছেন, তাও তোমার কল্যাণার্থেই নিয়েছেন। মনের ঝাল মেটানোর জন্য নেননি। কেননা আল্লাহওয়ালাকে কষ্ট দেওয়া হলে তারা যদি প্রতিশোধ না নিয়ে সবর করেন, তবে অনেক সময় তার পক্ষ হতে সেই প্রতিশোধ আল্লাহ তা'আলাই নিয়ে নেন। ফলে কষ্টদাতার উপর আযাব নেমে আসে। ভেবে দেখুন, আল্লাহওয়ালার সবরও কখনও কখনও কী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই বুযুর্গ মনে করেছেন, আমি সবর করলে সে বিপদে পড়তে পারে। তার চে' বদলা নিয়ে নেই এবং সে আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে যাক। এজন্যই বদলা নিয়েছেন।

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এর অর্থ তো দাঁড়ায় বুযুর্গগণ আল্লাহ তা'আলার চেয়েও বেশি দয়ালু। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হল–

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

'যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দেই।'[১৩০]

---

১২৯. নাহ্‌ল : ১২৬

১৩০. বুখারী, হাদীছ নং ৬০২১; ইবন রাজাব, জামি'উল-'উলূম ওয়াল-হিকাম, ১খ, ৩৫৭; হাফেজ ইবন আহমাদ, ৩খ, ১০০১

বুযুর্গ তো সবর করেন এবং উৎপীড়ককে ক্ষমা করে দেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, শাস্তি দিয়ে দেন। তা হলে বুযুর্গ কি আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি দয়ালু হয়ে গেলেন না?

প্রশ্নের উত্তর

হযরত থানভী (রহ.) প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, দেখ, বাঘিনীকে কেউ উত্ত্যক্ত করলে বাঘিনী তা অগ্রাহ্য করে, কিন্তু বাচ্চাকে উত্ত্যক্ত করলে বাঘিনী তাকে ছেড়ে দেয় না। ঠিক এরকমই আল্লাহ তা'আলার হক নষ্ট করা হলে তিনি অনেক সময় তা অগ্রাহ্য করেন ও ক্ষমা করে দেন, কিন্তু কেউ আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেআদবী করলে তিনি ক্ষমা করেন না। তাই বলেন,

مَنْ عَادَىٰ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

'কেউ আমার কোনও ওলীর সাথে দুশমনী করলে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেই।'[১৩১]

প্রকাশ থাকে যে, বুখারী শরীফে বর্ণিত কোনও হাদীছের সনদ সম্পর্কে এতটা বিতর্ক হয়নি, যতটা বিতর্ক মুহাদ্দিসগণ এই হাদীছটির সনদ সম্পর্কে করেছেন। এমন কি কেউ কেউ এ পর্যন্তও বলেছেন যে, নিজ গ্রন্থে এ হাদীছটিকে স্থান দেওয়া ইমাম বুখারী (রহ.)-এর একটি ভুল। কেননা তিনি যে মাপকাঠিতে হাদীছসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন, সে মাপকাঠিতে এ হাদীছ উতরায় না। সে হিসেবে এ হাদীছ তাঁর কিতাবে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণ লিখেছেন, এমন নয় যে, হাদীছটি বিলকুল মাওযূ' (জাল) বা একান্তই য'ঈফ (দুর্বল)। একথা সত্য তাঁর মাপকাটিতে এটি উত্তীর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও এটি নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন এ কারণে যে, তিনি কোনও কোনও সময় সনদে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও অন্যান্য দলীল প্রমাণ ও আলামত ইংগিত দ্বারা যখন নিশ্চিত হন হাদীছটি সহীহ তখন সনদের সে ত্রুটিকে উপেক্ষা করেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গংগুহী (রহ.)-এর জবাব

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের অন্যতম। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পৃষ্ঠপোষকও। সুন্নত ও

১৩১. বুখারী, হাদীছ নং ৬০২১

বিদ'আতের মধ্যবর্তী সীমা নির্ণয়ে তাঁর ভূমিকা বিশাল। একদা তিনি ওয়াজ করছিলেন। বয়ান ছিল কাওয়ালীর বিরুদ্ধে। উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা চলছিল। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যে বলছেন কাওয়ালী নাজায়েয ও হারাম, অথচ আমরা তো জানি হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) কাওয়ালী শুনতেন। উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) হয়ত দলীল জানতেন, আমার দলীল জানা নেই। আমি তো যা জানি তাই মানতে বাধ্য। দেখুন একদিকে কাওয়ালীর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা, অন্যদিকে যখন একজন বুযুর্গের নাম এল তখন কী বিনয় ও আদব। কিভাবে বুযুর্গদের সাথে আদব রক্ষা করতে হয়, তার শিক্ষা আমরা এর দ্বারা পাই।

বুযুর্গানে দীন সম্পর্কে শক্ত কথা উচ্চারণ করো না

বুযুর্গানে দীনের সাথে কোন বিষয়ে মতভিন্নতা দেখা দিলে তাতে কোনও দোষ নেই। ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। কিন্তু সাবধান মত প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সম্পর্কে কোনও কঠিন কথা যেন বলে না বসেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর কী মর্যাদা, তিনি আল্লাহ তা'আলার কতটা নৈকট্যপ্রাপ্ত তা তো জানা নেই। হতে পারে একটা মাত্র কঠিন কথার কারণে আল্লাহ তা'আলার গযব নেমে আসবে এবং জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। এমন কি কারও সম্পর্কে যদি এই সম্ভাবনাও বোধ হয় যে, তিনি একজন আল্লাহওয়ালা, তবে তার সম্পর্কেও কোনও কঠিন কথা যেন মুখ থেকে বের হয়ে না যায়।

যা হোক, রাগ করার বৈধ ক্ষেত্রও আছে। তা হচ্ছে প্রতিশোধগ্রহণ, সীমার ভেতর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয। কাজেই এতটুকু পরিমাণ রাগও করা বৈধ। তারপরও ক্ষমাপ্রদর্শন শ্রেয়। বিশেষত চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধিমূলক অনুশীলনের জন্য প্রথমদিকে বৈধ প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও বিরত থাকা চাই।

রাগ ওঠার ব্যাপারটা ইচ্ছাধীন নয়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, দ্রুত রাগ ওঠাটা একটা স্বভাবগত বিষয়। তা ইচ্ছা-এখতিয়ারের অতীত। এটা নিন্দনীয় নয়। তবে রাগের বশে এমন কোনও কাজ করা অবশ্যই নিন্দনীয়, যাতে সীমালংঘন হয়ে যায়।

অর্থাৎ রাগ ওঠা ইচ্ছাতীত। আর যত ইচ্ছাতীত বিষয় আছে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনও জবাবদিহিতা নেই। জবাবদিহিতা আছে

কেবল এমনসব কাজেরই জন্য যাতে মানুষের ইচ্ছশক্তির ভূমিকা থাকে। কাজেই ইচ্ছার বাইরে যে রাগ দেখা দেয় এবং তজ্জন্য যে মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেজন্য আল্লাহ ধরবেন না। কিন্তু সেই রাগের বশে কাজ করাটা এখতিয়ারী জিনিস, যেমন কাউকে গালি দেওয়া, মারধর করা ইত্যাদি। এতে যদি সীমালংঘন হয়ে যায় তবে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা ধরবেন। আর যতক্ষণ তা না করা হবে অর্থাৎ রাগকে কার্যে পরিণত করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ রাগ ও মানসিক উত্তেজনার দ্বারা কোনও ক্ষতি হবে না।

সীমালংঘন নিন্দনীয়

কিন্তু সাধারণত যখন রাগ দেখা দেয়, মানুষ তার বশীভূত হয়ে যায় এবং ইচ্ছাতীত রাগকে ইচ্ছাধীন কার্যে পরিণত করে ফেলে। রাগের মধ্যে থাকে উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার ফলে তার দেহ-মনে বিদ্যুত খেলতে থাকে এবং এর পরিণামে মানুষ অনেক সময় অন্যায়-অনুচিত কাজ করে ফেলে, সীমালংঘন করে বসে। এদিকেই ইংগিত করে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, ক্রোধের ক্ষিপ্রতা একটা স্বভাবগত বিষয় এবং তা মানুষের ইচ্ছাশক্তির অতীত। এটা দূষণীয় নয়। তবে ক্রোধবশে কাজ করতে গিয়ে যদি সীমালংঘন হয়ে যায়, সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়।

রাগের এলাজ : মনোবল প্রয়োগ

অতঃপর তিনি এর যে প্রতিকার দিয়েছেন তা নিম্নরূপ, 'এর এলাজ হিম্মত ও মনোবলের প্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ কারও উপর যদি রাগ ওঠে এবং তার নাক মুখ ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছা হয়, তবে মনের সেই চাওয়াটাকে কার্যে পরিণত করো না। জোরপূর্বক নিজেকে দমন কর ও তা থেকে বিরত রাখ। স্থির করে নাও ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও যে, আমি নিজ রাগের চাহিদানুযায়ী কখনও কোনও কাজ করব না। হিম্মত ও মনোবলকে কাজে লাগাতে হবে। মন যতই চাক না কেন আমি রাগের বশে কিছু করব না- এরূপ সংকল্পে আবদ্ধ হতে হবে। হাদীছ শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

'বীর পুরুষ সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দেয়। প্রকৃত বীর সেই, যে রাগের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে।'[১৩২]

---

১৩২. বুখারী, হাদীদ নং ৫৬৪৯; মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭২৩; আহমাদ, হাদীছ নং ৬৯২১; মালিক, হাদীছ নং ১৪০৯

মনোবল প্রয়োগের কলা-কৌশল

ক্রোধ সংবরণের আসল উপায় তো হল হিম্মত ও মনোবলের প্রয়োগ। তবে এর কিছু কলা-কৌশল আছে। তা অবলম্বন করলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় এবং তাতে হিম্মতে পরিপক্কতা আসে। ফলে ক্রোধের মুকাবিলায় সফলতা লাভ হয়। হযরত থানভী (রহ.) সেই কলা-কৌশল সম্পর্কে বলেন, 'যার প্রতি ক্রোধ দেখা দেয়, দ্রুত তার থেকে দূরে সরে যাওয়া, আ'উযুবিল্লাহ পড়া, নিজ দোষ-ত্রুটিতে নজর দেওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার গযবকে স্মরণ করা এ সকল বিষয় হিম্মত প্রয়োগে সহায়ক হয়ে থাকে।'[১৩৩]

প্রথম ও দ্বিতীয় কৌশল

প্রথম কৌশল বলেছেন, যার উপর রাগ ওঠে তার কাছে আর এক মুহূর্তও থেক না। দূরে সরে যাও। অথবা তাকেই দূরে সরিয়ে দাও। এতে রাগ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দ্বিতীয় কৌশল বলেছেন أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাই) পড়া। এ ব্যবস্থা কুরআন মাজীদেও দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

'শয়তানের পক্ষ হতে যদি তোমার উপর কোন হামলা আসে, তবে আল্লাহর পানাহ চাও।'[১৩৪]

ক্রোধের আরেক প্রতিকার : দরূদ পাঠ

আরবদের মধ্যে একটা সুন্দর রীতি ছিল। দিন-দিন তা উঠে যাচ্ছে। দু'জন লোকের মধ্যে যখন কোনও বিষয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত, আর তাতে একজন উত্তেজিত হয়ে পড়ত, তখন অন্যজন তাকে বলত–

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়।'

এটা তো পরীক্ষিত ব্যাপার, কাউকে দরূদ পড়তে বলা হলে সে যেমন লোকই হোক না কেন, না পড়ে পারে না।

---

১৩৩. আনফাসে 'ঈসা : ১৭০ পৃ.

১৩৪. আ'রাফ : ২০০

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন পাঠ করত–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

'হে আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর।'

এর পর আর রাগ থাকে কোথায়? ব্যস দু'জনের মধ্যে আপস হয়ে যেত। বড় ভালো একটা রেওয়াজ ছিল। আরবদের মধ্যে যখন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি, সেই বেদুঈন পরিবেশে এরকম ভালো ভালো রীতি-রেওয়াজ ছিল। কিন্তু যতই না আধুনিক সভ্যতার হাওয়া তাদের গায়ে লাগছে ততই সেসব রীতি তাদের থেকে ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। এটাও ক্রোধ নিবারণের একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল।

আল্লাহ তা'আলার গযব চিন্তা করা

হযরত থানভী (রহ.) তৃতীয় কৌশল শিখিয়েছেন নিজ দোষ-ত্রুটি ও আল্লাহ তা'আলার গযবের কথা স্মরণ করা। চিন্তা করবে, আমি ওই লোকের উপর যতটা রাগ করছি, আমার যা দোষ-ত্রুটি তাতে আমার প্রতি তো আল্লাহ তা'আলার এরচে' বেশি রাগ হওয়ার কথা। অথচ তিনি প্রতিনিয়ত ক্ষমা করছেন। আমার যা পাপ ও অপরাধ, সে অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ নাযিল হলে আমার কী গতি হবে? এটি খুবই কার্যকর ব্যবস্থা।

কষ্ট-ক্লেশের সাথে নম্রতা অবলম্বন করবে

তারপর তিনি বলেন, কিছুকাল চিন্তা করে কষ্ট-ক্লেশের সাথে নম্রতা অবলম্বন করবে। কিছুকাল পর তা অভ্যাসে পরিণত হবে। কাজেই মনোবল হারাবে না।'[১৩৫]

অর্থাৎ রাগের অবস্থায় নম্র আচরণ সহজ নয় ঠিক, কিন্তু তবুও কষ্ট-ক্লেশের সাথেই তা করবে। মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে কোমল আওয়াজে কথা বলবে এবং নম্র ব্যবহার করবে। নিয়মিত এর চর্চা করতে হবে। দু'চার দিন করার পর ছেড়ে দিলে চলবে না। এটা তো মজ্জাগত রোগ। তাই জীবন ভরই সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই সর্বক্ষণই এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কখনও হতোদ্যম হবে না ও মনোবল হারাবে না। কিছুকাল চেষ্টা করলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। এক পর্যায়ে নম্রতা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। তখন রাগ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। ফলে অনুচিত রাগ সহজেই পরিহার করা যাবে।

---

১৩৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৭০ পৃ.

রাগ সংবরণের সাতটি উপায়

হযরত থানভী (রহ.) পরে আরেক বাণীতে বলেন, কখনও রাগ উঠলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলবে।

(ক) চিন্তা করবে আমিও একজন অপরাধী। আল্লাহ তা'আলার কত হুকুম অমান্য করেছি। তিনিও যদি আমার প্রতি এভাবে রাগ করেন, তবে আমার দশা কী হবে?

(খ) আমি তাকে ক্ষমা করলে আল্লাহ তা'আলাও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

(গ) রাগের সময় বেকার বসে থাকবে না। দ্রুত কোনও একটা কাজে লেগে যাবে। দীনী বই-পুস্তক পাঠ এরূপ মুহূর্তে বিশেষ উপকারী হয়ে থাকে।

(ঘ) সেই জায়গা থেকে সরে যাবে।

(ঙ) বেশি বেশি আউযুবিল্লাহ পড়বে।

(চ) তাড়াতাড়ি ওযূ করে নেবে।

আমিও তো অপরাধী

এতে প্রদত্ত সর্বপ্রথম ব্যবস্থা হল নিজেকে গুনাহগার ভাবা। চিন্তা করবে আমিও তো একজন অপরাধী ও পাপী লোক। আমি ওই লোকটির উপর যেভাবে রাগারাগি করছি, তেমনি আমার পাপরাশির কারণে আল্লাহ তা'আলাও যদি আমার উপর রাগ করেন, আমার পরিণতি কী দাঁড়াবে? এরূপ চিন্তা করলে রাগ চলে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন

দ্বিতীয় ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ক্ষমা লাভের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। চিন্তা করবে, আমি যার উপর রাগ করেছি তাকে যদি ক্ষমা করে দেই, তবে আল্লাহ তা'আলাও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। ক্ষমা না করে যদি প্রতিশোধ নেই তাতে আমার লাভ কী? লাভ তো কিছুই নেই, উল্টো ক্ষতিরই আশংকা। তার চে' ক্ষমাই শ্রেয়, যেহেতু এর ফলে আখিরাতে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা আছে আর সে তো অনেক বড় প্রাপ্তি। এরূপ চিন্তা করলে আর রাগ থাকবে না।

এক সাহাবীর ঘটনা

একবার জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে উপস্থিত হল। আরয করল, অমূক ব্যক্তি আমার দাঁত ভেঙে দিয়েছে, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। আমিও তার দাঁত ভেঙে দেব। হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিলে তাতে তোমার লাভ কী? তোমার ভাঙা দাঁত তো আর জোড়া লেগে যাবে না। তারচে' এক কাজ কর। তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে দেই আর এভাবে মীমাংসা করে দেই।

সে বলল, আমি মীমাংসায় নেই। আমি তার দাঁতই ভাঙব। হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, ঠিক আছে, শরী'আত তোমাকে এ অধিকার দিয়েছে, তুমি তাঁর দাঁত ভেঙে দাও। সে যখন দাঁত ভাঙার জন্য তার দিকে এগুচ্ছিল, হযরত আবুদ-দারদা' (রা) তাকে থামালেন, বললেন, তুমি তো তার দাঁত ভাঙতে যাচ্ছ, তার আগে একটা কথা শুনে যাও। জিজ্ঞেস করল, কি কথা? তিনি বললেন, এখনও পর্যন্ত তুমি মজলূম আছ। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি একটু বেশি আঘাত দিয়ে ফেল, তবে তখন তুমি জালেম হয়ে যাবে আর জুল্‌ম করার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাকে ধরা খেতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি ক্ষমা কর, তবে সে সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন শোন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দার দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে ক্ষমা করে দেবেন, যে দিন ক্ষমালাভের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি। লোকটি বলল, আপনি নিজে একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন জী হাঁ, আমি নিজ কানে তাঁকে একথা বলতে শুনেছি। লোকটি বলল, তবে আমি তাকে ক্ষমাই করে দিলাম।

দেখুন লোকটা কতই না উত্তেজিত ছিল। কিছুতেই মীমাংসায় প্রস্তুত ছিল না। ক্ষমা করতে রাজি ছিল না। একই জিদ, তার দাঁত ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু যেই না নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ শুনতে পেল অমনি তার রাগের উপর পানি পড়ে গেল। এই হল মুমিনের শান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সহজ পথ বাতলে দিয়েছেন- তুমি যদি ক্ষমা কর, আখিরাতে তোমাকেও ক্ষমা করা হবে।

কোনও একটা কাজে লেগে যান

তৃতীয় ব্যবস্থা হিসেবে বলেছেন, কোনও কারণে রাগ উঠলে তখন নিষ্কর্মা বসে না থেকে সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটা কাজে লেগে যাওয়া উচিত, বিশেষত দীনী বই-পুস্তক পাঠে রত হয়ে পড়বে। চতুর্থ ব্যবস্থা হল, সেই স্থান থেকে সরে যাওয়া, পঞ্চম ব্যবস্থা আউযুবিল্লাহ... পড়া, ষষ্ঠ ব্যবস্থা পানি পান করা আর সপ্তম ব্যবস্থা হল ওযূ করা।

নিজেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনা

ক্রোধ সংবরণের আরও একটি উপায় হল নিজেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনা। অর্থাৎ রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে এবং বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। কেননা ক্রোধের ধর্ম হল উঁচুতে চড়ে মস্তিষ্ককে উত্তাল করা। তাই দেখা যায় শোওয়া ব্যক্তির রাগ উঠলে সে উঠে বসে যায়। বসা অবস্থায় রাগ উঠলে দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়ানো থাকলে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তো এই যখন রাগের ধর্ম, তখন এর চিকিৎসা করতে হবে বিপরীত আচরণ দ্বারা। সুতরাং রাগের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে আর বসা থাকলে শুয়ে যাবে।

যা হোক এসবই হল ক্রোধ সংবরণের বিভিন্ন উপায়। এসব উপায় অবলম্বন করলে ইনশাআল্লাহ হিম্মত ও মনোবল জন্ম নেবে, ফলে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে যাবে। হিম্মতই আসল জিনিস। এ উপায়গুলো কাজে আসবে তখনই, যখন হিম্মত ও মনোবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হবে। উদ্দেশ্য যদি মনোবল সৃষ্টি না হয় এবং ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পকে শানিত করা লক্ষ না থাকে তবে পানিই পান করুন কিংবা আউযুবিল্লাহ-ই পড়ুন, কোন কিছুতেই সুফল পাওয়া যাবে না। তাই প্রথমে অন্তরে এই হিম্মত ও সংকল্প নিয়েই কাজে নামতে হবে যে, যা-কিছুই হোক না কেন, আমি কিছুতেই রাগের বশবর্তীতে কোনও কাজ করব না, রাগের চাহিদা পূরণে লিপ্ত হব না। অতঃপর এই ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করলে তা হিম্মতের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ দেবে।

ক্রোধ সংবরণের উপায়

হযরত থানভী (রহ.) ক্রোধ সম্পর্কে তার এক বাণীতে একটি মৌলিক কথা বলেছেন। তা নিম্নরূপ,

আকস্মিকভাবে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়ার ব্যাপারটা ইচ্ছাতীত। তাই এটা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সেই উত্তেজনাকে জিইয়ে রেখে তদনুযায়ী কাজ করা (অর্থাৎ রাগের বশবর্তীতে কোন কাজ করা) সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বিষয়। আর ইচ্ছাধীন কাজ হতে বিরত থাকাও ইচ্ছাধীনই হয়ে থাকে। সুতরাং ক্রোধের চাহিদানুযায়ী কাজ হতে বিরত থাকাটা ইচ্ছাধীন সাব্যস্ত হল, যদি (এই বিরত থাকার অনুশীলনী নেওয়া হয় বারবার রাগের চাহিদানুরূপ কাজকে বর্জন করা হয়, তবে এক পর্যায়ে চাহিদাটাই (অর্থাৎ ক্রোধকে কার্যে পরিণত করার চাহিদা) নিস্তেজ হয়ে যাবে।'[১৩৬]

গতকাল আরয করা হয়েছিল, রাগ কেন উঠল সেজন্য আখিরাতে ধরা হবে না, কিন্তু রাগের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কাউকে ধমক দিলে কাউকে বকা দিলে বা মারধর করলে সেজন্য অবশ্যই ধরা হবে। এজন্যই হযরত (রহ.) বলেন, রাগের এলাজ হল, রাগের বশবর্তীতে কোন কাজ করো না। তাতে রাগের উত্তাপ-উত্তেজনা যত বেশিই হোক না কেন। ক্রোধ ক্রোধের জায়গায় থাকুক। তাতে উত্তেজিত হয়ে মুখ থেকে কোন কথা বের করো না এবং কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করো না; বরং সেই চাহিদাকে দমন করে রাখ। বারবার দমন করতে থাকলে ক্রমান্বয়ে উত্তেজনাও কমে আসবে এবং এভাবে রাগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বস্তুত এটাই রাগের প্রতিকার। যত বেশি হজম করবে ততই তা নিয়ন্ত্রণে আসবে। আর যত বেশি লাই দেবে এবং রাগের চাহিদা পূরণ করবে ততই তার তেজ বাড়বে।

বান্দার যে ঢোক গেলা আল্লাহর পসন্দ

ইমাম গাযালী (রহ.) ইহ্য়াউল-'উলূম 'গ্রন্থে হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে বান্দার কোনও ঢোক গেলাই এত বেশি পসন্দ নয়, যতটা পসন্দ রাগের ঢোক গেলা।'[১৩৭]

অর্থাৎ মানুষ পানি পান করে, শরবত পান করে, দুধ পান করে এবং আরও যা-কিছুই পান করে, তা এক-এক ঢোক করে পান করতে থাকে। এসব জায়েয। কিন্তু এর কোনওটিই আল্লাহ তা'আলার কাছে রাগের ঢোক গেলা অপেক্ষা বেশি প্রিয় নয়। রাগ গলাধঃকরণের অর্থ আল্লাহ তা'আলার মহিমাকে সামনে রেখে ক্রোধ সংবরণ করা, তাঁর ভয়ে রাগ হজম করা,

---

১৩৬, আনফাসে 'ঈসা : ১৭১ পৃ.

১৩৭. ইহ্য়াউল-'উলূম, ৩খ, ১৬৭ পৃ.; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২৮৬০

রাগের চাহিদা পূরণ না করা এবং রাগের বশে কোন কাজ না করা। এই রাগ সংবরণের কাজটি আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

বিচূর্ণ মনের মহিমা

বস্তুত এরূপ মুজাহাদাই কাম্য। 'দিল'-এর এর উপর যখন আঘাত পড়ে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে যখন তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়, তখনই সে 'দিল্' আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী ও তাঁর জ্যোতিপাতের উপযুক্ত আধারে পরিণত হয়। কবি বলেন,

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

'তুমি এ আরশি এত যত্নের সাথে আগলে রাখছ কেন? একে ভাঙতে দাও। কারণ এটা অন্যরকম এক আরশি। এটা যতই ভাঙবে, কারিগরের কাছে ততই প্রিয় হয়ে উঠবে।'

অর্থাৎ এ মনকে ভেঙ্গে চূর্ণ কর। যত বেশি চূর্ণ হবে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে ততই প্রিয় হয়ে উঠবে। এ দিলের উপর যত বেশি আঘাত পড়বে, এটা যত বেশী ক্ষত-বিক্ষত হবে, এর উপর তত বেশি আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী ও জ্যোতিবর্ষণ হবে। আল্লাহ তা'আলা মানব মনে নানা রকম চাহিদা দিয়েছেন। আর তা দিয়েছেনই দমন করার জন্য, চূর্ণ করার জন্য। সেই চূর্ণ করার মধ্যেই তার উৎকর্ষ নিহিত। এজন্য দেননি যে, মানুষ তা পূরণ করবে, সেই মত কাজ করবে আর এভাবে নিজের মানবিকতাকে ধ্বংস করবে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন−

إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ

'জান্নাতকে অপ্রীতিকর কাজ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।'[১৩৮]

অপ্রীতিকর বলতে এমন সব কাজকে বোঝানো হয়েছে, যা মনের পসন্দ নয়, মন যা করতে চায় না। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেসব কাজ করলে দিল্ চূর্ণ হয়, মনের উপর চোট পড়ে। যেমন রাগ হজম করা। এটা মন বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু মনের উপর আঘাত দিয়ে যদি রাগ হজম করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাতে খুশি হন। এমনিভাবে কু'দৃষ্টি মনের পসন্দ। তাকে সংযত করা অপসন্দ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ভয়ে দৃষ্টিকে সংযত

---

১৩৮. মুসলিম, হাদীছ নং ৫০৪৯; তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৮২

করলে এবং মনের এ চাহিদা পূরণ হতে বিরত থাকলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়। এসব কাজে অন্তর চূর্ণ হয় আর এর নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে অন্তর আল্লাহর তাজাল্লী ও তার জ্যোতির আধারে পরিণত হয়।

মনের চাহিদা চূর্ণ কর

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল- হাঈ (রহ.) বলতেন, একবার মনস্থির করে নাও যে-

آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں برباد ہوں   اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

'সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় যাক, বিনাশ হোক যত আক্ষেপ এখন তো এ মন-প্রাণ গড়ে তুলতে হবে তোমার যোগ্য করে। কেউ যদি সংকল্প করে যে, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মরজি বিরোধী যত কামনা-বাসনা আছে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবই, করব পিষ্ট ও পদদলিত আর এভাবে তার উপর আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করব। অতঃপর কাজে নেমে পড়ে, কামনা-বাসনা অনুযায়ী কাজের বদলে তার বিপরীত কাজ শুরু করে দেয়, তবে সফলতা আসবেই। একপর্যায়ে কামনা-বাসনা নিস্তেজ হয়ে যাবে এবং সে হয়ে উঠবে জিতেন্দ্রিয়।

মনে রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়-চাহিদা খতম হয় না। সাধনা দ্বারা তা কেবল দুর্বল ও নিস্তেজ হয়, জোশ-তেজ কমে যায়। কাজেই সতর্ক থাকতে হবে সারা জীবনই।

ঈমানের স্বাদ কখন অনুভব হয়?

উপর্যুপরি আঘাত ও দমন পীড়ণের ফলে মনের কামনা-বাসনা যখন নিস্তেজ হয়ে যায় তখনই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ঈমানের স্বাদ অনুভূত হয়। এবং তাঁর মা'রিফাত ও তত্ত্বজ্ঞান নসীব হয়। ঈমানের স্বাদ ও মারিফাতের মাধুর্যের বিপরীতে ইন্দ্রিয়সুখ অতি তুচ্ছ। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফয্ল ও করমে আমাদের সকলকে সেই নি'আমত দান করুন। গুনাহের ভেতরও মজা আছে ইন্দ্রিয়ভোগেও আছে সুখ, কিন্তু ঈমান ও মারিফাতের যে আস্বাদ, তার সামনে ওসবের কোনও মূল্যই নেই।

ঈমানের স্বাদ মুফ্তে পাওয়া যায় না

কিন্তু সে আস্বাদ তো মাগনা পাওয়া যায় না। প্রথমে নিজ রুচি-অভিরুচিতে আঘাত হানতে হয়। মনের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিতে হয়।

শুরুতে তাতে কষ্টও হয়, খুবই বেদনা বোধ হয়। কিন্তু সেই কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করে আঘাত হানতে থাক মনকে উপর্যুপরি দলিত মথিত করতে থাক। তাতে দিল-মন চূর্ণ হতে থাকবে। যখন সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই তা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী ও জ্যোতিবর্ষণের উপযুক্ত আধার হয়ে উঠবে।

হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই (রহ.) অতি চমৎকার একটি শ্লোক পড়তেন। শ্লোকটি হল–

یہ کہہ کے کوزہ گرنے پیالہ پٹک دیا   اب اور کچھ بنائں گے اس کو بگاڑ کے

'কারিগর এই বলে পেয়ালাটি ছুড়ে মারল যে, এবার এটি ভেঙ্গে গড়ব নতুন কিছু।

প্রথমে তো সে অতি যত্নের সঙ্গেই সেটি তৈরি করেছিল। কিন্তু মন তার ভরেনি। তাই সেটি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল। কারণ সে মনের মত করে নতুন কিছু গড়বে। সুতরাং হৃদয়-মনকে নতুনভাবে তৈরি করতে হলে তার উপর আঘাত হানতে হবে। হাতুড়ি চালাতে হবে। তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুন ছাঁচে গড়তে হবে।

জনৈক কবি কি সুন্দরই না বলেছেন–

بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں
جسے برباد کرتے ہیں اس کی دل میں رہتے ہیں

মানস প্রতিমা আমার বসত করে বিরান ঘরে
ধ্বংস যারে করে সে যে ঠাঁই গাড়ে তার চিত্ত পরে।

সুতরাং কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা-অভিরুচি চূর্ণ করে যখন দিল্-মন বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়, তারপরেই সেই দিলে আল্লাহ তা'আলার আসন স্থাপিত হয় এবং সেথায় তার নূরের উদ্ভাস ঘটে।

মনের উপর অস্ত্র চালাতে হবে

হৃদয়-মন চূর্ণ করার এ সাধনা নতুন কিছু নয়। যুগ-যুগ ধরে ওলী-বুযুর্গগণ এটা করে আসছেন। তার আগে করেছেন সাহাবায়ে কিরাম। বরং নবী-রাসূলগণ- যাদের আত্মা হত পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল, তাঁরাও নিজেদের ইচ্ছা-অভিরুচিকে দলন করতেন, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিপরীতে নিজ

ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতেন। বস্তুত ইচ্ছা-অভিরুচিকে চূর্ণ করতে পারলেই আল্লাহ তাআলা অন্তর্জগত আলোকিত করে দেন। অতঃপর তাতে আল্লাহ তা'আলার মারিফাত ঠাঁই পায় এবং ঐশ্বরিক নূরে তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তর-ভূবন যখন মারিফাতের আলোয় ভরে ওঠে তখন গুনাহের ইচ্ছা নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কুপ্রবণতার তেজ-তাপ ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য প্রথমে সেই প্রবণতার সাথে ধস্তাধস্তি করতেই হয়। আমিও এ বিষয়ে একটা শ্লোক তৈরি করেছিলাম, যা এরকম–

کتنے گنچے مضطرب ہیں دل میں کھلنے کے لئے   اپنے ہاتھوں سے ذرا نشتر لگا کر دیکھئے

হৃদয় ভুবনে কত কলি ফুটবে বলে উন্মুখ
নিজ হাতে একবার অস্ত্র চালিয়ে দেখ না!

মনের উপর যত অস্ত্র চালনা করবে, ততই ফুল সেখানে ফুটতে থাকবে, ততই উৎকৃষ্ট গুণাবলী সেখানে বিকশিত হয়ে উঠবে এবং ততই নূর ও তাজাল্লীতে তা সমুদ্ভাসিত হতে থাকবে।

ক্রমশ ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে

হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ বাণীতে সে কথাই বলছেন যে, ক্রোধের প্রতিকার কেবল এটাই। রাগ উঠলে উঠতে দাও। কিন্তু রাগের পর অন্যকে চড় মারা, গালি দেওয়া বা ভালোমন্দ কিছু বলার যে স্পৃহা দেখা দেয় সেই স্পৃহা অনুযায়ী কাজ করে বসো না; বরং তা দমনের চেষ্টা কর। চিন্তা করো যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সে স্পৃহাকে দমন করছি। তাতে ইনশাআল্লাহ ক্রোধ সংবরণের স্বাদ ও আনন্দও অনুভূত হবে। এই প্রচেষ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাতে থাকলে নফস ও মন ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

মানব মন দুধের শিশুতুল্য

হযরত বূসীরী (রহ.) 'কাসীদাতুল-বুরদার একস্থানে বলেন,

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى   حُبِّ الرَّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمُ

'নফস ও মন হল শিশুর মত, যাকে ছেড়ে দিয়ে রাখলে মাতৃদুগ্ধের আকর্ষণ তার অস্থি-মজ্জায় মিশে যাবে। কিন্তু সেই অবকাশ না দিয়ে যদি তার দুধপান ছাড়িয়ে দাও, ঠিক ছেড়ে দেবে।"

দুধের শিশু নিজ ইচ্ছায় কখনও মায়ের দুধ ছাড়তে চায় না। দু'বছর যাবৎ সে তা খাচ্ছে এবং এতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই ছাড়াতে চাইলে সে তাতে প্রস্তুত হবে না। কাঁদবে। এখন পিতামাতা যদি মনে করে দুধ ছাড়ালে ওর কষ্ট হবে, কান্নাকাটি করবে, নিজেও পেরেশান হবে আমাদেরকেও পেরেশান করবে, তারচে' খেতে থাকুক, ছাড়ানোর দরকার নেই, তবে সে যুবক হয়ে যাবে তারপরও ওই অভ্যাস যাবে না। পক্ষান্তরে বাবা মা' যদি দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করে, তবে দু'চার দিন কান্নাকাটি করবে, জ্বালাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই ছেড়ে দেবে। দুনিয়ার প্রতিটি দুধের শিশুর ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে।

নফসকে লাগামহীন ছেড়ে দিও না

হযরত বূসীরী (রহ.) বলেন, মানব মনও শিশুর মত। তাকে বেলাগাম ছেড়ে দিলে তোমার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। বেলাগাম ছাড়ার অর্থ সে যা চায় তাই করা, তার প্রতিটি চাহিদা পূরণ করা, এক কথায় ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ে চলা। এরকম করলে কখনও গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে না। জীবনভর পাপাসক্তই থেকে যাবে। ফলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কর, জোরপূর্বক তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখ, তবে প্রথমদিকে কষ্ট হলেও এক পর্যায়ে সে ঠিকই গুনাহবিমুখ হয়ে যাবে। চেষ্টাই আসল কথা। একই কথা রাগের বেলায়ও। রাগের চাহিদা দমন করতে থাক, রাগের বশে কোনও কাজ করতে যেও না। এক সময় দেখবে রাগের তেজ-তাপ কমে গেছে।

রাগের শ্রেষ্ঠতম প্রতিকার

রাগ সংবরণের জন্য কখনও কখনও অন্য একটি ব্যবস্থাও সুফল দিয়ে থাকে, তবে সেটি একটু কঠিন। হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

স্বভাবগতভাবেই যদি রাগ বেশি হয় এবং সামান্য কারণেও সীমাতিরিক্ত রাগ উঠে যায়, ফলে হিতাহিত জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তবে এর সর্বোত্তম প্রতিকার হল, রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর, রাগ যার উপর করা হয়েছিল তার হাত-পা ধরে ক্ষমা চাওয়া, নিজ মাথায় তার জুতা রেখে দেওয়া। দু'একবার এরূপ করলেই নফস সোজা হয়ে যাবে।'[১৩৯]

---

১৩৯. আনফাসে 'ঈসা : ১৭১ পৃ.

অর্থাৎ কারও প্রতি খুব বেশি রাগ উঠে গেলে এবং সে রাগ সীমা ছাড়িয়ে গেলে সর্বসমক্ষে তার কাছে ক্ষমা চাবে। সবিনয়ে বলবে, আমার দ্বারা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তার সামনে হাত জোড় করবে, তার পায়ে ধরবে এবং তার জুতা মাথায় নেবে। এর ফলে নফসের শিক্ষা হয়ে যাবে। ফের এরকম রাগ উঠলে নফস ভাববে, এতো মহা মসিবত দেখছি। আগে তো রাগ হজম করলেই চলত। কিন্তু এখন লোকসম্মুখে লাঞ্ছনা কুড়াতে হচ্ছে। এই ভয়ে রাগের স্পৃহায় ভাটা পড়বে। এক দু'বার এরকম করতে পারলে ইনশাআল্লাহ নফসের সুবুদ্ধি হবে।

মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাবে

আমার এক বন্ধুর কথা। অত্যন্ত মেজাযী মানুষ। রাগ উঠলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এমনকি মা'ও যদি কিছু বলে, তার সাথেও রাগারাগি শুরু করে দেয়। আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করে, ফজরে কী যিক্‌র করব, জুহরে কী তাসবীহ পড়ব ইত্যাদি। আমি তাকে বলেছি, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কেবল মায়ের কাছে ক্ষমা চাবে। তার পা জড়িয়ে ধরে বলবে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে ক্ষমা করে দাও। এ কথা শুনে সে স্তম্ভিত। পরক্ষণে বলল, হযরত! তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাব? এটা তো অনেক কঠিন। আমি বললাম, তোমাকে তা করতেই হবে। তার পা জড়িয়ে ধরেই ক্ষমা চাইতে হবে। আর এটা করবে সকল ভাইবোনের সামনে। সে বলল, অনেক কঠিন কাজ। আমি বললাম, যত কঠিনই হোক! তোমাকে এভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতেই হবে। সকল ভাইবোনের সামনে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাওয়াটা তার কাছে যারপরনাই কঠিন মনে হচ্ছিল। যা হোক শেষ পর্যন্ত সে তা করল। তারপর এসে আমাকে বলল, হযরত! কী বলব, তখন আমার বুকের উপর দিয়ে যেন সাপ বেয়ে নামছিল, মাথার উপর যেন করাত চলছিল। বললাম, আমি তো সেটাই চাচ্ছিলাম। বার কয়েক তাকে দিয়ে এটা করালে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। তার মরজি-মেজায একদম ঠিক হয়ে গেল।

বস্তুত এসব করতে মনে অনেক চাপ পড়ে। কিন্তু কখনও কখনও এছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কয়েক মাত্রায় এই তেতো ওষুধ গিলতে পারলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শিফা লাভ হয়। তিনি এই কঠিন রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। তবে একাজও শায়খের তত্ত্বাবধানে করা উচিত। নিজের বুদ্ধিতে করা ঠিক নয়। নিজের পক্ষ থেকে ওষুধ নির্বাচন অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে

দাঁড়ায়। উল্টো ফল দেখা দেয়। কেননা কোন্ ওষুধ কী মাত্রায় দিতে হবে তা শায়খই ভালো বোঝেন। প্রয়োজনের বেশি মাত্রায় দিলে রিএ্যাকশন হয় আবার কম দিলেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। তাই এলাজ করাতে হবে শায়খের দ্বারাই।

রাগের আরেকটি প্রতিকার

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, একটা বিষয় বেশি বেশি স্মরণ করলেও রোগ-সংবরণে উপকার পাওয়া যায়। বিষয়টি হচ্ছে–

'অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ক্রোধ সংবরণের ফল সব সময়ই ভালো হয়েছে আর তার বাস্তবায়ন সর্বদা কুফল বয়ে এনেছে এবং তা অন্তরেও গ্লানি সৃষ্টি করে।'[১৪০]

অর্থাৎ অতীত কালকে স্মরণ কর। দেখতে পাবে যতবার রাগ হযম করেছ তার পরিণাম ভালো হয়েছে। রাগ-সংবরণ দ্বারা কখনও কোনও ক্ষতি হয়নি। পক্ষান্তরে যখনই রাগকে কার্যকর করা হয়েছে, রাগের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, তা পরিণামে লজ্জা ও অনুতাপই ডেকে এনেছে। স্বভাব-মোজাযে যদি কিছুটাও সুস্থতা থাকে, সম্পূর্ণ বিকৃত না হয়ে গিয়ে থাকে তবে মানুষ রাগের পর অন্তরে কিছু না কিছু অন্ধকার, মলিনতা ও গ্লানি অবশ্যই অনুভব করে। হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-কে লক্ষ করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী সুন্দর বরেছেন–

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

'কোমলতা যে জিনিসেই প্রবেশ করেছে তাকে তা কেবল শোভাই দান করেছে আর যার থেকেই তা অপসৃত হয়েছে, তাকে তা কুৎসিত করে তুলেছে।'[১৪১]

সুতরাং যেখানেই নম্রতা পাওয়া যাবে, তা শ্রীবৃদ্ধির কারণ হবে। যখন দেখা যাচ্ছে রাগের দ্বারা কেবল ক্ষতিই হয় এবং লজ্জা-অনুতাপের কারণ হয় অপর দিকে এবং রাগ না করলে কোনও ক্ষতি নেই, লজ্জা-অনুতাপেও দগ্ধ হতে হয় না। পরন্তু নম্রতা অবলম্বনে সৌন্দর্যবর্ধন ঘটে, তখন সে কাজ ক্ষতি ও লজ্জার কারণ হয় না; বরং সবদিক থেকে লাভজনক হয়, অবলম্বন তো সেটাই করা উচিত।

---

১৪০. আনাফাসে 'ঈসা : ১৭২ পৃ.

১৪১. আল-মু'জামুল আওসাত, ২খ, ৩৪৪ পৃ. হাদীছ নং ২১৮০

রাগের সময় শিশুকে মারা উচিত নয়

অপর এক বাণীতে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, রাগের সময় শিশুদের কিছুতেই মারা উচিত নয় (তা শিক্ষকই হোক বা পিতামাতা)। বরং রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করেই শাস্তি দেওয়া চাই। উত্তম শাস্তি হল ছুটি বন্ধ করে দেওয়া। শিশুদের উপর এর আছর ভাল হয়। শিক্ষক ছাত্র পেটানোর ব্যাপারে নিজেকে এ কারণে স্বাধীন মনে করে যে, সাধারণত এ ব্যাপারে তাকে কোনও কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয় না। শিশু নিজে তো জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষমতাই রাখে না। আর অভিভাবক তো বলেই রাখে, হাড়গুলো আমার চামড়া-গোশত শিক্ষকের।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেই হক্বের কোন দাবিদার নেই, তার জবাবদিহি স্বয়ং রাব্বুল-'আলামীনের আদালতেই করতে হবে। এমনকি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার যদি তার অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম করে, তবে সেই মহা আদালতে তারও বিচার হবে।[১৪২]

শিশুদের মারপিট করা খুবই বিপজ্জনক কাজ

শিশুদেরকে মারপিট করা আসলে অত্যন্ত খতরনাক কাজ। আমার মহান পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলতেন, অন্যান্য গুনাহের ক্ষমা তো তাওবা দ্বারা লাভ করা সম্ভব, কিন্তু শিশুদের উপর জুলুম করলে তা মাফ করানো বড় কঠিন। কারণ, এটা হক্কুল-ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। আর হক্কুল- ইবাদ বা বান্দার হক কেবল তাওবা দ্বারা মাফ হয় না, বরং হকদার ব্যক্তির পক্ষ হতেও ক্ষমা পাওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে বান্দা তো শিশু-নাবালেগ। নাবালেগের ক্ষমা ধর্তব্য নয়। এমনকি সে যদি মুখে বলেও দেয় যে, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম তাতেও মাফ হয় না, যেহেতু তার কথা আইনত ধর্তব্য নয়। তাই এ অপরাধে ক্ষমাপ্রাপ্তি বড়ই কঠিন। সুতরাং শিশুদেরকে মারপিট করা বা তাদের প্রতি কঠোর আচরণে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার এবং দরকার আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা।

শিক্ষাঙ্গনে শিশুদের মারপিটে নিষেধাজ্ঞা

মক্তবের কারী সাহেব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এক্ষেত্রে বড় অসতর্ক। তারা শিশুদেরকে বেধড়ক মারপিট করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। হযরত থানভী (রহ.) আইন করে দিয়েছিলেন যে, মক্তবের

---

১৪২. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৩ পৃ.

কারী সাহেবগণ শিশুদেরকে মারতে পারবে না। কোনও কারী সাহেব এর ব্যতিক্রম করলে তিনি কৈফিয়ত তলব করতেন। কখনও শাস্তিও দিতেন। একবার তো এ পর্যন্ত বলে দিলেন, আর যদি কখনও জানতে পারি কারী সাহেব কোন শিশুকে মেরেছে, তবে মসজিদের চত্বরে দাঁড় করিয়ে আমি সেই শিশুকে দিয়েই তাকে পিটুনি দেওয়াব। বিষয়টা বিপজ্জনক হওয়ার কারণেই তিনি এতটা কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন।

রাগ পড়ে যাওয়ার পর সুচিন্তিতভাবে শাস্তি দিতে হবে

অনস্বীকার্য, যে সকল উস্তায শিশুদের পড়ান, তাদের কাজ বড় কঠিন। শিশুদের নিয়ন্ত্রণের রাখা খুব সহজ নয়। কখনও কখনও মারারও প্রয়োজন দেখা দেয়। যদি কখনও সেই রকম অবস্থা দেখা দেয় এবং মার ছাড়া কোনও গত্যন্তর না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে রাগান্বিত অবস্থায় মারা যাবে না; বরং যখন রাগ পড়ে যাবে তখন চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দেবে। ঠান্ডা মাথায় শাস্তি দিলে তাতে সীমালঙ্ঘন হবে না; বরং যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত ততটুকুই দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ক্রুদ্ধাবস্থায় শাস্তি দিতে গেলে যেখানে একটি চড় যথেষ্ট ছিল সেখানে দশটি দেওয়া হয়ে যাবে। তাতে এক তো সীমালংঘন ও জুলুম করার গুনাহ হবে, দ্বিতীয়ত মারের সুফলও পাওয়া যাবে না, উল্টো ক্ষতি হবে। কেননা যে কাজে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, বাস্তবে তা কুফলই বয়ে আনে। তৃতীয়ত পরে এজন্য অনুতপ্তও হতে হবে। কাজেই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায় কিছুতেই শাস্তি দেওয়া যাবে না। মেজায ঠাণ্ডা হওয়ার পর বুঝে শুনেই দিতে হবে।

হযরত থানভী (রহ.) রাগ সম্পর্কে মৌলিক এই দিক নির্দেশনা দান করেছেন। সেই সঙ্গে কোন্ রাগ ক্ষতিকর, কোনটা ক্ষতিকর নয় এবং রাগের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কী তাও বলে দিয়েছেন, প্রত্যেকের উচিত নিজের সাথে মিলিয়ে এর উপর আমল করা। আমলেরও উত্তম পন্থা হল নিজেকে সংশোধন করার নিয়তে কোনও শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলা। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে মন্দ চরিত্র ও কুপ্রবণতাসমূহ দূর করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফয্ল ও করমে আমাদেরকে রিপুদমন ও আত্মিক উৎকর্ষসাধনের তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী খুতুবাত : ৪র্থ খণ্ড, ৮৬-১৩২ পৃষ্ঠা

হাসাদ ও তার এলাজ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

গত তিন দিন ক্রোধ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আজকের আলোচনা হাসাদ (পরশ্রীকাতরতা) সম্পর্কে। এটাও একটা কঠিন রিপু ও আত্মিক ব্যাধি। এ ব্যাধি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং এর ব্যাপকতাও অনেক বেশী। মানুষ সচরাচরই এতে আক্রান্ত হয়ে যায়। বিশেষত আমরা যারা তালেবে ইলম-ইলমের চর্চায় লিপ্ত, তাদের মধ্যে এর প্রকোপ বড় বেশি। তাই খুব গুরুত্বের সাথে এর প্রতিকারের চিন্তা ও চেষ্টা করা উচিত।

তিনটি বিষয় ও তার বিধান

হাসাদ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ)-এর বাণীসমূহ আমরা এক-একটি করে পড়ছি ও তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও পেশ করছি। এক বাণীতে তিনি বলেন,

'এক হচ্ছে মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা। এ ক্ষেত্রে মানুষ মাযূর (অক্ষম-অপারগ)। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সেই প্রবণতা অনুযায়ী কাজ। তাতে মানুষ গুনাহগার হয়। তৃতীয় হচ্ছে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধাচরণ, তাতে মানুষ সওয়াবের অধিকারী হয়। বিরুদ্ধাচরণ এভাবে যে, হাসাদবশে কারও নিন্দা করার ইচ্ছা জাগলে নিন্দা না করে বরং তার প্রশংসা করবে, তাকে এড়িয়ে চলার ইচ্ছা জাগলে তার সাথে দেখা-সাক্ষাত করবে, তাকে সম্মান করবে, প্রথমে সালাম দেবে এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[১৪৩]

হাসাদ কাকে বলে ?

হযরত (রহঃ) হাসাদ বিষয়ক যাবতীয় বিষয় এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলে দিয়েছেন। সর্বপ্রথম বোঝার বিষয় হল 'হাসাদ' কাকে বলে? হাসাদ হলো কারও ভালো কিছু দেখে গায়ে জ্বালা বোধ করা ও তার বিলোপ কামনা করা।

---

১৪৩. আনফাসে ঈসাঃ ১৭৩ পৃঃ

হাসাদের দৃষ্টান্ত

মনে করুন, আমার এক সহপাঠী আছে। আমরা একত্রে পড়াশোনা করি। কিন্তু পরীক্ষায় সে সর্বদা প্রথম হয়। আমার চেয়ে বেশি নম্বর পায়। এ কারণে আমি জ্বলে মরি। কেন সে আমার চেয়ে বেশি নম্বর পায়? সে কেন আমার উপরে থাকে? মনে মনে কামনা করি সে যেন কম নম্বর পায়। প্রথম স্থান যেন অধিকার করতে না পারে, তাতে আমি প্রথম হতে পারি বা না পারি, কিন্তু সে যেন কিছুতেই না পারে। এই চিন্তা ও স্পৃহাকে হাসাদ বলে। এমনিভাবে এক ব্যক্তি বেশ সম্পদশালী। তাতে আপনার গাত্রদাহ হয়। কামনা করছেন, তার আয়-রোজগার কমে যাক। এটা হাসাদ। কিংবা এক ব্যক্তির খুব নাম-ডাক। মানুষ তাকে সম্মান করে। অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার এ অবস্থা দেখে আরেকজনের পিত্ত জ্বলে- কেন লোকে শুধু তার কথা বলবে? তাই কামনা করে তার এই সুনাম-সুখ্যাতি ধুলায় মিশে যাক। এই ব্যক্তি হাসাদে আক্রান্ত। সে পরশ্রীকাতর।

গিবতা করা জায়েয

আরেকটি হচ্ছে 'গিবতা'। এর মানে অন্যের কোন নি'আমত ও মঙ্গল দেখে নিজের জন্যও অনুরূপ কামনা করা ও মনে মনে এই প্রত্যাশা করা যে, তার যেমন আছে আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তেমনি দান করুন। মনে করুন, একজন স্বাস্থ্যবান লোক দেখে আপনার মনে কামনা জাগল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকেও এরূপ সুস্বাস্থ্য দান করতেন। অথবা কারও সম্পদ দেখে আকাঙ্ক্ষা করলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও অনুরূপ সম্পদ দিয়ে দিন, কারও জ্ঞান-বিদ্যা দেখে আশা জাগল আমারও যদি ওরকম হত, তো এই কামনাকে 'গিবতা' বলে। এতে অন্যের মঙ্গল দেখে গা জ্বালা করে না, তার বিলোপ কামনা করা হয় না, কেবল নিজের জন্যও অনুরূপ আশা করা হয়। এতে কোন দোষ নেই। এটা জায়েয। নাজায়েয হল হাসাদ ও ঈর্ষাপরায়ণতা, যাতে অন্যের মঙ্গল বিলুপ্ত হওয়ার কামনা থাকে, তা নিজের অর্জিত হোক বা নাই হোক।

মনে-মনে কষ্টবোধ গুনাহ নয়

হাসাদ বা ঈর্ষাপরায়ণতা খুব খারাপ জিনিস। কেউ যদি অন্যকে কোনও দিক থেকে নিজের চেয়ে উপরে উঠতে দেখে মনে মনে কষ্টবোধ করে, তবে এতটুকুতে কোন দোষ নেই, যতক্ষণ না সে সেই কষ্টের প্রকাশ কোন কাজের

দ্বারা ঘটায়। কেননা, এই কষ্টবোধ একটা ইচ্ছাতীত জিনিস। এই কষ্ট মনে আসতে না দেওয়ার কোনও ক্ষমতা মানুষের নেই এবং তা আসাতে তার ইচ্ছাশক্তিরও কোনও ভূমিকা নেই। তাই এ কষ্টবোধে কোনও গুনাহও নেই।

হযরত থানভী (রহঃ) একে 'স্বভাবগত অবস্থা' সাব্যস্ত করে বলেন, এ ব্যাপারে মানুষও নিরুপায়। তাই এতে গুনাহ নেই। তবে গুনাহ হবে না ততক্ষণই, যতক্ষণ এটা মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নিজের কোন কথা বা কাজে তার প্রকাশ ঘটবে না এবং সেই কষ্টের চাহিদানুসারে কোনও কাজ করা হবে না।

মনের অনুচিত স্পৃহা অনুযায়ী কাজ করা গুনাহ

গুনাহ হবে তখনই যখন হাসাদবশে কারও অমঙ্গলস্পৃহায় কোনও কাজ করা হবে। যেমন– কাউকে নিজের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হতে দেখে মানুষের কাছে তার দুর্নাম শুরু করে দেওয়া, যাতে তার সম্মান নষ্ট হয় বা কাউকে টাকা-পয়সায় নিজের উপরে চলে যেতে দেখে এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে তার আয়-উপার্জন কমে যায়। এমনিভাবে কারও স্বাস্থ্যহানি ঘটা, জ্ঞান-বিদ্যা হ্রাস পাওয়া, মানুষের উপর প্রভাব কমে যাওয়ার কামনায় কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা হবে গুনাহের কাজ। এমনিভাবে যদি কারও জন্য বদদু'আ করা হয় যে, তার ওই নি'আমত যেন লোপ পায় তাও গুনাহ। অন্তর্জালা মেটানোর জন্য মানুষ আরও অনেক কিছুই করে থাকে। যেমন– মানুষের সামনে গীবত করা, জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করার দুরভিসন্ধি আঁটা, দেখা-সাক্ষাত হলে সালাম না করা ইত্যাদি।

পরশ্রীকাতরতার পরিণামে কেউ যখন এসব কাজ করে, তখন আর সে মাযূর থাকে না। এগুলো সে ইচ্ছাকৃতই করে থাকে। তাই সে গুনাহগার হবে। গুনাহগার হত না কেবল তখনই, যখন সে মনের কষ্টকে মনের ভেতরেই রেখে দিত, আচার-আচরণে তার প্রকাশ না ঘটাত।

মনের অসৎ ভাবনাও বিপজ্জনক

ইমাম গাযালী (রহঃ) 'ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে লিখেছেন, অন্তরে হাসাদ জন্ম নেওয়া এবং অন্যের প্রতি এই অন্তর্দাহ দেখা দেওয়া যে, সে আমার উপরে উঠে গেল কেন, যদিও সরাসরি গুনাহ নয়, যেহেতু ইচ্ছাতীত বিষয় হওয়ার কারণে মানুষ এ ব্যাপারে মাযূর, কিন্তু এমনিতে এ জাতীয় ভাবনা ভালো জিনিস নয় ; বরং অনেক বড় বিপদের কারণ। কেননা, এ ভাবনা

অন্তরে জমাট বাঁধতে পারলে পরিশেষে তা মানুষকে পাপকর্মে লিপ্ত করে ফেলে। হয়ত গীবত শুরু করে দেয় অথবা সালাম-কালাম বন্ধ করে দেয় কিংবা অন্য কোনওরকম দুর্ব্যবহার করে বসে। এভাবে অন্তরের সেই অসৎভাবনা এক পর্যায়ে অন্যায় কর্মে প্রতিফলিত হয়। কাজেই ইচ্ছাতীত হাসাদ অন্তরে দেখা দেওয়ার পর তাকে জমাট বাঁধতে দেওয়া উচিত নয়। জমাট বাঁধা বিপজ্জনক। চেষ্টা করতে হবে যাতে অতি দ্রুত তা অপসৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে তা অপসৃত হবে ? এর কোন ব্যবস্থা আছে কি?

অসৎ ভাবনা অপসারণের তিনটি উপায়

হাসাদ অন্যের উন্নতি দেখে যে অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকার হিসেবে তিনটি কাজ করা যেতে পারে।

(এক) অন্তরে যে অসৎভাবনা জাগে তাকে মন্দ জ্ঞান করুন। ভাবুন যে, আমার মনের এ দহন খুবই খারাপ জিনিস। কোনও মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়।

(দুই) দ্বিতীয় কাজ এই করুন যে, যেই ব্যক্তির প্রতি অসৎভাবনা দেখা দিয়েছে তার গুনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিন। বিশেষত আপনার সাথে সম্পৃক্ত তার ভালো দিকগুলো নজরে আনুন, যেমন অমুক অমুক ক্ষেত্রে আমি তার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, সে তো আমার উপকারী বন্ধু। তাই তার প্রতি আমার মনোভাব বন্ধুত্বপূর্ণই হওয়া উচিত।

(তিন) যদিও অন্তর তার প্রতি ঈর্ষাকাতর, যার দাবি তাকে কষ্ট দেওয়া, তাকে দাবিয়ে রাখা, এবং তার অমঙ্গল কামনা করা, কিন্তু আপনি মনের উপর চাপ সৃষ্টি করুন। মনের বিরুদ্ধে তার জন্য দু'আ করুন। বলুন হে আল্লাহ ! তাকে আরও বেশি উন্নতি দান করুন। এ দু'আ কুইনাইনের কাজ করবে। কেননা মন তো কামনা করে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক, মানুষের কাছে ক্ষুদ্র সাব্যস্ত হোক এবং তার ক্রমোন্নতি থেমে যাক, অথচ আপনি তার জন্য দু'আ করছেন, হে আল্লাহ ! তাকে আরও বেশি উন্নতি দান কর, তার জ্ঞান-বিদ্যাকে আরও বিকশিত কর, তার স্বাস্থ্য আরও ভালো করে দাও। সন্দেহ নেই হাসাদ জ্বরের উপশমে এই তেতো ওষুধ খুবই কার্যকর সাব্যস্ত হবে।

এমনিভাবে যার প্রতি ঈর্ষা দেখা দেয়, সে যখন সামনে পড়বে তাকে আগে সালাম দেবে, তাকে সম্মান করবে এবং মানুষের সামনে তার প্রশংসা করবে ও তার গুণাবলী তূলে ধরবে। এতেও মনের উপর অনেক চাপ পড়বে, কিন্তু ঈর্ষা রোগের ওষুধ এটাই।

অসৎ ভাবনা অশুভ পরিণাম ডেকে আনে

অন্তর ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লে উপরিউক্ত কাজ তিনটি করতে হবে। অন্যথায় অনিচ্ছাজনিত অসৎ ভাবনাও অশুভ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। কেননা অন্তরে ঈর্ষা জাগা এবং সে কারণে কুচিন্তার উদ্ভবে যদিও নিজ ইচ্ছা শক্তির কোনও ভূমিকা ছিল না, কিন্তু এক পর্যায়ে সেই কুচিন্তা বাস্তব পাপকর্মেও পর্যবসিত হয়ে পারে, সে পাপকর্ম তোমার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। সেই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে এ কাজগুলি অবশ্যই করতে হবে। আর তা করলে অন্তর থেকে কুচিন্তা লোপ পাবে এবং ঈর্ষার প্রবণতাও হ্রাস পাবে, হযরত থানভী (রহঃ)-এর বাণীটিতে ফের চোখ বুলান। তিনি বলছেন, একটি হল 'স্বভাবগত প্রবণতা' অর্থাৎ ইচ্ছাতীত চিন্তা-ভাবনা, যা অন্তরে আপনিই দেখা দেয়, যেমন কারও উন্নতি দেখে অন্তর্দাহ সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাবহির্ভুক্ত হওয়ার কারণে এটা মাফ। অর্থাৎ এর জন্য কোনও জবাবদিহিতা নেই। দ্বিতীয় বিষয় হল, সেই প্রবণতার দাবি অনুযায়ী কাজ করা, যেমন তার ক্ষতি করার চেষ্টা করা, তার দুর্নাম করা, তার নামে অপবাদ রটানো এবং সমাজে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার তৎপরতা চালানো। এসব যে করবে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। আর তৃতীয় বিষয় হল যেই প্রবণতার বিরুদ্ধাচরণ করা। ঈর্ষাবশত কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা জাগলে সেই ইচ্ছা পূরণ না করে যদি তার বিপরীত কাজ করা হয়, তার জন্য দু'আ করা হয় এবং পেছনে তার সুনাম-সুখ্যাতি করা হয়, তবে এর জন্য অবশ্যই অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

কুচিন্তার বিরুদ্ধাচরণে যে সুফল লাভ হয়

হিংসা থেকে উদ্ভূত কুচিন্তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তার সুফল অনেক। শয়তান অন্তরে কুচিন্তার উদভব ঘটায়ই তো মানুষকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য। কেননা মানুষ হাসাদ বলে যেসব কাজ করে তা সবই কঠিন গুনাহ ও জাহান্নামে যাওয়ার কাজ, কিন্তু আপনি যখন সেই চিন্তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলেন, তখন শয়তানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিলেন। আপনি কুচিন্তা মোতাবেক তার জন্য বদদু'আ না করে উল্টো তার জন্য দু'আ করছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে আরও বেশি উন্নতি দান করেন, আপনি মানুষের কাছে তার সুনাম-সুখ্যাতি করছেন, ফলে যেই চিন্তার লক্ষ ছিল আপনাকে পাপকর্মে লিপ্ত করা, আপনি কিনা তার বিপরীতে পুণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে

পড়লেন। এভাবে কেবল পাপ থেকে বেঁচেই ক্ষান্ত হলেন না, বাড়তি সওয়াবেরও অধিকারী হয়ে গেলেন, আপনার আমল নামায় বিপুল সওয়াব লেখা হয়ে গেল। তা তো এজন্যই হল যে, আপনি ঈর্ষাজনিত কুচিন্তাকে দমন করে তার বিরুদ্ধাচরণে তৎপর থেকেছেন। বোঝা গেল যদি বিরুদ্ধাচরণ করা যায়, তবে আগের কুচিন্তাও অনেক লাভজনক হয়ে ওঠে।

গুনাহ কি ভালো জিনিস ?

বাবা নাজম আহসান (রহঃ) নামে হযরত থানভী (রহঃ)-এর এক খলীফা ছিলেন। অত্যন্ত বুযুর্গ মানুষ। তিনি চমৎকার সব কথা বলতেন, একবার বললেন, গুনাহ বড় ভালো জিনিস। আমরা বললাম, হযরত ! গুনাহ, তা আবার ভালো ? কথাটা বুঝে আসল না। বললেন, হাঁ গুনাহ বড় ভালো জিনিস। কেননা যখন গুনাহ করার ইচ্ছা জাগে আর কেউ জোরপূর্বক তা দমন করে, তখন মানুষ তার বদৌলতে কোথা হতে কোথায় পৌছে যায়। গুনাহ না হলে তো সেখানে পৌছতে পারত না। এই হল গুনাহ ভালো হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ গুনাহের চাহিদাকে কার্যে পরিণত না করে তাকে দমন করলে ও তার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়, প্রভূত নেকি কামানো যায়, এবং কুপ্রবণতা দমন করার ফলে আত্মিক অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়।

দুই ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করুন

দুজন লোকের মধ্যে তুলনা করে দেখুন,যাদের একজনের অন্তরে গুনাহের কোন চিন্তাই আসে না। তার গুনাহ করার কোনও অবকাশই আসে না। ফলে গুনাহবিহীন জীবন কাটানোর কারণে ইনশাআল্লাহ আখিরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। অপরজন এমন যে, পদে পদে তার অন্তরে গুনাহের ইচ্ছা জাগে,গুনাহ করার সুযোগ ও অবকাশও তার প্রচুর দেখা দেয়, যখন এক কদম অগ্রসর হয় অমনি কোন গুনাহের চাহিদা জন্ম নেয়, কিন্তু সে নিজেকে তা থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়, তারপর আবার পা বাড়ায়, ফের গুনাহের আগ্রহ দেখা দেয়, কিন্তু একইভাবে সে আগ্রহ দমন করে সামনে এগিয়ে যায়। এভাবে সে সারাটা জীবন পাপ প্রবণতার সাথে লড়াই করে চলে এবং পাপেচ্ছাকে দমন করতে করতে পরদেশে পাড়ি জমায়। এই যে দ্বিতীয় ব্যক্তি গুনাহের সাথে সংগ্রামরত থেকে এবং নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে বাঁচাতে বাঁচাতে কবরে পৌছায়, ভেবে দেখুন তো প্রথমজন অপেক্ষা উন্নতির কতটা উর্ধ্বে সে পৌছে

যায় ? এভাবে উন্নতির শীর্ষভাগে সে কিভাবে পৌছে গেল ? গুনাহের কারণেই নয় কি ? অর্থাৎ পাপপ্রবণতার সাথে সংগ্রাম করে করেই সে অন্যজনকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে, পৌছে গেছে উন্নতির চরম শিখরে। একারণেই বাবা নাজম আহসান (রহঃ) বলতেন, গুনাহ বড় ভালো জিনিস। কেননা গুনাহের ইচ্ছা দমন করতে থাকলে অভাবনীয় উন্নতি লাভ হয়।

ইংরেজদের কাবাব খুব সুস্বাদু হবে

হযরত শায়খুল-হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহঃ)-এর নাম কে না শুনেছে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী ছিলেন। ব্রিটিশদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল প্রচন্ড। তাদের প্রতিটি জিনিসই তিনি ঘৃণা করতেন। এঘৃণা তার অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল। একবার একজনে জিজ্ঞেস করল, হযরত ! আপনি ব্রিটিশদের শুধু দোষই বর্ণনা করেন, তাদের মধ্যে ভালো কিছুও তো থেকে থাকবে ? দুনিয়ায় তো এমন কোন বস্তুই নেই, যার মধ্যে শুধু দোষই আছে, গুণ কিছুই নেই। নিশ্চয়ই ব্রিটিশদের মধ্যেও কোনও না কোনও ভালো গুণ আছে। কাজেই তাদের ভালো কিছুও বর্ণনা করে দিন। হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহঃ) বললেন, হাঁ ভাই ! ব্রিটিশদের গোশত দিয়ে কাবাব বানালে তা খুব সুস্বাদু হবে। তাদের মধ্যে এই একটা ভালো জিনিস আছে।

যা হোক, গুনাহের ভালো দিক হল, যদি তার আগ্রহ দমন করে বিপরীত কর্মে রত হওয়া যায়, তবে তার দ্বারা আত্মিক উন্নতিতে মানুষ বহুদূর পৌছতে পারে। কাজেই হাসাদ বশে অন্তরে যে চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা দেখা দিয়েছিল তোমাকে গুনাহে লিপ্ত করতে। কিন্তু তুমি যদি তা দমন কর এবং তার বিপরীত কাজ কর তবে উল্টো তা তোমার উৎকর্ষ লাভেরই কারণ হয়ে যাবে। এমনিভাবে গুনাহের আরও যত কারণ ও উদ্বোধক আছে, সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে আখেরে তা মানুষের উন্নতির কারণ বনে যায়। সুতরাং তোমার অন্তরে কখনও কখনও হাসাদজনিত চিন্তা ভাবনা জাগ্রত হলে তাকে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানিয়ে ফেল। তাহলে ইনশাআল্লাহ হাসাদ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

হিংসুক ব্যক্তি তার হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলে

সূফিয়ায়ে কিরাম হিংসাকে আগুনের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা হিংসার ফলে মানুষের অন্তরে একরকম দাহের সৃষ্টি হয়। যখন দেখে কেউ

তার চেয়ে ভালো আছে, তাকে ডিঙিয়ে গেছে, তখন তার অন্তরে আগুন জ্বলে ওঠে। জনৈক আরব কবি বলেন,

اَلنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا اِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ

আগুন যখন গ্রাস করার মত কিছু না পায়, তখন নিজেকেই নিজে গ্রাস করে।[১৪৪]

অর্থাৎ হিংসা হল আগুনের মত। আগুনের ধর্ম জ্বালানো। জ্বালানোর জন্য তা যখন কোন বস্তু পায় তখন তো তাই জ্বালায়। যেমন কোন কাঠে আগুন লাগল আর আগুন তা পুড়ে ছাই করে দিল, কিন্তু যখন জ্বালানোর মত কিছু থাকে না, যেমন ওই কাঠই যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায়, তখন আগুন নিজেই নিজেকে জ্বালাতে থাকে। এভাবে তা জ্বলতে জ্বলতে নিঃশেষ হয়ে যায়। হিংসার আগুনও এরকমই। হিংসুক ব্যক্তি প্রথমে অন্যকে জ্বালানোর চেষ্টা করে, অন্যের ক্ষতি করতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে তাতে ব্যর্থ হয়, তার কোন ক্ষতি করতে না পারে, তখন সেই আগুনে নিজেই জ্বলতে থাকে। অন্তর্দহনে জ্বলতে-জ্বলতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষে সে রুগ্ন হয়ে যায়। এভাবে কত লোকই না হিংসার আগুনে পুড়তে পুড়তে খতম হয়ে গেছে।

হিংসা প্রকারান্তরে তাকদীরে আপত্তি

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, হাসাদ অত্যন্ত কঠিন গুনাহ। চিন্তা করলে বোঝা যায়, হিংসুক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা যে তাকদীর নির্ধারন করেছেন তার উপরই আপত্তি করে। যেন সে বলে, অমুককে কেন আমার চেয়ে উপরে স্থান দিলেন ? অমুককে কেন এই নি'আমত আমার চেয়ে বেশি দিলেন ? অমুককে কেন আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী বানালেন ? ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, যাকে যা দেওয়া হয়েছে তা তিনি নিজ জ্ঞান-কুদরতের ভিত্তিতেই দিয়েছেন। তিনিই তার অপার হিকমতে ফয়সালা করেছেন কাকে কি দিতে হবে এবং তা কি পরিমাণে দেওয়া হবে। কাজেই যাকে যা দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার হিকমতেরই ফয়সালা। এখন হিংসায় লিপ্ত হয়ে তুমি আপত্তি জানাচ্ছ অমুককে ওই জিনিস কেন দেওয়া হল? তার ভাগ্য কেন ওরকম করা হল ?

---

১৪৪. আল-বালাগাতুল আরাবিয়্যা : ১খ,৬১৮; আল-ইকদুল-ফরীদ, ১খ, ১৯৪

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

'আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের উপর যা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তার আকাঙ্ক্ষা করো না।'[১৪৫]

কেননা এতে তোমাদের ইচ্ছাশক্তির কোন হাত নেই। তা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কাজেই অমুকে কেন ওই জিনিস পেল, আমি কেন পেলাম না, এরকম চিন্তা মাথায় এনো না।

সবই আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা

এটা তো আল্লাহ তা'আলারই স্থিরীকৃত ব্যবস্থা যে কাউকে সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন, কিন্তু তার তেমন টাকা-পয়সা নেই, আবার যাকে টাকা-পয়সা দিয়েছেন, তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। কাউকে জ্ঞান-বিদ্যার অধিকারী করেছেন, কিন্তু তাকে বিষয় সম্পত্তি দেননি। কাউকে সম্মান-সুখ্যাতি দিয়েছেন কিন্তু সে নিঃসন্তান। সন্তানের নি'আমত থেকে সে বঞ্চিত। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তিনি নিজ সিদ্ধান্তক্রমে কাকে কোন নি'আমত কী পরিমাণে দেওয়া হবে তা স্থির করেছেন। এখানে আপত্তি তোলার কোনও অধিকার তোমার নেই।

নিজ নি'আমতে নজর দাও

হিংসুক ব্যক্তির নিজ নি'আমতের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তার চোখ থাকে অন্যের দিকে এবং তার নি'আমত যাতে লোপ পায় সেই অপেক্ষায় থাকে। সে যদি চিন্তা করত আল্লাহ অমুককে ওই জিনিস দিয়েছেন তো আমাকেও বঞ্চিত রাখেননি, আমাকে দিয়েছেন এই জিনিস, তবে মুহূর্তেই হিংসার আগুন নিভে যেত। যদি ভাবা হয় অমুকের টাকা আছে বটে, কিন্তু তার তো ইলম নেই, যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দিয়েছেন, তবে হাসাদ থাকতে পারে কি? জনৈক কবি কি সুন্দর বলেছেন,

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا   لَنَا عِلْمٌ وَّلِلْاَعْدَاءِ مَالٌ

'আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে যে বন্টন করেছেন তাতে আমরা খুশি। তিনি আমাদের দিয়েছেন, ইলম (জ্ঞান)। আর অজ্ঞজনদের টাকা-পয়সা।'[১৪৬]

---

১৪৫. নিসা : ৩২

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ক আরও একটি সুন্দর শ্লোক পাওয়া যায়। যথা-

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الرَّحْمٰنِ فِيْنَا   لَنَا حَسَبٌ وَّلِلثَّقَفِى مَالٌ

'দয়াময় আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে বন্টন করেছেন আমরা তাতে খুশি। তিনি আমাদের দিয়েছেন আভিজাত্য আর ছাকীফ বংশকে দিয়েছেন অর্থ-কড়ি।'[১৪৭]

সুতরাং অভাব ও দুঃখবোধের কোনও কারণ নেই। কোনও না কোনও নি'আমত আল্লাহ প্রত্যেককেই দিয়েছেন। তা দিয়েছেন নিজ ফায়সালা অনুযায়ী। আল্লাহ তা'আলার সেই ফায়সালায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

যা হোক হাসাদের ভেতর সর্বাপেক্ষা মন্দ দিক হল, তাতে আল্লাহ তা'আলার বন্টন ও তাকদীরের উপর আপত্তি তোলা হয়। তাই সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে এ রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করা দরকার।

প্রথম কাজ হিংসাজনিত চিন্তা-ভাবনাকে ঘৃণা করা

গতকাল আরয করা হয়েছিল অনেক সময় নিজ ইচ্ছার বাইরে হাসাদ প্রসূত চিন্তা-ভাবনা দেখা দেয়। যদিও ইচ্ছাতীত হওয়ার কারণে মানুষ সে ব্যাপারে মাযূর এবং তাতে তার কোনও গুনাহ নেই, কিন্তু পরিণামের কথা ভাবলে তাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা, এসব চিন্তা-ভাবনা যে কোনও সময় মানুষকে কঠিন গুনাহে লিপ্ত করতে পারে। তাই এর এলাজ ও প্রতিকার জরুরি। প্রতিকার হিসেবে প্রথম কাজ হল এসব চিন্তা-ভাবনাকে ঘৃণা করা এবং এর চাহিদাবিরোধী কাজ করা।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন,

ইচ্ছাজনিত কাজের বিপরীতটাও ইচ্ছাজনিতই হয়ে থাকে। কাজেই হাসাদ থেকে যেসব বিষয়ের উৎপত্তি হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিপরীত কাজকর্মে লিপ্ত হও। যেমন গীবতের পরিবর্তে প্রশংসা করা। এতে মনের উপর চাপ পড়বে ঠিক, কিন্তু তার উপর তো কারও হাত নেই। হাত যার উপর আছে সেই মুখকে সঠিক কাজে লাগাও। এমনিভাবে যার প্রতি হিংসা, তার সাথে

---

১৪৬. রাওযাতুল-আদব,১২ পৃ

১৪৭. তাবাকাতুল শু'আরা, ১খ, ৩৫ পৃ; বাহজাতুল-মাজালিস, ১খ, ৩৯পৃ ; আশ-শে'র ওয়াশ শু'আরা, ১খ, ১৯২

বিনীতভাবে দেখা-সাক্ষাত কর। তার কোন ক্ষতি হলে সেজন্য মুখে সহমর্মিতা প্রকাশ কর- তার সামনেও এবং পেছনেও। সামনাসামনি তাকে সম্মান কর। মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া ও উপহার দাও। কিছু কাল এরূপ করতে থাকলে হাসাদ দূর হয়ে যাবে। এসব কাজ অন্ততপক্ষে বিশবার করবে।'[১৪৮]

অর্থাৎ যেই কাজ করা মানুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন, তা ছেড়ে দেওয়াও ইচ্ছাধীন বিষয়। চাইলেই তা ছাড়া সম্ভব। কাজেই হাসাদের কারণে আমি অমুককে মারব, তাকে গালি দেব, লাঞ্ছিত করব, তার দুর্নাম করব, গীবত করব, ইত্যাদি যেসব কাজ করার ইচ্ছা জাগে তা সবই যখন সম্ভবপর কাজ, ইচ্ছা হলেই করা যায়, তখন এগুলো না করা এবং এর বিপরীত কাজ করাও সম্ভব। ইচ্ছা হলেই তা করা যায়।

যার প্রতি হিংসা জাগে তার প্রশংসা করুন

হিংসার কারণে যার দুর্নাম রটানোর ইচ্ছা হয়, তার প্রশংসা করুন, জনসম্মুখে তার গুণাবলী তুলে ধরুন। এটা করা সম্ভব, মানুষের ইচ্ছা ও সাধ্যের অন্তর্ভুক্ত কাজ। সুতরাং নিজ ইচ্ছায় আপনি এটা কার্যে পরিণত করুন। হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, হাসাদ থেকে যেসব বিষয় সৃষ্টি হয় তার বিপরীত কাজ কর ; যেমন গীবত করার ইচ্ছা হয়েছে। তো তার প্রশংসায় লিপ্ত হও।

একথা সত্য যে, মন তা করতে প্রস্তুত হবে না। তা নাই হোক, তার উপর চাপ সৃষ্টি করেই প্রশংসা করতে থাক।

মনে চাচ্ছে, তাকে গালি দিতে,তার বদনাম করে বেড়াতে। সে যাতে সারা দুনিয়ায় অপমানিত হয় সেটাই মনের কামনা। কিন্তু সেই ইচ্ছা ও কামনাকে দমন করতে হবে। আর তা এভাবে যে মনের বিপরীতে মুখে তার প্রশংসা করতে থাক। প্রশংসা করার অর্থ এ নয় যে, কৃত্রিমভাবে তার গুণাবলী প্রচার করবে। বরং তার প্রকৃত গুণের কথাই বলবে। দুনিয়ায় এমন কোনও জিনিস নেই, যার প্রশংসনীয় কোনও দিক নেই। তুমি যাকে হিংসা করছ তার মধ্যেও আছে। খুঁজলে অবশ্যই পেয়ে যাবে। তা খুঁজে বার করে বলতে থাক, মাশাআল্লাহ তার মধ্যে এই-এই ভালো গুণ আছে।

---

১৪৮. আনফাসে 'ঈসা: ১৭৪ পৃ.

হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত থানভী (রহঃ)লিখেছেন, হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) একবার চলতি পথে দেখলেন, একজন লোককে শূলে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার ডান হাত ও বাম পা কাটা। তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তার ব্যাপার কী ? জানানো হল, সে একজন চোর। প্রথমবার চুরি করলে তার ডান হাত কেটে ফেলা হয়। তারপরও চুরিতে লিপ্ত হয়, ফলে তার বাম পা কেটে দেওয়া হয়। তবুও সে নিবৃত্ত হয়নি। যথারীতি চুরিতে লিপ্ত থাকে। তৃতীয়বার ধরা পড়লে তাকে শূলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হযরত জুনায়দ (রহঃ) একথা শুনে তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার ঝুলন্ত পা ধরে চুমো খেলেন।

লোকে বলল, হযরত ! আপনি এত বড় মানুষ হয়ে একটা চোরের পায়ে চুমো খেলেন ? ব্যাপারটা আমাদের বুঝে আসছে না। তিনি বললেন, শোন, লোকটির মধ্যে অনেক বড় একটা গুণ আছে। কাজে নিষ্ঠা ও অবিচলতা। আমি তার সেই সদগুণকে চুম্বন করেছি। যদিও সে তার এই গুণটিকে মন্দকাজে ব্যবহার করেছে, গুনাহের কাজে যুক্ত করেছে, কিন্তু অবিচলতার গুণটি এমনিতে অনেক ভালো এবং একটি প্রশংসনীয় গুণ। এটি ভালো জায়গায় ও ভালো কাজে ব্যবহার করলে এর মাধ্যমে সে উন্নতি উৎকর্ষের কত উচ্চতায়ই না পৌছতে পারত।

প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো গুণ থাকে

দুনিয়ার প্রতিটি লোকের মধ্যেই কোনও না কোনও ভালো গুণ থাকে। 'আল্লামা ইকবাল শিশুদের জন্য লেখা একটি কবিতায় বলেন,

نہیں ہے کوئی چیز نکمّی زمانے میں   کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

এ জগতে কোনও জিনিস নয় সম্পূর্ণ অকাজের। সর্বার্থে মন্দ নয় কেউ জগত সংসারে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসকেই নিজ হিকমত ও অপার প্রজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। তাই কোনও জিনিসই সম্পূর্ণ বেকার ও অহেতুক হতে পারে না।

কাজেই আপনার অন্তরে কারও প্রতি হিংসা দেখা দিলে তার ভেতর কি কি ভালো দিক আছে খোঁজ করুন। তারপর লোক সম্মুখে তা বর্ণনা করুন। এটা করতে কষ্ট হবে। মনের উপর করাত চালু হয়ে যাবে। তা চলতে দিন। কেননা হিংসার যে রোগ অন্তরে জন্ম নিয়েছে, তার চিকিৎসা করাতের মাধ্যমেই করতে হবে। এজন্যই হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, গীবতের স্থলে

তার প্রশংসা করুন, যদিও অন্তরে তা অপ্রীতিকর বোধ হয়। মুখ তো নিজ ইচ্ছাধীন। কাজেই তার উপর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন। মনের বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করুন। এই হল এক কাজ।

তার প্রতি বিনীত আচরণ করুন

দ্বিতীয় কাজ হল, তার প্রতি বিনীতভাবে সাক্ষাত করুন ও নম্র কথা বলুন। মন তো চায় তার চেহারা খামছে ধরতে, তাকে অপমান করতে। কিন্তু মনের সে ইচ্ছা দমন করে তার সাথে বিনীয়-নম্র আচরণ করুন। সাক্ষাত কালে বিনয়ভাব প্রদর্শন করুন এবং কোমল ভাষায় কথা বলুন। তৃতীয় কাজ হল, তার দুঃখ কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করুন। তার যদি কোনও মসিবত দেখা দেয়, তাতে সহমর্মিতামূলক আচরণ করুন। তার সামনেও এবং পেছনেও। চতুর্থ কাজ হল, দেখা-সাক্ষাত হলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন।

তাকে হাদিয়া ও উপহার দিন

পঞ্চম কাজ মাঝে মাঝে তাকে হাদিয়া- তোহফা দিন। এতে যেমন তার অন্তরে আপনার মহব্বত সৃষ্টি হবে, তেমনি আপনার অন্তরেও তার ভালোবাসা জন্মাবে। কিছু লোক অতিরিক্ত ব্যয়কুণ্ঠ। তারা অন্য যে-কোনও কাজই সহজে করে ফেলতে পারে, কিন্তু টাকা-পয়সা খরচের প্রশ্ন আসলে মন কুকড়ে যায়। অনেক বড় বোঝা মনে হয়। তাদের লক্ষ করেই কেউ বলেছেন, জান চাও তো বান্দা হাজির, কিন্তু যদি টাকা-পয়সা চাও, সেটা চিন্তার বিষয়। আসলে পকেট থেকে টাকা বের করা একটু কষ্টেরই ব্যাপার। তা যতই কষ্ট হোক এ ওষুধ পান করতেই হবে। যখন তা পান করবেন এবং পয়সা খরচ করে তাকে হাদিয়া দেবেন, তখন দ্বিবিধ উপকার হবে। এক তো পয়সাও বের হবে, পয়সা খরচের অভ্যাস হবে, দ্বিতীয়ত হাদিয়া নিয়ে যখন তার কাছে যাবেন, মন থেকে এ যাবৎকালের লালিত বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে এবং উভয় পক্ষ হতে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

এসবই হল আমাদের বিপরীত কাজ। ইনশাআল্লাহ এগুলো করলে অন্তর থেকে হাসাদ ও হিংসার রোগ দূর হয়ে যাবে।

সুফলের জন্য চাই নিয়মিত চর্চা

অতঃপর হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, 'কিছুকাল নিয়মিত এরূপ করতে থাকলে হাসাদ দূর হয়ে যাবে। অন্ততপক্ষে বিশবার তো করবেই।

এক ব্যক্তি পত্র মারফত হযরত (রহঃ)- কে জানিয়েছিল, অমুকের প্রতি আমার মনে হিংসা আছে। এটা দূর করার উপায় কী ? এর উত্তরে হযরত ব্যবস্থা দান করেন যে, 'তার প্রশংসা করবে। তাকে সম্মান করবে। এবং হাদিয়া দেবে। অন্ততপক্ষে বিশবার এরূপ করবে। ইনশাআল্লাহ হাসাদ দূর হয়ে যাবে।

হাসাদ ও হিকদ-এর পার্থক্য

অন্য একটি চিঠির জবাবে হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন, কারও কোনও ক্ষতি বা বিপদের সংবাদ শুনলে যদি অন্তরে, আনন্দবোধ হয়, তবে এটা হাসাদ। সেই বোধ যদি তার পক্ষ হতে কোনও ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, তবে সেটা 'হিকদ'। উভয়টাই রিপু। কিন্তু এ রিপুর কারণে কোনও শাস্তি নেই। শাস্তি হবে সেই রিপুর বশে কোনও কাজ করলে। কাজ করাটা মানুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন। সুতরাং না করাটাও ইচ্ছাধীনই হবে। অবশ্য রিপুর দমনও জরুরী, যাতে তা শক্তিশালী হতে না পারে। দমন করার উপায় হল, লজ্জিত হওয়া, তাওবা করা এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা, যেন তিনি এ রোগ দূর করে দেন। সেই সংগে ওই ব্যক্তির সাহায্যও করা চাই, তা অর্থ দিয়ে হোক বা কায়িকভাবে হোক কিংবা দু'আর দ্বারা। এর ফলে রিপু দমন হয়ে অনেকটা নির্মূল হয়ে যাওয়ার মতই হবে।'[১৪৯]

হযরত (রহঃ) এ চিঠিতে হাসাদ ও হিকদ-এর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন, কারও কোনও ক্ষতির সংবাদ পেলে যদি আনন্দবোধ হয়, যেমন কারও বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি হয়ে যাওয়ার খবর শুনে মনে মনে বলল, বেশ হয়েছে, তার টাকা-পয়সা কমে গেল, অথবা তার ব্যবসায় মার খাওয়ার খবর শুনে মনে মনে বলল, ভালো হয়েছে, খুব বেড়ে গিয়েছিল। এবার একটু দমন পড়বে, এই যে অন্যের ক্ষতিতে সুখানুভূতি হল, এটাই হাসাদ।

এই সুখানুভূতির কারণ যদি হয়ে থাকে তার পক্ষ হতে কোনও আঘাতপ্রাপ্তি সেটা হিকদ। যেমন কেউ আপনাকে কোনও ভাবে কষ্ট দিয়েছিল। তাতে আপনার অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ দেখা দেয়। সেই বিদ্বেষের কারণেই তার ক্ষতির কথা শুনে মনে মনে খুশি হলেন, একটু আরামবোধ করলেন। এটা হল হিকদ বা বিদ্বেষ। কেউ কাউকে আঘাত

---

১৪৯. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৪ পৃ.

করলে প্রতিঘাত করার স্পৃহা জাগতেই পারে, কিন্তু সেই স্পৃহা কার্যকর করার সুযোগ সব সময় হয় না। আর তা না হলেই মনের ভেতর ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, যার থেকে জন্ম নেয় বিদ্বেষ। ফলে মনে মনে সে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে এবং তার কোন কষ্ট ও ক্ষতির কথা শুনলে কেমন যেন আনন্দবোধ হতে থাকে। কামনাই থাকে তার কোন অনিষ্ট ও অকল্যাণ হোক। এরই নাম হিকদ। সামনে ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা আসবে।

যা হোক হযরত থানভী (রহঃ)এস্থলে হাসাদ ও হিকদের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। কারও ভালো দেখার পর যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়, যদ্দরুন তার কোন ক্ষতি ও বিপদের কথা শুনলে মনে আনন্দবোধ হয়, তাকে বলে হাসাদ। আর কারও দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার বিপদের সংবাদ পেলে যে আনন্দবোধ হয়, তাকে বলে হিকদ (বিদ্বেষ)।

কুপ্রবণতাকে দমন করা জরুরি

হযরত (রহঃ) বলেন, মূল প্রবণতার কারণে কোন শাস্তি নেই। অর্থাৎ অন্তরে ইচ্ছাবহির্ভূত যে ভাবনা জন্ম নেয়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সেজন্য ধরা হবে না, ধরা হবে কেবল তখনই,যখন সেই ভাবনাকে কার্যে পরিণত করা হবে, অর্থাৎ হাসাদবশত অন্তরে যে কুভাবনা জাগে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কারও অকল্যাণ কামনা করা ও তার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা পাপ, সেজন্য অবশ্যই ধরা হবে, যেহেতু এটা ইচ্ছাধীন তৎপরতা। তৎপরতা যখন ইচ্ছাধীন, তখন এর থেকে বিরত থাকার বিষয়টাও ইচ্ছাধীন। তাই বিরত থাকা জরুরি।

মূল প্রবণতাটি ইচ্ছাধীন না হওয়ায় সে ব্যাপারে উদাসীন থাকার কোন সুযোগ নেই। বরং চেষ্টা করতে হবে কিভাবে সে প্রবণতাকে দুর্বল ও দমন করা যায়, যাতে তা বাড়তে না পারে, কেননা বাড়লে তো তা গুনাহে লিপ্ত করবে। কুপ্রবণতাকে দুর্বল ও দমন করার উপায় হল তার জন্য লজ্জিত হওয়া, তাওবা করা এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। সেই সংগে যার প্রতি হাসাদ দেখা দিয়েছে তাকে সাহায্য করাও কর্তব্য, তা আর্থিকভাবে হোক বা কায়িকভাবে কিংবা দু'আর মাধ্যমে। এভাবে ইনশাআল্লাহ সে প্রবণতা নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং নির্মূল হওয়ার কাছাকাছি পৌছে যাবে।

শয়তানের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করুন। হাসাদ খুবই খারাপ জিনিস। বিশেষত 'উলামা মহলেও এটা খুব বেশি দেখা যায়। কেননা 'ইলম' এর ধর্ম আত্মোত্তোলন-নিজেকে উর্ধ্বে স্থাপন। সে কারণে অন্যকে জ্ঞানে অগ্রগামী ও বেশি জনপ্রিয় দেখতে পেলে অনেক সময় অন্তরে হাসাদ জন্ম নেয়।

আমি আমার মহান পিতা (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি, এক ব্যক্তি স্বপ্নে শয়তানের সাক্ষাত পেল। তাকে দেখল ফেরিওয়ালার বেশে। কাঁধে অনেক গুলো পোটলা নিয়ে যাচ্ছে। পোটলাগুলোও আশ্চর্য রকমের। কোনওটিতে মল, কোনওটিতে মূত্র, কোনওটিতে পুঁজ, দুনিয়ার যত নাপাক দ্রব্য, সবই তার একেকটি পোটলায় আছে। কোন পোটলায় কী মাল তা উপরে লেখা আছে। কোনওটায় লেখা হাসাদ, কোনওটায় লেখা বিদ্বেষ, কোনওটায় অর্থ লালসা, কোনওটায় সম্মানস্পৃহা ইত্যাদি। সে শয়তানকে জিজ্ঞেস করল, তুই এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস। সে বলল, এগুলো আমার ব্যবসায়ের পণ্য। বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। লোকটি বলল, এসব তো মলমূত্র, কে এগুলো কিনবে ? শয়তান বলল, আমার বাজার চেনা আছে। কোন বাজারে কোন মাল চলবে বেশ জানি। বাণিজ্যিক এলাকায় নিয়ে যাব 'অর্থলালসা'। ব্যবসায়ীরা এটা কিনবে। সম্মান-লালসা ও হাসাদ নিয়ে যাব উলামা ও বিদ্বানদের মহলে। তারা এটা হাতে হাতে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন।

'ইলম ও বিদ্যা থেকে জন্ম নেয় হাসাদ ও সম্মানস্পৃহা

'ইলমের সাথে ইখলাস না থাকলে অন্তরে সম্মানস্পৃহা জন্মায় আর তার থেকে সৃষ্টি হয় হাসাদ ও পরশ্রীকাতরতা। অন্যকে যখন দেখে জ্ঞান-বিদ্যায় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তখন ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে- সে কেন আমার উপরে চলে যাবে ? কেন তার খ্যাতি আমার চেয়ে বেশি হবে ? কেন সে আমার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হবে ? আল্লাহর সন্তুষ্টি যখন লক্ষবস্তু না থাকে তখনই 'আলেম ও বিদ্বানের অন্তরে এই রোগ বাসা বাঁধে। কিন্তু লক্ষবস্তু যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, অর্থাৎ ইলমের সাথে যদি ইখলাসও থাকে, তবে হাসাদ ও সম্মানস্পৃহা জন্ম নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং অন্য কাউকে জ্ঞানে অগ্রগামী হতে এবং 'ইলমে তাকে ছাড়িয়ে যেতে দেখলে খুশিই হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইখলাস দান করুন। আমীন।

মাওলান মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী (রহঃ)-এর ইখলাস

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলভী (রহঃ)-আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- আমার মহান পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-এর সহপাঠী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও মুহব্বত ছিল। তার পক্ষ হতে মহব্বতের একটা নিদর্শন হল, তিনি আব্বাজী (রহঃ)-এর রচিত প্রতিটি গ্রন্থের দু'টি করে কপি নিজের কাছে রাখতেন এবং নিজে যা লিখতেন আব্বাজী (রহঃ)-এর রচিত গ্রন্থের নামেই তার নামকরণ করতেন। যেমন আব্বাজী (রহঃ)-এর রচিত তাফসীরগ্রন্থের নাম মা'আরিফুল কুরআন। তিনিও একখানি তাফসীরগ্রন্থ লেখেন এবং তারও নাম দেন মা'আরিফুল কুরআন। আব্বাজী (রহঃ) دعاوي مرزا (মিরযা কাদিয়ানীর বহু বিচিত্র দাবি) নামে একখানি বই লেখেন। তিনিও একই বিষয়ে একখানি বই লেখেন এবং নাম দেন دعاوي مرزا। এমনিভাবে আরও কয়েকটি বই তিনি অভিন্ন নামে রচনা করেন।

হাসাদের কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয়

তিনি লাহোরে থাকতেন। একবার আমি লাহোর গেলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। বিদায়কালে বললেন, মওলভী শফী'কে আমার সালাম বলো।

তিনি মওলভী শব্দের আগে কখনও মাওলানা বলতেন না। তিনি বলেন, মওলভী শফী'র সাথে আমার বায়ান্ন বছরের সম্পর্ক। আলহামদুলিল্লাহ এই দীর্ঘ সম্পর্কের ভেতর পরস্পরের মধ্যে কখনও বিন্দুমাত্র চির ধরেনি। তারপর বললেন, আচ্ছা বলত, আমাদের সম্পর্কে কখনও চির ধরেনি কেন ? বললেন, আলেম উলামার মধ্যে সম্পর্কে চির ধরে তার কারণ হল হাসাদ। অমুকে কেন আমার সামনে চলে গেল এই ঈর্ষাতেই অন্তরে মলিনতা দেখা দেয় এবং পরিণামে সম্পর্ক নষ্ট হয়। আল-হামদুলিল্লাহ মওলভী শফী'র প্রতি কখনও আমার মনে হাসাদ ও ঈর্ষা দেখা দেয়নি।

তারপর বললেন, আচ্ছা বলতো আমাদের মধ্যে হাসাদ কেন দেখা দেয়নি? আমি আরয করলাম, আপনিই বলে দিন। বললেন, তুমি কি 'কাফিয়া' পড়েছ ? বললাম, জী হাঁ, পড়েছি। বললেন, তাতে যে توابع 'তাওয়াবে'-এর আলোচনা আছে তা পড়েছ ? বললাম জী হাঁ, পড়েছি। বললেন, 'তাওয়াবে' এর মধ্যে না'ত-' এর বিষয়টা পড়েছ ? বললাম, জী হাঁ পড়েছি। বললেন, না'ত দু'প্রকার। একটি হল মাতবূ-এর না'ত। আরেকটি

মাতবূ-এর মুতা'আল্লিকের না'ত। যেমন زيد العالم (জ্ঞানী যায়দ)। এখানে العالم (জ্ঞানী) যায়দের না'ত (বিশেষণ)। কখনও না'ত সরাসরি মাতবূ'-এর না হয়ে তার মুতা'আল্লিকের হয়, যেমন زيد العالم غلامه (যায়েদ যার গোলাম জ্ঞানী)। এস্থলে العالم মূলত যদিও زيد এর না'ত (বিশেষণ), কিন্তু যখন তারকীব (বাক্যের শব্দ বিশ্লেষণ) করবে, তখন زيد কে বিশেষিত বিশেষ্য এবং العالم غلامه কে তার না'ত বা বিশেষণ বলবে, অথচ العالم 'যায়দ'-এর বিশেষণ নয় ; বরং তার মুতা'আল্লিক অর্থাৎ তার সাথে সম্পৃক্তজনের বিশেষণ। তা সত্ত্বেও তারকীবে তাকে যায়দেরই বিশেষণ বলা হয়।

এই ভূমিকা দানের পর তিনি বললেন, মওলভী সাহেব! যখন মওলভী শফী'-এর কোনও ইলমী অবদান আমার সামনে আসে, আমি মনে করি যে অবদান তিনি রেখেছেন প্রকৃতপক্ষে তা তার হলেও পরোক্ষভাবে আমারও বৈ কি ! অর্থাৎ আমি زيد العالم اخوه (যায়দ, যার ভাই জ্ঞানী)-এর শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই সুদীর্ঘকালীন সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সত্ত্বেও অন্তরে কখনও হাসাদ দেখা দেয়নি। এই চেতনা আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই দান করুন।

'ইলমের সাথে 'ইখলাস ও সেবকত্বের চেতনা

সুতরাং 'ইলমের ভেতর ইখলাস থাকা অপরিহার্য। 'ইলম শিখতে হবে কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্যে। অন্যদের উপর জাঁক দেখানোর জন্য নয়। আমাদের হযরত ডাক্তার 'আব্দুল হাই (রহঃ) কী চমৎকার বলছেন- অন্যের উপর বাহাদুরি দেখানোর জন্যই কি আল্লাহ তা'আলা 'ইলম দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার নি'আমত। তিনি অনুগ্রহ করে তোমাকে দান করেছেন। তোমার কর্তব্য এর সঠিক ব্যবহার করা, সঠিক খাতে ব্যবহার করা। এর সঠিক খাত হল অন্যের কল্যাণ ও খেদমত। কাজেই এর মাধ্যমে অন্যের উপকার করার চেষ্টা কর। এর দ্বারা অন্যের খেদমত কর। তুমি খাদেম, অন্যসব লোক তোমার মাখদূম। যে ব্যক্তি ইলম শিখবে তার অন্তরে এই চেতনাও সৃষ্টি করতে হবে, জাহির করার মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

যখন এই চেতনা সৃষ্টি হবে, যখন ইখলাস জন্ম নেবে তখন আর অন্তরে হাসাদ দেখা দেবে না। অন্য কাউকে ইলমে অগ্রগামী হতে দেখলে গাত্রদাহ সৃষ্টি হবে না। বরং যখন দেখবে লোকে আরও বেশি শিখছে এবং তাদের দ্বারা মানুষ বেশি- বেশি উপকৃত হচ্ছে, তখন মনে করবে তারা তোমারই কাজ করছে। তাদের দ্বারা তোমার লক্ষ পূরণ হচ্ছে। সে হিসেবে তারা তোমার সহযোগী। আর এই ভেবে তুমি খুশিই হবে। দুঃখবোধ করবে না।

খ্যাতি খুব ভালো জিনিস নয়

দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা খুব ভালো জিনিস নয়। এর দ্বারা দুনিয়াবী আরামও নষ্ট হয়। এটা নানা বিড়ম্বনার কারণ। এর পরিণামে মানুষ সম্পূর্ণ অকর্মা হয়ে যায়। এরূপ ফযূল জিনিস হাসিল করার দিকে নজর দেওয়া কেন ? কেন এর ভিত্তিতে অন্যকে হিংসা করা ? আরে ভাই তোমার চেয়ে অন্যের দিকেই যদি মানুষ বেশি ঝোঁকে তাতে তোমার খুশিই হওয়া উচিত, যেহেতু কাজের অর্ধেকের বেশি অন্য লোকে আঞ্জাম দিচ্ছে এবং তোমার ভার লাঘব হচ্ছে। তোমার উচিত সেজন্য আল্লাহর শুকর আদায় করা- ঈর্ষাকাতর হওয়া নয়।

সারকথা অন্তরে ইখলাস থাকলে হিংসার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। হাসাদ থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠতম উপায় এই ইখলাস। কাজেই সব আমলে ইখলাস অর্জনের চেষ্টা কর। এটা যত বেশি অর্জিত হবে, এ রোগও তত বেশি নির্মূল হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ৪র্থ খণ্ড, ১৩৪-১৬৪ পৃষ্ঠা

বিদ্বেষ ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

গেল দু'দিনের আলোচনা ছিল হাসাদ (পরশ্রীকাতরতা) সম্পর্কে। আলহামদুলিল্লাহ তা সমাপ্ত হয়েছে। এর পর হযরত থানভী (রহঃ) আরেকটি আত্মিক রোগ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। রোগটি হল হিক্‌দ-বিদ্বেষ।

বিদ্বেষও মানব মনের একটি কঠিন ব্যাধি। এটা কত বড় রোগ তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়। তিনি ইরশাদ করেন,

আল্লাহ তা'আলা শবে বরাতে অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করেন। কালব গোত্রের ছাগপালের যত পশম আছে, তার সমসংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন। কিন্তু দু'জন লোককে তিনি ক্ষমা করেন না। এক সে ব্যক্তি যে, পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে, অন্য মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।[১৫০]

বনু কালব নামে আরবে এক বিশাল গোত্র ছিল। ছাগ পালনে তারা বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেকের ছিল বড়-বড় বকরীর পাল। সকলেরগুলো হিসাব করলে লাখের সংখ্যা পার হয়ে যাবে। এসব ছাগলের গায়ে যত পশম, তার সমসংখ্যক লোককে শবে বরাতে মাফ করা হয়। কিন্তু দু'জন লোককে মাফ করা হয় না।

টাখনুর নিচে পোশক পরা

দেখুন, এ রাত কত বরকতময়। রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। রহমত বিতরণ হতে থাকে। কিন্তু দু'জন লোক কত হতভাগ্য ! তারা ক্ষমা

---

১৫০. ইবন মাজা, হাদীছ নং ১৩৮০ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ৬৩৫৩

পায় না। একজন সেই, যে প্যান্ট, পায়জামা, লুংগি ইত্যাদি এতটা নামিয়ে পরে, যদ্দরুন টাখনুর নিচ ঢেকে যায়। এটা অহংকারের আলামত। এ রাত তো বিনয় প্রদর্শনের। যে ব্যক্তি বিনয় প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তা'আলার সামনে কাতরতা ও নিজ হীনতা প্রকাশ করে না, উল্টো তাকাব্বুরের প্রকাশ ঘটায়, সে যেন মাগফিরাতের কোন প্রয়োজন বোধ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন না।

অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি

দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সেই, যে অন্য মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকেও ক্ষমা করেন না, তাতে সে যতই নামাযী হোক, যত রোযাই রাখুক, যত ইবাদত-বন্দেগীই করুক, শবে বরাতেও শবে কদরেও তাকে ক্ষমা করা হয় না। চিন্তা করে দেখুন বিদ্বেষ কত খারাপ জিনিস। যে রাতে আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাতের ভান্ডার লুটিয়ে দেওয়া হয়, সে রাতে পর্যন্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই সাবধান হওয়া উচিত। নিজ অন্তর পরখ করে দেখা দরকার তাতে কোন মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ আছে কি না। থাকলে আর দেরি নয়, এখনই তার অপসারণে মনোযোগী হতে হবে। নিজেকে বিদ্বেষ মুক্ত করে ফেলতে হবে। কেননা

کفر است در طریقت ما کینہ داشتن آئین ما است سینہ چوں آئینہ داشتن

'আমাদের এ পথে বিদ্বেষ পোষণ কুফরী। আমাদের আইনে বক্ষদেশ রাখতে হবে আয়নার মত শুভ্র-সফেদ। অর্থাৎ অন্তরে কোন মুসলিমের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ থাকতে পারবে না।

হিক্‌দ বা বিদ্বেষ কাকে বলে ?

হিক্‌দ কাকে বলে ? এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অন্তরে কারও অশুভ কামনা পোষণ করা ও তাকে কষ্টদানের ব্যবস্থাগ্রহণ করাকে হিক্‌দ বলে।[১৫১]

অর্থাৎ কারও সম্পর্কে অন্তরে এই কামনা পোষণ করা যে, তার ক্ষতি হোক, সে কষ্টে পড়ুক ও বিপদগ্রস্ত হোক, সেই সংগে তাকে কষ্টদান ও ক্ষতিগ্রস্ত করার তৎপরতা চালানোই হল হিক্‌দ ও বিদ্বেষ।

---

১৫১. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৪ পৃ,

বিদ্বেষ যেভাবে জন্ম নেয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ জন্ম নেয় অন্যের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ এক ব্যক্তির দ্বারা আপনি কোনও ভাবে দুঃখ-কষ্ট পেলেন। সে কারণে আপনার মনে ক্ষোভ জন্মাল। আপনি চাচ্ছেন তাকেও অনুরূপ দুঃখ কষ্ট দিতে। কিন্তু সে ব্যক্তি আপনার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। তাকে কিছু করার মত ক্ষমতা আপনার নেই। হয়ত সে বয়সে আপনার বড়। বা মর্যাদায় আপনার উপরে তাই চাইলেও কিছু করতে পারছেন না। প্রতিশোধ গ্রহণ আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এক দিকে মনে ক্ষোভ। প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। অন্যদিকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা। মনের ক্ষোভ মেটানোর পথ পাচ্ছেন না। বাষ্প বের হতে পারছে না। এতে করে মনে যে বিষবাষ্প জমে তাই এক পর্যায়ে বিদ্বেষে পরিণত হয়। তখন আপনি চিন্তা করেন, আচ্ছা এখন তো বদলা নেওয়ার সুযোগ নেই, কিন্তু এক মাঘে তো শীত যায় না। একদিন না একদিন সুযোগ হাতে আসবেই। সেদিন তোমাকে ছাড়ব না। এটাই হিক্দ ও বিদ্বেষ।

তবে এতটুকু ভাবনা গুনাহ নয়। অর্থাৎ যখন চান্স পাব, প্রতিশোধ নিয়ে নেব, সে আমার যে ক্ষতি করেছে, তেমনি ক্ষতি তারও করে ছাড়ব, এতটুকুতে কোন পাপ নেই। কেননা শরী'আত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। আপনাকে কেউ কষ্ট দিলে সমপরিমাণ কষ্ট তাকে দেওয়ার হক আপনার আছে।

ক্রুদ্ধাবস্থায় মানুষ সীমার মধ্যে থাকে না

কিন্তু রাগ বড় খারাপ জিনিস। অন্তরে যখন তা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং দমন করা না হয়, তখন তার বিষবাষ্পে মানুষ খেই হারিয়ে ফেলে। ফলে স্থির করে ফেলে, যদি কখনও সুযোগ পাই, তবে সে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে, তার দশগুণ আমি দেখে নেব। এটাই সাধারণ অবস্থা। যে লোক সীমারক্ষায় অভ্যস্ত নয়, সে কখনও সীমার ভেতর থাকতে পারে না। যারা নিজেদের মধ্যে গালাগালি করে অভ্যস্ত, তাদের কাজ হল একজনের গালির জবাবে দশগুণ শুনিয়ে দেওয়া। একজন হয়ত বেকুব বা আহাম্মক বলল। দ্বিতীয়জন বলে দেয়, তুই আহাম্মক, তোর বাপ-দাদাও আহাম্মক। সে কেবল 'তুইও আহাম্মক' বলে থামে না ; বরং চোদ্দ গোষ্ঠিকে জড়িয়ে নেয়। যার আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভ হয়নি, সে সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যায়।

আরবী প্রবচন আছে-

اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ

মূর্খ লোকের উত্তেজনা কেবল একবার আহাম্মক বলে দেওয়াতেই প্রশমিত হয় না ; বরং আরও বেড়ে যায়। এমনিভাবে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেলেও সীমার মধ্যে থাকে না। কেউ তাকে একটা ঘুষি দিলে প্রতি উত্তরে দুই ঘুষি মারবে।

প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাই বিদ্বেষ

কাজেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পৃহা যখন অন্তরে আছে, তখন এই প্রতিজ্ঞাও থাকবে যে, যখনই প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাব তাকে দেখে নেব। তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। এই দুষ্ট প্রবণতাকেই হিক্‌দ ও বিদ্বেষ বলে। এর ফলে সে যখনই সুযোগ পাবে তাকে কষ্ট দেবে, তার বদনাম করবে, গীবত করবে। মুখে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ আসলে মুখে কষ্ট দেবে-কটাক্ষ করবে, নিন্দাবাণ বর্ষণ করবে আর হাতে আঘাত করার সুযোগ আসলে দুহাত দেখে নেবে। এটা বিদ্বেষেরই কুফল। কাজেই এমনিতে এ প্রবণতায় গুনাহ না থাকলেও এর পরিণাম খারাপ। একে দমন করা না হলে এক পর্যায়ে গুনাহে লিপ্ত করে ছাড়বে। তাই এর দমন ও চিকিৎসা জরুরি।

মানুষের হাতে কোনও মানদণ্ড নেই

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন। কেউ জেনে-শুনে আপনাকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করার হক আপনার আছে। কিন্তু সেটা সোজা কথা নয়। আপনি ততটুকু আঘাতই তাকে করতে পারেন যতটুকু সে আপনাকে করেছে। সেই সীমার মধ্যেই আপনাকে থাকতে হবে। তার বাইরে যেতে পারবেন না, যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু সীমারেখা ভেদ হয়ে গেল কিনা তা বোঝার উপায় কী ? কারও কাছে তো এমন কোনও মানদন্ড নেই যা দ্বারা সে আঘাতকে মাপতে পারবে এবং সীমা স্থির করতে পারবে যে, এই ওজনের আঘাত করলে সীমার মধ্যে থাকবে তার বেশি হলে সীমা পার হয়ে যাবে। কী করে বুঝবে যে, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করছি মনের ঝাল মেটানোর জন্য, না আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ? আসলে এসব পরিমাপ করার কোন যন্ত্র মানুষের কাছে নেই।

হযরত 'আলী (রাযি.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার এক ইহুদী হযরত 'আলী (রাযি.)-এর সামনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করল। হযরত 'আলী (রাযি.)-এর পক্ষে তা বরদাশত করা কিভাবে সম্ভব। তিনি ইহুদীটিকে ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার বুকে চড়ে বসলেন। ইহুদী যখন দেখল বাঁচার কোন উপায় নেই একটা চালাকি করল। সে হযরত 'আলী (রাযি.)-এর মুখে থুথু ছুঁড়ে দিল। সাথে সাথে তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকে বলল, ছেড়ে দিলেন কেন ? এখন তো আরও বেশি শাস্তি দেওয়া দরকার ছিল। হযরত 'আলী (রাযি.) বললেন, আমি তো তাকে শাস্তি দিচ্ছিলাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বেআদবী করেছে বলে। তার সাথে আমার লড়াই ব্যক্তিগত কারণে ছিল না। আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য ছিল। কিন্তু সে যখন আমার মুখে থুথু মারল আমার রাগ বেড়ে গেল এবং তা কেবলই ব্যক্তিগত কারণে। এখন প্রতিশোধ নিলে তা ব্যক্তিগত কারণে নেওয়া হত। আমি আমার ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নিতে চাই না।

সাহাবায়ে কিরামের আত্মিক পরিশুদ্ধি ছিল অভাবনীয়

এমনই ছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُزَكِّيهِمْ

'তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন।'

আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঠিয়েছেন মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। সুতরাং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে এমন শুচিশুদ্ধরূপে গড়ে তোলেন, যার কোন নজীর মানবেতিহাসে পাওয়া যায় না। হযরত 'আলী (রাযি.)-এর এ ঘটনা তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের অবস্থা এরকম নয়। যে কারণে কেউ যখন অন্যের থেকে প্রতিশোধ নেয় তখন সীমার মধ্যে থাকে না। যতটুকু প্রতিশোধ নেওয়া দরকার তারচেয়ে অনেক বেশি নিয়ে ফেলে, আবার প্রতিশোধ নিতে না পারলেও তার অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। আর বিদ্বেষ বড়ই খারাপ জিনিস।

বিদ্বেষের চিকিৎসা

হাসাদ ও বিদ্বেষের চিকিৎসা একই রকম। অর্থাৎ মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে লোকসম্মুখে প্রতিপক্ষের প্রশংসা করুন। তার জন্য দু'আ করুন- হে

আল্লাহ ! দুনিয়া ও আখিরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। হে আল্লাহ ! যার অশুভ কামনায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে আছ, তাকে দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও তাকে সাফল্যমন্ডিত করুন। এর দ্বারা এক সময় অন্তর থেকে বিদ্বেষ ঘুচে যাবে। কেননা অন্তরে আছে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ, ইচ্ছা হয় তাকে চিবিয়ে খেতে, অথচ মুখ দিয়ে বের করা হচ্ছে তার প্রশংসা এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ। বাইরের এই আচরণের আছর ভেতরে পড়বেই। ফলে বিদ্বেষ নির্মূল হয়ে যাবে। তবে কাজটা কঠিন। কঠিন হলেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। কেননা এ রোগের চিকিৎসা এটাই। তাই যারা ভাগ্যবান, যাদের অন্তরে হিম্মত ও সবর আছে, কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তারা এটা অবলম্বন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

'এ কাজ কেবল সেই করতে পারে, যে নিজেকে সবরে অভ্যস্ত করে তুলেছে এবং এ কাজ সেই করতে পারে যে মহা ভাগ্যবান।'[১৫২]

এর দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একাজ করতে সক্ষম হবে সে একজন ভাগ্যবান লোক।

জান্নাত পেতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে

ভাই, জান্নাত তো কিছু সস্তা জিনিস নয়, যা এমনিতেই পাওয়া যাবে। জান্নাত পেতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। কখনও জান কুরবানী দিতে হয়, কখনও মাল। কখনও কুরবানী দিতে হয় আবেগ-স্পৃহা। আবেগ-স্পৃহা কুরবানী অনেক সময় জানমালের কুরবানী অপেক্ষাও কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু যত বড় প্রাপ্তি ত্যাগও তত বড়ই স্বীকার করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার জন্য ত্যাগ করতে হয় সব কিছুই। যেখানে জান কুরবানী দরকার হয় সেখানে জানের কুরবানী, যেখানে মালের কুরবানী দরকার সেখানে মালের কুরবানী এবং যেখানে আবেগ-অনুভূতির কুরবানী দরকার সেখানে তাই কুরবানী করতে হবে। কবি বলেন,

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'এই যে প্রাণ উৎসর্গ করলাম, এটা তো ছিল তারই দান। সত্য কথা হল সত্যিকারের উৎসর্গ কিছুই করা হল না।'

---

১৫২. হা-মীম-সাজদা : ৩৫

তো অন্তরে যেই ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছিল, তারই অনুকূলে দু'আ করা হল। আল্লাহ তা'আলা দেখছেন, আমার বান্দা আমারই জন্য এ কাজ করেছে। আমারই জন্য নিজের আবেগ-অনুভূতি চূর্ণ করেছে। ইচ্ছা ও চাহিদা কুরবানী করেছে। মনের কামনা-বাসনা যবাই করে দিয়েছে। পরিণামে আল্লাহ তা'আলা রোগ থেকে মুক্তিদান তো করবেনই, মর্যাদারও অভাবনীয় উন্নতি দান করবেন।

তার সদগুণের প্রতি লক্ষ করুন

বিদ্বেষ নির্মূলের জন্য প্রথম কাজ হল বিদ্বেষকে ঘৃণা করা। মনে করতে হবে, আমার অন্তরে যে তার অশুভ কামনা জাগছে এটা ভালো জিনিস নয়, খুবই মন্দ। অন্যের মন্দ চাওয়া কিছুতেই উচিত নয়। সেই সংগে তার মধ্যে কি কি সদগুণ আছে সেদিকেও লক্ষ করুন। বিদ্বেষ নির্মূলের জন্য এ পন্থা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার একটা বিষয় অপছন্দ হলে পছন্দের কোনও বিষয়ও পেয়ে যাবে।[১৫৩]

এ হাদীছে মুলত স্বামী-স্ত্রীকে তাদের সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাটি প্রযোজ্য সকলের জন্যই। এতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যার প্রতি অন্তরে বিদ্বেষভাব দেখা দিয়েছে তার সদগুণাবলীর দিকে তাকাও। খুঁজে খঁজে বার কর তার মধ্যে ভালো দিক কি কি আছে। চিন্তা কর, আমার অন্তরে যে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে, তা অমুক দোষের কারণে হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে যে কেবল এই দোষই আছে তা তো নয় ; গুণও তো কিছু না কিছু থেকে থাকবে। তারপর খুঁজে দেখ কি কি সদগুণ আছে। অনেক কিছুই পেয়ে যাবে। যখন সেই সব গুণের প্রতি লক্ষ করবে বিদ্বেষভাব হালকা হয়ে যাবে।

জগত সংসারে সম্পূর্ণ মন্দ নয় কেউ

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ায় এমন কোন লোক নেই, যার মধ্যে একটি সদগুণ নেই। আল্লাহ তা'আলা জগতে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার

---

১৫৩. মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৭২ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৮০১৩

কোনওটিই আপাদমস্তক কালোও নয়, সাদাও নয়। বরং প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু দোষও আছে, কিছু গুণও আছে। এটাই জগত সংসারের নিয়ম।

نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں   کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

কোনওকালেই কোনও বস্তু নয় সম্পূর্ণ অকর্মা। জগত-সংসারে কেউ নয় একেবারেই মন্দ। কাজেই যেসব দোষের কারণে কারও প্রতি তোমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোকে কিছুকালের জন্য ভুলে যাও, এবং লক্ষ কর তার মধ্যে বিদ্যমান সদগুণসমূহের দিকে।

বিদ্বেষের কুফল স্মরণ করুন

দ্বিতীয় কাজ কুরআন ও হাদীছে বিদ্বেষ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা স্মরণ করা, যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, শবে বরাতেও তার গুনাহ ক্ষমা করা হয় না।

তারপর সাবধান থাক, যাতে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা না হয় এবং একটা কাজও অংগ-প্রত্যংগ দিয়ে করা না হয়। বরং লোকসম্মুখে তার প্রশংসা কর এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার অনুকূলে দু'আ করতে থাক।

যা বিদ্বেষের অন্তর্ভুক্ত নয়

মনের কোনও কোনও অবস্থা বাস্তবে বিদ্বেষ নয়, কিন্তু লোকে মনে করে তাও বিদ্বেষের অন্তর্ভুক্ত এবং সে জন্য চিন্তিত হয়। তাই আগে বুঝে নিতে হবে বিদ্বেষ কী ? কেউ যখন স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে অন্যের অমঙ্গল চিন্তা করে এবং কিভাবে তার ক্ষতি করা যায় সেই ধান্ধায় থাকে আর এভাবে তার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হয়ে যায়, তখনই তাকে বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং তার মনের সেই অবস্থাটাকে বিদ্বেষ বলা হবে। কেবল মানসিক কুণ্ঠাকে বিদ্বেষ বলা যাবে না। যেমন একজনের সাথে মনের মিল হয় না। তাই তার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে ইচ্ছা হয় না, তার বাড়িতে যেতে ভালো লাগে না। তার কাছ থেকে দূরে থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ হয়। এটা বিদ্বেষ নয় মোটেই। এটা কেবলই তবিয়তের অমিল, স্বভাবগত প্রভেদ। কাজেই কারও সাথে মিশতে ইচ্ছা না হলে মিশবেন না। তাতে কোনও দোষ নেই। হাঁ তার হকসমূহ যাতে খর্ব না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন সালাম দেওয়ার অবকাশ হলে সালাম দেওয়া, সে সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া, অসুস্থ হয়ে পড়লে

খোঁজখবর নেওয়া, ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, আনন্দ-বেদনার মুহূর্তে তার পাশে থাকা ইত্যাদি। এগুলো তার হক। এগুলো আদায়ে যত্নবান থাকলেই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত তার সাথে মেলমেশা করা, সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আড্ডা দেওয়া, হাসি-তামাশা করা ইত্যাদি কোনও হক নয়। এসব না করলে দোষ নেই। তার সাথে বিদ্বেষের কোনও সম্পর্ক নেই। বিদ্বেষ হল অকল্যাণ কামনা ও ক্ষতিসাধনের তৎপরতা। তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

এ বিষয়টাকেই হযরত থানভী (রহঃ)তার ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেন যে, কারও সাথে যদি দুঃখজনক কোনও ব্যাপার ঘটে যায় আর সে কারণে তার সাথে মেলামেশা করতে ইচ্ছা না হয়, তবে সেটা হিক্‌দ ও বিদ্বেষ নয় ; বরং এটা মানসিক কুণ্ঠা, যা গুনাহ নয়।'[১৫৪]

অর্থাৎ মানুষের মন-মানসিকতা বিচিত্র রকমের। রুচি- অভিরুচি একেকজনের একেক রকম হয়ে থাকে। সে দিক থেকে একের সাথে অন্যের বনে না। তা না বনলে জোর করে বনাতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তাই এটা বিদ্বেষও নয়।

অন্যের ক্ষতিতে আনন্দবোধ

যারা শায়খের নির্দেশনায় আত্মশুদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করে তারা নিজের বিভিন্ন অবস্থার কথা শায়খকে মুখে বা লিখে জানিয়ে থাকে। খারাপ কিছু মনে হলে জানায় যে, আমার ভেতর এই-এই জাতীয় প্রবণতা লক্ষ করছি। এটা কোনও রোগ নয় তো ? রোগ হলে তার এলাজ কী ? শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য এটাই। তো জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহঃ)-এর কাছে এক চিঠিতে লিখল-

বিরুদ্ধভাবাপন্ন কোনও লোকের যদি কারও দ্বারা কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, তাতে অন্তরে এক ধরনের আনন্দ বোধ হয়।'[১৫৫]

শায়খের মাধ্যমে নিজেকে ইসলাহ করানোর নিয়ম এটাই যে, অন্তরে যখন যে অবস্থা দেখা দেয় তা শায়খকে অবহিত করতে হবে। উপরিউক্ত পত্রলেখক অনুভব করেছিল যে, আমার প্রতিপক্ষের যদি কোনও রকম ক্ষতি

---

১৫৪. আনফাসে 'ঈসা : পৃ, ১৭৪

১৫৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৫

সাধিত হয়, যেমন ঘরে আগুন লেগে যাওয়া, চুরি-ডাকাতি হওয়া, বা দুর্নাম রটা ইত্যাদি, তবে সেজন্য অন্তরে একধরনের আনন্দ অনুভূতি হয়। সেই আনন্দের অনুভুতি কি গুনাহ, না গুনাহ নয় ? গুনাহ হলে এর প্রতিকার কী ? কিভাবে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ?

এ আনন্দ রোধনীয়

উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন, বৌদ্ধিক ও বিশ্বাসগতভাবে চিন্তা করবে যে, এ আনন্দ অনুচিত। এটা রোধ করা দরকার। সাথে দু'আ করবে,হে আল্লাহ ! এ আনন্দ দূর করে দিন।'[১৫৬]

হযরত থানভী (রহঃ)-এর এককেটি শব্দ অত্যন্ত মাপাজোখা হয়ে থাকে। তিনি বোঝাচ্ছেন অন্যের দুঃখে আনন্দবোধ করাটা যে ভালো জিনিস নয় ; বরং অতি মন্দ, এটা নিজ আকল বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা কর এবং সেই বিশ্বাসও অন্তরে জাগ্রত কর। বৌদ্ধিক ও বিশ্বাসগত শব্দদু'টি ব্যবহার করার কারণ, স্বভাবগতভাবে যে আনন্দ দেখা দেয়, তা ইচ্ছাতীত বিষয়। তাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন ভূমিকা নেই। আর ইচ্ছাতীত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ধর-পাকড় নেই। বৌদ্ধিক ও বিশ্বাসগতভাবে ভাবতে হবে যে, অন্যের দুঃখে আমার যে আনন্দ বোধ হচ্ছে এটা অতি মন্দ খাসলত। এ আনন্দ অনুচিত। এটা বর্জনযোগ্য। তাই বর্জনের চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টা হিসেবে দ্বিতীয় কাজ আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। কাজেই দু'আ করবে হে আল্লাহ ! এই আনন্দ অতি মন্দ। অন্যের দুঃখে আমার এভাবে আনন্দিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমার ইচ্ছার বাইরেই তা এসে যাচ্ছে। ঠেকানোর কোন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি নিজ রহমতে এ আনন্দ দূর করে দিন।

ইচ্ছাতীত কল্পনা গুনাহ নয়, কিন্তু মন্দ বটে

অন্যের দুঃখে অন্তরে যে আনন্দ বোধ হয়, হযরত থানভী (রহঃ) তাকে গুনাহ সাব্যস্ত করেননি। তিনি বলেননি যে, এটা অনেক বড় গুনাহ। কেননা অনিচ্ছায় যেসব কুধারণা ও অসৎ কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হয় তাতে গুনাহ নেই। সেজন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ধরা হবে না। কিন্তু এমনিতে বিষয়টা ভালো নয়। কেননা কেউ যদি অন্তরে সে কুধারণাকে জমাট বাঁধতে

---

১৫৬. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৫

দেয়, তবে এক পর্যায়ে তা বিদ্বেষে পরিণত হবে এবং সেই বিদ্বেষবশে তার দ্বারা গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে যাবে। হয়ত গীবত করবে, মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলবে, গালাগাল করবে ইত্যাদি। কাজেই অনিচ্ছাজনিত ভাবনা কল্পনা গুনাহ না হলেও তা মন্দ অবশ্যই। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে হবে হে আল্লাহ ! আমার অন্তর থেকে এসব দূর করে দিন।

এ দু'টি কাজ তো অবিলম্বেই করবে। সেই সংগে লক্ষ্য রাখবে যাতে সেই ভাবনা-কল্পনার বশবর্তীতে কোনও অন্যায় আচরণ না হয়ে যায়।

আঘাতপ্রাপ্তিকে নিজ বদ আমলের পরিণাম মনে করা

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহঃ)- কে লিখেছিল,

আকাঙ্ক্ষা হয়, যেন বিরোধী ব্যক্তির বিরোধিতাকে নিজের অনুচিত কার্যকলাপ ও বদ আমলের কুফল গণ্য করি।'[১৫৭]

প্রতিপক্ষের দিক থেকে কোন আঘাত পেলে তার পরিণামে অন্তরে বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এজন্য পত্র লেখক লিখেছে, আমার আন্তরিক কামনা, আল্লাহ তা'আলা যেন আমার মন-মেজাযকে এমন বানিয়ে দেন, যাতে কারও দ্বারা কোনও কষ্ট পেলে তার প্রতি উত্তেজিত হয়ে না উঠি ; বরং দুনিয়ার যে কারও দ্বারা কোনও রকম দুঃখ-কষ্ট পেলে মনে করি এটা আমার বদ আমলের পরিণাম। কেননা, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

তোমাদের যা কিছু বিপদাপদ দেখা দেয় তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল।'[১৫৮]

বিপদাপদ যখন নিজ কৃতকর্মেরই ফল, তখন অন্য কেউ আমাকে গালমন্দ করলে বা অন্য কোনওভাবে কষ্ট দিলে তাও তো আমার কৃতকর্ম ও বদ আমলেরই ফল হবে। আমি খারাপ কাজ না করলে সে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিত না, এমনকি কষ্টদাতা কোন মানুষ না হয়ে জীব-জন্তুও যদি হয়, কোনও পশুর দ্বারাও যদি আমি কোন কষ্ট-ক্লেশ পাই, তাও নিঃসন্দেহে আমার অন্যায়-অপরাধেরই পরিণাম। কেউ যদি আমাকে মারধর করে তবে বুঝতে হবে মারধর সে ব্যক্তি করছে না ; বরং আমার পাপ ও অন্যায়-অনুচিত কাজই তা করছে।

---

১৫৭. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৫ পৃ,

১৫৮. শূরা : ৩০

জল্লাদ রাজাজ্ঞা পালন করে মাত্র

বাদশাহ যদি জল্লাদকে হুকুম দেয় অমুককে একশ' চাবুক মার, তবে দৃশ্যত চাবুক মারছে জল্লাদই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মারছে বাদশা। জল্লাদ তার হুকুম পালন করছে মাত্র। তাই তো যাকে চাবুক মারা হয়, সে জল্লাদকে নয়; বাদশাহকেই তার দুশমন মনে করে। সে যদি কখনও প্রতিশোধ নিতে চায়, তবে জল্লাদের থেকে নয় ; বরং বাদশাহ থেকেই নেবে। কেননা বাদশা যখন চাবুক মারার নির্দেশ দিয়েছে তখন তা না মারার সাধ্য জল্লাদের নেই। হুকুম মানতে সে বাধ্য। যেহেতু সেটাই তার ডিউটি। সে অপারক। তাই তাকে শত্রু মনে করা হয় না।

কাজেই চিন্তাটা যদি এভাবে করা হয় যে, যে ব্যক্তি আমাকে দুঃখ কষ্ট দিচ্ছে তার তো তা না দেওয়ার সাধ্য ছিল না। সাধ্য ছিল না দেওয়ারও। তাকদীরই তাকে দিয়ে আমাকে কষ্ট দেওয়াচ্ছে। আর দেওয়াচ্ছে আমার কোন অন্যায় অপরাধের কারণে। এটা আমার কৃতকর্মেরই ফল। দুনিয়াতেই আমাকে সে ফল ভোগ করতে হচ্ছে। কাজেই কষ্টদাতাকে কেন খারাপ মনে করব বা শত্রু গণ্য করব ? যদি এভাবে চিন্তা করা হয়, তবে কারও প্রতি অন্তরে কখনও বিদ্বেষভাব জন্ম নেবে না।

এরূপ চিন্তা ইচ্ছাশক্তির অধীন

হযরত থানভী (রহঃ) উত্তর লেখেন, এরূপ চিন্তা ইচ্ছাধীন বিষয়, বারবার চিন্তা করতে থাকলে এতে পরিপক্বতা অর্জিত হবে।[১৫৯]

অর্থাৎ কারও দ্বারা কোনও দুঃখ-কষ্ট পেলে আমি নিজ কৃতকর্মের ফলেই তা পাচ্ছি- এরূপ চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের আছে। এটা তার ইচ্ছাশক্তির অধীন। নিয়মিত এরূপ চিন্তা করতে থাকলে এক পর্যায়ে এটা অন্তরে বসে যাবে।

হযরত যুন-নূন মিসরী (রহঃ)-এর ঘটনা

প্রখ্যাত ওলী হযরত যুন-নূন মিসরী (রহঃ)-এর ঘটনা। 'রিসালা কুশায়রিয়া'-গ্রন্থে আছে, একদা তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। নির্বোধ কিসিমের একটি লোক রাস্তায় তার পিছু নিল। উদ্দেশ্য তাকে কষ্ট দেওয়া। তার হাতে একটি লাঠি ছিল। অকস্মাৎ সেই লাঠি দিয়ে সে হযরত যুন-নূন (রহঃ)-এর মাথায় পেটাতে শুরু করল।

---

১৫৯. আনফাসে 'ঈসা : ১৭৫ পৃ,

তখন হযরত যুন-নূন (রহঃ)-এর মুখ দিয়ে প্রথম যে কথা উচ্চারিত হয়েছিল তা ছিল-

اِضْرِبْ رَأْسًا طَالَ مَا عَصَى اللهَ

পেটাও এ মাথাকে। এ মাথা বহুদিন আল্লাহর নাফরমানি করছে।[১৬০]

অর্থাৎ মাথায় যে লাঠির বাড়ি পড়ছিল, তিনি তাকে নিজ কৃতকর্ম ও বদ আমলেরই পরিণাম গণ্য করেছিলেন।

আমিই সর্বাপেক্ষা বেশি দুষ্কৃতকারী

হযরত যুন-নূন মিসরী (রহঃ)-এর ঘটনা। একবার মিসরে মারাত্মক অনাবৃষ্টি চলছিল। লোকজন এসে তাকে ধরল, হযরত ! বৃষ্টি হচ্ছে না। ভয়াবহ খরা। দু'আ করুন,আল্লাহ তা'আলা যেন বৃষ্টি দান করেন। উত্তরে তিনি বললেন, এ খরা মানুষের পাপাচারেরই পরিণাম। আর আমার চেয়ে কঠিন পাপী এই জনপদে কেউ নেই। আমি শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আশা করা যায় আমি চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার রহমত এসে যাবে এবং বৃষ্টি নামবে। এভাবে তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট লোক মনে করছেন।

মোট কথা আল্লাহ তা'আলার ইশারা ছাড়া কারও সাধ্য নেই অন্য কারও ক্ষতি করবে। মানুষেরও সে সাধ্য নেই, জিন্ন বা অন্য কোন জীবজন্তুরও নেই। আসলে যা-কিছু ঘটছে তা আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও তার ইশারায়ই হচ্ছে। আপনি আমি যেহেতু সেই হিকমত বুঝতে পারি না, তাই দুঃখ-কষ্ট পেলে চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দেই।

তিনি চান দুনিয়াতেই পাক-পবিত্র করে দিতে

মাওলানা রুমী (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সিংহের খাঁচার মধ্যে পড়ে যায় তবে সে সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে যায়। পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া তার করার কিছু থাকে না। সে পারে কেবল নিজেকে তার হাতে ছেড়ে দিতে- খাবি তো খেয়ে ফেল। ছিঁড়ে- ফেড়ে ফেলবি তো তাই কর। অনুরূপ প্রতিটি লোকের

---

১৬০. হিলয়াতুল-আওলিয়া, ৭খ, ৩৮৮ ; ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, ১খ, ৩২ ; সিফাতুস-সাফওয়ার, ১খ, ৪৪৫ ; আর রিসালাতুল-কুশায়রিয়্যা,১খ, ৭। উল্লেখ্য এসব গ্রন্থের, বর্ণনা অনুযায়ী এটি হযরত যুন-নূন মিসরী (রহঃ)-এর নয় ; বরং হযরত ইব্রাহীম ইবন আদহাম (রহঃ)-এর ঘটনা।

চিন্তা করা উচিত জগত-সংসারের প্রতিটি কাজ খালেস মালিকের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। কেউ আমাকে পাথর মারলে তা তার ইশারায়ই মারছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, তার এ রকম ইশারা কেন ? তা এ কারণে যে, তুমি কোন পাপকার্য করেছিলে। আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছেন ইহজগতেই তোমাকে তার শাস্তি দিয়ে দিতে, যাতে আখিরাতে শাস্তিভোগ করতে না হয়। কেননা পথ দু'টিই ছিল। হয় আখিরাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা, নয়ত দুনিয়ায় কোন শাস্তি দিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহমত করেছেন। আখিরাতের কঠিন শাস্তির বদলে দুনিয়ার লঘু শাস্তিকেই তোমার জন্য পছন্দ করেছেন, যাতে হিসাব নিকাশ সব এখানেই শেষ হয়ে যায়।

বিদ্বেষ বিলোপের মোক্ষম দাওয়াই

সুতরাং অন্য কারও দ্বারা কোন দুঃখ-কষ্ট পেলে মনে করবে তা তাকদীর ও নিয়তির অধীনেই ঘটছে। কাজেই সেই ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ ও ক্ষোভ নিরর্থক। বিদ্বেষ পোষণ যদি করতেই হয়, তা নিজ বদ আমল ও পাপকর্মের উপরই করা যায়। কেননা দুঃখ-কষ্টদানের পরিস্থিতি সে কারণেই তো সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ অন্তরে কারও প্রতি বিদ্বেষ জন্মাবেই না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ৪র্থ খণ্ড, ১৬৬-১৮৬ পৃষ্ঠা

রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা এবং তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرَائِيْ يُرَائِيْ اللهُ بِهٖ

হযরত জুনদুব ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন আবূ সুফয়ান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পরিণামে তাকে কুখ্যাত করে তোলেন। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করেন (অর্থাৎ মানুষের সামনে তার মুখোশ খুলে দেন, যাতে তারা বুঝতে পারে এই ব্যক্তি যা কিছু করছে মানুষকে দেখানোর জন্যই করছে)।[১৬১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীছে দুটি রোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-

(ক) রিয়া; (প্রদর্শস্পৃহা) ও

(খ) সুম'আ; (খ্যাতিস্পৃহা)।

নাম ডাকের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে 'সুম'আ' এবং মানুষকে দেখানোর লক্ষে কোন কাজ করাকে 'রিয়া' বলে। গেল জুমু'আয় আরয করেছিলাম ইখলাস অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। যে কাজই করা হবে তা যেন এক আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার লক্ষে করা হয়, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা না হয়। ইখলাস অর্জন করা যেমন ফরয, তেমনি তার বিপরীত জিনিস রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা হারাম। ইখলাসই সমস্ত আমলের রূহ। ইখলাসবিহীন আমলের কোনও মূল্য নেই, দৃশ্যত সে আমল যত বড় ও যত

---

১৬১. বুখারী, হাদীছ নং ৬০১৮ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৫৩০১ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১০১৬ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৯৫৫৭

বেশিই হোক। ইখলাস যত কম হবে সেই অনুপাতে আমলের উপকারও কমতে থাকবে। কাজেই ইখলাস অর্জনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। যেহেতু এটা আমলের প্রাণবস্তু। রিয়া ও সুম'আ আমলকে বরবাদ করে দেয়। রিয়া একটি কঠিন ব্যাধি। এর থেকে মুক্তিলাভ সহজ নয়। অনেক সাধনা দরকার। এটা এমনই সুক্ষ্ম রোগ, যা রোগী নিজেও অনেক সময় টের পায় না। তাই প্রথমে এর স্বরূপ বোঝা দরকার। অতঃপর এর চিকিৎসার জন্য বুযুর্গানে দীন যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তাও আলোচনা করা যাবে।

রিয়ার স্বরূপ

রিয়া একটি কঠিন ব্যাধি। এটা সম্মানস্পৃহারই একটি শাখা। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার যত পন্থা আছে তার যে কোনওটির মাধ্যমেই সেই সম্মান অর্জন করা যায়। কিন্তু রিয়া হয় কেবল ইবাদতে। মানুষের মনে নিজ মূল্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইবাদত করলে বলা হবে সে রিয়ায় আক্রান্ত। উদাহরণত এক ব্যক্তি সুখ্যাতি অর্জন করতে চায়। এ লক্ষে সে প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়। এভাবে মানুষের অন্তরে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও গণমানুষের মধ্যে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার প্রচেষ্টা চালায়। তার এ প্রচেষ্টাকে সম্মানস্পৃহা বলা হবে, কিন্তু এটা রিয়া নয়। কেননা তার এ প্রচেষ্টা ইবাদত নয়। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়াকে কেউ ইবাদত বলবে না। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং দান-খয়রাত করে। তার উদ্দেশ্য মানুষ এসব ইবাদত দেখবে এবং তার প্রশংসা করবে। এটা রিয়া। সুতরাং সম্মানস্পৃহা (হুব্বে জাহ) একটি সাধারণ রোগ, যার বিশেষ একটি শাখা হল রিয়া। রিয়ার সার কথা হল ইবাদতে 'আবিদের দৃষ্টি খালেক থেকে সরিয়ে মাখলূকের দিকে নিয়ে যাওয়া।

রিয়ার প্রথম স্তর

লোকভেদে রিয়ার বিভিন্ন স্তর আছে। কোনও কোনও স্তর তো কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কোনও স্তর তার নিচে এবং কোনও স্তর আরও নিচে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রিয়া হল ঈমান ও বিশ্বাসে লোক দেখানোর মনোভাব, অর্থাৎ অন্তরে তো বিশ্বাস নেই, কিন্তু স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজেকে মু'মিন বলে প্রচার করে এবং ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে তাদেরকে সেকথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে। পরিভাষায় একে 'নিফাক' বলে। অর্থাৎ প্রকাশ করে এক, কিন্তু মনে আরেক। নিফাক রিয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।'[১৬২]

অর্থাৎ মুনাফিকদের শাস্তি কাফেরদের চেয়েও কঠিন হবে। কেননা তারা কাফের তো বটেই, সেই সংগে প্রতারকও। ঈমানের কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেয়। এটা এক মারাত্মক অপরাধ।

রিয়ার দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তরের রিয়া হল ফরয ইবাদতে লোক দেখানোর মানসিকতা। যেমন এক ব্যক্তি নামায পড়তে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু নামাযীদের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকায় সে নামায পড়তে বাধ্য হয়ে গেছে। ভাবছে নামায না পড়লে লোকে বেনামাযী বলবে। সমাজে অসম্মান হবে। তাই বেনামাযী হওয়ার বিষয়টা লুকানোর জন্য সকলের সাথে নামায পড়ে ফেলল। এখানে দু'টো ব্যাপার আছে। এক তো খুশি মনে নামায পড়া। সে ভাবছে অন্য সময় তো পড়ি না, কিন্তু এখানে যখন পড়ার সুযোগ হয়ে গেছে পড়েই ফেলি। এক্ষেত্রে আশা করা যায় সে রিয়ার মধ্যে পড়বে না। কিন্তু মতলবই যদি থাকে পালানো, কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় পালাতে পারছে না। বাধ্য হয়ে সে বেনামাযী হওয়ার বেইজ্জতি থেকে বাঁচার জন্য নামায পড়ে নিল। এটা ফরযের ভেতর রিয়া। এমনিতে এটা শিরক অপেক্ষা নিম্মস্তরের হলেও সূফী-সাধকদের দৃষ্টিতে শিরকই বটে, যেহেতু সে খালেকের জন্য পড়ছে না, মাখলূকের জন্য পড়ছে, যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায পড়ে, সে ইনশাআল্লাহ এই স্তরের রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

রিয়ার তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হল নফল ইবাদতে লোক দেখানোর মনোবৃত্তি। এক ব্যক্তি নফল 'ইবাদতে অভ্যস্ত নয় এবং নফল আদায়ের তাওফীকও তার হয় না। কিন্তু এমন এক মজলিসে সে আটকা পড়েছে, সেখানে সকলে নফল পড়ে। এখানেও দুই অবস্থা হতে পারে। যদি মনে করে এমনিতেই তো নফল পড়ি না। আজ যখন আল্লাহ তা'আলা সুযোগ করে দিয়েছেন, তখন পড়ি না

১৬২. নিসা : ১৪৫

কেন। এ অবস্থা রিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না, যদি উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করা এবং সুযোগকে কাজে লাগানো। পক্ষান্তরে ইচ্ছা যদি থাকে পালানো, কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় পালাতে পারছে না। অগত্যা লোক দেখানোর জন্য নফল পড়ে নিল, তবে এটা অবশ্যই রিয়া হবে।

রিয়ার চতুর্থ স্তর

এমনিভাবে নামাযের কায়ফিয়াত (গুণগত মান)-এর ভেতরও রিয়া হতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় তো তড়িঘড়ি করে নামায পড়ে, নামাযের মুস্তাহাব ও আদবের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখে না, কিন্তু সে এমন এক পরিবেশে গেল, সেখানে সকলেই অতি যত্নের সাথে নামায আদায় করে। সে ভাবল আমি আমার মত করে নামায পড়লে সকলে খারাপ মনে করবে। তাই সে অন্যদের মত সুন্দরভাবেই পড়ল। এটা নামাযের কায়ফিয়াত ও গুণগত মানের ভেতর রিয়া। এরও উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানো যে, সে কত সুন্দরভাবে নামায পড়ে। এতেও গুনাহ হয়।

পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরের রিয়াও নফল ইবাদতের কায়ফিয়াতে। এক ব্যক্তি কখনও লম্বা কিরাত ও দীর্ঘ রুকূ-সিজদা করে না, কিন্তু ভক্তদের সামনে তা লম্বা করে, যাতে তাদের ভক্তি-বিশ্বাস নষ্ট না হয়। এভাবে মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসের খাতিরে নামায দীর্ঘ করাও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়টা অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দেখা দেয়। কাউকে দেখলে নামাযে খুশূ-খুযূর ভাব চলে আসে। এতক্ষণ একভাবে নামায পড়ছিল, যেই না কেউ এসে পড়ল, অমনি নামায সুন্দর হয়ে গেল। প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ রিয়া থেকে বাঁচার উপায় কী ? সে কি নতুন জন্ম নেওয়া খূশূ-খুযূ ছেড়ে দেবে, না তা ধরে রাখবে এবং নিয়ত সংশোধন করে নেবে ?

এ ব্যাপারে হযরত হাকীমুল-উম্মত থানভী (রহঃ) বলেন, মুহাক্কিক সূফীদের মধ্যে মতভিন্নতা আছে। কেউ বলেন, এরূপ লোক আগের নিয়মেই নামায পড়বে, আকস্মিক দেখা দেওয়া খুশূ-খুযূর দিকে লক্ষ করবে না, যা কিনা অন্যকে দেখার ফলে জন্ম নিয়েছে। কারও মতে সে এই খুশূ'-খূযূ' ধরে রাখবে এবং নিয়ত খালেস করে নেবে।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত মতই উত্তম এবং এটাই অনুসরণ করা উচিত, তবে সাধারণ অবস্থায় এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ত বদলানো কঠিন, তাই

সহজ পন্থা এটাই যে, নিয়ত বদলানোর চিন্তা না করে ব্যস যেভাবে নামায পড়ছে, পড়তে থাকবে।

এসব ব্যাপার যেহেতু অনেকটা সুক্ষ্ম, যা নিজে-নিজে সমাধান করা সম্ভব হয় না, তাই পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যে, কোনও মুরশিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি যে নির্দেশনা দেন সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

রিয়া যে-কোনও 'ইবাদতেই হতে পারে

মনে রাখতে হবে, রিয়া কেবল নামাযেই নয়, যে কোন 'ইবাদতেই দেখা দিতে পারে। উদাহরণত একব্যক্তি কাউকে কিছু টাকা দান করছিল। ইচ্ছা ছিল পাঁচ টাকা দেবে, কিন্তু ইতোমধ্যে সেখানে পরিচিত কোনও ব্যক্তি এসে গেল। এখন সে ভাবছে মাত্র পাঁচ দিলে সে এই বলে নিন্দা করবে, দেখ কত বড় টাকাওয়ালা মানুষ, অথচ মাত্র পাঁচ টাকা দান করছে। এই ভেবে সে দশ টাকা দান করল। তার এই বৃদ্ধি আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়নি, মাখলূকের জন্য হয়েছে। পাঁচ টাকায় ইখলাস থাকলে তা তো আল্লাহর জন্যই হয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত পাঁচ টাকায় ইখলাস না থাকায় তা রিয়া গণ্য হবে। মোটকথা রিয়া যে কোনও ইবাদতেই হতে পারে। আর এটা শয়তানের মস্ত ফাঁদ। সে যখন মানুষকে আল্লাহর অভিমুখী দেখে এবং ইবাদতে ধ্যানমগ্ন পায়, তখন ঘাবড়ে যায়। এমন চলতে থাকলে তো সে তার থাবা থেকে বেঁচে যাবে! তখন শয়তান রিয়ার কৌশল গ্রহণ করে তার আমল বরবাদ করে দেয়।

রিয়ার আরেকটি সূক্ষ্ম স্তর

সূফিয়ায়ে কিরাম বলেন, কেউ যদি নিভৃতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় পূর্ণ ইখলাসের সাথে 'ইবাদত-বন্দেগী করে, পরে কেউ এসে তার সে আমলের প্রশংসা করে আর বলে, আমি 'ইবাদতরত অবস্থায় আপনাকে দেখে ফেলেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও আপনার মত ইখলাস দান করুন, আর এই প্রশংসা শুনে সে খুশি হয় এবং তৃপ্তিবোধ করে, তবে এটাও সূক্ষ্ম রিয়া। এর ফলে সে এরূপ প্রশংসা বাক্যের অপেক্ষায় থাকে, এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরে এরই জন্য ইবাদত করে।

এক সাহাবীর ঘটনা

একবার এক সাহাবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় পূর্ণ ইখলাসের সাথে ইবাদত করি, পরে যখন কেউ প্রশংসা করে তাতে আনন্দবোধ হয়, এটা কেমন?

তিনি বললেন,

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'এটা মু'মিনের পক্ষে নগদ সুসংবাদ।'[১৬৩]

অর্থাৎ কেবল আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই যেহেতু 'ইবাদত করা হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই তার নেক বান্দাদের মাধ্যমে তাকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার এ 'ইবাদত আল্লাহ তা'আলার কাছে কবূল হয়েছে। কাজেই এটা রিয়া নয়। তবে এটা কেবল সেই অবস্থায়ই প্রযোজ্য, যখন প্রশংসাবাক্য শুনে অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগবে এবং মনে মনে বললো আল্লাহ তা'আলার শুকর, তিনি মানুষের সামনে আমার ভালো হালই প্রকাশ করেছেন। অন্যথায় যদি আমার প্রকৃত রূপ মানুষের কাছে প্রকাশ পেত তবে প্রশংসা করা তো দূরের কথা, তারা আমাকে নিন্দারও উপযুক্ত মনে করত না ; বরং অভিশাপ দিত। এ মনোভাব থাকলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত থেকে বেঁচে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি প্রশংসাবাক্যে তৃপ্তিবোধ করে, তবে ভয় আছে ভবিষ্যতে এ অবস্থা তাকে রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেবে ফলে তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণেই একে সূক্ষ্ম রিয়া বলা হয়েছে।

বিনয়ের আলামত

একবার হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, আমরা যে বিভিন্ন সময় নিজেকে হীন, অধম, ফকীর ও অকর্মা বলি আর মনে করি এটা আমার তাওয়াযু ও বিনয়, প্রকৃতপক্ষে এটা বিনয়ের রিয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে, লোকে তাকে একজন বিনয়ী আলেম ও গুণী ব্যক্তি বলবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তখনই, যখন এ জাতীয় বিনয়ের শব্দ ব্যবহার কালে কেউ বলে ওঠে, নিশ্চয়ই (আপনি ও রকমই)। তখনকার অবস্থা দেখার মত। কত যে খারাপ তখন তার লাগে। এর দ্বারাই তো বোঝা যায় সে এসব শব্দ খাঁটিমনে বলছিল না ; বরং এর দ্বারা সে কেবল কৃত্রিমভাবেই বিনয় প্রদর্শন করছিল।

প্রকৃত বিনয় হল, নিজেকে ফানা করে দেওয়া, নিজেকে এমনই অধম মনে করা যে, মনের ভেতর নিজের সম্পর্কে কোনও শ্রেষ্টত্ববোধ থাকবে না।

---

১৬৩. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭৮০ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২০৪১৬

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

আমি আমার মহান পিতার কাছে ঘটনা শুনেছি যে, জনৈক বুযুর্গের মজলিসে লোকজন আসত এবং তার ওয়াজের খুব প্রশংসা করত। তাতে তিনি খুব খুশি হতেন। এক মুরীদ একবার বলল, হযরত ! এটা তো খুব আজব ব্যাপার যে, মানুষের প্রশংসায় আপনি খুব খুশি হন। বুযুর্গ বললেন, ব্যাপারটা যা মনে করছ তা নয়। প্রশংসার কারণে নিজেকে উপযুক্ত মনে করে আনন্দ প্রকাশ করছি না। আসল কথা হল, প্রশংসাকালে আমি ভাবি আল্লাহ তা'আলা কত মেহেরবান, তোমাদেরকে আমার বাহ্যিক দিকটাই দেখাচ্ছেন। তাই প্রশংসা করছ। আমার ভেতরের অবস্থা যদি প্রকাশ করে দিতেন তবে তোমরা মোটেই প্রশংসা করতে না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণীর কথা চিন্তা করেই খুশি হই। চিন্তা করে দেখুন তার দৃষ্টিভংগী। এটাই প্রকৃত বিনয়। নিজেকে অধম-অকর্মন্যও বলছেন না এবং কোনও প্রশংসার প্রতিবাদও করছেন না, কিন্তু অন্তরের ভেতর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের অনুভূতিই বিরাজ করে।

মোট কথা রিয়ার বহু শাখা-প্রশাখা আছে। অনেক সময় কোনটা রিয়া এবং কোনটা রিয়া নয় তা বোঝাও মুশকিল হয়ে যায়।

রিয়া সম্পর্কে হাদীছের বাণী

রিয়া এমনই বিপজ্জনক ব্যাধি যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

مَنْ صَلَّى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ بِاللهِ

'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর মানসিকতায় নামায পড়ল, (মাখলূককে) আল্লাহর সাথে শরীক করল।'[১৬৪]

কেননা, ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করা, কিন্তু মাখলূককে সেই রাজি-খুশির মধ্যে অংশীদার বানিয়ে নিল। তাই এটা শিরক। হাদীছটির পরবর্তী অংশে আছে–

مَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ بِاللهِ

'যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য রোযা রাখে, সে আল্লাহর সংগে (মাখলূককে) শরীক করল।'[১৬৫]

---

১৬৪. আহমাদ, ১৬৫১৭

চিন্তা করে দেখুন রিয়া কি মারাত্মক রোগ। এর সীমানা শিরকের সাথে লাগালাগি। আর এটা এতই ব্যাপক যে, পদে পদেই এর আশংকা থেকে যায় এবং খটকা দেখা দেয় রিয়া হয়ে গেল কি না।

রিয়ার চিকিৎসা

পূর্বেই আরয করা হয়েছে যে, এর এলাজের জন্য কোন কামেল শায়খের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তার পরামর্শ মত চলতে হবে।

বুযুর্গানে দীন বলেন, রিয়ার মূল হল আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহিমার অনুভূতিতে কমতি তার মহব্বত ও ভালোবাসায় ঘাটতি। অন্তরে আল্লাহ প্রেম যত বাড়বে, রিয়ার মাত্রা ততই কমবে। আল্লাহর মহব্বতে হৃদয়-মন আকীর্ণ থাকলে দৃষ্টি মাখলূকের দিকে যায় না, বরং খালেকের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। রাজ দরবার দ্বারা এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করুন বাদশাহ আপনাকে কোন কাজের জন্য তার দরবারে ডেকেছে, আপনি দরবারে উপস্থিত তো হলেন, কিন্তু আপনার দৃষ্টি ও মনোযোগ কোনওটাই বাদশাহর দিকে নয়। চোখ মন অন্যের অভিমুখী করে রেখেছেন। অপর দিকে এক নিগ্রো গোলাম দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ও মন উভয়ই বাদশাহর দিকে। অন্যদিকে তার লক্ষ নেই। এবার নিজেকে সেই গোলামের সাথে তুলনা করে দেখুন। বাদশাহর দরবারে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি আপনার যে অমনোযোগ, সেটা কি তার প্রতি আপনার বেআদবী ও অবমাননাকর আচরণ নয়? এরূপ আচরণ কেবল সেই করতে পারে যার অন্তরে বাদশাহর প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ ও সমীহভাব থাকলে দরবারে বসে তাকে ভিন্ন অন্য দিকে ধ্যান যেতেই পারে না। ঠিক এরকমই অন্তরে আল্লাহ প্রেম থাকলে, তার মহিমার অনভূতি জাগ্রত থাকলে মাখলূকের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। তখন সম্মানস্পৃহা ও রিয়া আপনিই খতম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যাদের অন্তরে তার মহব্বত ও প্রেম দান করেন, তারা অন্য কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এর দৃষ্টান্ত সূর্যের মত। সূর্য উঠলে তার প্রচন্ড তাপের সামনে চাঁদ-তারা দাঁড়াতেই পারে না। তারা সূর্য হতে আড়াল হয়ে যায়। অনুরূপ অন্তরে যখন আল্লাহ প্রেমের উদ্ভাস ঘটে, তখন সেথা হতে জগত-সংসারে আর সব ভালোবাসা অপসৃত হয়ে যায়। সূফিয়ায়ে কিরাম তো এ পর্যন্ত বলেছেন যে,

---

১৬৫. আহমাদ, হাদীছ নং, ১৬৫১৭

جدھر دیکھتا ہو ادھر تو ہی تو ہے

'যে দিকে তাকাই কেবল তুমিই তুমি'। তারা আরও বলেন,

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے

تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

'যখন সূর্যের উদয় হল, চাঁদ-তারা সব আড়াল হয়ে গেল। ভরা মজলিসে তখন কেবল এক তুমিই দৃশ্যমান থাকলে।'

(হুসায়ন ইবন) মানসূর হাল্লাজের ঘটনা

হুসায়ন ইবন মানসূর হাল্লাজ অনেক বড় সূফী ছিলেন। একবার ভাবসমাহিত অবস্থায় তিনি বলে ফেললেন انا الحق 'আমিই পরম সত্য'। লোকে মনে করল তিনি নিজেকে আল্লাহ দাবি করেছেন। ফলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেননি। তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন জগত-সংসারে সত্যিকারের অস্তিমান সত্তা কেবল আল্লাহ তা'আলাই আছেন, আর কেউ নয়। আপনস্থানে তিনি সঠিকই ছিলেন। উলামায়ে কিরামের ফতোয়া মোতাবেক তার উপর দন্ড বিধান জারি করা হল। আমি আমার মহান পিতার (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি, 'আনাল হক' বলার কারণে তাকে যখন মৃত্যুদন্ড দেওয়া হল, তখন সেখানে হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-ও উপস্তিত ছিলেন। মানসূর হাল্লাজ তাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, হে জুনায়দ ! তুমিও এখানে আছ ? যারাই আমাকে কতল করার ফতোয়া দিয়েছে তাদের কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু তুমি তো একজন 'আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তুমি কেন এখানে এসেছ ? হযরত জুনায়দ (রহঃ) বললেন, প্রকৃত অবস্থা যাই হোক না কেন বিধান ফকীহগণ যা বলেছেন সেটাই। তাই আমিও সেই ফতোয়াই দিয়েছি। বস্তুত মানসূর হাল্লাজ বোঝাতে চাচ্ছিলেন, সত্যিকারের অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলারই আছে। আর যা কিছু আছে তা কেবল তাঁরই দান। আমি ও আমার যা কিছূ আছে, তাতে আল্লাহর মহিমাই দৃষ্টিগোচর হয়।

যা হোক মাঝখানে এ বিষয়টা এসে পড়েছে তাই বললাম, না হয় মানসূর হাল্লাজের এ কথা অনুসরণযোগ্য নয়। তাঁর দেখাদেখি অন্য কারও এরূপ বাক্য উচ্চারণ জায়েয হবে না। মূলত বোঝানো উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা কখনও কখনও এমন তীব্র অনুভূতিও সৃষ্টি করে দেন, যখন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

জনৈক বুযুর্গের কাছে প্রশ্ন

জনৈক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হযরত একি আজব ব্যাপার ফির'আওন যখন বলল, 'আনাল হক' এবং বলল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى 'আমিই তোমাদের রব্ব' তখন কুরআনও তাকে লা'নত করেছে, অথচ মানসূর 'আনাল-হক' বললে তাকে লা'নত করা হয় না ; বরং 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা হয়। এর কী রহস্য ? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? তিনি উত্তর দিলেন, ফির'আওন যে 'আনাল-হক' বলেছিল, তাতে সে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করছিল, অপরপক্ষে মানসূর তা বলেছিল নিজেকে অস্বীকার ও বিলোপ করে দিয়ে। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

আরয করছিলাম, আত্মিক যে- কোনও রোগের উত্তম দাওয়াই হল অন্তরে আল্লাহ প্রেমের প্রতিষ্ঠা এবং দৃষ্টিতে মাখলূক থেকে সরিয়ে খালেকের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

হযরত শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ) ও এক দেহাতী

একদিনের কথা। হযরত শাহ ইসমা'ঈল শহীদ দিল্লীর জামে মসজিদে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ওয়াজ করলেন। ওয়াজ শেষে যখন চলে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তিকে দেখলেন, দ্রুত বেগে মসজিদের সিড়ি টপকাছে। তার গোটা দেহ ঘামে নাওয়া। যা হোক সে উপরে উঠে আসল। কিন্তু উঠে দেখল লোকজন চলে যাচ্ছে। তার খুব আফসোস হল। ঘটনাক্রমে হযরত ইসমা'ঈল শহীদ (রহঃ)-ই তার সামনে পড়লেন। সে তাকে ভালোভাবে চিনত না। তাই জিজ্ঞেস করল মওলভী ইসমাঈলের ওয়াজ কি শেষ হয়ে গেছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে। সে ইন্নালিল্লাহ পড়ে বলল, আমি তো অনেক দূর থেকে তার ওয়াজ শুনতে এসেছিলাম। এভাবে সে খুব আক্ষেপ করতে লাগল। হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) তার হাত ধরে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, আফসোস করার দরকার নেই। আমারই নাম ইসমাঈল। আপনি বসে পড়ুন। এতক্ষণ যে ওয়াজ করেছি তা পুনরায় আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে তিনি সিঁড়িতে বসে পড়লেন এবং দীর্ঘ সময়ের সেই ওয়াজ সেই একজন মাত্র শ্রোতাকে শুনিয়ে দিলেন। পরে কোনও একজন তাকে বলল, হযরত ! আশ্চর্য কথা, মাত্র একজন লোকের খাতিরে কয়েক ঘন্টার ওয়াজ পুনরায় শুনিয়ে দিলেন ? তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে। প্রথমবারও তো একজনের জন্যই ওয়াজ করেছিলাম, পরের বারও একজনের

জন্যই করেছি। লোক সমাগম ও তাদের পসন্দ-অপসন্দের কোন তোয়াক্কা তো আমি করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করা।

বধূ তো সেই জন, প্রিয় যাকে চায়

আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, হিন্দীতে একটা প্রবচন হল- 'সুহাগন উও জেসে পিয়া চাহে' অর্থাৎ বর যাকে পসন্দ করবে বধূ তো সেই। ঘটনার বিবরণ এই যে, একটি মেয়ের বিয়ে। তাকে খুব সাজানো হচ্ছে, যেমনটা বিয়েতে হয়ে থাকে। সব রকমে পরিপাটি করে তোলার পর সখীরা তাকে নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি শুরু করে দিল। তারা তার রূপের সাজের খুব প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ নির্বিকার। কারও কথার কোনও উত্তর দেয় না। কাউকে একটু কৃতজ্ঞতা জানায় না, চুপচাপ বসে আছে। একজনে বলল, আচ্ছা তোর হল কি ? একদম কথা বলিস না। সবাই কত কষ্ট করল, একটু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানালি না। কারও প্রশংসায় একটু খুশি হলি না। বল তো ব্যাপার কী ? শেষে বলল, সবই সত্য। তোমরা অনেক কষ্ট করেছ, আমাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছ, সবাই প্রশংসা করছ। কিন্তু এতে আমার লাভ কী? এসব সার্থক তো হবে তখনই যখন সেই আসল লোকটির পসন্দ হবে, যার জন্য এত আয়োজন, যার জন্য তোমরা আমাকে সাজিয়েছ।

আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, আমরা দুনিয়ায় যা কিছু করছি, তাতে কারও প্রশংসায় কিছু হবে না ; বরং যার জন্য করা হচ্ছে তিনি যদি পসন্দ করে নেন, তবেই এর সার্থকতা। কবি বলেন,

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

সত্যিকারের তাওহীদ ও একের ভেতর লীন তো প্রমাণ কেবল তখনই যখন হাশরের মাঠে আল্লাহ বলবেন, আমার এ বান্দা আমারই খাতিরে দোজাহান দিয়েছিল বিসর্জন। সেই সংগে তার পক্ষ হতে ঘোষণা হবে,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

'হে প্রশান্ত চিত্ত। তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের কাছে, অতঃপর শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।[১৬৬]

---

১৬৬. ফাজর : ২৭-৩০

খালেকের পসন্দ সন্ধান

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কখনও হাসতেন না। চেহারায় একটু মুচকি হাসিরও আভাস পাওয়া যেত না। কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনাকে কখনও হাসতে দেখি না কেন ? তিনি বললেন জানি না দুনিয়া থেকে আমার বিদায় কিভাবে ঘটবে, আমার কোনও আমল তার দরবারে কবুল হচ্ছে কি না ? এই চিন্তায় আমি হাসতে পারি না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা,জীবিত অবস্থায় তো কখনও হাসেন নি, কিন্তু মৃত্যুর পর তার মুখে হাসি দেখা গেছে। প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়া মাত্র চেহারায় হাসি ফুটে উঠেছে। বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, আয়াত ... يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এর সম্ভাষণ তিনিও পেয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং চিন্তা হোক এটাই, যার জন্য এসব আমল করা হচ্ছে, তার পসন্দ হচ্ছে কি-না। এ ফিকির আল্লাহপ্রেমেরই দাবি। অন্তরে আল্লাহপ্রেম এসে গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে- নির্মূল হয়ে যাবে জটিল সব ব্যাধি। আল্লাহপ্রেম জন্মানোর উপায় হল আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে ওঠাবসা করা। তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে প্রেমের উত্তাপ কিছু না কিছু লাগবেই। সেই উত্তাপে তোমার অন্তরেও আল্লাহপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠবে।

আল্লাহপ্রেম যেভাবে সৃষ্টি করতে হয়

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, আল্লাহপ্রেম সৃষ্টি করার একটা স্বোপার্জিত পন্থাও আছে। তা হল আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজির ধ্যান। আল্লাহ তা'আলা কত অগণ্য নি'আমতই না আমাদের দান করেছেন। রাতে শোওয়ার আগে একবার মুরাকাবা কর। অন্যসব চিন্তা ভাবনা থেকে মন-মস্তিস্ক শূন্য করে ভাবতে থাক, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কি-কি নি'আমত দিয়েছেন। সেই সংগে নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকেও নজর দাও। ভাবতে থাক, আমি তার নি'আমতের কী হক আদায় করেছি ? তা তো করিইনি, উল্টো পাপাচারেই লিপ্ত থেকেছি। এক চক্ষুই তো এমন এক নি'আমত, সারা জীবনেও যার শুকর আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ লক্ষ- কোটি টাকা খরচ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা মুফতেই আমাকে এটা দান করেছেন। আমি এর কী হক আদায় করেছি। এভাবে একদিকে তার নি'আমত স্মরণ কর, অন্যদিকে নিজ ত্রুটি-বিচুতির দিকে নজর দাও। ভেবে দেখ আল্লাহ তা'আলা কী অসীম ধৈর্যশীল, অপার সহনশীলতার মালিক।

একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। মনে করুন, একজন অসহায় লোক পথে পথে ঘুরছিল। তার না ছিল খাওয়ার কিছু, না ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই। আপনার বড় মায়া হল। তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভাইয়ের মত যত্ন করলেন। তার থাকা ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু সে এত বড় দয়ার কথা ভুলে গেল। শুরু করে দিল অবাধ্যতা। সুযোগ পেলে চুরি করতেও ছাড়ে না। বলুন, আপনি কত দিন তা বরদাশত করবেন? একদিন না একদিন বের করে দেবেনই। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ মালিককে দেখুন। দিনরাত তার নাফরমানী করছে, কিন্তু নি'আমত কেড়ে নিচ্ছেন না। এই উদাহরণ যোগে আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজি ও নিজ পাপরাশি চিন্তা করলে অন্তরে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, চল্লিশ দিনের চিল্লা (নিভৃত সাধনা) কর এবং চিন্তা কর যেন প্রকৃত অনুগ্রহকর্তা এত কিছু দান করেছেন সত্যিকারের মহব্বতের উপযুক্ত কি তিনিই নন ? এরূপ চিন্তা ও অনুধ্যানের ফলে অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে। অন্তরে আল্লাহপ্রেম সৃষ্টি হয়ে গেলে মাখলূকের দিক থেকে দৃষ্টিও সরে যাবে। অর্থাৎ তখন আর মানুষের জন্য কাজ করা হবে না, বরং যা কিছু করবে খালেকের জন্যই করবে। মাখলূকের সাথে সম্পর্ক ও লেনদেন তখনও থাকবে, কিন্তু তা থাকবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এরা আমার মালিকের সৃষ্টি, মালিকের পক্ষ হতে আমার উপর এদের কিছু হক ধার্য করা হয়েছে। আমি সেই হক আদায় করছি। তখন সে মাখলূকের কাছে প্রশংসার আশাবাদী থাকবে না।

সারকথা সম্মানস্পৃহা ও প্রদর্শনেচ্ছা (রিয়া) প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা'আলার মহিমাজ্ঞান ও মহব্বতের ঘাটতি থেকে। মহব্বত বৃদ্ধির পন্থা হল প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নি'আমতরাজিকে স্মরণ করা। কোনও কোনও চোখ কেবল এ কারণেই অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে যে, তারা কেবল বালা-মসিবতকেই দেখে। আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। আমরা চিন্তা করি না যে, সর্বদা নি'আমতের পাল্লাই ভারী থাকে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুণতে চাইলে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ বড় অবিচারক, অকৃতজ্ঞ।'[১৬৭]

---

১৬৭. ইবরাহীম : ৩৪

এ আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা যেন সর্বক্ষণ নি'আমতরাজি স্মরণ রাখি। তা স্মরণ রাখলে দুঃখ-কষ্ট আপনিই লাঘব হয়ে যায়।

বুযুর্গানে দীনের দৃষ্টিকোণ

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসায়ন সাহেব (রহঃ) নামে আমার মহান পিতা (রহঃ)-এর একজন উসতাদ ছিলেন। সাধারণ্যে তিনি মিয়া সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আব্বাজী (রহঃ) তাকে দেখতে যান। তিনি বলেন, সালাম দিয়ে আরয করলাম, কেমন আছেন ? তখন তার প্রচন্ড জ্বর। বললেন, আল হামদুলিল্লাহ, আমার চোখ, কান, নাক, পেট ইত্যাদিতে কোন কষ্ট নেই। কি কি রোগ ছিল না এক-এক করে সব উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, কেবল জ্বর আছে। ইনশাআল্লাহ তাও ভালো হয়ে যাবে। এভাবে অসুস্থাবস্থায়ও দৃষ্টি কেবল নি'আমতরাজিরই দিকে।

দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা নি'আমতই বেশি

আব্বাজী (রহঃ) একদিন বসে বসে কথা বলছিলেন। মাঝখানে কথা উঠল যে, শিশুদের যখন দাঁত গজায় তখন নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। ঘরের এক মহিলাও সেখানে ছিল। সে বলে উঠল, দাঁত এক আজব জিনিস। আসতেও কষ্ট দেয়, যেতেও কষ্ট দেয়। তখন তাঁর দাঁত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। পড়বে পড়বে অবস্থা। আব্বাজী বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দী। দাঁতের ব্যাপারে তোমার কেবল এ দু'টো কথাই মনে আছে। নিজের পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবনে এই দাঁত দিয়ে মনে-মনে, বরং টনে টনে খাবার চিবিয়েছ। কত রকম খাদ্য চিবিয়ে পেটের ভেতর চালান করেছ। সেকথা মনে রাখনি। এটা কি আশ্চর্য নয় ?

এভাবে আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টি থাকে নি'আমতের দিকে আর আমাদের দৃষ্টি দুঃখ-কষ্টের দিকে। অথচ বাস্তব কথা হল, এ জগতে সর্বাপেক্ষা দুঃখীজনও হিসাব করলে দেখবে কষ্ট অপেক্ষা আরামের তালিকাই লম্বা। দুঃখের তুলনায় সুখের পাল্লাই ভারী।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজির দিকে দৃষ্টি দাও এবং সেই সংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দু'আও পড়তে থাক। মুনাজাতে মাকবুলেও সে দু'আটি আছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِيْ تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ

'হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই সেইসব নি'আমতের কারণে যা দ্বারা আমি তোমার নাফরমানীর কাজে শক্তি অর্জন করেছি ।

পূর্ণ দু'আটি নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيْهِ ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِيْ ثُمَّ لَمْ أُوْفِ لَكَ بِهٖ ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى مَعَاصِيْكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِيْ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ ، اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِيْ فَاِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِيْ فَاِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ.[১৬৮]

এ দু'আটি আরবীতে মনে না থাকলে সমস্যা নেই । অর্থ বলাও যথেষ্ট । এ আলোচনা শুনেই যেন আমরা ক্ষান্ত না হয়ে যাই । যখন সম্ভব আমল করার চেষ্টা করতে হবে । রোজ একটা সময় নির্দিষ্ট করে ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নি'আমতরাজি স্মরণ করা চাই । তাতে অন্তরে আল্লাহ প্রেম সৃষ্টি হবে । সেই সংগে আত্মিক রোগ ও রিপুসমূহ থেকেও মুক্তিলাভ হবে । এটাও রোগ নিরাময়ের এক কার্যকর চিকিৎসা । এছাড়াও চিকিৎসার বিভিন্ন উপায় আছে। তবে মৌলিক ব্যবস্থা এটাই । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দিন । আমীন ।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ২য় খণ্ড, ১২১-১৪০ পৃষ্ঠা

---

১৬৮. কানযুল-উম্মাল, হাদীছ নং ৫১২৬ ; ২খ, ৮০৮ পৃ, ; বায়হাকী, শু'আবুল-ঈমান, ১৫খ, ২০৪ পৃ, হাদীছ নং ৬৯০৮

অহংকার ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ!

কিবর ও তাকাব্বুর (অহংকার) বহু রোগের মূল। এর থেকে অনেকগুলো আত্মিক রোগ জন্ম নেয়। এ কারণেই তাকাব্বুরকে উম্মুল-আমরায বা সর্বরোগের মূল বলা হয়। সৃষ্টিজগতে সর্বপ্রথম যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তা এই তাকাব্বুরই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইবলীসকে আদেশ করেছিলেন, 'আদমকে সিজদা কর' সে সিজদা করতে অস্বীকার করল। যুক্তি দাঁড় করালো যে,

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾

'আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা।'[১৬৯]

মোক্ষম যুক্তি। তাকে যখন আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর আদমকে মাটি দ্বারা, তখন আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হবে কেন ? এভাবে সে নিজেকে বড় ও আদম (আঃ) কে ছোট মনে করল।

তা যুক্তি যত ধারালোই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিপরীতে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু সে হুকুম অপেক্ষা যুক্তিকেই বড় করে দেখল। ফলে অহংকারের শিকার হয়ে গেল। তো এই অহংকারই ছিল জগতের প্রথম পাপ। এই অহংকারজনিত পাপের দরুন ইবলীস চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়ে গেল।

অহংকার সর্বপাপের মূল

অহংকার থেকেই হাসাদের জন্ম নেয়। কেউ যখন নিজেকে বড় ভাবে আর এ অবস্থায় অন্য কাউকে তাকে ছাড়িয়ে যেতে দেখে, তখন ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। সে কেন তার উপরে চলে যাবে ? উপরে তো আমারই থাকার কথা।

---

১৬৯. আ'রাফ :১২

এই তাকাব্বুর থেকেই জন্ম নেয় বিদ্বেষ। অধিকাংশ ক্রোধ ও ক্ষোভেরও জন্ম তাকাব্বুর থেকে। অহংকারবশেই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। এমনিভাবে তাজাসসুস ও ছিদ্রান্বেষণেরও মূল ওই অহংকার। মোটকথা তাকাব্বুর ও অহংকার থেকে বহু রোগের উৎপত্তি হয়।

দৈহিক বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ থাকে। কেউ নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ, কেউ বক্ষ বিশেষজ্ঞ, কেউ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। অনুরূপ আত্মিক রোগেরও স্পেশালিষ্ট আছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) তাদের একজন। 'ইহ্য়াউল-উলূম'-গ্রন্থে তিনি বলেন, অহংকার সব রোগের মূল। একবার এ রোগ জন্ম নিলে তার থেকে অসংখ্য রোগের উৎপত্তি হয়। তাই এ রোগ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসা করানো উচিত। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফজল ও করমে আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন। যদি আমাদের মধ্যে এ রোগ থেকে থাকে তবে আশু আরোগ্য দান করুন। আমীন।

তাকাব্বুর কাকে বলে ?

তাকাব্বুর ও কিবর-এর অর্থ নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করা। একজনের বয়স ত্রিশ বছর, আরেকজনের বিশ। বলা বাহুল্য যার বয়স ত্রিশ বছর সে নিজেকে অপরজন অপেক্ষা বড়ই মনে করবে। এই বয়সে বড় মনে করাটা মূলত 'কিবর' নয়। এতে কোন দোষ নেই। দূষনীয় হল নিজেকে উত্তম মনে করা। আমি তার চে' ভালো, আমি উত্তম, সে অধম- এই বোধই হল কিবর।

অন্তরে বড়ত্ববোধ ও অহমিকা থাকলে নিজ আচার-আচরণ দ্বারা তার প্রকাশ হয়েই যায়। তার কথা, কাজ, ও চলাফেরা দ্বারা অহমিকা টপকাবে। তো কথা ও কাজে অহমিকা প্রকাশকে বলে তাকাব্বুর। এই হল কিবর ও তাকাব্বুর মধ্যে প্রভেদ। অন্তরে বড়ত্ববোধ লালন করাকে বলে কিবর আর অন্যের সামনে বড়াই করাকে বলে তাকাব্বুর। তাকাব্বুরের ভেতর অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করার বিষয়টাও থাকে। তো তাকাব্বুর হল কিবরের ফল। কিবর হল কারণ আর তাকাব্বুর তার কার্য। তাই তাকাব্বুর বিলোপের জন্য কিবরের নির্মূল জরুরি।

তাকাব্বুর একটি গুপ্ত ব্যাধি

অহংকার একটি গোপন রোগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ টের পায়না যে, তার মধ্যে এ রোগ আছে। যে রোগ ভেতরে- ভেতরে বাড়তে থাকে, অথচ সহজে ধরা যায় না, অন্য রোগ অপেক্ষা সেটাই বেশি বিপজ্জনক। আজকাল

বলা হয়ে থাকে সর্বাপেক্ষা জটিল রোগ হল ক্যান্সার। কেননা এটা একবার জন্ম নিলে ভেতরে ভেতরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে নিজেও টের পাওয়া যায় না, ডাক্তারও ধরতে পারে না। রোগ তো ধরা পড়ে যন্ত্রণাবোধ হলে। রোগী যখন কষ্ট পায় তখনই বুঝতে পারে ভেতরে রোগ আছে। রোগে যন্ত্রণাবোধ হওয়াটাও মূলত-আল্লাহ তা'আলার এক রহমত। কেননা যন্ত্রণা হল ভেতরে রোগ থাকার সিগন্যাল। এ সিগন্যাল পেলেই মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সুস্থ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ভেতরে রোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কষ্টবোধ না হয়, তবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় না এবং চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। ফলে ভেতরে-ভেতরে রোগ বাড়তেই থাকে। তা টের পাওয়া যায় এমন এক পর্যায়ে যখন আর তা নিরাময়যোগ্য থাকে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

কিবরের রোগটাও এরকমই। লোকে নিজেকে নিরহংকার ভাবে, অথচ বাস্তবে সে অহংকার রোগে আক্রান্ত। রোগ তার ভেতরে আছে, কিন্তু টের পায় না। আপনি কি কখনও কাউকে বলতে শুনেছেন যে, আমি অহংকার করছি বা আমি একজন অহংকারী। কেউ কখনও এটা স্বীকার করেনি।

পরিধানের কাপড় টাখনুর নিচে ঝোলানো

হাদীছ শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধানের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়বে, তার সেই অংশ জাহান্নামে যাবে।' হাদীছের অহংকার শব্দটির দিকে লক্ষ করে অনেকে বলে টাখনুর নিচে পোশাক পড়া নাজায়েয কেবল তখনই যখন তা অহংকারবশত করা হয়। কিন্তু কেউ যদি বিনা অহংকারে কেবল ফ্যাশন বা তার দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের কারণে টাখনুর নিচে কাপড় পড়ে তবে তা নাজায়েয হবে না। তাদের একথা সমাজে বেশ প্রচার পেয়ে গেছে। বহু লোকেই ব্যাপারটা এরকমই মনে করে। ইওরোপ-আমেরিকার সফরে দেখেছি সেখানকার মুসলিম সমাজে এ কথা প্রসিদ্ধ। যাকেই জিজ্ঞেস করা যায়, বলে আমি এ কাজ অহংকারের কারণে করছি না।

আমি তাদের বলি, আচ্ছা তোমরা আমাকে এমন একজন লোক দেখাও তো যে স্বীকার করে, আমি এটা অহংকারবশত করি? এমন একজনও পাবে না। কেননা তাকাব্বুর এমনই এক রোগ, রোগী নিজে তা সহজে টের পায় না। টের পেলে তো এ রোগ খতমই হয়ে যেত। তাকাব্বুর জন্মই নেয় ব্যক্তির অগোচরে। যার মধ্যে এটা থাকে সে টেরই পায় না তার মধ্যে এ

রোগ আছে। কাজেই আমি এ কাজ অহংকারবশে করছি না, তাই এ কাজ আমার জন্য জায়েয- এ জাতীয় কথা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে লুঙ্গি পরতেন

দুনিয়ায় কারও সম্পর্কেই তাকাব্বুর না থাকার গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। হাঁ, এক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তাই আছে, যার সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় তিনি অহংকার অহমিকা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। অথচ দেখুন নিশ্চিত নিরহংকার সেই সত্তা; কিন্তু লুংগি পরেছেন টাখনুর উপরে মধ্যনলা বরাবর। তিনি কখনও টাখনুর নিচে লুংগি ঝুলাতেন না। কেননা সেভাবে লুংগি পরা অহংকারপূর্ণ কাজ। তার বিপরীতে আমরা যারা অহংকারে আক্রান্ত বা যে কোনও মুহূর্তে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি আছে, তারা টাখনুর নিচে লুংগি পরি আর দাবি করি এটা অহংকারবশে করি না, এর চে' বড় শয়তানী ধোঁকা আর কী হতে পারে?

প্রকাশ্য বিনয়ে গুপ্ত অহংকার

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, অনেক সময় মানুষ এমন কাজও করে, যা আপাতদৃষ্টিতে বিনয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে নিপট অহংকার। যেমন আজকাল নিজেকে অধম, অকর্মন্য ও নাদান-মূর্খ বলার একটা রেওয়াজ পড়ে গেছে। বাহ্যদৃষ্টিতে এটা তাওয়াযূ' ও বিনয় বটে। মনে হয় এসব শব্দ দ্বারা সে বিনয়ই প্রকাশ করছে। অথচ বাস্তবিকপক্ষে তা অহংকার হতে পারে এবং অনেক সময় তা হয়েই থাকে। কেননা এ সব শব্দ ব্যবহারের পেছনে তার লক্ষ থাকে শ্রোতা যেন পাল্টা বলে দেয়, জনাব, কী বলছেন মূর্খ, আপনি অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি। এটা সত্য কিনা পরীক্ষা করেই দেখুন না। পরীক্ষা হতে পারে এভাবে- যে ব্যক্তি বলছে আমি একজন মূর্খ, অকর্মন্য, প্রত্যুত্তরে তাকে বলে দিন, ঠিকই বলেছেন আপনি মূর্খ ও অকর্মন্য বটে। দেখবেন তখন সে কি মূর্তি ধারন করে। এর দ্বারা বোঝা যায় সে তা খাঁটি মনে বলছিল না। প্রত্যুত্তরে যাতে প্রশংসা করা হয় এবং সম্মানজনক উপাধিতে তাকে ভূষিত করা হয়, সে লক্ষেণ তা বলছিল। কাজেই এটা তাওয়াযূ' নয় কিছুতেই, নিশ্চিত তাকাব্বুর।

বস্তুত তাকাব্বুর অতি সূক্ষ্ম জিনিস। ভেতরে তা থাকা সত্ত্বেও টের পাওয়া যায় না। তাই চিকিৎসকের দরকার হয়, যে লক্ষণ দেখে রোগ ধরে ফেলবে এবং উপযুক্ত দাওয়াই দেবে।

দেখতে অহংকার বাস্তবে অহংকার নয়

অনেক সময় কারও কোনও কাজকে দৃশ্যত অহংকার মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা অহংকার হয় না। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ

'আমি বনী আদমের সরদার; এটা কোন অহংকার নয়।'[১৭০]

এ কথা বলছেন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্য কেউ বললে এটা তার বড়াই করা হত, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্পর্কে যে দাবি করেছেন আমি মানব জাতির সরদার। এটা তার বড়াই নয় ; বরং কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায়ার্থেই তিনি একথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানিতে তাঁকে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করেছেন। কাজেই দৃশ্যত এটা বড়ত্ব প্রদর্শন হলেও বাস্তবত: তা নয় ; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার নি'আমতের স্বীকারোক্তি যে, এ নি'আমত তিনিই আমাকে দান করেছেন।

প্রশংসাবাক্যে হযরত যূন-নূন মিসরী (রহঃ)-এর খুশি হওয়া

হযরত যূন-নূন মিসরী (রহঃ) উচ্চস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সামনে এসে কেউ তাঁর প্রশংসা করলে খুশি হতেন। যদি বলত, আপনি চমৎকার ওয়াজ করেছেন, আপনি একথাটি বড় সুন্দর বলেছেন বা এ জাতীয় কোন প্রশংসাবাক্য, তবে মুখে হাসি ফুটে উঠত। দর্শকের মনে হত এ বুযুর্গ নিজের প্রশংসা শুনলে খুশি হন। কারও অন্তরে অহংকার থাকলে সে তো এটাই কামনা করবে যে, লোকে তাঁর প্রশংসা করুক। সামনাসামনি প্রশংসা করলে সে খুশি হবে।

হযরত যুন-নূন মিসরী (রহঃ) একজন স্বীকৃত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর তো সম্মুখ প্রশংসায় খুশি হওয়ার কথা নয় ; কিন্তু তিনি তা হতেন। এ কারণে কারও কারও খটকা লেগেছিল- ব্যাপার কি ? তিনি খুশি হন কেন ? একজনে

---

১৭০. মুসলিম,হাদীছ নং ৪২২৩ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩০৭৩ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪০৫৩ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৪২৯৮ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৪১৫

জিজ্ঞেসই করে বসল, হযরত ! আপনাকে দেখছি প্রশংসা করলে খুশি হন। কেউ আপনার কোনও কাজের প্রশংসা করলে আনন্দে হাসেন। এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাই আমি প্রশংসাকালে খুশি হই, কিন্তু ব্যাপার তোমারা যা মনে করছ তা নয়। আসলে আমি খুশি হই এই ভেবে যে, লোকে যে আমার প্রশংসা করছে, আমি তো তার উপযুক্ত নই, আমার নিজের তো কোন আমল নেই। যা-কিছু করা হচ্ছে তা আল্লাহ তা'আলার তাওফীকেই হচ্ছে। তিনি করাচ্ছেন বলেই কিছু কাজ করা হচ্ছে। কাজেই প্রশংসা যা করা হয়, তা মূলত আমার আল্লাহ তা'আলারই করা হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হচ্ছে দেখে আমি আনন্দবোধ করি। এই চিন্তা করে খুশি হই যে, আমার মালিক আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন বলে প্রশংসা করা হচ্ছে। দর্শক মনে করে তিনি নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হচ্ছেন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন শোকর গোযারীর উচ্চাসনে। বোঝা গেল বিষয়টা দু'রকমই হয়ে থাকে। কখনও ভেতরে অহংকার থাকে, কিন্তু ব্যক্তি নিজে তা বুঝতে পারে না। আবার কখনও দৃশ্যত মনে হয় অহংকার আছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা অহংকার নয়। সুতরাং আমার মধ্যে অহংকার নেই বললেই কাজ হবে না। কেননা আমি হয়ত মনে করছি অহংকার নেই, অথচ বাস্তবে আমি এ রোগের শিকার, যা আমি টের পাচ্ছি না।

অহংকারী লোকের দৃষ্টান্ত

আরবী সাহিত্যে অহংকারী ব্যক্তির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, যার মধ্যে অহংকার আছে সে ওই ব্যক্তির মত, যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। বলাবাহুল্য এ অবস্থায় তার কাছে নিচের লোকদের খুব ছোট মনে হবে। একইভাবে নিচে যারা আছে তাদের চোখেও সে খুব ছোট দৃষ্টিগোচর হবে। এখন দাঁড়াচ্ছে এই যে, তার দৃষ্টিতে নিচের লোকেরা ছোট্ট আর নিচের লোকদের কাছে সে ছোট। অহংকারীর ব্যাপারটাও এরকমই। সে নিজ ভাবনা অনুযায়ী খুব উঁচুতে আছে। তার ভেতরে যে অহংকার বাসা বেঁধে আছে সে খবর তো তার নেই। তাই সে নিজেকে বড় ও অন্যদেরকে ছোট মনে করে।

অন্যদিকে অন্যরা তো তার কথাবার্তা ও চালচলন দেখে বুঝতে পারে সে একজন অহংকারী। তাই তাদের দৃষ্টিতেও সে ছোট গন্য হয়। তারা মনে করে লোকটা একটা আহাম্মক, নিজেকে নিজে বড় মনে করে।

মোটকথা চিকিৎসকের কাছে না গেলে অহংকার রোগ ধরা পড়ে না। নিজে নিজে বোঝা যায় না যে, অহংকার আছে। তাই আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হওয়া উচিত নয়। এ কথা ভুল যে, আমি টাখনুর নিচে কাপড় অহংকার বশে পড়ছি না। কেননা আমি তো জানি না আমার মধ্যে অহংকার আছে কি না। টাখনুর নিচে কাপড় পড়ার একটা কারণ অহংকারও হয়ে থাকে। অসম্ভব নয় আমি হয়ত সে কারণে পরছি। আর এ কারণেই হাদীছে এভাবে পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছে। তাকাব্বুর সম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ)-এর কিছু বাণী আছে, এবার সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা পেশ করা যাচ্ছে।

অজ্ঞদের তুলনায় জ্ঞানীজনের নিজেকে উত্তম মনে করা

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, 'অধিকাংশ সময় মনে হয় আমি 'আলেম, অমুক জাহেল (মূর্খ)। আমি তার চে' উত্তম। এর এলাজ কী ? এ ব্যাপারটা সচারচরই ঘটে। আল্লাহ তা'আলা একজনকে ইলম দিয়েছেন, সে 'আলেম। আরেকজনকে দেননি। এ ক্ষেত্রে 'আলেমের মনে এ কথা এসেই যায় যে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ইলম শিখেছি। অমুক ব্যক্তি শেখেনি। আর অজ্ঞতার চেয়ে জ্ঞানবত্তা নিশ্চয়ই উত্তম। এভাবে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের একটা বোধ অন্তরে এসে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা অহংকার, না অহংকার নয় ? হযরত থানভী (রহঃ) উত্তরে বলেন,

নিজেকে বলবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কে শ্রেষ্ঠ তা কেবল তিনিই জানেন। এমনও তো হতে পারে, তার মনের অবস্থা খুব ভালো, অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার কাছে তুই অতি হীন ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তোকে বাহ্যিক দু'চার হরফের শিক্ষা দান করেছেন, সে কারণে নিজেকে বড় মনে করছিস। তিনি চাইলে এ জ্ঞান তো কেড়েও নিতে পারেন। তখন কি করবি ? এই ধ্যান বারবার করবে। সেই সংগে দু'আও করবে।[১৭১]

একটি প্রশ্ন

এস্থলে একটা বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। মানুষের পক্ষে বাস্তব কোনও বিষয়কে অস্বীকার সম্ভব নয়। এক ব্যক্তির কোনও এক বিষয়ে জ্ঞান-বিদ্যা আছে। অন্য একজনের তা নেই। যার তা আছে সে কিভাবে বলবে আমি জানি না। আর না জানা অপেক্ষা জানা ভালো এতেও কোন সন্দেহ নেই।

---

১৭১. আনফাসে 'ঈসা ; ১৫৪

কুরআন মাজীদে ইরশাদ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, উভয়ে কি সমান ?'[১৭২]

অর্থাৎ অজ্ঞদের তুলনায় জ্ঞানীগণ উত্তম। কাজেই যার জ্ঞান আছে, সে তার এ গুণের কথা কিভাবে অস্বীকার করবে ?

এমনিভাবে এক ব্যক্তি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ ও শক্তিশালী, সেই তুলনায় আরেকজন বেশ দুর্বল। এ ক্ষেত্রে এটাই তো স্বভাবিক যে, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি অন্যজনের তুলনায় নিজেকে বেশি সুস্থ ও শক্তিশালী মনে করবে। এর বিপরীত চিন্তা করা তো সম্ভব নয়।

কিংবা মনে করুন এক ব্যক্তির অনেক টাকা-পয়সা। সেই তুলনায় আরেকজন অনেক গরীব। এক্ষেত্রে ধনী লোকটি তো এটাই চিন্তা করে যে, তার তুলনায় আমি ধনী। তার টাকা নেই, আমার আছে।

অনুরূপ এক ব্যক্তি বড় অফিসার, উচ্চপদে চাকরি করে। অন্য একজন তার চাপরাশি বা শ্রমিক। এক্ষেত্রে পদস্থ ব্যক্তি নিজেকে চাপরাশির উপরেই ভাববে। তা না ভাবাটা তো অবাস্তব। যদি বলে সে উপরে, অমি নিচে তবে মিথ্যা বলা হবে। আবার উপরের বক্তব্যমতে বাস্তব বলাটা হবে অহংকার। শক্তিশালী যদি বলে আমার শক্তি বেশি আর ওই ব্যক্তির কম আর তা যদি হয় অহংকার, তবে এর বিপরীত বলাটাও তো মিথ্যাচার। আলেম ব্যক্তি যদি বলে আমি আলেম নই, মূর্খ ; সেটা কি মিথ্যা নয়? দেখা যাচ্ছে সত্য বললে হয় অহংকার, আর বিপরীত বললে হয় মিথ্যা। পরিষ্কার উভয়সংকট। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কি ? কিভাবে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান হবে, যাতে অহংকারও না হয় আবার মিথ্যা থেকেও বাঁচা যায় ?

প্রশ্নের উত্তর

হযরত থানভী (রহঃ) আরেক জায়গায় এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছেন, যা স্মরণ রাখার মত এবং তা দ্বারা এ প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা অহংকার নয়, উত্তম মনে করাই অহংকার'।

---

১৭২. যুমার : ৯

পূর্ণাঙ্গ মনে করার অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমত অন্যের তুলনায় নিজের মধ্যে বেশি থাকার ধারণা। যেমন মনে করা, দৃশ্যত অমুকের ভেতর ইলম কম, সেই তুলনায় আমার বেশি আছে, তার স্বাস্থ ভালো নয়, আমার স্বাস্থ ভালো, আল-হামদুলিল্লাহ আমার টাকা-পয়সা বেশি আছে, অমুকের সেই তুলনায় কম, তার বাড়িটি ছোট, সেই তুলনায় আমার বাড়ি বড়, তার ছেলে মেয়ে কম, তার চে, আমার বেশি ইত্যাদি। এরূপ বলাতে কোনও দোষ নেই। এটা অহংকার নয়। অহংকার হচ্ছে নিজেকে উত্তম ও অন্যকে অধম মনে করা। উত্তম-অধমের মাপকাঠি তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এটা কার মধ্যে বেশি, কার মধ্যে কম, তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। এই অজ্ঞতার ধ্যানই অহংকারের চিকিৎসা। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি উত্তম, না সে তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন, হতে পারে সে-ই উত্তম-এরকম চিন্তা করলে অহংকার লোপ পাবে।

নি'আমতের জন্য শুকর আদায় কর্তব্য

উপরে যে বলা হল, অন্যের তুলনায় নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা অহংকার নয়। অর্থাৎ অমুকের চেয়ে আমার 'ইলম বেশি আছে, বা আমার স্বাস্থ্য ভালো কিংবা আমার বয়স বেশি ইত্যাদির অনুভব তাকাব্বুর নয়। তবে এর জন্যও শর্ত হল যেই নি'আমত নিজের মধ্যে বেশি আছে বলে মনে হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলার শুকর আদায় করতে হবে। চিন্তা করবে এই বেশিটা আমার বাহুবলে অর্জিত নয়, কেবলই আল্লাহ তা'আলার দান। আল্লাহর দান চিন্তা করলে পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ভাবনা অহংকার জন্মানোর কারণ হবে না।

উত্তম মনে করা একটি ভিত্তিহীন ধারণা

নিজেকে উত্তম ভাবা যায় কিসের ভিত্তিতে ? কার পরিণাম কী দাঁড়ায় তা কে জানে ? কে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত, কে নৈকট্যপ্রাপ্ত নয় তা কেবল তিনিই জানেন। সেখানে ইলমের বড়াই কোনও কাজে আসবে না এবং অর্থ-সম্পদের জাঁক দিয়েও কিছু হবে না। ইলমের অধিকারী হলেই যে সে উত্তম হয়ে যাবে এর কোনও গ্যারান্টি নেই। হাদীছ শরীফে তো একথাও আছে যে, জাহান্নামকে সর্বপ্রথম যা দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে, তা হবে একজন 'আলেম। কাজেই আমি একজন 'আলেম, লোকে আমাকে আল্লামা বলে, আমার হাতে চুমো খায়, তাই আমি উত্তম-এটা সম্পূর্ণ অলীক ধারণা। স্বাস্থ্য, সম্পদ বা ইলম, যাই হোক না কেন এসবের কোনও ভরসা নেই। হিসাব-নিকাশের

ব্যাপারটা যখন সামনে এসে যাবে তখন কত বড়-বড় আল্লামা, মহাজ্ঞানী-মহাপন্ডিত আটকা পড়ে যাবে তার কোন ঠিকানা নেই। কাজেই এসব জিনিস কোন মাপকাঠি নয়। এর ভিত্তিতে নিজেকে উত্তম মনে করারও কোনও সুযোগ নেই।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাকে বলেছিল, তুমি তো আমার কুকুরটার চেয়েও নিকৃষ্ট। জবাবে বুযুর্গ বলেছিলেন, দেখ ভাই, এখন নিশ্চিত করে বলতে পারব না আমি কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট কি না। যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজিরা হবে, তখন যদি হিসাব-নিকাশে উতরে যেতে পারি, তবে কসম করেই বলব আমি কুকুর অপেক্ষা উত্তম। পক্ষান্তরে সেখানে যদি আটকে যাই এবং আমি জাহান্নামের উপযুক্ত সাব্যস্ত হই তবে তোমার কথাই ঠিক- আমি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা কুকুরকে তো কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তাকে আখিরাতে শাস্তিও ভোগ করতে হবে না। একেই বলে সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা ।

শ্রেষ্টত্বের ভাবনা অন্তর থেকে মুছে ফেলুন

সত্যিকারের আল্লাহওয়ালা যারা, তাদের দৃষ্টি থাকে নিজের প্রকৃত অবস্থার দিকে। লোকে তাদের গালি দেয়, কিন্তু ভাবে আমি আসলে কী ? নিজ কমতি ও নিজ ক্রুটি-বিচ্যুতির দিকে নজর থাকার কারণে অন্যের গালমন্দ তাদের প্রভাবিত করতে পারে না। বস্তুত তা প্রভাবিত করে কেবল তখনই, যখন নিজ কমতির দিকে নজর থাকে না। ফলে নিজেকে কেউকেটা ভাবা হয়। মনে করা হয় আমি অনেক উপরের মানুষ। এই সব ভাবনা অন্তর থেকে দূর করে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠত্বের বোধ মুছে ফেলতে হবে।

নিজেকে লক্ষ্য করে বলুন, তোর তো জানা নেই কে আল্লাহর কাছে ভালো, কে মন্দ। তুই যাকে মন্দ জ্ঞান করছিস হতে পারে তার অন্তর্জগত শুভ্র-সমুজ্জ্বল, যে কারণে সে আল্লাহর প্রিয় আর সে দরবারে তুই অতি হীন ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা দু-চারটা হরফের বাহ্যজ্ঞান তোকে দিয়েছেন বলে তোর এত জাঁক। তিনি চাইলে তো এ সব কেড়েও নিতে পারেন। তখন তোর দশা হবে কি ? কাজেই কিসের ভিত্তিতে তুই বড়াই করছিস ? তুই কি মায়ের পেট থেকেই ইলম ও জ্ঞান নিয়ে এসেছিস ? এটা তো এক মহান সত্তারই দান। যিনি দান করেছেন চাইলে তিনি নিয়েও যেতে পারেন।

তা হে মন ! তুই কি অর্থ সম্পদের বড়াই করছিস ? এই টাকা তুই কোথায় পেলি ? মায়ের পেট থেকে নিয়ে এসেছিস, না কোন মহান দাতা এসব তোকে দান করেছেন ? নিশ্চিয়ই তাঁর দানেই তুই ধনী। এ ধন তো তিনি কেড়েও নিতে পারেন।

না কি সুস্বাস্থ্যের কারণে এত দেমাক। তা কত বড়-বড় পালোয়ান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে এক সময় তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি কেড়ে নিয়েছেন আর তখন তারা বেলুনের মত চুপসে গেছে। তোরও তো যে কোনও সময় সেই দশা হতে পারে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমাদের এক প্রিয়জন ছিল, বছর দু'য়েক আগে তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। সারা দেওবন্দে প্রসিদ্ধ ছিল, ঘুষি মেরে বরফের চাঁই ভেঙে ফেলতে পারে। এমনই ছিল তার গায়ের জোর। জীবনে কখনও ছুরি দিয়ে তরমুজ কাটেননি। ঘুষি মেরেই ভেঙে ফেলতেন। সেই সংগে তিনি অনেক বড় 'আবেদ-যাহেদও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি লাহোর অবস্থান করেছেন। চার-পাঁচ বছর আগে তাঁর সাথে মুলাকাত করতে যখন লাহোর যাই, দেখি খানা খাওয়ার জন্য মুখে হাত নেবেন সেই শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। অন্য কেউ তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে তিনি কেঁদে দিলেন। বললেন, এই হল সেই 'হামেদ' যে কিনা ঘুষি মেরে বরফের চাঁই ভেঙে ফেলত। আর এখন কি না সে নিজ হাতে খাবারও খেতে পারছে না।

কিসের ভিত্তিতে এই দেমাগ ?

তা ভাই ! অহংকার-অহমিকা দেখাচ্ছ কিসের ভিত্তিতে ? এই ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের কারণে ? না ক্ষনিকের টাকা-পয়সার কারণে ? নাকি এক ফোঁটা বিদ্যা-বুদ্ধির কারণে ? এর কোনটি তোমার কাছে চিরদিন থাকবে ? এসব আল্লাহ্ তা'আলারই তো দান। তিনি যখন ইচ্ছা কেড়েও নিতে পারেন। দু'চার হরফের যে বিদ্যা লাভ হয়েছে। আজ যদি তিনি তা ফেরত নিয়ে নেন তখন তুমি কি করতে পারবে ? এই চিন্তা মাথায় রাখ। বার বার চিন্তা কর। যখনই অন্তরে বড়ত্বভাব জাগবে, সংগে-সংগে চিন্তা করবে, এক মহাদাতা এ নি'আমত আমাকে দিয়েছেন। এ দান তাঁরই করুণা। আমার কোনও যোগ্যতা বলে পাইনি এবং এটা আমার অধিকারও নয়। আমার মত কত লোক আছে, যারা পথে পথে ঘুরছে। তাদের চেয়ে আমার তো এমন কোন

বিশেষত্ব নেই যদ্দরুন এ নি'আমত আমাকেই পেতে হত। কাজেই এ প্রাপ্তি তাঁর করুণা ছাড়া কিছু নয়। তিনি যেমন করুণা করে দিয়েছেন, তেমনি আবার নিয়েও যেতে পারেন। কাজেই এর ভিত্তিতে অন্যের সামনে গর্ব করার ও বড়ত্ব জাহির করার কোন অবকাশ আমার নেই। বরং আমার কর্তব্য শোকর আদায় করা যে, হে আল্লাহ নিজ দয়ায় আপনি এ সম্পদ আমাকে দিয়েছেন। আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না। এতে আমার কোন অধিকার ছিল না এবং এটা অর্জনের কোন ক্ষমতাও আমার ছিল না। কেবল আপনার দয়া ও মেহেরবানিতেই এটা আমি পেয়েছি। এজন্য আপনার অশেষ শোকর হে দয়াময়। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

শোকর বহু রোগের ওষুধ

আমাদের হযরত ডাক্তার 'আরেফী (রহঃ) বলতেন, শুকরও একটি মূল্যবান সম্পদ। এটা বহু রোগের দাওয়াই। যে ব্যক্তি শোকর আদায় করবে সে কখনও অহমিকার শিকার হবে না ইনশাআল্লাহ। কেননা শোকর বলাই হয় এই বোধকে যে, যে সব নি'আমত আমার অর্জিত হয়েছে, তার উপযুক্ত আমি ছিলাম না, আল্লাহ তা'আলাই নিজ অনুগ্রহে আমাকে দান করেছেন। তাঁর হাজার শোকর।

শোকর আদায় করা হয় কখন ? যখন দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করা হয় বা প্রাপ্যের বেশি লাভ হয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি কেবল দায়িত্বটুকুই আদায় করে বা ঋণ পরিশোধ করে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার কোনও ব্যাপার নেই। উদাহরণত এক ব্যক্তি আপনার নিকট থেকে এক হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। কথা দিয়েছে দু'মাস পর আদায় করবে। আপনি দু'মাসের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন। তার কর্তব্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানো। সে যদি দু'মাস পর ঋণ পরিশোধ করে, তবুও আপনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো জরুরী নয়, কেননা তখনও অনুগ্রহকারী আপনিই, যেহেতু দু'মাসের জন্য এক হাজার টাকা ঋণ দিয়ে আপনি তার উপকার করেছেন। টাকাগুলো আপনি নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। ধার দিয়ে আপনি সেই উপকার লাভ থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। সর্বাবস্থায় উপকারকারী আপনিই। কাজেই দু'মাস পর ঋণ পরিশোধ করে সে আপনার কোন উপকার করছে না। ফলে সে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তিরও হকদার হবে না।

কৃতজ্ঞতার অধিকার জন্মায়, তখনই, যখন দায়িত্ব অপেক্ষাও বেশি কিছু করা হয়। যেমন ওই ঋণগ্রহীতার কথাই ধরা যাক। তার দায়িত্ব ছিল ঋণের

এক হাজার টাকা পরিশোধ করা। কিন্তু সে যদি পূর্বশর্ত ছাড়া স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরও দু'শ টাকা বেশি দেয় এবং সর্বমোট বারশ টাকা আপনাকে প্রদান করে, তবে অতিরিক্ত দুশ' টাকা দিয়ে সে আপনার প্রতি অনুগ্রহ করল। এবার সে কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার। আপনার কর্তব্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো।

এবার আসুন আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জানানোর বিষয়ে। মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তখন বোঝানো হয়, বান্দাকে তিনি যে নি'আমত দিয়েছেন, তা দেওয়া তাঁর দায়িত্ব ছিল না। আমি তা পাওয়ার হকদার ছিলাম না এবং তাতে আমার কোন অধিকার ছিল না। আল্লাহ জাল্লাশানুহু কেবল নিজ অনুগ্রহে আমাকে তা দিয়েছেন। এভাবে কৃতজ্ঞতার ভেতর এই স্বীকারোক্তি নিহিত থাকে যে, আমি নি'আমতের হকদার ও উপযুক্ত ছিলাম না। যে ব্যক্তি নিজেকে অনুপযুক্ত ভাবে সে কি কখনও অহংকার করতে পারে ? তা কখনই পারে না। সুতরাং যখনই আল্লাহ তা'আলার কোনও নি'আমত লাভ হয়, শোকর আদায় করুন, ইনশাআল্লাহ তাকাব্বুর ও অহংকার নির্মূল হয়ে যাবে।

শয়তানের কৌশল থেকে বাচাঁর উপায়

আমাদের হযরত 'আরেফী (রহঃ) বলতেন, শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়ে গেল এবং আল্লাহ তা'আলাকে বলল-

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ۝

'অতঃপর আমি তাদের কাছে আসব তাদের সম্মুখ দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে (আর এভাবে আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব)। অবশেষে আপনি তাদের অধিকাংশকেই শোকরগোযার পাবেন না।'[১৭৩]

এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য বনী আদমের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া, যেহেতু তাদের সাথে বড়াই করার পরিণামেই তাকে বিতাড়িত হতে হয়েছে।

হযরত (রহঃ) বলতেন, শয়তান যেহেতু মারাত্মক দুরন্ধর,তাই তার জানা আছে, যে ব্যক্তি শোকরগোযার হবে, তার সাথে তার কোন চাতুর্য চলবে না।

১৭৩. আ'রাফ : ১৭

তাকে সে নিজ ফাঁদে ফেলতে পারবে না। বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহর শোকর আদায় করবে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

বিপদকালেও নি'আমতের কথা স্মরণ

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যে সব নি'আমত আমরা ভোগ করছি তার জন্য সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞচিত্ত থাকা উচিত। এক মুহূর্তে আমরা কি একটি মাত্র নি'আমতই পাচ্ছি ? আদৌ তা নয় ; বরং প্রতি পলে আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে অগণ্য নি'আমত। ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنۡ تَعُدُّوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ لَا تُحۡصُوۡہَا ؕ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَظَلُوۡمٌ کَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ গুণতে চাও, তা গুণে শেষ করতে পারবে না।'[১৭৪]

মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। সামান্য একটু কষ্ট- ক্লেশে পড়লেই সর্বক্ষণ সেই গীতই গাইতে থাকে, অথচ সেই কষ্ট-ক্লেশের সময়ও যে আল্লাহর অগণ্য নি'আমত সে ভোগ করে যায় তার নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। সে দিকে একটু ভ্রূক্ষেপও করে না।

আমাদের শায়খ হযরত 'আরেফী (রহঃ)-এর এক নানা ছিলেন, যার তালিম-তারবিয়াতও হযরতের গড়ে ওঠার পেছনে অনেক ভূমিকা রেখেছে। অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। বুযুর্গানে দীনের সাহচর্যপ্রাপ্তও ছিলেন। হযরত (রহঃ) বলেন, শৈশবে রাতের বেলা যখন ঘুমাতে যেতাম তখন এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ত। দেখতাম নানাজান বিছানায় বসে বসে অত্যন্ত ভক্তি-মহব্বতের সাথে পড়ে যাচ্ছেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা তোমারই শোকর ; হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা তোমারই শোকর ; হে আল্লাহ তোমারই প্রশংসা তোমারই শোকর।

এভাবে দীর্ঘক্ষণ দুলছেন আর পড়ে যাচ্ছেন। একটু বুঝ-সমঝ হয়ে উঠলে একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাতে ঘুমানোর আগে আপনি বসে বসে কী করেন ? তিনি বললেন, ভাই সারা দিন তো গাফলতির মধ্যে কাটে,

---

১৭৪. ইবরাহীম : ৩৪

আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা হয় না। তাই রাতে শোওয়ার আগে বিছানায় বসে-বসে আল্লাহ তা'আলার এক-একটি নি'আমত কল্পনা করি এবং সেজন্য তাঁর শোকর আদায় করি, যেমন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

হে আল্লাহ! আপনি এই বাড়ি দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। হে আল্লাহ! আপনি রিযক দিয়েছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। হে আল্লাহ! আপনি আরামদায়ক বিছানা দিয়েছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। হে আল্লাহ! আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। হে আল্লাহ! আপনি স্ত্রী দান করেছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। হে আল্লাহ! আপনি সন্তান দিয়েছেন- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর।

এভাবে একেকটি নি'আমতের কথা স্মরণ করে শুকর আদায় করি, যাতে নি'আমতসমূহের জন্য যে শুকর আদায় করা দরকার, তার হাজার ভাগের এক ভাগ বা লক্ষ ভাগের এক ভাগ মুখে আদায় হয়ে যায়।

ঘুমানোর আগে শোকর আদায়

হযরত (রহঃ) বলতেন, তোমরাও এরূপ কর। রাতে ঘুমানোর আগে সমস্ত নি'আমতের শোকর আদায় করে নাও। সামান্য একটু ধ্যান করলেই অসংখ্য নি'আমত স্মরণ হয়ে যাবে। কেবল একটা নি'আমত নিয়েও যদি চিন্তা করা হয়, তবে তারও পরিমাণ এত বেশি দেখতে পাবে যে, সারা জীবনও সিজদায় পড়ে থাকলে তার যথার্থ শোকর আদায় হবে না। এই চোখ দু'টি আল্লাহর কত বড় নি'আমত। একটি চোখ সামনে রাখ আর ভাব এটা কেমন নি'আমত। একটা ক্ষুদ্র চুলও যদি তাতে পড়ে যায়, তখনই টের পাওয়া যায় এটা কেমন নি'আমত। কাজেই একটা চোখের যদি শোকর আদায় করতে চাও, তা করে শেষ করতে পারবে না।

অহংকার থেকে বাঁচার দাওয়াই

আমাদের হযরত (রহঃ) বলতেন, ভাই, তাকাব্বুর বড় খারাপ জিনিস। বড়-বড় চিকিৎসকও হয়রান হয়ে যায়। এর চিকিৎসা করা খুব সহজ নয়। তবে আমি তোমাদেরকে একটা টোটকা বাতলে দিচ্ছি। এটা প্রয়োগ করলে ইনশাআল্লাহ এ রোগে আর আক্রান্ত হবে না। আর কখনও হলেও

ইনশাআল্লাহ আশু আরোগ্য লাভ হবে। টোটকাটি এই যে, আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহের জন্য শোকর আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোল। সর্বক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তে, চলাফেরা উঠাবসা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার শোকর জপতে থাক।

মওসুম ভালো হলে বল- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। বাতাস চলছে তো বল-আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর। এভাবে ভালো যা কিছু সামনে এসে যায় তার জন্য শোকর আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যাও। যত বেশি শোকর আদয় করবে- ইনশাআল্লাহ তাকাব্বুর থেকে ততই নিরাপদ থাকবে। কথাটি বলতে ছোট, কিন্তু এর কার্যকারিতা অমোঘ। আমল করাও কিছু কঠিন নয়। কেবল একটু ধ্যান ও চর্চার প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

তাকাব্বুরের প্রকারভেদ

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, তাকাব্বুর বহু ভাগে বিভক্ত। এটা যে কত প্রকার তা গুণে শেষ করা যাবে না। তার অধিকাংশই এত সূক্ষ্ম যে, মুহাক্কিক ও বিশেষজ্ঞ শায়খ ছাড়া অন্য কারও দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছায় না। শরী'আতের আলেমগণকেও এ ব্যাপারে চুল- চেরা বিশ্লেষণের পেছনে না পড়ে সেই মুহাক্কিকের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে হয়।[১৭৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, অহংকার এমন এক সূক্ষ্ম রোগ, রোগী নিজে যে সম্পর্কে অনুভব করতে পারে না যে, সে তাতে আক্রান্ত কি না। এর কোনও কোনও প্রকার এত বেশি সূক্ষ্ম যা মুহাক্কিক শায়খ ছাড়া কেউ ধরতে পারে না। কেবল তার পক্ষে তা নির্ণয় করা ও ওষুধ নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

অহংকারের বিভিন্ন চিকিৎসা

একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝুন। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ)-এর নিয়ম ছিল, কেউ তার কাছে ইসলাহের জন্য আসলে সর্বপ্রথম অহংকারের চিকিৎসা দেওয়া হত, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা দান করেন। কাউকে বলতেন, তুমি প্রতি নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলবে, ভাইয়েরা ! আমার মধ্যে অহংকার আছে। আপনারা দু'আ করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। বলার

১৭৫. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৪ পৃ,

দরকার পড়ে না যে, একজন অহংকারী ব্যক্তির পক্ষে এটা কত কঠিন কাজ হবে। ভরা মজলিসে ঘোষণা করে দেওয়া যে, আমার মধ্যে অহংকার আছে, চারটিখানি কথা নয়। এটা বলার সময় মনের উপর পাহাড় ভেংগে পড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শায়খের নির্দেশে কেউ যখন এটা করবে তখন সে মুগুরের বাড়িতে অহংকার লেজ গুটিয়ে পালাবে।

কাউকে বলতেন, তুমি নামাযীদের জুতা সোজা করে রাখবে। এভাবে একেজনকে একেক রকম ব্যবস্থা দিতেন। জানা কথা সব রোগীর একই ওষুধ হয় না। রোগ বিভিন্ন হওয়ায় ওষুধও বিভিন্নই হয়ে থাকে। রোগের কারণ হয় বিচিত্র এবং অবস্থাও হয় বিভিন্ন। তাই এক ওষুধ সবার মধ্যে কাজ করে না। কেউ যদি চিন্তা করে হযরত (রহঃ) অমুক রোগের জন্য অমুককে এই-এই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, আমিও সেই মত কাজ শুরু করে দেই, তবে সে মারাত্মক ভুল করবে। কার জন্য কোন ওষুধ সংগত তা শায়খের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব।

নিজের চিকিৎসা নিজে করা

এক ব্যক্তি দেখল হযরত থানভী (রহঃ) অমুককে অহংকারের চিকিৎসা হিসেবে নামাযীদের জুতা সোজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে মনে করল আমিও এটা করি না কেন। উচিত তো ছিল কোনও শায়খের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি যে ব্যবস্থা দেন তা অনুসরণ করা। কিন্তু তা না করে নিজেই নিজের চিকিৎসা শুরু করে দিল। সেমতে নামাযীদের জুতা সোজা করতে লেগে গেল। হযরত থানভী (রহঃ) তার এ কান্ডের কথা জানতে পারলেন। তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, এভাবে চিকিৎসা হয় না। আমার তো মনে হচ্ছে এরূপ করার দ্বারা তোমার অহংকার কমবে না ; বরং আরও বাড়বে, কেননা এর ফলে শয়তান তোমার মাথায় এই ধারণা বসিয়ে দেবে যে, দেখ তুমি কত বিনয়ী, কাজেই নিজের চিকিৎসা নিজের দ্বারা হয় না। কেউ যদি অহংকার নিরাময়ের জন্য নিজেই কোন ওষুধ নির্বাচন করে তাতে উল্টো ফলও ফলতে পারে। বরং এ কাজ তাকে দিয়েই করানো উচিত, যাকে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বানিয়েছেন।

কোন শায়খের তারবিয়াত গ্রহণ কর

এই জ্ঞান এমনিতেই হাসিল হয়ে যায় না। এর জন্য নিজেকে শায়খ সমীপে পদদলিত করতে হয়। শায়খের হাতে দলাই-মাড়াই খেলেই ভেতর

থেকে অহংকার নিষ্ক্রান্ত হয়। আর তখনই বোঝা যায় কোন অহংকারের চিকিৎসা কিভাবে করতে হয়। আমরা যে সকল বুযুর্গের নাম নিয়ে থাকি, যেমন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহঃ), হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহঃ) প্রমুখ, এরা সকলে ঘষা-মাজা খেয়েই আপন-আপন মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। তাদের এমন একজনও নেই, যিনি আপনা-আপনিই শায়খ বনে বসে গিয়েছিলেন। বরং ঘর্ষণ- পেষণের বদৌলতেই তারা যা বনার বনেছেন।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) আমাদের 'আকাবিরে দেওবন্দ' (দেওবন্দের মহামনীষীগণ)-এর এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপণেই তিনি অসাধারণ কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। আমাদের মত নয় যে, কাঁচা-পাকায় মিলিয়ে কোনও রকমে একখানি সনদ নিয়ে বের হয়ে পড়ি আর সকলে আলেম বলতে শুরু করে দেয়। তিনি সত্যিকার অর্থেই সুযোগ্য 'আলেমরূপে গড়ে ওঠেন। আমি পূর্বে এক জায়গায় আরয করেছিলাম যে, 'ইলমের মধ্যে এক রকম ঊর্ধ্বগামিতা থাকে। 'আলেম হওয়ার পর এই ভাব জন্ম নেয় যে, আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি, একটা কিছু হয়ে গেছি। তো সদ্য শিক্ষা সমাপণকারী হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর হাতে একখানি পুস্তিকা পড়ল। হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানভী (রহঃ)-এর লেখা। ইনি ছিলেন 'থানাভবন খানকাহ'-এর বিখ্যাত তিন মনীষীর একজন। বাকি দু'জন হলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) ও হযরত হাফেজ জামেন শহীদ (রহঃ)। এঁরা তিনজনেই উক্ত খানকায় অবস্থান করতেন।

মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানভী (রহঃ)-এর রচিত পুস্তিকাটিতে এমন একটি কথা চোখে পড়ল, যা হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) দৃষ্টিতে সঠিক মনে হচ্ছিল না। তিনি মনে করলেন এ সম্পর্কে লেখকের সাথে কথা বলা উচিত। তো যথারীতি বিতর্কের উদ্দেশ্যে তিনি থানাভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

থানাভবনে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর সাথে আগে থেকেই কিছুটা পরিচয় ছিল। কাজেই সাক্ষাত করার জন্য প্রথমেই তাঁর কক্ষে গেলেন। হাজী সাহেব (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় আসা হয়েছে ? বললেন, শায়খ মুহাম্মাদ থানভী (রহঃ)-এর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন কেন ? বললেন, বাহাস করতে হবে। একথা শুনে হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, তাওবা, তাওবা ! তিনি কত বড় আলেম, আর তুমি সদ্য পাস করা মওলভী। এমন একজন বড়

ব্যক্তির সাথে বাহাস করতে চাচ্ছ, যিনি আল্লাহওয়ালাও বটে ! গাংগূহী (রহঃ) বললেন, হযরত ! তিনি তার এক পুস্তিকায় এমন একটা কথা লিখেছেন, যা সঠিক নয়। হাজী সাহেব (রহঃ) তাঁকে শান্ত করলেন। আর সে তো কেবল শান্ত করা নয় ;বরং তা ছিল জীবনের কাঠামো বদলে দেওয়া। তাঁর প্রতি হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর এমন দৃষ্টি পড়ল, যদ্দরুন বাহাস করার উদ্দীপনা একদম খতম হয়ে গেল, সেখানেই তিনি তাঁর হাতে বায়আত হয়ে গেলেন।

তোমাকে সব কিছু দিয়ে দিলাম

টানা চল্লিশ দিন সেখানে থাকলেন। অথচ গাংগূহ থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন ক্ষণিকের জন্য। বাহাস করতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণই থাকবেন। তাই কাপড়- চোপড় কিছুই সংগে নিয়ে আসেননি। কেবল পরিধানের কাপড়ই নিয়েই বের হয়ে পড়েছিলেন। ব্যস থাকতে লাগলেন। ময়লা হয়ে গেলে ধুয়ে সেই কাপড়ই পরে নিতেন। এভাবে পূর্ণ চল্লিশ দিন- এক চিল্লা সেখানে কাটালেন। এই অবস্থানকালে হাজী সাহেব (রহঃ) তাকে ভালোভাবে ঘর্ষণ-পেষণ করেছেন। তার কী ফল দাঁড়াল ? ফল দাঁড়ালো এই যে, চল্লিশ দিন পর যখন বিদায় গ্রহণ করছিলেন, হাজী সাহেব (রহঃ) তাকে লক্ষ করে বললেন,

'মিয়া রশীদ আহমাদ ! আমার কাছে যা কিছু আমানত ছিল তার সবটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

এটা সাধারণ কোন অবস্থা ? শায়খ বলছেন, আমার কাছে যা-কিছু আমানত ছিল সব তোমাকে দিয়ে দিলাম ! এমনই উচ্চাসন আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেছিলেন।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর বিস্ময়কর হালত

গাঙ্গুহী ফেরার পর দীর্ঘদিন আত্মসমাহিত অবস্থায় কাটে। অনেক দিন পর্যন্ত হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর কাছে চিঠিও লেখেননি। শেষে হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) নিজেই লেখেন,

'প্রিয়, বহুদিন তোমার খবরাখবর পাই না। কী অবস্থায় আছ পত্র মারফত জানিও'।

এভাবে শায়খ নিজেই প্রিয় মুরীদের খবর নিচ্ছেন। উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) লেখেন,

'হযরত ! বহুদিন চিঠি লিখতে পারিনি। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে লিখব। নিজের অবস্থা লিখতে বড় লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও নিজের অবস্থা সেই অবস্থাহীনই রয়ে গেছে। তাই লিখতে লজ্জা লাগছিল। অবশ্য আপনার দু'আ ও সুদৃষ্টির কারণে যে পার্থক্য অনুভূত হচ্ছে তা নিম্নরূপ,

(এক) শরীআত তবীয়ত বনে গেছে।

(অর্থাৎ মানুষের ভেতর যেমন ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি স্বভাবগত চাহিদা দেখা দেয়, এবং সে চাহিদা পূরণ না করা পর্যন্ত মানুষ শান্তিলাভ করে না, তেমনিভাবে শরী'আতের চাহিদাসমূহ পূরণ না করা পর্যন্ত শান্তি পাই না)।

(দুই) প্রশংসাকারী ও নিন্দুকের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না।

(অর্থাৎ কেউ প্রশংসা করলে যেমন বিশেষ আনন্দবোধ হয় না, তেমনি কেউ নিন্দা করলেও আবেগে আঘাত লাগে না। আমার কাছে এখন উভয় সমান)।

(তিন) শরী'আতের কোনও মাসআলায় কোনও খটকা অনুভব হয় না।

এ চিঠি যখন হযরত হাজী সাহেব (রহঃ)-এর হাতে পৌঁছল, তখন সেখানে আরেক দৃশ্য। তিনি চিঠিখানি মাথার উপর রাখলেন, তারপর বললেন, 'তিনি যা লিখেছেন, সে রকম হাল তো আমারও অর্জিত হয়নি। এই হচ্ছেন শায়খ আর ওই মুরীদ। এমনটা এমনিই হয়ে যায় না। এর জন্য পেষাই হওয়ার দরকার পড়ে।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর আরেকটি ঘটনা

চল্লিশদিনের সেই অবস্থানকালীন ঘটনা। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) প্রিয় মুরীদকে ডেকে বললেন, আজ তুমি আমার সাথে খানা খাবে। আদেশমত খাবার সময় তিনি উপস্থিত হলেন। দস্তরখানে তরকারির দুটি পেয়ালা ছিল। একটি কোপ্তা, অন্যটিতে ডাল। হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) কোপ্তার পেয়ালাটি নিজের সামনে রাখলেন আর ডালের পেয়ালাটি মুরীদের সামনে। ইশারা ছিল তুমি ডাল খাও, আমি কোপ্তা খাব। খাবার মাঝখানে হযরত হাফেজ জামেন শহীদ (রহঃ) সেখানে উপস্থিত। তিনি খাদ্যের বন্টন দেখে বললেন, হযরত ! আপনি এটা কী করছেন ? কোপ্তা নিজে খাচ্ছেন আর তাকে ডাল খাওয়াচ্ছেন ?

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) বললেন, আরে এটা তো আমার করুণা যে, তাকে আমার সাথে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি। উচিত কাজ তো ছিল রুটিতে ডাল

রেখে তার হাতে দেওয়া আর বলা বাইরে সিঁড়িতে বসে খাও। একথা বলে প্রিয় মুরীদের দিকে লক্ষ করলেন, চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটছে কি না। দেখলেন কোন ভাবান্তর নেই। বোঝা গেল আলহামদুলিল্লাহ কিবর ও অহংকারের রোগ সম্পূর্ণ বের হয়ে গেছে।

মুরীদকে এভাবেই পেষাই করা হয় আর তা করার পরই যথার্থ চিকিৎসা হয়ে যায়। কাজেই কারও নিজের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে নিজে স্থির করে নেবে তার উপযুক্ত দাওয়াই কী হতে পারে।

দাওয়াই নিতে হবে শায়খের কাছ থেকেই

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তির যাতায়াত ছিল। সে নিজেই নিজের দাওয়াই নির্ণয় করত। একবার ফয়সালা করল, তার মধ্যে অহংকারের রোগ আছে, তার চিকিৎসা দরকার। কাজেই একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নিল। এবার আব্বাজী (রহঃ) তাকে ধরে বললেন, এভাবে তো তোমার নফস আরও বেশি মোটা হচ্ছে এবং অহংকার আরও বাড়ছে।

একারণেই হযরত থানভী (রহঃ) বলছেন, অহংকার হয় বহু কিসিমের। প্রত্যেকটির ধরনও ভিন্ন এবং চিকিৎসাও ভিন্ন। তাই এর চিকিৎসা নিজে নিজে সম্ভব নয়। বরং এর জন্য নিজেকে কোন শায়খের হাতে সমর্পণ করতে হবে।

শায়খ প্রথমে দেখবেন তাকাব্বুর আছে কিনা। অনেক সময় তাকাব্বুর থাকে না, কিন্তু বাহ্যিক কিছু কাজ দেখে তাকাব্বুরের সন্দেহ হয়। আবার অনেক সময় তাকাব্বুর থাকে, কিন্তু তাকে তাকাব্বুর মনে করা হয় না। তাই শায়খ প্রথমে সিদ্ধান্তে আসবেন আসলে তাকাব্বুর আছে কি না। যখন রোগ নির্ণয় হয়ে যাবে তখন চিন্তা করবেন এলাজ করা হবে কোন পদ্ধতিতে।

বিনাবাক্যে শায়খের অনুসরণ

এমন কি যে ব্যক্তি 'আলেম হয়ে গেছে। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি সব কিছু পড়েছে এবং য়থেষ্ট ইলম হাসিল করেছে, তারও নিজ ইসলাহের জন্য কোনও মুহাক্কিক শায়খের অনুসরণ করতে হয় এবং বিনাবাক্যে তার কথা মেনে চলতে হয়। শায়খ যদি বলেন তোমার মধ্যে অহংকার আছে বুঝতে হবে ঠিকই আমার মধ্যে অহংকার আছে। তারপর তিনি চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা দান করেন সে মত চলতে হবে। আপত্তি

উত্থাপন ও প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। তা করতে গেলে সব বরবাদ যাবে। কেউ একজন খুব সুন্দর বলেছেন,

تلمیذے کہ چوں وچرا نکند و مریدے کہ چوں وچرا کند ہر دو را بصحرا باید فرستاد

'যে ছাত্র কী ও কেন (অর্থাৎ প্রশ্ন) করে না আর যেই মুরীদ কী ও কেন করে, তাদের দু'জনকেই বের করে দাও।'

যে প্রশ্ন করে না সে ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়। ছাত্রের তো কাজই হল বুঝতে চাওয়া। আর সেজন্য যত প্রশ্ন করার দরকার তা করতে হবে। কোনও বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ দেখা দিলে বা অস্পষ্টতা রয়ে গেলে তা দূর করার জন্য প্রশ্ন করতেই হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন শায়খের মুরীদ হবে, তার কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। আপনি এরূপ কেন করলেন ? এটা কেন করতে হবে ? এ জাতীয় প্রশ্ন যে মুরীদ করবে তাকে গেট আউট করে দাও। সে মুরীদ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

বোঝা গেল ছাত্রের কাজ হল প্রশ্ন করা। মুরীদের কাজ প্রশ্ন না করা। যে ছাত্র চুপচাপ বসে থাকে, কিছু জিজ্ঞেসই করে না, সে বোকা। সে ছাত্রত্বের হক আদায় করে না। আর যে মুরীদ প্রশ্ন করে, সব কিছুই বুঝতে চায়, সেও যথার্থ মুরীদ নয়। তার সফলতা দুরূহ ।

যে 'আলেম কিতাবী 'ইলম শিখেছে বিনা বাক্যে কোনও শায়খের হাতে সমর্পিত থাকা তার জন্য আরও বেশি জরুরি। কেননা আগেই বলেছি 'ইলমের ধর্ম উর্ধ্বগামিতা। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে সেই ধর্ম আপনিই তার মধ্যে কাজ করে। বড়ত্বের বোধ তার মধ্যে এমনিই সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি কিছু একটা হয়ে গেছি এভাব সে ভাবতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে দেখা যায়। তাই তার আত্মিক তারবিয়াত সমধিক প্রয়োজন। ঘর্ষণ-পেষণ ছাড়া তারও রোগ সহজে দূর হয় না।

মরহুম যাকী কায়ফী (রহঃ)-এর ঘটনা

আমার সর্বজ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নাম ছিল যাকী কায়ফী। তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। একজন কবি ছিলেন। দারুল-উলূম দেওবন্দে কাফিয়া-শরহে জামী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর পড়াশুনা ছেড়ে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যান। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাইজান, আপনি লেখা-পড়া শেষ করলেন না কেন ? মাঝখানেই কেন ছেড়ে দিলেন ? উত্তরে বললেন, 'বড় মিয়াঁ' আমার ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছেন।

বড় মিয়াঁ হলেন হযরত মিয়াঁ সায়্যিদ আসগার হুসায়ন সাহেব (রহঃ)। যিনি মিয়াঁ সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাশফ ও কারামতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা ব্যাপার কী হয়েছিল ? বললেন, একদিন বাসা থেকে দারুল-উলূম যাচ্ছিলাম। পথেই হযরত মিয়াঁ সাহেবের বাড়ি। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। আব্বাজী (রহঃ) এর শিক্ষার প্রভাবে এটা তো সম্ভব ছিল না যে, মিয়া সাহেব (রহঃ)-এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাব আর তাঁর সাথে দেখা করে দু'আ নিয়ে যাব না। তাই ভাবলাম তাঁর সাথে দেখা করে দু'আ নিয়ে যাই। মিয়া সাহেব (রহঃ)-এর কাছে বাদাম বা অন্য কোনও খাবার থাকত। কোনও শিশু দেখা করতে গেলে তা দিয়ে দিতেন। যা হোক আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। তারপর দু'আ চাইলাম-হযরত ! আমার জন্য দু'আ করবেন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইলম দান করেন। বড় মিয়াঁ বললেন, না ভাই না, 'ইলম বড় মন্দ জিনিস। আমি তোমার জন্য দু'আ করব না।

একথা শুনে তো আমি স্তম্ভিত। ইনি কী বলছেন ? ইলম মন্দ জিনিস ? তারপর নিজের সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন, ভাই ! প্রথমে আমি দারুল–উলুমে মুলসারী (বকুল) গাছের নিচে পুরানো ছেঁড়া চাটাইতে বসতাম। এখন চকিতে বসে পড়াই। এখন যদি মিয়া সাহেবকে বল, নিচে বসে পড়াতে হবে, তবে তার খারাপ লাগবে। এভাবেই 'ইলম তাকাব্বুর সৃষ্টি করে। এজন্যই আমি তোমার জন্য 'ইলমের দু'আ করব না। ভাইজান বলেন, সেদিনই আমার মনে হয়েছিল মিয়া সাহেব আমার গতি পরিস্কার করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম 'ইলম আমার জন্য নয়। যা হোক তিনি কাশফওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিনি জানতে পেরেছিলেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তি তার তকদীরে নেই। তাই সুচিন্তিত পন্থায় ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। তা বোঝাতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তা লক্ষ্য করার মত। বললেন, 'ইলম তাকাব্বুর জন্মায়। আর যদি তাই হয়, 'ইলমের কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সেই আলেম হওয়া অপেক্ষা মুর্খ থাকা অনেক ভালো। কেননা সে অবস্থায় আখিরাতে অহংকারের শাস্তি থেকে তো রক্ষা পাওয়া যাবে। তাই বলে কি 'ইলম শিখবে না ? শিখবে, অবশ্যই শিখবে, তবে অহংকার যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সেই ব্যবস্থাও নেবে। এর একমাত্র উপায়, হল নিজের লাগাম অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া। তিনি লক্ষ রাখবেন আমার মধ্যে কি কি রোগ জন্ম নিচ্ছে। সেই অনুপাতে তিনি উপযুক্ত ওষুধ দান করবেন।

'ইলম হল দোধারী তরবারি

আমার মহান পিতা (রহঃ) বলতেন, 'ইলম দোধারী তরবারির মত। আল্লাহ তা'আলা যদি 'ইলমে বরকত দান করেন, তাতে নূর দেন ও তাকে উপকারী বানিয়ে দেন, তবে সুবহানাল্লাহ এটা কতইনা কল্যাণকর, আর আল্লাহ না করুন, এতে যদি বরকত ও নূর না থাকে এবং এটা অহংকার ও গৌরব সৃষ্টি করে দেয়, তবে এর চেয়ে ধ্বংসকর জিনিসও আর কিছু নেই। আব্বাজী (রহঃ) বলতেন, খাবার যত তৈলাক্ত, দামী, শানদার ও সুস্বাদু হয়, পচে গেলে তা ততই পুঁতিগন্ধময় হয় এবং সারাটা মহল্লা দূষিত হয়ে যায়। মামুলী খাবার পচলে অতটা দুর্গন্ধ ছড়ায় না। এমনিভাবে মানুষ যত উপর থেকে পড়ে আঘাত ততই বেশি লাগে। নিচ থেকে পড়লে তেমন আঘাত লাগে না। ঠিক এরকমই 'ইলম অনেক দামী জিনিস, অনেক উপরের জিনিস। সেজন্যই এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যক্তিকে অহমিকায় লিপ্ত করে দেয়, তবে এর ধ্বংসকরতাও হয় অনেক বেশি। তাই নিজের ইসলাহ করানোর প্রয়োজন অন্যদের তুলনায় আলেমের অনেক বেশি হয়ে থাকে।

শয়তানের ঘটনা

আব্বাজী (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি। এক ব্যক্তি শয়তানকে স্বপ্নে দেখল। তার মাথায় অনেকগুলো পোটলা। ফেরিওয়ালার মত সেগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ করে দেখা গেল, কোনও পোটলায় পায়খানা, কোনও পোটলায় পেশাব, কোনওটায় গোবর, কোনওটায় অন্য কোনও ময়লা। সে শয়তানকে জিজ্ঞেস করল, এসব কী ? শয়তান সেসব পোটলা দেখিয়ে বলল, এটার ভেতর অহংকার, এটার ভেতর হিংসা, এটার ভেতর বিদ্বেষ, এটার ভেতর সম্মানস্পৃহা ইত্যাদি। সবই ছিল মল-মূত্রের আকারে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, এগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ? শয়তান বলল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। ফের জিজ্ঞেস করল, এগুলো কেউ টাকা দিয়ে কিনবে নাকি ? শয়তান বলল, আমার বাজার চেনা আছে এবং কোন জিনিসের ক্রেতা কে তাও জানা আছে। অহংকার ও সম্মানস্পৃহা নিয়ে যাব আলেমদের মহলে। তাদের কাছে এর খুব চাহিদা। এ দুই নাপাক তারা খেতে খুব মজা পায়। তাদের কামনা লোকে আমাকে সম্মান করুক। আমার খুব খ্যাতি হোক, আমার প্রশংসা করুক ও ভক্ত হয়ে যাক। এটা হল সম্মানস্পৃহা-হুব্বে জাহ। এর ভালো মার্কেট উলামা-মহল। এর প্রতি তাদের আগ্রহ খুব বেশি। সেখানে গিয়ে এই বিষ্ঠা বিক্রি করব। তারা সানন্দে খাবে।

মুই কি হনু রে !

যা হোক 'ইলম একে তো উচ্চতাধর্মী, যে কারণে ইলমওয়ালার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়, তায় রয়েছে বাইরের উসকানি। লোকে আলেম উলামাকে দেখলে সম্মান করে, কেউ দাড়িয়ে যায়, কেউ হাতে, কেউ পায়ে চুমু খায়, কেউ দাওয়াত করে, কেউ হাদিয়া দেয়, এসব কারণে 'ইলমধারী ব্যক্তির মনে একটা ভাব জন্মায় আর মনে করে আমি একটা কিছু হয়ে গেছি। এই যে এত মানুষ আমাকে সম্মান করে, আমার পেছনে চলে তা কি এমনিই। আমার ভেতর কিছু আছে বলেই তো।

এক লোভীর ঘটনা

এরূপ ইলমধারীর উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত থানভী (রহঃ) লিখেছেন, 'আশআব' নামক এক ব্যক্তি খুবই লোভী ছিল। তার নামই পড়ে গিয়েছিল আশ'আব তম্মা'- লোভাতুর আশআব। একদিন সে রাস্তায় চলছিল, ছেলে-ছোকড়ারা উত্ত্যক্ত করার জন্য তার পেছনে লেগে গেল। তাদের কবল থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল তোমরা এখানে কি করছ ? অমুক জায়গায় যাও, সেখানে মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে। একথা শোনামাত্র ছোকড়ার দল সেদিকে দৌড় দিল। পেছনে-পেছনে আশআবও ছুটল। লোকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন দৌড়াচ্ছ ? বলল, ওরা দৌড়াচ্ছে যে ! অসম্ভব কি মিষ্টি বিতরণ হতেও তো পারে।

আমাদের অবস্থাও এরকমই। প্রথমে তো নিজ ইলম দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। সে ধোঁকায় পড়ে মানুষ আমাদের ভক্ত হয়েছে। কেউ হাতে চুমু খাচ্ছে, কেউ পায়ে চুমু দিচ্ছে, কেউ দাওয়াত করছে, কেউ হাদিয়া দিচ্ছে, কেউ আল্লামা উপাধি দিচ্ছে আরও কত কি ! এখন মন-মস্তিষ্কে ধারণা জন্মেছে, এত লোক যখন আমার পেছনে চলছে ও ভক্তি করছে, তখন নিশ্চয়ই আমি কিছু একটা হয়ে গেছি। নইলে তারা এত সম্মান করবে কেন ? এরই পরিণামে ইলমধারী ব্যক্তি আরও বেশি অহমিকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

'ইলমের জন্য শোকরগোযার হও

সুতরাং যারা দীনী 'ইলমের সংগে সম্পৃক্ত, কিংবা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন গুণ দিয়েছেন তাদের এই অহংকার- রোগের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্ক থাকা দরকার-পাছে এ মহাব্যাধি তাদের আক্রমণ করে

বসে। কখনও এতে আক্রান্ত হয়ে গেলে অচিরেই চিকিৎসা করাতে হবে। একটা তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হল শোকরগোযারী করা যে, হে আল্লাহ ! আমি তো ইলমের মত মহাসম্পদের উপযুক্ত ছিলাম না। তা সত্ত্বেও আপনি দয়া করে আমাকে এটা দান করেছেন। হে আল্লাহ ! আপনার অশেষ শোকর। সেই সংগে চিন্তা করবে, এটা যেমন আল্লাহ তা'আলার দান, তেমনি তিনি চাইলে যে কোনও সময় কেড়েও নিতে পারেন। তিনি কেড়ে নিলে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। কুরআন মাজীদে ইরশাদ

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

'যাতে সে জানার পর নাজানা হয়ে যায়।'[১৭৬]

অর্থাৎ আগে অনেক কিছু জানত। পরে সব জ্ঞান বিদায় নিয়ে গেল। এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মানব-মস্তিস্কের কোন স্ক্রু সামান্য ঢিলা হয়ে গেলে মুহূর্তেই সব জ্ঞান-বিদ্যা উঠে যায়। এই মানুষ কিসের বড়াই করতে পারে ? কিসের ভিত্তিতে তার এত দেমাক ?

'আলেম ও শায়খের প্রভেদ

একারণেই হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) ও হযরত নানূতবী (রহঃ)-এর মত মহামনীষী, যারা ছিলেন 'ইলমের সাগর, নিজেদের ইসলাহের জন্য হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)-এর হাতে নিজেদের সপেঁ দিয়েছিলেন, অথচ তিনি নিয়মতান্ত্রিক কোন আলেম ছিলেন না। লোকে হযরত নানূতবী (রহঃ)- কে জিজ্ঞেস করল, হযরত ! একি কাহিনী ? ব্যাপারটা কি উল্টো হয়ে গেল না ? উচিত তো ছিল তাঁরই আপনাদের কাছে আসা। কারণ তিনি আলেম নন। আপনারা আলেম। অথচ আপনারাই কিনা তাঁর কাছে যাচ্ছেন !

উত্তরে হযরত নানূতবী (রহঃ) বললেন, তার ও আমাদের দৃষ্টান্ত হল- (পুথিবিদ্যা বিশারদ ও কারিকরের মত)। এক ব্যক্তি মিষ্টান্ন দ্রব্য সম্পর্কে খুব জানে। সে জানে কালোজাম সর্বপ্রথম কে তৈরী করেছে, কোথায় কোথায় এটা পরিচিত, কোন- কোন দেশে খাওয়া হয়, কি-কি দ্রব্য দ্বারা বানানো হয়, এর প্রস্তুতপ্রণালী কী, এটা কত প্রকার ইত্যাদি। তাকে যদি বলা হয় কালোজাম সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিন, একটা প্রবন্ধ লিখে দিন, তা বেশ

---

১৭৬. নাহল ৭০

পারবে। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি কখনও কালোজাম খেয়েছেন ? উত্তর দেবে, না কখনও খাইনি। অপর এক ব্যক্তি কালোজামের ইতিহাস জানে না, কে প্রথম বানিয়েছে, কোথায় পাওয়া যায়, কিভাবে তৈরী করতে হয় তার কিছুই জানা নেই। কিন্তু রোজ সকাল-বিকাল সে কালোজাম খেয়ে থাকে। আচ্ছা বল তো এ দু'জনের মধ্যে কে সেরা ? যে ব্যক্তি কালোজামের উপর বক্তৃতা দিতে ও প্রবন্ধ লিখতে পারে, অথচ কখনও খায়নি সে ? না কি যে তার কিছুই পারে না, কিন্তু রোজ তা খায় ; সেই ? নিশ্চয়ই- যে ব্যক্তি রোজ সকাল-বিকাল খায় সেই সেরা, যদিও সে প্রস্তুত প্রনালী জানে না।

তারপর হযরত নানূতবী (রহঃ) বললেন, আমরা হলাম কালোজামের ইতিহাসবেত্তার মত, যে কখনও কালোজাম খেয়ে দেখেনি। আর হাজী সাহেব হলেন সেই ব্যক্তির মত, যে তা রোজ সকাল-বিকাল খায়। তিনি কালোজাম তুলে আমাদের মুখে দিয়ে দিয়েছেন- এই নাও কালোজাম খাও। এ কারণেই আমরা তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি।

যা হোক যে ব্যক্তি 'ইলম শিখেছে, বিশেষভাবে তার উচিত কোন শায়খের কাছে গিয়ে নিজের ইসলাহ করানো ও তার তারবিয়াত গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দিন-আমীন।

অহংকারের আরেক চিকিৎসা

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, অহংকারের আরেক চিকিৎসা হল আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। যখন অহংকারভাব অনুভব হয় তখন তো অবশ্যই। আর সে ভাব অনুভব না হলেও রোজ একটা সময় স্থির করে এ ধ্যান করা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা কত বড়, কত মহান, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা কত গৌরবময় – এই চিন্তার পাশাপাশি নিজ হীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অহংকার দূর হয়ে যায়। এক অহংকারী জনৈক বুজুর্গকে লক্ষ করে বলেছিল, আপনি জানেন আমি কে ? বুযুর্গ বললেন, কেন জানব না ? অবশ্যই জানি তুমি কে ? তুমি হলে-

أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ وَآخِرُكَ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ وَأَنْتَ فِيمَا بَيْنَ ذَالِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

'তোমার সূচনা হল পুঁতিগন্ধময় বীর্য, সমাপ্তি গলিত লাশ আর এ দু'য়ের মাঝখানে তুমি বিষ্ঠাবাহী দেহ'।

মরে গেলে তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন কেউ তোমাকে কাছে রাখতে রাজি হবে না। মাটির গর্তে তোমাকে ফেলে রাখবে। কেননা বেশিক্ষণ থাকলে তুমি বাড়িতে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তুমি শুরুতেও নাপাক, শেষেও নাপাক, আর মধবর্তী সময়ে নাপাক বয়ে বেড়াচ্ছ। এবার বোঝ তুমি কে।

চামড়া ঢাকা নাপাক-সমষ্টি

আল্লাহ তা'আলা কতইনা মেহেরবান। চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা তিনি সব ঢেকে রেখেছেন। কোথাও থেকে চামড়া ছিড়ে গেলে ভেতরের নাপাকী বের হয়ে আসে। রক্ত বের হয়, পুঁজ বের হয়, কিংবা মলমূত্র। সারা দেহে নোংরা-ময়লা ভরা। আল্লাহ তা'আলা এই চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা তা ঢেকে দিয়েছেন। তাই তা চোখে পড়ে না। কাজেই অন্তরে কখনও অহংকার দেখা দিলে-নিজের এই অবস্থার ধ্যান কর। চিন্তা কর তোমার সূচনা কী ছিল, সমাপ্তি কিসে হবে এবং মাঝখানেই বা তোমার অবস্থা কী।

বাহ্যগমনকালীন অবস্থা চিন্তা করা

হযরত (রহঃ) বলেন, আরও একটা কার্যকর ব্যবস্থা হল, যখন অহংকার ভর করে মলত্যাগকালীন অবস্থাকে চিন্তা করবে। তখন তুমি কী অবস্থায় থাক, তোমাকে কেমন দেখা যায়, কী কাজটা কর ? এতে নিজের স্বরূপ বুঝে আসবে এবং অহংকার খতম হয়ে যাবে। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও গৌরব-গরিমার ধ্যান করবে, নিজ ক্ষুদ্রতা ও হীনতা চিন্তা করবে। মানুষ এমন কী বস্তু, যদ্দরুন সে অহংকার করতে পারে, কিসের জন্য তার জাঁক, কিসের দেমাক ? নিজের কোনও ক্ষমতা নেই, কোনও কিছুই তার নয়। নিজেকে নিজে রক্ষা করবে সেই শক্তিও তার নেই। তার যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর দান।

আরেকটি ব্যবস্থা

হযরত (রহঃ) বলেন, অহংকার বিলোপের আরেকটা ব্যবস্থা হল, ইচ্ছাকৃতভাবে এমন-এমন কাজ করবে, যাকে লাঞ্ছনাকর মনে করা হয়ে থাকে- যখন তা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসায় সফল পাওয়া না যাবে।

হযরত 'উমর (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত 'উমর ফারূক (রাযি.)একদিন একটি দামী পোশাক পরে খুতবা দিচ্ছিলেন। জামাটি তার খুব পসন্দ হয়েছিল এবং তাতে নিজেকে খুব ভালো

লাগছিল। বেশ মানাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর জামাটি খুলে ফেলেন এবং পিঠে পানির মশক তুলে নেন। শুরু করে দিলেন ভিস্তিগিরি। মানুষের ঘরে-ঘরে পানি নিয়ে যেতে লাগলেন। লোকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এই কী করছেন? বললেন, আমার অন্তরে আত্মম্ভরিতার ভাব এসে যাচ্ছিল, তার দাওয়াই দিচ্ছি।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর কাজ ছিল শিক্ষকতা করা। মানুষকে হাদীছের শিক্ষা দান করতেন। রাজনীতির সাথে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। একবার সেই অবকাশ এসে গেল। বাইরাইনের গভর্ণর ছুটিতে যাচ্ছিল। তার স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)- কে নিয়োগ দেওয়া হয়। দরবেশ প্রকৃতির লোক ছিলেন। জীবন ভর আল্লাহ কি বলেছেন আর রাসূল কি বলেছেন- সেই চর্চা ও প্রচারেই ব্যস্ত থেকেছেন। এখন শুরু হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় কাজ। সারা দিন গভর্ণরের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতেন। আর রাত হলে এক আজব দৃশ্যের অবতারনা করতেন। মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে চলতেন আর ডাক ছেড়ে বলতেন, পথ ছাড় আমীরুল-মু'মিনীন আসছেন-পথ ছাড় আমীরুল-মু'মিনীন আসছেন! এভাবে মানুষকে জানান দিতেন যে, দেখ গভর্ণর লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে চলছে, এটা করতেন প্রতিষেধক হিসেবে, যাতে গভর্ণরের পদমর্যাদার কারণে মন-মস্তিস্কে অহংকার ভর করতে না পারে।

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ)- কে বলা হত যুগের ইমাম এবং সমকালের আবূ হানীফা। 'আরওয়াহে ছালাছা' গ্রন্থে হযরত থানভী (রহঃ) তাঁর ঘটনা লিখেছেন, একদিন তিনি পাঠদান করছিলেন। এ সময় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। ছাত্রদের বললেন, ভেতরে চলো। ছাত্রগণ আপন-আপন কিতাব নিয়ে ভেতরে চলে গেল, কিন্তু সকলের জুতো থেকে গেল বাইরে। হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) দেখলেন জুতোগুলো পড়ে আছে। ভিজে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি তাড়াতাড়ি সেগুলো জড়ো করে ভেতরে নিয়ে আসতে শুরু করলেন।

তিনি এটা করছিলেন দু'কারণে। (এক) নিজ চিকিৎসার্থে। যাতে নিজের ভেতরে অহংকারের আভাসমাত্র দেখা দিতে না পারে। (দুই) মানুষ আত্মিক

চিকিৎসা গ্রহণ করলে আত্মা শুদ্ধ-সমুজ্জল হয়ে যায়। আত্মা শুদ্ধ ও সমুজ্জল হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রদের জুতা তুলে লওয়া বা এ জাতীয় অন্য কোনও কাজ নিজের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। বরং তা নিজের স্বাভাবিক কাজ কর্মের অংশ হয়ে যায়।

সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহঃ)- কে হযরত থানভী (রহঃ)-এর নসীহত

হযরত মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহঃ) ভারতবর্ষের এক ক্ষণজন্মা মনীষী। বিখ্যাত 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থখানি তাঁরই রচিত। অসাধারণ মুহাক্কিক ও গবেষক আলেম ছিলেন। রাজনীতিতেও সুবিখ্যাত ছিলেন। একবার তিনি থানাভবনের খানকায় হযরত থানভী (রহঃ)-এর সাথে মুলাকাত করতে গেলেন। তিনি বলেন, যখন বিদায় নিচ্ছিলাম, আরয করলাম, হযরত! আমাকে কোন নসীহত করুন। হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ ! ইনি এত বড় আলেম। আমাকে নসীহত করতে বলছেন। হে আল্লাহ ! এমন কোন নসীহত আমার অন্তরে দান করুন, যা তার জন্য উপকারী হবে। আকস্মিকভাবে তখন আমার অন্তরে জাগ্রত হল যে, আমাদের এ পথের সারকথা তো একটাই-নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া-আত্মবিলোপ।

হযরত সায়্যিদ সাহেব (রহঃ) বলেন, হযরত থানভী (রহঃ) একথা বলেই হাতে এমন এক ঝাঁকুনি দিলেন, যার ঝাপটায় আমার অন্তরে কম্পন ধরে গেল। অজানতেই আমার চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে আসল।

হযরত 'আরেফী (রহঃ) বলেন, এরপর হযরত সায়্যিদ সাহেব (রহঃ)-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি নিজেকে এমন মেটানোই মিটিয়েছিলেন যার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এত বড় 'আলেম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে একদম ফানা করে দিয়েছিলেন। আমি একদিন দেখলাম, হযরত থানভী (রহঃ)-এর মজলিসের বাইরে তিনি মজলিসে আগত লোকদের জুতা সোজা করছেন।

সত্যিকারের ইলম তো এই বড় মিয়ারই আছে

হযরত ডাক্তার 'আরেফী (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত থানভী (রহঃ) নিজ কক্ষে রচনার কাজে মশগুল ছিলেন। সায়্যিদ সাহেব (রহঃ) দূর থেকে এক মনে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, যেখান থেকে হযরত থানভী

(রহঃ)কে তো দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু হযরত থানভী (রহঃ) তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমি পেছন থেকে হঠাৎ তাঁর কাছে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হযরত এখানে কী করছেন। আমার প্রশ্নে তিনি চমকে উঠলেন। বললেন, কিছু না। আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম। শেষে বললেন, আমি দেখছিলাম সারা জীবন যেসব জিনিসকে 'ইলম মনে করছিলাম, তা এই বড় মিয়া যেখানে আছেন, সেই দৃষ্টিতে নিছক মূর্খতা। আসল 'ইলম তো তাঁর কাছেই আছে।

পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা হযরত সায়্যিদ সাহেবকে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, যা খোদ তার শায়খের ভাষাতেই এভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে,

از سلیمان گیر اخلاص عمل　　داں توندوی را منزه از شغل

'আমলের ইখলাস শিখে নাও সুলায়মানের কাছ থেকে। জেনে রেখ এই নদবী মুক্ত সব ভন্ডামি থেকে।

হযরত থানভী (রহঃ) নিজেই হযরত সায়্যিদ সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে এ বয়েতটি রচনা করেন। কত বড় সনদ তিনি এর দ্বারা তাঁকে দান করেছেন। বস্তুত কিছু বলতে হলে আগে নিজেকে মিটাতে হয়, ফানা করতে হয়।

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل وگلزار ہوتا ہے

'নিজেকে কিছু বানাতে যদি চাও তবে আগে নিজ আমিত্বের বিলোপ ঘটাও। জেনে রেখ, বীজ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরই পরিণত হয় ফুল ও ফুলবাগিচায়।'

কোনও শায়খের হাতে ঘর্ষণ-পেষণ ছাড়া এ জিনিস হাসিল হয় না। এ কারণেই বলা হয় সাধনা-মুজাহাদা যা করবে শায়খের তত্ত্বাবধানে থেকেই করবে, তবেই তার ফল পাওয়া যাবে।

হযরত মুফতী আজম (রহঃ)-এর বিনয়

হযরত ডাক্তার 'আব্দুল-হাই (রহঃ)-এর চেম্বার শুরু দিকে ছিল রবসন রোডে। তখন আব্বাজী (রহঃ) সেই চেম্বার থেকে খানিকটা দূরত্বেই অবস্থান করতেন। ডাক্তার সাহেব (রহঃ) নিজেই বলেছেন, একদিন আমি চেম্বারে বসা। জনাকয়েক লোক সেখানে ছিল।

উল্লেখ্য হযরত ডাক্তার সাহেব (রহঃ)-এর কাছে যেমন শারীরিক রোগের পেসেন্ট আসত, তেমনি আসত আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত লোকজনও। তিনি বলেন, একটু পরে দেখলাম হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ) দুধের পাতিল হাতে নিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি চিন্তা করলাম, সুবহানাল্লাহ !

এত বড় মুফতী এভাবে দুধের পাতিল হাতে নিয়ে যাচ্ছে, তাও এমন উন্মুক্ত পথে ! চেম্বারে বসা লোকদের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, ওই যে, দুধের পাতিল নিয়ে যাচ্ছেন, ওই ব্যক্তিকে তোমরা চেন ? তারা বলল, না চিনি না। আমি বললাম, ইনি পাকিস্তানের প্রধান মুফতি। তিনি হাতে পাতিল নিয়ে যাচ্ছেন- যেভাবে অতি সাধারণ একজন লোক গিয়ে থাকে।

বড়ত্বের কল্পনাও কখনও জাগেনি

আল্লাহ তা'আলা আমার মহান পিতা (রহঃ)- কে এমন উচ্চতর বিনয় দান করেছিলেন, সত্য কথা হল আমি সে রকম বিনয় আর কারও মধ্যে দেখিনি। অনেক সময় লোকে কৃত্রিম বিনয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু আব্বাজীর চরিত্রে সে রকম কৃত্রিমতার কোনও বালাই ছিল না। কেননা তার মন-মস্তিস্কে নিজ সম্পর্কে এ ধারণাই বদ্ধমুল ছিল যে, আমি তো এক মূল্যহীন মানুষ। নিজ সম্পর্কে বড়ত্বের কোন কল্পনাও তার মধ্যে কখনও জাগেনি। এ কারণেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনও কাজ করতেও তার কখনও খারাপ লাগত না। আমি নিজ চোখে দেখেছি, বাজার থেকে আলু কিনে তা জামার আঁচলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন।

হযরত মুফতী সাহেব (রহঃ)- কে হযরত মাদানী (রহঃ) এর নসীহত

দেওবন্দেও তিনি এভাবে দুধ আনার জন্য পাতিল নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) তাঁকে এ অবস্থায় দেখে ফেলেন। পরদিন তিনি যখন দারুল-উলূম দেওবন্দে পৌছান তখন হযরত মাদানী (রহঃ) আব্বাজীকে বললেন, দেখুন ভাই মওলভী শফী সাহেব ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অতি উচ্চস্তরের বিনয় দান করেছেন। কিন্তু এতটা বিনয়ও ঠিক নয়। কেননা এখন আপনি দারুল-উলুমের মুফতী। আর এ জাতীয় কাজে অনেক সময় সাধারণ লোকে ভুল বোঝে। তারা এর অবমূল্যায়ন করে। কাজেই এতটা বিনয় প্রদর্শনও উচিত নয়। কিন্তু আব্বাজী

(রহঃ) মনে করতেন, আমি তো কিছুই নই। কাজেই কোন কাজ করব আর কোনটা করব না সে বিচার কিজন্য করব ? এমনই ছিল তাঁর বিনয়।

মাঝে-মাঝে খালি পায়েও হাঁটা উচিত

আমাদের হযরত 'আরেফী (রহঃ) বলতেন, মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাটবে এবং কখনও কখনও অন্যদের জুতা সোজা করে দেবে।

হযরত থানভী (রহঃ) 'আরওয়াহে ছালাছা'-গ্রন্থে লেখেন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহঃ) কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে অহংকারভাব লক্ষ করলে তার চিকিৎসার্থে হুকুম দিতেন, তুমি দরসগাহ (শ্রেণীকক্ষ) এর বাইরে ছাত্রদের জুতা সোজা করবে। আবার যে শিক্ষার্থীকে শুদ্ধচিত্ত দেখতেন, তার জুতা নিজেই সোজা করে রাখতেন।

শায়খের নির্দেশে আত্মাবমাননাকর কাজও করবে

বলা হয়ে থাকে, তরীকতের পথে কখনও কখনও লাঞ্ছনাকর কাজও করতে হয়। তবে সে কাজও নিজে-নিজে স্থির করবে না। নিজ মতে চলার দ্বারা অনেক সময় বিপরীত ফলও ফলে, উল্টো অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মন-মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যায়। বরং এ কাজও করতে হবে শায়খের তত্ত্বাবধানে। শায়খ না বললে এরূপ কাজ কিছুতেই করবে না।

এক ব্যক্তি কোথাও লেখা দেখেছে, অন্যের জুতা সোজা করলে অহংকার লোপ পায়, ব্যস সে আব্বাজীর মজলিসে এসে অন্যের জুতা সোজা করতে লাগল। আব্বাজী তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। কারণ বললেন, এই ব্যক্তির মন-মানসিকতা এমন যে, সে জুতা সোজা করার কাজ করতে থাকলে অহংকার আরও বাড়বে। ভাবতে থাকবে- আমি বড় বিনয়ী লোক, যে কারণে অন্যের জুতা সোজা করছি। এই ভাবনাই তো অহংকার। কাজেই এ পথেও স্বাধীনভাবে নয় ; বরং শায়খের নির্দেশমতেই চলতে হবে।

অহংকার ও কৃতজ্ঞতার পার্থক্য

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, নি'আমত নিয়ে বড়াই করা হল অহংকার আর তাকে আল্লাহর দান মনে করা এবং নিজ অনুপযুক্ততার প্রতি দৃষ্টি রাখা শোকর। পূর্বে আরয করা হয়েছে যে, অহংকার বিলোপের সর্বোত্তম দাওয়াই হল শোকর। যে যত বেশি শোকর আদায়ে অভ্যস্ত হবে তার অন্তর তত বেশি অহংকারমুক্ত থাকবে। হযরত (রহঃ) তার এ বাণীতে বলছেন, আল্লাহ

তা'আলার কোন নি'আমত পেয়ে বড়াই করা অর্থাৎ সেজন্য নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করা হল অহংকার। কিন্তু যদি মনে করে আমি অতি ক্ষুদ্র, এ নি'আমতের উপযুক্ত ছিলাম না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজ মেহেরবাণীতে এটা আমাকে দান করেছেন, তবে এই অনুভূতিকে বলা হবে কৃতজ্ঞতা। এ কৃতজ্ঞতাই অহংকারের ওষুধ। একে 'তাহদীছে নি'আমত'- ও বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নি'আমতকে স্মরণ ও তার আলোচনা করা। মুখে প্রকাশ করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই নি'আমত দান করেছেন। এ প্রকাশ অহংকার তো নয়ই ; বরং এটা 'ইবাদত'। অপরদিকে অন্যের সামনে বড়াই করা নিজের কোন নি'আমত বা গুণ দ্বারা দেমাক দেখানো হল তাকাব্বুর এবং তা অত্যন্ত কঠিন গুনাহ।

এ গুপ্ত গুনাহ সূক্ষ্মও বটে। এর সীমানা 'তাহদীছে নি'আমত'-এর সীমানার লাগালাগি। আল্লাহ তা'আলার নি'আমতের স্বীকারোক্তি ও তার প্রকাশ স্বরূপ কেউ নিজের কোনও গুণের কথা অন্যকে জানালে তা হয় ' তাহদীছে নি'আমত'। এটা আদৌ গুনাহ নয় ; বরং ইবাদত। আর যদি সেটাই হয় বড়ত্ব প্রকাশের জন্য তবে তা অহংকার, যা কবীরা গুনাহ। উভয়ের মধ্যে ভেদরেখা টানা খুব সহজ নয়, কোনটা অহংকার ও কোনটা তাহদীছে নি'আমত তা নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

'তাহদীছে নি'আমত'-এর নির্দেশ

তাহদীছে নি'আমত বা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ ও প্রচার করা শরী'আতেরই হুকুম। আল্লাহ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

'আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে নি'আমত দেওয়া হয়েছে, তা বর্ণনা করুন।'[১৭৭]

অর্থাৎ মানুষের সামনে প্রকাশ করুন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই নি'আমত দান করেছেন। এ হিসেবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যেমন

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ

---

১৭৭. দুহা : ১১

'আমি বনী আদমের সরদার আর এটা কোন অহংকার নয়।'[১৭৮]

এটা ছিল তাঁর পক্ষ হতে 'তাহদীছে নি'আমত'-আল্লাহ তা'আলার নি'আমত ও অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি। তবে বিষয়টা যেহেতু অহংকারের লাগোয়া, তাই সতর্ক থাকতে হবে যাতে অহংকারের সীমানায় ঢুকে না পড়ি। সেই নির্দেশনা দানের লক্ষে নবীজি নি'আমত বর্ণনা শেষে বলছেন-

وَلَا فَخْرَ

এটা কোন অহংকার নয়'।

অর্থাৎ এর দ্বারা আমি বড়াই করছি না, অন্যদের হেয় জ্ঞান করছি না। অহংকারে অন্যকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করার একটা ব্যাপার থাকে। নি'আমতের প্রকাশ 'তাহদীছে নি'আমতরূপে গণ্য হবে তখনই, যখন তাতে অন্যকে ছোট মনে করা না হবে। হাদীছটির শেষোক্ত শব্দ দ্বারা সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

'তাহদীছে নি'আমত'-এর আলামত

নি'আমতের কথা প্রকাশ যে অহংকারস্বরূপ নয় ; বরং 'তাহদীছে নি'আমত' হিসেবে করা হয়েছে, তা বোঝার একটা আলামতও আছে। আলামত হল, নি'আমত প্রকাশ করার ফলে বিনয় বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ তা'আলার সকাশে নিজ অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি আরও গভীর হয়। কেননা সে তো আল্লাহর সমীপে স্বীকার করছে যে, হে আল্লাহ ! আমি এ নি'আমতের উপযুক্ত ছিলাম না, এটা অর্জন করার কোনও ক্ষমতাও আমার ছিল না, আপনি নিজ দয়ায় আমাকে এটা দান করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এ বোধ ও স্বীকারোক্তির ফলে বিনয়-নম্রতা আরও বেড়ে যায়।

মক্কা-বিজয়কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয়ভাব

হিজরী ৮ম সালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজেতা হিসেবে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করছিলেন। বিজয়ীরূপে তাঁর এ প্রবেশ ছিল এমনই এক নগরে যেখানকার অধিবাসীগণ তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য

১৭৮. মুসলিম, হাদীছ নং ৪২২৩ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩০৭৩ ; আবূ দাউদ হাদীছ নং ৪০৫৩ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৪২৯৮ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৪১৫

করেছিল। তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিল, যার বাসিন্দাগণ তার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, নামাযকালে তাঁর গায়ের উপর ময়লা-আবর্জনা ফেলে দিত, তাঁর গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারত এবং আরও নানাভাবে তাকে উৎপীড়ন করত, অতঃপর মাত্র আট বছর যেতে না যেতেই তিনি সেই নগর জয় করে ফেলেছেন এবং এক বিজয়ী সেনাপতিরূপে সেখানে ফিরে এসেছেন। তাঁর স্থানে অন্য কোনও বীর সেনানায়ক হলে প্রবেশ করত মাথা উঁচিয়ে, বুক টান করে,প্রবেশ করত দর্পিত ভংগীতে, একাধিপত্যের শ্লোগান দিতে দিতে। কিন্তু তিনি প্রবেশ করছেন অভাবনীয় বিনয়-ভংগীতে- তাঁর মাথা ঝুঁকে আছে, থুতনি বুকের সাথে লেগে যাচ্ছে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে এবং মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে কুরআন মাজীদের আয়াত

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়- যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।'[১৭৯]

একেই বলে 'তাহদীছে নি'আমত'। তিনি এ আয়াত পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন যে, হে আল্লাহ ! এ বিজয় কেবল আপনিই দান করেছেন। এ নি'আমতের বোধ-অনুভব বাঙ্ময় হচ্ছে তার অংগ-প্রত্যংগের বিনয়-নম্রতা দ্বারা। এর ফলে আল্লাহ অভিমুখিতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই তাহদীছে নি'আমতের আলামত।

অহংকারের আলামত

তাকাব্বুর ও অহংকার-অহমিকার আলামত হল মাথা উঁচিয়ে বুক টান করে চলা, নিজেকে অন্যদের উপরে ভাবা ও শ্রেষ্ঠ গণ্য করা, অন্যদের ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এবং তাদের সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ করা। অন্তত পক্ষে মনে মনে হলেও নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করা হয়। এখন কোনটা 'তাহ্দীছে নি'আমত' ও কোনটা তাকাব্বুর তা নির্ণয় করা কঠিন। সবার পক্ষে উভয়ের মধ্যকার ভেদরেখা টানা সম্ভব নয়। এ কারণেই শায়খের দরকার। শায়খ বলে দিতে পারেন, তুমি যে নি'আমতের কথা প্রকাশ করছ এ আসলে

১৭৯. ফাতহ : ১-২

তাহদীছে নি'আমত নয়, বরং তাকাব্বুর। তুমি নিজে এর নাম 'তাহদীছে নি'আমত' দিয়েছ বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর আড়ালে তুমি অহংকার প্রকাশ করছ। কাজেই এটা শয়তানী কাজ। এর থেকে বিরত হও।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে নিজের মন ও খেয়াল-খুশিকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দেন, তারা প্রতিটি পদে নিজেকে খতিয়ে দেখেন যে, চলাটা সঠিক পথে হচ্ছে না ভুল পথে। আমি আমার শায়খ হযরত 'আরেফী (রহঃ)-এর মুখে হযরত থানভী (রহঃ)-এর ঘটনা শুনেছি যে, একবার তিনি এক মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। বহু লোক ওয়াজ শুনছিল। দিল্ খুলে বয়ান করছিলেন। জ্ঞান-তত্ত্বের ফোয়ারা ছুটছিল। ওয়াজের মাঝখানে হযরতের মাথায় একটা কথা আসল। তিনি বললেন, এবার আমি আপনাদের একটা কথা বলছি। 'তাহদীছে নি'আমত'-হিসেবে বলছি। একথা আপনারা আমার কাছ থেকে শুনবেন। আর কারও কাছে শুনতে পাবেন না।

তিনি এখনও সে কথাটি বলেননি। এরই মধ্যে চৈতন্য হল। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমি যে 'তাহদীছে নি'আমত'-এর নাম দিয়ে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আসলে তো এটা 'তাহদীছে নি'আমত' নয় ; বরং বড়াই হয়ে গেল। এই যে বললাম 'এ কথা আপনারা আমার কাছেই শুনবেন। আর কারও কাছে শুনতে পাবেন না'-এটা একরকম বাহাদুরি হয়ে গেল। আমি ইসতিগফার করছি, হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ কাজ কেবল তার পক্ষে সম্ভব, যার অন্তরে 'মিটার' লাগানো আছে। সেই মিটারই পরিমাপ করছে, কোন্ কথাটি সীমার মধ্যে আছে আর কোনটি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এত বড় 'আলেম ও বুযুর্গ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক বলছেন, আমি 'তাহদীছে নি'আমত' নাম দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে এটা বড়াই ও অহংকার হয়ে গেছে। তা হলে আপনি-আমি কোথায় আছি। না জানি আমরা তাহদীছে নি'আমতের নামে নিজের কত গুণকীর্তন করি আর প্রকৃত পক্ষে তা সবই হয়ে যায় অহংকার ও বড়ত্ব প্রদর্শন।

নি'আমত বৃদ্ধি দ্বারা আল্লাহ-অভিমুখিতা বৃদ্ধি

কাজেই 'তাহদীছে নি'আমত'-এর আলামতকেও সামনে রাখতে হবে। দেখতে হবে নি'আমত বর্ণনার ফলে বিনয় সৃষ্টি হচ্ছে কি না, আল্লাহ ভীতি

বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, এবং আল্লাহ অভিমুখিতায় মাত্রাযোগ হচ্ছে কি না। তা যদি হয়, বোঝা যাচ্ছে সত্যিই তা 'তাহদীছে নি'আমত'। প্রকৃত মু'মিনের আলামত তো এটাই যে, তার প্রতি যত বেশি নি'আমত বর্ষিত হবে, সে তত বেশি সিজদাবনত হবে, তত বেশি তার সামনে নিজ স্বরূপ উন্মোচিত হবে, তত বেশি তার বিনয়, নম্রতা, আল্লাহভীতি ও আল্লাহ অভিমুখিতা সঞ্জীবিত হবে এবং নিজ হীনতা, দাসত্ব ও আবদিয়াতের বোধ তত বেশি গভীর হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার অনুভূতি সে লালন করে। আর সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে যখন যে নি'আমতই দান করেন, সে ডাক দিয়ে ওঠে, হে আল্লাহ ! আমি তো এ নি'আমতের উপযুক্ত ছিলাম না। আপনি কেবল নিজ দয়াতেই এটা আমাকে দিয়েছেন। এভাবে নি'আমত যত বাড়ে তার আল্লাহর প্রতি রুজু'ও তত বাড়তে থাকে।

নি'আমতের কৃতজ্ঞতায় হযরত সুলায়মান (আঃ)

হযরত দাউদ 'আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র সুলায়মান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা অগণ্য নি'আমত দান করেছিলেন। হযরত সুলায়মান 'আলাইহিস-সালামকে এমন এক রাজত্ব দিয়েছিলেন, যার কোন তুলনা মানবেতিহাসে নেই। অতীতে তো নেই। ভবিষ্যতে সে রকম রাজত্ব কারও নসীব হবে না। তাঁর রাজক্ষমতা কেবল মানুষের উপরই নয়, জিন্ন, পশু-পাখি, জল-স্থল ও শূন্যলোক সর্বত্র কার্যকর ছিল। এ নি'আমত দেওয়ার পর হুকুম হল-

اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكۡرًا ؕ وَ قَلِيۡلٌ مِّنۡ عِبَادِیَ الشَّكُوۡرُ ﴿۱۳﴾

'হে দাউদ পরিবার ! তোমরা শোকর অবলম্বন কর। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগোযার বড় কম।'[১৮০]

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ 'আলাইহিস-সালাম এমনভাবে সময়সূচী স্থির করে রেখেছিলেন, যাতে তাঁর ঘরে এমন একটা মুহূর্তও না যায়, যখন কেউ না কেউ আল্লাহ তা'আলার শোকর ও ইবাদতে লিপ্ত থাকবে না। পরিবারের সবার মধ্যে তিনি সেজন্য সময় বন্টন করে দিয়েছিলেন। এই সময় থেকে ওই সময় পর্যন্ত অমুক, তারপর থেকে ওই সময় পর্যন্ত অমুক। এভাবে পরিবারের প্রত্যেকে সেই সময় বন্টনের আওতাভুক্ত ছিল। দেখুন কিভাবে নি'আমত বৃদ্ধির সাথে শোকর ও আল্লাহ অভিমুখিতায় বৃদ্ধি ঘটছে।

---

১৮০. সাবা : ১৩

হযরত সুলায়মান (আঃ) দু'আ করছেন–

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ-বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত কর ।'[১৮১]

তো এটাই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ঠ্য । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে যত বেশি নি'আমত দেওয়া হবে তার ভেতর তত বেশি বিনয় সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর প্রতি তার অনুরাগ- অভিমুখিতা ততই বাড়তে থাকবে ।

দুষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য

অপরদিকে দুষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য এর বিপরীত । সে যত বেশি নি'আমত পায় ততই উদ্ধত হয়ে ওঠে এবং ফির'আওনী খাসলত চাঙা হতে থাকে । কবি মুতানাব্বী বড় তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন । তার এক কবিতায় আছে-

اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ

وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَا

'তুমি যদি ভদ্র লোককে সম্মান কর । তবে তুমি তার মালিক হয়ে যাবে । আর যদি ইতরজনকে সম্মান কর, সে উদ্ধত হয়ে যাবে' ।

অর্থাৎ ভদ্র লোককে ইজ্জত-সম্মান করলে সে তা কখনও ভুলবে না । ফলে সে তোমার গোলাম হয়ে যাবে আর তুমি হবে তার মালিক । পক্ষান্তরে নীচ প্রকৃতির লোককে সম্মান করলে সে মনে করবে সম্মান তার পাওনা ছিল । কারণ সে অনেক উঁচু দরের মানুষ আর সেজন্যই তুমি তাকে সম্মান করছ । এর ফলে সে তোমার মাথায় চড়ে বসবে ।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই একথা প্রযোজ্য । কেউ যদি নি'আমত লাভ করে আর তার ফলশ্রুতিতে সে অধিকতর বিনীত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর সামনে

---

১৮১. নাম্‌ল : ১৯)

আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে, তবে বোঝা যাবে সে একজন শোকর গোযার লোক। কাজেই সে ব্যক্তি যদি নি'আমতের কথা প্রকাশ করে আর বলে, আল-হামদুলিল্লাহ আমি এই-এই নি'আমত লাভ করেছি আর অহংকার হয়ে যায় কিনা সেই ভয়ে একথা বিনীতভাবে বলে, তবে তার সে কথাকে 'তাহদীছে নি'আমত'-রূপে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি নি'আমত লাভের পর মাথা উচিয়ে কথা বলে আর বড়াই করে বেড়াই যে, আমি তো এরকম, আমি এই করেছি সেই করেছি, তবে সে একে 'তাহদীছে নি'আমত' নাম দিক আর যাই করুক, প্রকৃতপক্ষে এটা তার অহংকার।

শায়খের প্রয়োজন

'তাহদীছে নি'আমত'-এর আলামত তো বোঝা গেল, কিন্তু কেউ নিজে নিজে এ ফয়সালা নিতে গেলে ভুল করবে যে, আমি যা বলছি তা তাহদীছে নি'আমত' হিসেবে বলছি। কেননা কারও পক্ষে নিজে-নিজে সে সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়। এর জন্য শায়খ দরকার। কাজেই কখনও কোন নি'আমতের কথা প্রকাশ করলে শায়খকে জানানো উচিত যে, আমি অমুক জায়গায় আমার অমুক নি'আমতের কথা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে আমার সীমালংঘন হয়ে গেছে কি না ? শায়খ বলে দেবেন যে, এই সীমা পর্যন্ত সঠিক এবং তার বেশিটা ভুল। পনের বিশবার শায়খকে তা জানানো হলে এবং শায়খ তা সংশোধন করে দিলে ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ে তার পরিপক্বতা লাভ হবে এবং এক পর্যায়ে তার মন মানসে এক অনির্বচনীয় মানদন্ড স্থাপিত হয়ে যাবে, যা দ্বারা সে নিজেই ফয়সালা নিতে পারবে তার কোন কথাটি সঠিক, কোনটি ভুল এবং কোনটা অহংকার আর কোনটা তাহদীছে নি'আমত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ১ম খণ্ড, ২৪৯-৩১৩ পৃষ্ঠা

উজব (আত্মগুণমুগ্ধতা) ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ!

'আনফাসে 'ঈসা' গ্রন্থে হযরত মাওলানা 'ঈসা সাহেব (রহঃ) 'উজব' শিরোনামের অধীনে এ রোগ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহঃ)-এর বাণীসমূহ উল্লেখ করেছেন। তাসাওউফ ও তরীকতের পরিভাষায় 'উজব' 'কিবর' ও 'তাকাব্বুর'-এ তিনটি শব্দ পাশাপাশি আসে। আপাতদৃষ্টিতে তিনওটি একই রকম মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনওটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

'উজব-এর ব্যাখ্যা

মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় উজব। তা চূড়ান্ত রূপ নেয় তাকাব্বুরে। নিজের কোনও গুণের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে এমন মুগ্ধ হয়ে যাওয়া যে, তার কারণে নিজেকে উত্তমবোধ হয় এবং তা যে আল্লাহ তা'আলার দান সেই অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায়- একেই উজব বলে। যেমন এক ব্যক্তি আলেম। সে তার নিজের এ গুণের কারণে মুগ্ধ। এখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তার ইলম যে আল্লাহ তা'আলারই দান সে কথা চিন্তা করে না। তো এই ব্যক্তি উজবে আক্রান্ত। উজবের ভেতর অন্যকে ছোট মনে করার বিষয়টা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। উভয় অবস্থাই উজবের অন্তর্ভুক্ত। এর মূলকথা হল আল্লাহ তা'আলার দানের প্রতি দৃষ্টি না রেখে নিজ গুণ ও যোগ্যতা দ্বারা প্রসাদবোধ করা। বোঝা গেল 'উজব'-এর সম্পর্ক কেবলই নিজের সাথে, অন্যের সাথে এর সম্বন্ধ থাকে না।

কিবর ও তাকাব্বুর

উজবের থেকেই মানুষের মধ্যে 'কিবর' জন্ম নেয়। নিজের কোন গুণের প্রতি লক্ষ করে নিজেকে অন্য অপেক্ষা বড় মনে করাকে 'কিবর' বলে। উজব অপেক্ষা এতে এক ধাপ বেশি থাকে। উজবে থাকে কেবল নিজ গুণের প্রতি দৃষ্টি আর কিবরে সেই সঙ্গে নিজেকে বড় মনে করার বিষয়টাও যুক্ত থাকে।

সুতরাং নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করাই হল কিবর। অতঃপর সেই বড়ত্বের বোধকে অন্যের সামনে ফলানোকে বলে তাকাব্বুর। অর্থাৎ কথাবার্তা ও চালচলনে এই ভাব দেখানো যে আমি তোমাদের বড়, সেই তুলনায়, তোমরা ছোট-এটাই তাকাব্বুর ও অহমিকাপ্রদর্শন। তাকাব্বুরের পরবর্তী স্তর হল ইসতিকবার (ঔদ্ধত্য)। কুরআন মাজীদে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাকাব্বুরের কারণে কেউ যখন অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তখন সে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়, সে আর কাউকে হিসাবের মধ্যে ধরে না। নিজ মরজিমত যা ইচ্ছা তাই করে, এমনকি অন্যের উপর জুলুম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এই অবস্থাকে 'ইসতিকবার' বলে। কুরআন মাজীদে ফির'আওন সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ চরিত্র যার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়, সে সত্যগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যের মুখে সত্য কথা শুনলে হঠকারিতা প্রদর্শন করে। সত্য মেনে নিলে কি না উঁচু নাক নিচু হয়ে যায়, তাই কোনওক্রমেই তা মানতে প্রস্তুত হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন-আমীন।

উজবের চিকিৎসা

মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় উজব। এটাই ক্রমে কিবর ও তাকাব্বুরে পরিণত হয়। কাজেই জন্ম নেওয়া মাত্রই উজবের চিকিৎসা করে ফেলা উচিত। এ প্রসংগে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন,

'আমলের ভেতর দু'টি দিক আছে। (ক) এক তো নিজ কৃতিত্ব। (খ) আল্লাহ তা'আলার দান ও নি'আমত। আমলকে নিজ কৃতিত্ব হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার নি'আমত হিসেবে দেখা উচিত এবং সে কারণে আনন্দবোধও বাঞ্ছনীয়। ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

'বল' এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতেই হয়েছে সুতরাং এ কারণে তারা আনন্দিত হোক।' (ইউনুস : ৫৮)[১৮২]

আমলকে আল্লাহর দান মনে করবে

কেউ কোনও আমল করার পর যদি মনে করে এ আমল করতে পারাটা আমার কৃতিত্ব, তা যে আল্লাহ তা'আলার দান সে দিকে লক্ষ না করে, বরং

১৮২. আনফাসে 'ঈসা : ১৬২

নিজ কৃতিত্ব বিবেচনায় আহ্লাদ বোধ করে, তবে তাকে তার উজব রূপে গণ্য করা হবে। এতে সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এই ভেবে আনন্দবোধ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ নি'আমত দান করেছেন, তাকে আমলের তাওফীক দান করেছেন, তবে তা তো দূষণীয় নয় ; বরং একটি প্রশংসনীয় কাজই গণ্য হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমলের জন্য আনন্দবোধের আদেশ কুরআন মাজীদেই আছে। যেমন উপরে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে।

এরূপ ক্ষেত্রে আমলকারী ব্যক্তি চিন্তা করে এ আমল করতে পারাটা তো আমার কোন কৃতিত্ব নয়। আল্লাহ তা'আলাই নিজ দয়ায় আমাকে দিয়ে এটি করিয়েছেন। সুতরাং আমার জন্য এটা আল্লাহ তা'আলার এক নি'আমত। এতে যে আনন্দবোধ হয়, তা নিজ কৃতিত্বের কারণে নয় ; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কারণে। তাই এ আনন্দ প্রশংসনীয় এবং তা কুরআনী আদেশেরই অনুসরণ।

নেক কাজে আনন্দবোধ ঈমানের আলামত

এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

যখন তোমার নেককাজ তোমাকে আনন্দ দেবে আর মন্দকাজ তোমাকে কষ্ট দেবে তখন (বুঝবে) তুমি একজন মু'মিন।'[১৮৩]

সুতরাং নামায পড়লে যদি আনন্দ বোধ হয় আর বলে হে আল্লাহ ! আপনারই শোকর, আপনি আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিয়েছেন, তাতে কোন দোষ নেই ; বরং এটা ঈমানের আলামত। এমনিভাবে রোযা ই'তিকাফ কিংবা অন্য কোনও ইবাদত করার দ্বারা আনন্দবোধ হলে এবং সেজন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করলে সে আনন্দ আদৌ দূষনীয় নয় ; বরং ঈমানের আলামত হিসেবে তার মূল্য আছে।

এক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি যখন কোন ভালো কাজ করি তখন মনে আনন্দবোধ হয়। এ কারণে আমার চিন্তা হচ্ছে বিষয়টা উজব নয় তো ? উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

১৮৩. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ২১১৪৫

لَا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'না, এটা মু'মিনের নগদ সুসংবাদ।'[১৮৪]

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটা নগদ পুরস্কার লাভ করলে। তিনি তোমার অন্তরে আনন্দ দান করেছেন। এটাও তো একটা প্রাপ্তি। এটা উজব ও তাকাব্বুর নয়। এজন্য দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। শর্ত হল এটাকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করতে হবে। ভাবতে হবে যে কোন নেককাজ তার তাওফীকেই হয়ে থাকে। যেমন সাহাবায়ে কিরাম বলেছিলেন-

لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'আল্লাহ তা'আলার সাহায্য না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না এবং দান খয়রাত করতাম না ও নামাযও পড়তাম না।'[১৮৫]

সুতরাং যে কোনও নেককাজ করতে পারাকে যদি আল্লাহ তা'আলার দান মনে কর, তবে সেজন্য আনন্দিত হওয়ায় কোন দোষ নেই। দোষ হবে তখনই যখন নেক কাজকে নিজ কৃতিত্ব মনে করবে আর ভাববে এটা করে আমি একটা কিছু হয়ে গেছি। সেই সংগে এটা যে আল্লাহ তা'আলারই দান সেদিকে নজর না রাখবে। সেই নজরের অভাবেই মানুষ সৎকাজ করতে পেরে গর্ববোধ করে এবং নিজেকে বড় ও অন্যকে ছোট মনে করে। এই আনন্দকেই কুরআন মাজীদে لَا تَفْرَحْ শব্দে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ নেক কাজ করে তোমরা উল্লসিত হয়ো না।

পক্ষান্তরে উপরে বর্ণিত আয়াতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا

তারা এতে আনন্দিত হোক' তা এই অহমিকাজনিত উল্লাস নয় ; বরং কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক আনন্দ। তা হলে দেখা যাচ্ছে নেক কাজ সম্পর্কিত আনন্দ দু'রকম। একটি কাঙ্ক্ষিত ও আদিষ্ট আরেকটি হারাম ও নিষিদ্ধ। যেই আনন্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে তা হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্তির কারণেই নেক কাজ করা সম্ভব হয়েছে- এই বোধজনিত

---

১৮৪. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭৮০ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২০৪১৬

১৮৫. বুখারী, হাদীছ নং ২৬২৫ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৩৩৬৩ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩০৯৯ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫০০৫

আনন্দ। এতে নেক কাজকে নিজ কৃতিত্ব মনে করা হয় না। নিজ কৃতিত্ব মনে করে যে আনন্দ প্রকাশ হয় তা নিছক অহংকার এবং সে কারণে হারাম।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

তবে উভয় আনন্দের মধ্যে নিজে-নিজে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এর জন্য মুহাক্কিক শায়খের দরকার। শায়খই বলে দিতে পারেন যে, তোমার এ আনন্দ প্রথশ শ্রেণীর। কাজেই চিন্তার কারণ নেই। সাহাবীর অন্তরে চিন্তা জেগেছিল, নেক কাজ করার পর তাঁর যে আনন্দবোধ হয় তা প্রথম শ্রেণীর না দ্বিতীয় শ্রেণীর ? তা কি কাঙ্ক্ষিত আনন্দ, না অনাকাঙ্ক্ষিত ও নিষিদ্ধ আনন্দ ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে,

لَا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'না, এটা (অনাকাঙ্ক্ষিত আনন্দ নয় ; বরং) মু'মিনের নগদ সুসংবাদ'।

অর্থাৎ এটা প্রথম শ্রেণীর আনন্দ। তাঁর এ উত্তরে সাহাবী নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। আশ্বস্ত হয়ে গেলেন যে, এ আনন্দ মন্দ ও দূষণীয় নয়। যদি দূষণীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হত তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংশোধনী দান করতেন। রোগের প্রতিকার বাতলে দিতেন।

বর্তমানকালে শায়খের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য

আজকাল মানুষ শায়খের শরণাপন্ন হয় আজব-আজব উদ্দেশ্যে, যেমন কখন কী ওজীফা পড়বে তা জেনে নেওয়া, স্বপ্ন দেখলে তার তাবীর জিজ্ঞেস করা, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা আদায়ের দু'আ শেখা, বেকার হলে চাকরি-বাকরির জন্য দু'আ চাওয়া ইত্যাদি। এসবই যেন শায়খের কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শায়খকে এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। ব্যস এরই নাম পীর-মুরীদী। মনে রাখতে হবে পীর মুরীদীর সাথে এসব বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। তাবীজ দেওয়া, ঝাঁড়-ফুঁক করা, দু'আ করা, ওজীফা বাতলানো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো শায়খের কাজ নয়। শায়খের শরণাপন্ন হবে চরিত্রিক ইসলাহের জন্য, আত্মিক উৎকর্ষের জন্য। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে, সৎকাজ করলে যে আনন্দবোধ হয়, তা বাঞ্ছনীয় কি না ? এ আনন্দ উজব ও গুনাহ কি না ? অতঃপর শায়খ যে পরামর্শ দেন তা গ্রহণ করতে হবে এবং তার নির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে। এটাই পীর-মুরীদীর উদ্দেশ্য। আজকাল লোকে এসব বিষয় জিজ্ঞেস করে না, কেবল ওজীফা ও যিকর-আযকার সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করে।

আল্লাহর তাওফীক লাভে শোকর আদায়

হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, নেক কাজ যারা করে তাদের উচিত আমলকে নিজ কৃতিত্ব মনে না করা, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ জেনে শোকর আদায় করা। চিন্তা করা যে, তিনিই আমাকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন, নয়ত আমার কি ক্ষমতা ছিল ?

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی   منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

'বাদশাহর সেবা করছ ভেবে মনে করো না তুমি তার প্রতি দয়া করছ ; বরং তিনি যে সেবা করার সুযোগ তোমাকে দিয়েছেন, মনে রাখবে সেটাই তোমার প্রতি তার করুণা ![১৮৬]

অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগী, মানব সেবা, দীনী ইলমের প্রচার, ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগ, ফতোয়া দান, দীনী বই-পুস্তক রচনা, শিক্ষাদান ইত্যাদি যা-কিছু নেককাজ করা হয়, তাকে নিজ কৃতিত্ব মনে করবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এসব করার তাওফীক দিয়েছেন বলে শোকর আদায় কর যে, হে আল্লাহ ! আপনার অশেষ শোকর, আপনিই আমাকে এগুলো করার তাওফীক দিয়েছেন, নয়ত কত লোক রাস্তা–ঘাটে ঘুরছে, যাদের এসব করার অবকাশ হয় না। আমি তো তাদের চেয়ে আলাদা কিছু নই যে, আমার দ্বারা এগুলো হওয়া অনিবার্য ছিল। সুতরাং হে আল্লাহ এসব আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। এভাবে চিন্তা করলে উজব ও অহংকার জন্ম নেওয়ার সুযোগ থাকে না।

উপরে যে বয়েতটি উল্লেখ করা হয়েছে, এটি শেখ সা'দী (রহঃ)-এর রচিত। এর দ্বারা তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, দীনী ইলমের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখছ, ওয়াজ করছ, কিতাব লিখছ, জনসেবা করছ, ইত্যাদি আরও যা কিছু তোমার দ্বারা হচ্ছে, ভাবছ না কি এর দ্বারা তুমি কারও প্রতি দয়া করছ। দয়া তো তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা করেছেন যে, এসব করার তাওফীক তিনি তোমাকে দিয়েছেন। চেয়ে দেখ না কত লোক এদিক- সেদিক ঘুরছে। আমল করার কোনও তাওফীক তাদের হয় না। আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এটা কি জাঁক করার বিষয় ? কি কারণে অন্যের সামনে বড়াই দেখাচ্ছ ? তোমার তো কর্তব্য দেমাক দেখানো নয় বরং

---

১৮৬. আনফাসে 'ঈসা :১৬২

আল্লাহ তা'আলা কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন বলে তার শোকর আদায়ে রত হওয়া। তিনি তাওফীক দিয়েছেন বলে সিজদাবনত হওয়া।

একই কথা নামায পড়া, রোযা রাখা, ই'তিকাফ করা, তারাবীহ পড়া, তিলাওয়াত করা বা অন্য যে- কোনও ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এসব করা সম্ভব হয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যেই। কাজেই এসব করে অহংকার প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই ; বরং তিনি যে তাওফীক দান করেছেন সেজন্য যত বেশি সম্ভব শোকর আদায় করাই কর্তব্য।

শোকর দ্বারা আরও বেশি তাওফীক লাভ হয়

সুতরাং ইবাদতের অবমূল্যায়ন করো না। বরং শোকর আদায় কর যে, তিনি তা করার তাওফীক দিয়েছেন। চিন্তা কর তিনি তাওফীক না দিলে তোমার কী দশা হত ? কোথায় পড়ে থাকতে ? এরূপ চিন্তা করে যদি শোকর আদায়ে লিপ্ত হও, তবে উজব ও তাকাব্বুর তো সৃষ্টি হবেই না, বরং আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে আরও বেশি ইবাদত ও নেককাজ করার তাওফীক দান করবেন।

তবে এর জন্য অনুশীলন দরকার। এক দিনেই হয়ে যায় না। যখনই কোনও নেক কাজের তাওফীক হয়, তখনই সেজন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে। আমাদের হযরত (রহঃ) বলতেন, কোনও কোনও আমল কলন্দরী আমল অর্থাৎ এমন গুপ্ত কাজ, আপাতদৃষ্টিতে যা এমন কিছুই নয় ; কিন্তু তার কার্যকারিতা অভাবনীয়। শোকর আদায়ের বিষয়টাও এরকমই। এটা দেখতে তেমন বড় কিছু কাজ নয়। চুপিসারে বলে দিলেন, 'আল-হামদুলিল্লাহ' কেউ টেরও পেল না কিংবা বলে দিলেন 'আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর কেউ কিছু বুঝল না, অথচ ভেতরে ভেতরে এর মাধ্যমে মুহূর্তেই আপনি কোথা হতে কোথায় পৌঁছে যেতে পারেন। কেউ টের পায় না আপনি কোন উচ্চতায় উপনীত হয়েছেন, এ সম্পর্কেই তো বলা হয়েছে

میاں عاشق و معشوق کہ رمزیست   کراما کاتبین را ہم خبر نیست

'প্রেমিকজন ও প্রেমাস্পদের মধ্যে থাকে এমন গোপন ইশারা, কিরামুন কাতেবীনেরও যার খবর থাকে না'।

শুকর আদায়ের অনুশীলন করুন

আমাদের হযরত (রহঃ) বলতেন, মুখে শোকরের শব্দ যপতে থাক। পদে-পদে শোকর আদায় কর। প্রচন্ড গরমে হঠাৎ ঠান্ডা বাতাসের ছোঁয়া লেগে গেল তো বল

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

'হে আল্লাহ! তোমারই সমস্ত প্রশংসা এবং তোমারই যত শোকর।

ঘরে প্রবেশ করেছ, শিশু সন্তানকে খেলতে দেখে প্রাণ জুড়িয়েছে। তো বল- আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর।

ক্ষুধা পেয়েছিল। খাবার খেয়ে শান্তি পেয়েছে, তো বল আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু ওয়া লাকাশ-শুকর।

মনে মনে বল। বলার অভ্যাস গড়ে তোল। প্রতিটি মুহূর্তেই তো কোনও না কোনও নি'আমত ভোগ করা হয়েছে। তাই প্রতিবারই মনে মনে শোকর আদায় কর। এভাবে চর্চা করতে থাকলে অভ্যাস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন হয়ে যাবে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজে ব্যস্ত, কিন্তু অন্তঃকরণ শোকর আদায়ে মশগুল। আমাদের হযরত (রহঃ) বলতেন,

جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں
کوئی آساں ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

সুদীর্ঘ কাল দুঃখ-কষ্টের ঘাত-প্রতিঘাতে কলজে পানি হয়ে গেছে। দুঃখ-কষ্টে অভ্যস্ত হয়ে ওঠাটা সহজ কিছু তো নয়।

হযরত বলতেন, আমি বছরের পর বছর সাধনা করেছি, যাতে প্রতিটি মুহূর্তে কোনও না কোনও নি'আমতের জন্য শোকর আদায় হতে থাকে। ভেতরে ভেতরে নিজ খালেক ও মালিকের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ কিছু জানতে পারেনি।

কৃতজ্ঞতা আদায়ে মন্দ স্বভাব নির্মূল হয়

শোকর এমনই এক মহৌষধ, যা অসংখ্য বদ চরিত্র নির্মূল করে। এবং এর মাধ্যমে বেশুমার সদগুণ অর্জিত হয়ে যায়। কাজেই শোকরের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এটা খুব সহজ আমল। এর জন্য খুব বেশি সাধনার দরকার পড়ে না। খুবই সংক্ষিপ্ত কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি কাজে আল্লাহ

তা'আলার শোকর আদায় করতে থাকুন। যেমন মসজিদ থেকে বের হলেন এবং দরজায় সহজেই জুতা পেয়ে গেলেন। বলুন

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

কারও সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন এবং সহজেই তার দেখা পেয়ে গেলেন, মনে মনে বলুন

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

যখনই যে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তা ছোট হোক বা বড় তাতে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করুন। লোকে এ শোকরের কদর করে না। মনে করে এটা মামুলি কাজ। কিন্তু দেখতে যত সহজই হোক কার্যত এটা মহৌষধ। আমল করেই দেখুন। মানুষ এর যত বেশি চর্চা করবে তত বেশি সুফল পাবে। এর ফলে উজব ও তাকাব্বুর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ রহস্য শয়তানেরও জানা আছে। খুব ভালো জানে যে ব্যক্তি শোকর আদায় করবে সে তার ফাঁদে পড়বে না। এজন্যই সে বলেছিল-

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

তাদের অধিকাংশকেই তুমি শোকর গোযার পাবে না।'[১৮৭]

আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমতে আমাকে এবং আপনাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ৪র্থ খণ্ড, ৭৩-৮৪ পৃষ্ঠা

---

১৮৭. আরাফ : ১৭

অন্যকে তাচ্ছিল্যজ্ঞানের প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

হযরত থানভী (রহঃ) তার এক বক্তব্যে বলেন,

কাউকে কোনও বিষয়ে খাটো দেখলে চিন্তা করবে আমিও অন্য কোনও বিষয়ে তার চেয়ে খাটো আছি। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু দোষের পাশাপাশি কিছু গুণও থাকে। তার মধ্যে একটি দোষ থাকলে আমার মধ্যে অনেক দোষই থাকতে পারে কিংবা আমার মধ্যেও হয়ত একটা দোষই আছে, কিন্তু সেটি তার ওই দোষ অপেক্ষা অনেক বেশি নিকৃষ্ট। এ অবস্থায় আমি তাকে খাটো ও হীন মনে করি কিভাবে ? কেন আমি অন্যদেরকে নিজের চেয়ে তুচ্ছ গণ্য করি ? কেন প্রথমে সালাম দিতে আমার লজ্জাবোধ হয় ?[১৮৮]

অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনার জন্য জবাবদিহিতা নেই

অনেক সময় ইচ্ছার বাইরে মনের ভেতর নানা ধারণা জাগে। কারও সম্পর্কে ধারণা হল, এই ব্যক্তি অমুক বিষয়ে আমার নিচে এবং আমি তার উপরে। কেবল এই ধারণা দূষনীয় কিছু নয়। ইচ্ছাবহির্ভূত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বার বার এরূপ ধারণা করা এবং অন্তরে এ ধারণাকে দানা বাঁধতে দেওয়া, অতঃপর এ ধারণা অনুযায়ী আচরণ করা অবশ্যই দূষনীয়। এসব অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর চিকিৎসা দরকার।

মেধাবী ছাত্রের অন্তরে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা

কয়েকজন শিক্ষার্থী একই শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাদের মধ্যে একজন বেশ মেধাবী ও প্রতিভাবান। প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

---

১৮৮. আনফাসে 'ঈসা : ১৫৮

অন্যরা তার তুলনায় দুর্বল ও মেধাহীন। এ ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রটির মনে স্বাভাবিকভাবেই এ ধারণা থাকবে যে, আমি অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। সত্য বটে এই এক দিক থেকে সে অন্যদের উপরে, কিন্তু তাকে চিন্তা করতে হবে যে, মেধার দিক থেকে সে তাদের উপরে হলেও না জানি কত দিক থেকে অন্যরা তার কত উপরে। আল্লাহ তা'আলাই জানেন, তিনি তাদেরকে কত সদগুণ দিয়েছেন এবং এমন কোনও বিশেষত্বও হয়ত তাদের মধ্যে রেখেছেন, যা তাঁর বেশি পসন্দ এবং সে কারণে তারা তার তুলনায় কত এগিয়ে আছে এবং সে তাদের পেছনে পড়ে আছে। এভাবেও ভাবতে পারে যে, আমার মধ্যে তো কত দোষ আছে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমার কোন খবর নেই। কিংবা আমার মধ্যে একটা দোষই আছে, কিন্তু সেই একটা দোষ অন্যদের পড়াশুনার দুর্বলতা অপেক্ষা অনেক বেশি বিপজ্জনক।

দুর্বল ছাত্রদের মাহাত্ম্য

দেখুন, একজন শিক্ষার্থী হয়ত পড়াশুনায় দুর্বল, কিন্তু সে নেককার, নিজ ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ যথারীতি আদায় করে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, অপর দিকে একজন শিক্ষার্থী খুব মেধাবী, অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন, পরীক্ষায় সর্বদা প্রথমস্থান অধিকার করে, কিন্তু সে পাপকর্মে লিপ্ত থাকে, নামাযে-অবহেলা করে এবং আমল-আখলাকে যত্নবান নয়। এ দু'য়ের মধ্যে তুলনা করলে দ্বিতীয়জন অপেক্ষা প্রথমজনই বেশি মর্যাদার অধিকারী হবে। কেননা দ্বিতীয়জনের আমলই যখন ঠিক নয়, তখন মেধা ও প্রতিভা দিয়ে কী হবে। আমলহীন মেধা নিয়ে অহংকার বৃথা। শিক্ষাগত যোগ্যতায় সে অন্যদের উপরে থাকলেও আমল-আখলাকের দুর্বলতার কারণে সে প্রকৃত মর্যাদায় তাদের অনেক পেছনে। সে দুর্বলতা তার জ্ঞানগত যোগ্যতায়, জল ঢেলে দিয়েছে।

'বেদীন হওয়া'-এর চেয়ে বড় কোন দোষ নেই

আজকাল লোকে দীনী ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কোন দোষ মনে করে না। অথচ আসল দোষ এটাই। এক ব্যক্তি তার পুত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাকে বলছিল, আমার এই পুত্র খুব মেধাবী, অত্যন্ত প্রতিভাবান। পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিল। অমুক দেশে উচ্চপদে চাকরি হয়ে গেছে। সেখানে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণ করুন। ফের বলতে লাগল, তবে একটু বেদীন হয়ে গেছে। লোকটি পুত্রের

বেদীন হওয়াকে এমন লঘুভাবে উল্লেখ করল যেন এটা বিশেষ কোন দোষ নয়। যেন তার মূল বিষয়গুলো ঠিক আছে- আর গৌণ বিষয়ে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে।

আমি বললাম এর দৃষ্টান্ত এ রকম যে, এক গ্রামে এক ব্যক্তি খুব অসুস্থ্য লোকজন তাকে দেখানোর জন্য একজন ডাক্তার নিয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব এসে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল। শেষে বলল, এ লোক সম্পূর্ণ ঠিকঠাক আছে। তার অংগ-প্রত্যংগ সব ভালো। হাত, পা, চোখ, কান কোনও কিছুতে সমস্যা নেই। শুধু একটু প্রাণটা চলে গেছে এই যা। আমি লোকটিকে বললাম, আপনি আপনার পুত্রের যে পরিচয় দিলেন তা তো এ রকমই। তার সবই ঠিক আছে, কেবল একটু বেদীন হয়ে গেছে এই যা। অথচ দীনী ত্রুটি ও আমল-আখলাকের কমতি দুনিয়ার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি অপেক্ষা গুরুতর। কাজেই আপনি যাকে খাটো মনে করছেন, অসম্ভব নয় বিশেষ কোন আমলের কারণে সে আপনার চেয়ে অনেক উঁচু আর আপনার মধ্যে হয়ত এমন কোন দোষ আছে, যদ্দরুন আপনি তার অনেক নিচে পড়ে রয়েছেন। আপনার সেই এক দোষ তার বহু দোষ অপেক্ষাও ওজনে ভারী।

নগণ্য লোক আল্লাহ তা'আলার প্রিয়

যদি ধরেও নেওয়া যায় তার চেয়ে আপনার দোষ-ত্রুটি কম, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে কে মাকবূল, কে বেশি প্রিয় তা কে জানে ? বাহ্যত যাকে নগণ্য মনে হয় অনেক সময় আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মূল্য অনেক বেশি হয়ে থাকে। হাদীছ শরীফে আছে,

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

'কোনও-কোনও বিপর্যস্ত, ধুলোমলিন, মানুষের দরজা থেকে বিতাড়িত লোক আল্লাহ তা'আলার (কাছে এমন প্রিয় যে তার নামে) কসম করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কসম রক্ষা করেন। অর্থাৎ কসম করে যদি বলে, এমন-এমন হবে, আল্লাহ তা'আলা তাই করে দেন।'[১৮৯]

মানুষের কাছে তো এরূপ লোকের মূল্য নেই। দরজায় ঢুকতে দেয় না। ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে বড় প্রিয়। তিনি

---

১৮৯. মুসলিম, হাদীছ নং ৪৭৫৪ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৭৮৯

বিতাড়িত করেন না। তিনি তার কথা অগ্রাহ্য করেন না। বান্দা যখন তাঁর নামে কসম করেছে, তখন তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেন না। জান্নাতে যারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, হাদীছ শরীফে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ إِذَا غَابُوْا لَمْ يُفْتَقَدُوْا

যারা অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ খবর নেওয়া হয় না।'[১৯০]

উদাহরণত এক ব্যক্তি রোজ মসজিদে এসে নামায পড়ে। কিন্তু সমাজ দৃষ্টিতে সে অতি নগণ্য। সে যদি হঠাৎ কোনও দিন মসজিদে না আসে, তবে কেউ জিজ্ঞেস করবে না, অমুক লোকটি রোজ মসজিদে আসে, আজ কেন আসল না। সে কোথায় গেল ? সে কোথায় বিবাহের প্রস্তাব দিলে সহজে তার প্রস্তাব গৃহীত হবে না। তার সাথে আত্মীয়তা করতে কেউ রাজি হবে না। এরূপ লোক সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তারা জান্নাতে উচ্চস্থান লাভ করবে।

বাহ্যিক অবস্থা দেখে মানুষকে পরিমাপ করো না

মানুষের কেবল বাহ্যিক দিকটাই দেখ না। প্রকাশ্যে সে কেমন তা দেখে বিচার করো না। কে জানে আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কত মর্যাদা। আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ'-এমন লোকও আল্লাহ তা'আলার কাছে বহু জনপ্রিয় ও নামী দামী লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান। তাই বলা হয়েছে, কোনও লোককেই বাহ্যিক অবস্থা দেখে তুচ্ছ মনে করো না। কোন মুসলিমকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা কবীরা গুনাহ। এটা মদপান ও ব্যভিচারের মতই হারাম। কাজেই কখনও নিজ কৃতিত্ব ও অন্যের ত্রুটির দিকে দৃষ্টি গেলে সে দৃষ্টি যেন অহংকারে লিপ্ত করে না বসে। বরং সংগে-সংগে চিন্তা করবে, অসম্ভব কি তার মধ্যে হয়ত এমন বহু সদগুণ আছে, যা আমার জানা নেই। কিংবা আমার মধ্যে হয়ত এমন অনেক দোষ আছে, যা তার দোষ অপেক্ষা অনেক কঠিন। অসম্ভব নয় সে হয়ত আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে ঘৃণ্য ব্যক্তি

এমন লোকও আছে, যে বাহ্য দৃষ্টিতে অত্যন্ত নামী-দামী। মানুষের চোখে খুবই মর্যাদাবান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কণামাত্র ওজনও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সে রকম হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

---

১৯০. ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩৯৭৯

হাদীছ শরীফে আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

যেসব লোক আমার কাছে ঘৃণ্য এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে দূরে থাকবে, তারা হল সেই সব লোক, যারা অতিরিক্ত কথা বলে, যারা চোয়াল ছড়িয়ে কথা বলে এবং অহমিকা প্রদর্শন করে।'[১৯১]

অর্থাৎ যারা সভা-সমিতি মাতায়, অত্যন্ত বাগ্মীপুরুষ ও অনলবর্ষী বক্তা, সর্বদা লোক পরিবৃত হয়ে থাকে, এমনভাবে কথা বলে যেন চোয়াল ভেংগে যাবে, সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা হিসেবে বিখ্যাত, সাধারণ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত, সকলেই প্রশংসা করে যে, কি দারুন বক্তা, কত বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত। কত উদারপ্রাণ ও সামাজিক। এ জাতীয় লোক আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘৃণ্য।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার কাছে মাকবূল ও প্রিয় হওয়ার মাপকাঠি বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী নয় এবং তার কাছে অপ্রিয় হওয়ারও মাপকাঠি নয় বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি। মানুষ কারও সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেবে কিসের ভিত্তিতে এবং কারও ভালো-মন্দ হওয়া নির্ণয় করবে কোন মাপকাঠিতে ? সর্বক্ষণ আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত। কখনও কারও বাহ্যিক অবস্থা দেখে কোন ফয়সালা দেওয়া উচিত নয়। লেবাস-সূরত দেখেই বলে দিওনা অমুক ভালো, অমুক মন্দ।

কাফেরকেও তুচ্ছজ্ঞান করো না

মানুষ যখন প্রথম দীনের উপর চলতে শুরু করে তখন খুব উদ্দীপনা থাকে। সেই উদ্দীপনা ও উত্তেজনা বশে দুনিয়ার সব মানুষের নিন্দা সমালোচনা শুরু করে দেয়। মনে করে সব বেঈমান, সকলেই জাহান্নামে যাবে, কেবল আমি একাই জান্নাতে যাব। এটা খুবই মারাত্মক কথা। মুসলিম তো মুসলিম, কোনও কাফেরকেও নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী বলা যায় না। কেননা অসম্ভব তো নয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে দেবেন। এবং মুহূর্তের ভেতর তার মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

---

১৯১. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৪১ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৭০৬৬

কোনও কাফেরকে 'স্থায়ী জাহান্নামী' বলো না

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) আরও একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কারও বাহ্যিক কথাবার্তা যদি কুফর পর্যায়ের হয়, তবে মুফতীর কাজ তার সম্পর্কে কুফরের ফতোয়া দেওয়া এবং দুনিয়ায় তার সাথে কাফেরদের মতই আচরণ করা হবে। এ ব্যাপারে মুফতীকে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কারও কথার যদি একশ' রকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় আর তার নিরানব্বইটিই যায় কুফরীর দিকে, মাত্র একটা ব্যাখ্যা হয় ইসলামের অনুকূলে তবে সেই এক ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই তাকে মুসলিম বলা হবে। কাজেই তার সম্পর্কে কুফরের ফতোয়া দেওয়া যাবে না। ইসলামের অনুকূলে একটি ব্যাখ্যারও যদি অবকাশ না থাকে, তবেই তাকে কাফের বলা হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও কুফরের ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও একথা বলা উচিত হবে না যে, সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেননা বাহ্যিকভাবে তার কথা কুফর বটে, কিন্তু গুপ্তভাবে তার এমন কোনও ব্যাখ্যা থাকতেও পারে, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার কাছে সে কুফর থেকে মুক্ত সাব্যস্ত হবে।

এক ব্যক্তির ক্ষমালাভের ঘটনা

হযরত থানভী (রহঃ) বুখারী শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা এর উদাহরণ দিয়েছেন। সে হাদীছে অতীত জাতিসমূহের কোনও এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, মৃত্যু আসন্ন হলে সে তার পুত্রদেরকে ডেকে ওসিয়ত করেছিল, আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর সেই ছাই যেদিন তীব্র বেগে বাতাস চলবে সেদিন সেই বাতাসে উড়িয়ে দেবে। সে এর কারণ বলেছিল, আমি বড় পাপী লোক। আল্লাহ আমাকে ধরতে পারলে রক্ষা নেই। কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তিনি যাতে ধরতে না পারেন সেজন্যই এ ব্যবস্থা। অতঃপর তার মৃত্যু হয়ে গেলে পুত্ররা ওসিয়ত পালন করল।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার শক্তির বাইরে সে যাবে কোথায়? আল্লাহ বললেন, 'হও'। অমনি সে তার পূর্ণ অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, এমন করলে কেন ? সে বলল, আল্লাহ ! তোমার ভয়ে ! আল্লাহ বললেন, এই ব্যক্তি তো আমার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারপর সে আবার আমাকে ভয়ও করে। কি কঠিন ভয় যে, সে তার পুত্রদেরকে বলেছে, আমি আল্লাহর সামনে

পড়ে গেলে আমাকে ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। এসব কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'[১৯২]

বাহ্যিক কুফর সত্ত্বেও ক্ষমার কারণ

আপাতদৃষ্টিতে তার ওসিয়ত ছিল মারাত্মক কুফরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাতে তাকে ধরতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এরকম ওসিয়ত করেছিল। তার মানে আল্লাহর সর্বাত্মক ক্ষমতায় তার বিশ্বাস ছিল না। সে ভাবছিল তার দেহভস্ম বাতাসে ছড়িয়ে দিলে আল্লাহ তা একত্র করে তাকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না। এটা পরিস্কার কুফর। কিন্তু এ ওসিয়তের উৎস যেহেতু ছিল আল্লাহ তা'আলার ভয়, তাই তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, কারও দ্বারা বাহ্যিক কোন কুফরী কথাবার্তা হয়ে গেলে, তাকে কুফরের ফতোয়া দিতে হবে বটে, যেহেতু তা দেওয়া মুফতীর দায়িত্ব, কিন্তু তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হয়ে গেল।

মানসূর হাল্লাজকেই দেখুন না, যার 'আনাল-হক'-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর শিষ্য বা খলিফা ছিলেন। তিনি যখন 'আনাল-হক' বললেন, যা দৃশ্যত কুফরী কথাই ছিল, তখন উলামায়ে কিরাম ফতোয়া দিলেন যে, মানসূর কাফের হয়ে গেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কাফের ছিলেন না। কুফরের ছায়াও তাঁর উপর পড়েনি। তার মুখ থেকে একথা বের হয়েছিল কেবলই ভাবাচ্ছন্নতাবশে। এবং এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও বর্তমান ছিল। কিন্তু যেহেতু ফিতনা বিস্তার লাভ করছিল তাই উলামায়ে কিরাম কুফরের ফতোয়া দিয়ে দেন।

ফাঁসির সময় হযরত জুনায়দ (রহঃ)-এর সাথে কথোপকথন

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সময় সে দৃশ্য দেখার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। তাদের মধ্যে হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-ও ছিলেন। মানসূর হাল্লাজ তাকে দেখে বলে উঠলেন, হে জুনায়দ ! এই যে লোকজন এখানে সমবেত হয়েছে, প্রকৃত অবস্থা এদের জানা নেই। তারা বেখবর। তাই

---

১৯২. বুখারী, হাদীছ নং ৬৯৫২ ; মুসলিস, হাদীছ নং ৪৯৪৯ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ২০৫২ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৩৫৯৭

তাদের সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই। কিন্তু হে জুনায়দ ! আপনি তো জানেন, আমি কী বলেছি এবং কী বোঝাতে চেয়েছি। আপনি কেন এসেছেন? হযরত জুনায়দ (রহঃ) বললেন, আমি এসেছি এজন্য যে, তোমার বিরুদ্ধে যে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে তা সঠিক এবং তোমার পরিণতি এটাই হওয়া উচিত। অথচ হযরত জুনায়দ (রহঃ)-ও জানতেন সাধারণভাবে যা বোঝা হচ্ছে মানসূরের ঠিক তা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় ; তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন অন্য কিছু। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কিরামকে দীনের প্রহরী বানিয়েছেন। হক কথা বলে দেওয়া তাদের দায়িত্ব। কেউ কুফরী কথা বললে তাদের কর্তব্য এ কথা বলে দেওয়া যে, তার কথাটি কুফর।

এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল, আপনারা দীনের ঠিকাদার বনে গেছেন। যাকে ইচ্ছা কাফের বানান, যাকে ইচ্ছা মুসলিম বলেন।

আমি বললাম, আমরা ঠিকাদার তো নই, তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দীনের পাহারাদার বানিয়েছেন। পাহারাদারের কর্তব্য পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও যদি আসে পাহারাদারের দায়িত্ব তাকে আটকে দেওয়া। এবং পরিচয়পত্র ছাড়া ছাড় না দেওয়া। প্রথমে পরিচয়পত্র দেখাবে, প্রবেশাধিকার প্রমাণ করবে, তারপরই ঢুকতে দেওয়া হবে, অথচ সে প্রহরী আর ইনি প্রধানমন্ত্রী। এমনিভাবে আমরাও দীনের প্রহরী দ্বাররক্ষী। কোনও লোক যদি দীনের মধ্যে দাখিল হতে চায়, কিন্তু দীনের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী তার মধ্যে নেই, তবে আমাদের কর্তব্য তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া অর্থাৎ জানিয়ে দেওয়া যে, সে দীনে ইসলামের মধ্যে নেই।

কুফরী ফতোয়ার সাথে জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা না দেওয়া

সুতরাং যথাযথ নীতিমালার অনুসরণে মুফতী সাহেবগণ কারও সম্পর্কে কুফরীর ফতোয়া দিলে, তাতে আপত্তির অবকাশ নেই। ফতোয়া দেওয়া তাদের দায়িত্ব। তারা সে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু ফতোয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কী ব্যবহার করবেন, সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে ? জাহান্নামে গেলে সেখানে অনন্তকাল থাকবে, না কখনও মুক্তি পাবে ? এসব বিষয় ফয়সালা দানের কোনও এখতিয়ার আমাদের নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া অনুচিত কাজ। কেননা এমন হতেই পারে যে,

একজন লোক দৃশ্যত কাফের, কিন্তু তার কাছে হয়ত এমন কোন ব্যাখ্যা আছে, যার দরুন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করবেন এবং সে মুক্তি পেয়ে যাবে।

মোটকথা তুচ্ছজ্ঞান কাউকেই করা যাবে না, এমনকি কাফিরকেও না। অন্যকে তুচ্ছ ও হীন মনে করা অহংকার আর অহংকার করা হারাম ও নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও করমে আমাদেরকে তা থেকে হেফাজত করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :

ইসলাহী মাজালিস : ২য় খণ্ড, ৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা

কৃপণতা কাকে বলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ اَمَّا بَعْدُ!

বখীলী ও কৃপণতাও একটি আত্মিক রোগ। অর্থ-সম্পদের মোহ থেকেই এর সৃষ্টি। টাকার প্রতি যার ভালোবাসা গভীর, তার তা হাতছাড়া করতে জান বের হয়ে যায়। অর্থ ব্যয়ের এই কষ্ট ও কুণ্ঠাই কার্পণ্য। এটা খুবই মন্দ চরিত্র। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এর নিন্দা করা হয়েছে। এ স্বভাব যার মধ্যে থাকে, তার দ্বারা নিজ দায়-দায়িত্ব পালন এবং ফরয ও ওয়াজিব কার্যাদি সমাধায় অবহেলা হয়ে যায় আর এভাবে সে গুনাহগার হয়ে যায়।

বখীলীর কুফল

কৃপণতা মানবমনে অর্থ-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এরূপ লোক অর্জিত টাকা-পয়সা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। ফলে শরী'আত যে সব খাতে অর্থব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে সেখানেও অবহেলা প্রদর্শন করে। জাকাত দিতে গড়িমসি করে। ওয়াজিব দান-খয়রাতে পিছিয়ে থাকে। এমনকি স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণও ঠিকভাবে দেয় না। কৃপণতার এক কুফল তো এই। দ্বিতীয় কুফল যে- কোনও উপায়ে অর্থোপার্জনের স্পৃহা। বখীল ব্যক্তির বিত্তবাসনা অশেষ। হালাল-নির্বিচারে সকল পন্থায় সে পয়সা কামাতে চায়। টাকা আসছে তো আসতে দাও। কোন পথে আসছে তা দেখা বৃথা। আসাটাই আসল কথা। এমনকি বখীল যদি মৌলভীও হয় আর অবৈধ কোন উপায়েও তার হাতে টাকা আসে, তবে কোনও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সে তা হালাল বানানোর চেষ্টা করে আর এভাবে তা পকেটে ঢোকায়। একটুও তর সয় না পাছে তা অন্য কারও হাতে চলে যায়।

কৃপণতা দোধারী তরবারি

বখীলী হল দোধারী তরবারি। এর ফলে একদিকে ওয়াজিব হকসমূহ আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় অন্যদিকে এটা নানা রকম গুনাহে লিপ্ত হওয়ার উৎসাহ

যোগায়। এর কারণে মানুষ অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জনের ধান্ধা করে। এভাবে বখীলীর তরবারি দু'দিক থেকেই কাটে। হক আদায়ে নিরুৎসাহী করে এবং গুনাহ পাপকর্মে উৎসাহ দেয়। সুতরাং এটা এক কঠিন রোগ। এর চিকিৎসায় অবহেলার সুযোগ নেই। 'আনফাসে 'ঈসা'-গ্রন্থে এ বিষয়ে হযরত থানভী (রহঃ)-এর বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত হয়েছে যা অনুসরণ করলে এ রোগ থেকে সহজেই মুক্তিলাভ হতে পারে।

কিতাবুল-বুখালা

কৃপণতা সম্পর্কে কথা অনেক। বিস্তারিত বলতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক আল-জাহিজ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। নাম দিয়েছেন 'কিতাবুল-বুখালা'। দু'শ পৃষ্ঠার সে পুস্তকে তিনি বিভিন্ন বখীলের বৃত্তান্ত পেশ করেছেন এবং বখীল কত ধরনের হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য কী এবং তাদের কত আজব-আজব ঘটনা আছে তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বইখানি পড়লে জানা যায়, কৃপণ কত প্রকার, কোন কোন জায়গায় কৃপণতা করা হয়, কতভাবে করা হয়, এবং কৃপণতা কত রকমে মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। বইখানি ধ্রুপদি আরবী সাহিত্যের এক চমৎকার নিদর্শন।

ইমাম গাযালী (রহঃ)'ইহয়াউ উলূমিদ-দীন' গ্রন্থে কৃপণতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তবে মাওলানা মুহাম্মদ 'ঈসা সাহেব (রহঃ) 'আনফাসে 'ঈসা' গ্রন্থে হযরত থানভী (রহঃ)-এর যে বাণীসমূহ সন্নিবিষ্ট করেছেন, তা অতি সারগর্ভ ও পূর্ণাঙ্গ। এক পৃষ্ঠার মধ্যে এ রোগের মূল কারণ এর কুফল ও প্রতিকার সম্পর্কিত যাবতীয় কথা এসে গেছে।

জনৈক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহঃ)-এর কাছে চিঠি লিখেছিল, পয়সা খরচ করতে মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে।

উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন, তাতে যদি কারও কোনও ওয়াজিব হক খর্ব না হয়, তবে চিন্তার কিছু নেই।

আত্মশুদ্ধির জন্য নিজের দোষের কথা চিকিৎসককে জানাতে হবে

নিজের ইসলাহের জন্য আল্লাহর যেসব বান্দা কোন শায়খের শরণাপন্ন হয়, তারা শায়খকে নিজের আত্মিক দোষসমূহ একেকটি করে অবহিত করে

থাকে। কোন শায়খের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে আত্মার চিকিৎসা করানো। তাই আত্মিক অবস্থা তাকে জানাতে হয়, যাতে তিনি বাস্তব রোগসমূহ নিরূপন করতে ও তার উপযুক্ত দাওয়াই দিতে সক্ষম হন। তাকে জানানো না হলে তো নিজের থেকে কিছু বুঝতে পারবেন না। কেননা শায়খের তো গায়বী ইলম নেই যে, মুরীদের যাবতীয় অবস্থা অদৃশ্যভাবেই জেনে ফেলবেন।

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে আত্মশুদ্ধির ফিকির দিয়েছেন, নিজেকে শোধরানোর গরজ যাদের আছে, এমনিতেই তাদের দৃষ্টি নিজ দোষ-ত্রুটির দিকে যায়। নিজেকে শোধরানের ফিকির না থাকলে ঔদাসিন্যের মধ্যেই জীবন কাটে, নিজের ভেতর কী ঘটছে, জীবন কোন পথে চলছে, সঠিক পথে, না ভুল পথে, মনের ভেতর যেসব চিন্তা-ভাবনা জাগে তা ঠিক না ভুল, নিজ আখলাক চরিত্রের অবস্থাই বা কী ? এসবে তার কিছু যায় আসে না। কোনও কিছুরই তোয়াক্কা তার নেই। ব্যস এভাবেই সে কবরে চলে যায়, পক্ষান্তরে যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ফিকির দান করেন তার ভেতর এক ধরনের খটকা দেখা দেয়।

অন্তরে খটকা দেখা দেওয়া

আমাদের হযরত 'আরেফী (রহঃ) বলতেন, তাকওয়া মানে খটকা। অর্থাৎ অন্তরে এই দ্বিধা-সংশয় জন্ম নেওয়া যে, আমি যে সব কাজ করছি তা সঠিক করছি, না ভুল ? আমার মনে যে সব চিন্তা-ভাবনা জাগে তা উচিত, না অনুচিত ? এই খটকাই সাফল্যের চাবিকাটি। অন্তরে যখন কোনও বিষয়ে খটকা দেখা দেবে আর সে সম্পর্কে শায়খকে জিজ্ঞেস করবে, তখনই শায়খ ব্যবস্থা দান করবেন। ফলে তার সংশোধন সহজ হবে।

তো ওই ব্যক্তির অন্তরে খটকা জাগল যে, টাকা-পয়সা খরচ করতে এত কষ্ট লাগে কেন ? এটা কোন আত্মিক রোগ নয় তো ? বখীলী নয় তো ? তাই যদি হয় তবে তো সংশোধন দরকার। এ চিন্তাতেই শায়খের কাছে চিঠি লিখেছেন।

খরচে কষ্টবোধ হওয়া গুনাহ নয়

উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, যদি কোন ওয়াজিব হক আদায়ে অবহেলা না হয়, তবে চিন্তার কিছু নেই'।

অর্থাৎ টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায় যে কষ্ট ও দুঃখ বোধ হয়, এমনিতে তা কোন গুনাহ নয়। কেননা এটা অনিচ্ছাকৃত বিষয়। এতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনও ভূমিকা নেই। যে জিনিস মানুষের ইচ্ছাশক্তির অতীত, তার কারণে আল্লাহ তা'আলা কাউকে শাস্তি দেন না। হাঁ এ কষ্ট ও দুঃখ যদি কোন ওয়াজিব হক আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে, কর্তব্যপালনে প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই কর্তব্যপালন না হওয়ার কারণে অবশ্যই গুনাহ হবে। কেননা কর্তব্যপালনের বিষয়টা মানুষের ইচ্ছাধীন। চাইলেই তা করতে পারে। যেমন যাকাত ও সদাকায়ে ফিতর আদায় করা। স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ দেওয়া, শ্রমিকের বেতন দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো যথাক্রমে আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের হক। এ হক আদায় করা অবশ্যকর্তব্য এবং তা আদায় করা মানুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন। এখন কেউ যদি অর্থব্যয়ে মনে কষ্ট লাগার কারণে এসব হক আদায় না করে বা যথাযথ পরিমাণে আদায় না করে, তবে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

বিষয়-সম্পত্তির আসক্তি গুনাহ নয়

'ওয়াজিব হক' অনাদায়ের একটা দিক পাপকর্মে লিপ্ত হওয়াও, যেমন অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করা। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল মনে কষ্ট ও কুণ্ঠাবোধ হওয়ার দ্বারা কোনও গুনাহ হবে না। এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) উত্তরে বলেন, যদি কোনও ওয়াজিব হক অনাদায় না থাকে, তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই।

কার্পণ্যের মূল অর্থ বিষয়াসক্তি। অর্থের মোহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের অন্তরে সম্পদের আসক্তি গচ্ছিত রাখা হয়েছে। যেমন ইরশাদ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

'মানুষের জন্য ওই সকল বস্তুর আসক্তিকে মনোরম করা হয়েছে, যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা মোতাবেক হয় অর্থাৎ নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, চতুষ্পদ জন্তু ও খেত-খামার।'[১৯৩]

১৯৩. আলে-ইমরান : ১৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاُحۡضِرَتِ الۡاَنۡفُسُ الشُّحَّ ؕ

'মানুষের অন্তরে (কিছু না কিছু) কৃপণতার প্রবণতা তো নিহিত রাখাই হয়েছে।'[১৯৪]

সুতরাং কৃপণতার প্রবণতা কোন গুনাহ নয় এবং এর জন্য কোন জবাবদিহিতাও করতে হবে না। হাঁ মানুষ যখন সেই আসক্তিকে গুনাহের কাজে ব্যবহার করে কিংবা সেই আসক্তির কারণে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা হয়ে যায় তখন সেই অবহেলার কারণে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কেননা কর্তব্য পালনে অবহেলা করে সে গুনাহগার হয়ে গেছে।

হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর দু'আ

আমি আমার মহান পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি, হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর আমলে যখন ইরান অধিকৃত হয় এবং কিসরার রাজপ্রাসাদ মুসলিমদের করতলগত হয়, তখন মসজিদে নববীতে সোনার এত বড় স্তূপ হয়ে যায় যে, হযরত উমর ফারুক (রাযি.) স্তূপের আড়ালে পড়ে যান। স্তূপের এক পাশে দাঁড়ালে অন্যপাশ থেকে তাঁকে দেখা যেত না। এ অবস্থা দেখে তিনি দু'আ করছিলেন, হে আল্লাহ! আমরা একথা বলি না যে, এই অর্থ-সম্পদের প্রতি আমাদের কোন আসক্তি নেই এবং সে আসক্তি নির্মূল হয়ে যাক, এ দু'আও করছি না। আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যাতে সম্পদের আসক্তি আমাদের দীনদারীর পক্ষে ক্ষতিকর না হয়।

লক্ষ করার বিষয় হল, তিনি অর্থ-সম্পদের আসক্তি দূর করে দেওয়ার জন্য দু'আ করেন নি, কেননা অর্থ-সম্পদ আল্লাহর দান। একে فَضۡلُ اللّٰهِ আল্লাহর অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদে একে خَيْرٌ 'কল্যাণ'-ও বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে-

جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمۡ قِيٰمًا

অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন।'[১৯৫]

---

১৯৪. নিসা : ২৮

১৯৫. নিসা : ৫

কাজেই অর্থ-সম্পদকে ঘৃণা করা কাম্য নয়। বরং এমনিতে সম্পদ তো কাজেরই জিনিস। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পদকেই মানুষের জীবন-রক্ষার অবলম্বন বানিয়েছেন। তাই আমরা না এর প্রতি ঘৃণা কামনা করি, না এর আসক্তি বিলোপের দু'আ করি। তবে হাঁ ইয়া আল্লাহ ! আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা জানাই যেন অর্থ-সম্পদ আমাদের ফিতনার কারণ না হয়। এর কারণে যেন পাপাচারে লিপ্ত না হই। এর দ্বারা যেন আমাদের দীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সম্পদের যে আসক্তি গুনাহ

বোঝা গেল অর্থ-সম্পদের স্বভাবগত ভালোবাসা গুনাহ ও ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর হল ভালোবাসার বাড়াবাড়ি, যা সঠিক খাতে এর ব্যয়কে ব্যাহত করে। অর্থাৎ যে বিষয়াসক্তির কারণে মানুষ কার্পণ্য করে সেটাই হারাম। কৃপণতা একটি ব্যাধি। এর চিকিৎসা অবশ্যকর্তব্য।

হযরত থানভী (রহঃ) পত্রলেখককে সান্তনা দিয়েছেন যে, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা না হলে, চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবে মনে রাখতে হবে, একই ব্যবস্থা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। চিকিৎসক প্রত্যেক রোগীর অবস্থানুপাতে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। হযরত থানভী (রহঃ)ওই লোককে যখন দেখলেন মধ্যপন্থার ভেতরেই আছে, তার রোগ সীমা ছাড়িয়ে যায়নি, তাই সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

বিষয়াসক্তি বিপদসংকেত বটে

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, অর্থ-সম্পদের মহব্বত ও অর্থব্যয়ে কষ্টবোধ এমনিতে নিন্দনীয় ও গুনাহ না হলেও অশুভ পরিণামের বিপদসংকেত বটে। এ অবস্থা বিরাজ করতে থাকলে এক পর্যায়ে সীমালংঘন করে 'কার্পণ্য'-এর সীমায় পৌছে যেতে পারে এবং যে কোনও সময়ে দায়িত-কর্তব্য পালনের পক্ষে বাধা হতে দাঁড়াতে পারে। কাজেই কখনও অর্থব্যয়ে কুণ্ঠা ও কষ্টবোধ হলে তাকে বিপদের সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখতে হবে। যাতে বিপদে পতিত হতে না হয় তাই শুরুতেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যবস্থা হল স্বভাবগত আসক্তিকে তীব্র হতে না দিয়ে বরং খানিকটা নিস্তেজ করে দেওয়া, যাতে আসক্তি বিপদসীমা হতে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং কখনও সীমা অতিক্রম করার আশংকা থাকে।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, সম্পদের ভালোবাসা কমাতে থাক। কমাতে কমাতে এ পর্যায়ে নিয়ে আস, যাতে অর্থব্যয়ে আর কষ্টবোধ না হয়, কিংবা কষ্ট লাগলেও তা এত সামান্য হবে, যা কষ্ট না লাগার মতই। নিয়মিত অনুশীলন করতে থাকলে এক সময় এ গুণ অর্জিত হয়ে যাবে।

ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা

ইমাম যুহরী (রহঃ) হাদীছ শাস্ত্রের একজন মহাপন্ডিত। ইমাম মা'মার ইবন রাশেদ (রহঃ) তাঁর একজন বিখ্যাত ছাত্র। তিনি ইমাম যুহরী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন,

مَارَأَيْتُ اَحَدًا الدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَهٗ مِمَّا كَانَتْ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ كَانَتْ اَهَمَّ عِنْدَهٗ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ

আমি ইমাম যুহরী (রহঃ)-এর কাছে দুনিয়া যত তুচ্ছ ছিল এমনটা আর কারও কাছে দেখিনি। দুনিয়া এমনই তুচ্ছ তাঁর কাছে ছিল যে, তাঁর কাছে দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ছিল উটের লেদাতুল্য।[১৯৬]

অর্থাৎ তাঁর কাছে টাকা-পয়সার কোন মূল্যই ছিল না। বরং গবাদি পশুর মলের মত তুচ্ছ মনে করতেন, যে কারণে তার দিকে ভ্রুক্ষেপই করতেন না। ভালোবাসার তো প্রশ্নই আসে না।

মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মাদ ঝানঝানভী (রহঃ) ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)-এর শায়খ। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বাজারে গিয়ে কোন কিছু কিনলে নিজ হাতে টাকা গুণে দিতেন না। বরং টাকার থলিটি বিক্রেতার হাতে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন এর থেকে তুমি তোমার মালের দাম নিয়ে নাও। তিনি চিন্তা করতেন, থলির ভেতর থেকে টাকা বের করে গুণতে যে সময় খরচ হবে ততক্ষণ বরং যিকর করলেই লাভ বেশি। এটা ছিল তার নিয়মিত অভ্যাস। একদিন চোর বিষয়টা লক্ষ করল। সে দেখল হযরত মিয়াজী (রহঃ)-এর কাছে টাকার থলি আছে। সে তার পিছু নিল। এবং এক ফাঁকে সে থলিটি নিয়ে পালাল। মিয়াঁজী (রহঃ) তাকে ধরার চেষ্টা করলেন না। এমনকি পিছনে ঘুরেও দেখলেন না কে থলিটি নিয়ে গেল। সে চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি আপন পথে চলে গেলেন।

---

১৯৬. তারছুত-তাশরীব, ১খ, ২৩৮

ওদিকে থলি নিয়ে চোর পড়ল মহামসিবতে। সে বাজার থেকে বের হতে চাচ্ছিল কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কখনও এ গলিতে যায়, কখনও ওই গলিতে। ঘুরতে ঘুরতে আবার আগের রাস্তায় ফিরে আসে। সে এক দুর্ভেদ্য গোলক ধাঁধা। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গেল। শেষে তার মনে হল, এটা হয়ত আল্লাহর ওলীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম। তার টাকা চুরি করার কারণেই এই ফ্যাসাদ দেখা দিয়েছে। অগত্যা সে মিয়াঁজী (রহঃ)-এর বাড়ির পথ ধরল। এবার বের হওয়ার পথ পেয়ে গেল। সোজা তার বাড়ির দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। দরজায় করাঘাত করলে ভেতর থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে ? চোর বলল, এই আপনার থলি নিয়ে নিন। তিনি বললেন, ওটা আমি নেবনা। চোর বলল, অবশ্যই নিন। তিনি বললেন, না, ওটা যখন তুমি নিয়েছিলে তখনই আমি তোমাকে দান করে দিয়েছি। এখন আর আমি ওটার মালিক নই। চোর বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ে নিন। তিনি বললেন, না আমি নিতে পারি না। ওতে আমার কোন হক নেই। নিরুপায় হয়ে চোর বলল, হযরত ! আমি তো বাড়ি যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তাহলে দু'আ করে দিন যেন রাস্তা পেয়ে যাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে চলে যাও। আমি দু'আ করছি। অবশেষে সে থলিটি নিয়ে চলে গেল।

তো আল্লাহর এমন বান্দাও আছে, যাদের অন্তর থেকে অর্থ-সম্পদের আসক্তি সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে। সে রকম অবস্থা অর্জন করতে পারলে তো ভালো। অন্যথায় সম্পদের ভালোবাসাকে অন্ততপক্ষে এপরিমাণ কমিয়ে আনা চাই, যাতে তা বিপদসীমা হতে অনেক দূরে থাকে। এ কারণেই ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেছেন, মালের মহব্বত থেকে একটু পিছিয়ে থাক। এ সম্পর্কে তিনি দু'টি কথা বলেছেন।

সম্পদের আসক্তিকে মন্দজ্ঞান করা ও দু'আ করা

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, কখনও যদি দেখ টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গেলে মনে কষ্টবোধ হচ্ছে, তখন মনের এ অবস্থাকে মন্দজ্ঞান করবে। চিন্তা করবে যে, এটা ভালো গুণ নয়। দ্বিতীয় কাজ হল আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা। বলবে, হে আল্লাহ ! বিষয়াসক্তির সাপ আমাকে দংশন করে না বসে। কখনও যেন আমার জন্য এটা মসিবতে পরিণত না হয়। হে আল্লাহ ! আমার অর্থ-সম্পদের ভালোবাসা মাঝামাঝি পর্যায়েই যেন থাকে। সীমার মধ্যেই যেন থাকে। কিছুতেই যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে না যায়। এভাবে দু'আ করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ ! এ আসক্তি ক্ষতির কারণ হবে না। অবশ্য হযরত থানভী (রহঃ) পত্রলেখককে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে দিয়েছেন

যে, মনের এ কুণ্ঠাও দূষণীয় ও নাজায়েয নয়। তিনি এজন্য তাকে সতর্ক করার প্রয়োজন মনে করেননি। বস্তুত এটা সেই ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। এটাকে সাধারণ নিয়ম বানানো চলবে না। হযরত থানভী (রহঃ) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতেন যে, এই ব্যক্তি অর্থ প্রেমে অগ্রগামী হওয়ার নয়। অন্য কেউ হলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন না ; বরং সতর্ক করে দিতেন যে, টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ার কারণে মনে কষ্ট লাগা কোনও ভালো গুণ নয়। এটা বিপজ্জনক। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। বস্তুত শায়খ তাঁর অভিজ্ঞতা ও সাধনালব্ধ জ্ঞান দ্বারা বুঝে ফেলেন কার জন্য কোন ব্যবস্থা প্রযোজ্য। সে হিসেবেই তিনি পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অর্থপ্রেম নয়, মিতাচারপ্রিয়তা

অন্য একজন চিঠি লিখেছিল, অর্থব্যয় করতে মোটামোটি কষ্টই বোধ হয়। অভাবে পড়ে যাওয়া বা দেনাদার হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। যদিও দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ত্রুটি করা হয় না।

এর উত্তরে হযরত থানভী (রহঃ) লেখেন, এটা বিষয়াসক্তি নয়, বরং ঔচিত্যপ্রিয়তা।'[১৯৭]

চিঠির সারমর্ম ছিল, টাকা-পয়সা খরচ করতে কষ্ট লাগে। ভয় হয় অভাবে পড়ে যাই কি না কিংবা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি কি না। তবে সে ভয় সত্ত্বেও যেখানে যা খরচ করা দায়িত্ব তা করতে অবহেলা করি না।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর উত্তরের সারমর্ম হল, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যখন ত্রুটি করা হয় না, তখন টাকা-পয়সা দ্বারা যা উদ্দেশ্য তা তো পূরণ হচ্ছে। যে বিষয়াসক্তি নিন্দনীয় এবং যা একটা আত্মিক রোগ ও গুনাহ তার মধ্যে এটা পড়ে না। কাজেই এটা দূষণীয় নয়। অবশ্য তারপরও সতর্ক থাকা দরকার। কেননা ক্রমে এ আসক্তিই মোহে পরিণত হয়ে মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারে। তা যাতে করতে না পারে সেজন্য দরকার এ ভালোবাসাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন-আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস : ৫ম খণ্ড, ৭৪-৮৪ পৃষ্ঠা

---

১৯৭. আনফাসে 'ঈসা : ১৯০

কৃপণতার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

যে সকল আত্মিক রোগ মানুষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, কৃপণতাও তার একটি। গত দিনের আলোচনায় এর কিছুটা ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছিল। এ প্রসংগে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন,

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ . . . فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহরই জন্য দান-নিবৃত্ত থাকে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করল।'[১৯৮]

এ হাদীছে দান করা ও না করা উভয়কে 'আল্লাহ তা'আলার জন্য'- এই শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় বদান্যতা নি:শর্তভাবে প্রশংসনীয় নয় এবং কৃপণতাও নিঃশর্তভাবে নিন্দনীয় নয়। বরং আল্লাহর জন্য হলে উভয়টাই প্রশংসনীয় আর আল্লাহর জন্য না হলে উভয়টাই নিন্দনীয়। মোটকথা, আখলাক-চরিত্র সবই স্বভাবগত বিষয়। স্বভাবগত হওয়ার স্তরে কোনও চরিত্রই প্রশংসনীয়ও নয়, নিন্দনীয়ও নয়। বরং এর প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় হওয়াটা নির্ভর করে প্রয়োগক্ষেত্রের উপর।'[১৯৯]

কৃপণতা নিঃশর্তভাবে নিন্দনীয় নয়

বুখল (কৃপণতা)-এর অর্থ অর্থব্যয় হতে বিরত থাকা। এর বিপরীত শব্দ হল সাখাওয়াত (বদান্যতা)। সাখাওয়াত অর্থ মুক্তমনে টাকা-পয়সা খরচ

---

১৯৮. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৪৫; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪০৬১; আহমাদ, হাদীছ নং ১৫০৬৪

১৯৯. আনফাসে 'ঈসা : ১৯০

করা, খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ না করা। সাধারণভাবে মনে করা হয়, বুখল সর্বাবস্থায় মন্দ আর সাখাওয়াত সর্বাবস্থায় ভালো। হযরত থানভী (রহঃ) এ বাণীতে স্পষ্ট করে দেন যে, এ দৃষ্টিভংগী সঠিক নয়। দান-খয়রাত হতে বিরত থাকাও সর্বাবস্থায় মন্দ নয় এবং দু'হাতে খরচ করাও সর্বাবস্থায় ভালো কাজ নয়। বরং কখনও-কখনও খরচ না করাও ভালো, প্রশংসনীয় ও ছওয়াবের কাজ হয়ে থাকে এবং কখনও খরচ করা হয়ে যায় মন্দ ও গুনাহের কাজ, অন্ততপক্ষে নিন্দনীয় কাজ।

অর্থব্যয় হবে কেবলই আল্লাহর জন্য

হযরত থানভী (রহঃ) একথার প্রমাণস্বরূপ একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলনীতি বর্ণনা করেন যে,

مَنْ أَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ ... فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দেয় এবং আল্লাহরই জন্য দান করা হতে বিরত থাকে। সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করে ফেলল।'[২০০]

এ হাদীছে আরও কিছু কথা আছে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক কেবল এতটুকুর সাথে।

হাদীছটির মর্মকথা হল দেওয়া ও না দেওয়া দুইই হতে হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য। দেওয়া অর্থ খরচ করা, তা গরীব-মিসকীনকে দান করা হোক, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা হোক, যাকাত দেওয়া হোক, স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করা ও তাদের খানাপিনা-পোশাকাদির ব্যবস্থা করা হোক কিংবা নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা হোক সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব অর্থব্যয়ে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করাই উদ্দেশ্য হবে। কোনও ফকীরকে টাকা দেওয়ার সময় লক্ষবস্তু থাকবে একটাই – আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ; মানুষকে দেখানো নয়। স্ত্রী ও সন্তানদের পেছনে ব্যয় করবে, তখনও চিন্তা করবে এদের বিভিন্ন হক আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ন্যস্ত রেখেছেন। সে সব হক আদায় করা আমার দায়িত্ব। আমি সেই দায়িত্ব পালনার্থেই এই টাকা খরচ করছি। এভাবে খরচ করলে তা আল্লাহ তা'আলার জন্য দেওয়া' এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

২০০. তিরমিযী, হাদীছ নং, ২৪৪৫; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪০৬১

নিজ প্রয়োজনে খরচও আল্লাহর জন্য করা

এমনিভাবে নিজ প্রয়োজনে টাকা-পয়সা খরচ করলে তাও আল্লাহর জন্য হতে পারে। যেমন খাওয়ার সময় নিয়ত করবে, আমার এ জীবন আল্লাহ তা'আলার দান। এটা আমার কাছে আল্লাহর আমানত। আমার উপর এরও হক আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

'নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার নিজ সত্তারও হক আছে।'[২০১]

কাজেই আমি যদি পানাহার না করি এবং ক্ষুধায় মারা যাই তবে তা হবে আত্মহত্যা ও অবৈধ মৃত্যু। আমার কর্তব্য তা হতে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ প্রদত্ত এ আমানতকে রক্ষা করা। আমি সেই আমানত রক্ষা, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই পানাহার করছি। এর ফলে পানাহার করাটাও 'আল্লাহর জন্য দান' হয়ে যাবে।

বাজার থেকে মালামাল কেনাও আল্লাহর জন্য দান

কেউ বাজার থেকে মাল কিনলে বাহ্যত তা নিজ প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কেনা হয়। কিন্তু তা যেহেতু নিজ প্রাণরক্ষা ও নিজ সত্তার হক আদায়ার্থে কেনা হয় অথবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির জন্য কেনা হয় কিংবা উদ্দেশ্য থাকে কোন অভাবগ্রস্তকে দেওয়া, এ তিনটি কারণের যে কোনও কারণেই তা কেনা হোক নিয়ত সহীহ থাকলে এ খরচও আল্লাহ তা'আলার জন্যই করা হয়েছে বলে স্বীকৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমনই এক দীন দিয়েছেন যার অনুসরণ দ্বারা নিজ স্বার্থও হাসিল হয় আবার সওয়াবও পাওয়া যায়। কাজ করা হয় নিজের বা বিবি-বাচ্চাদের প্রয়োজন সমাধার জন্য, অথচ হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলার জন্য- দরকার একটু দৃষ্টিকোণ বদলের। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত থাকলে এসব কাজও আল্লাহ তা'আলার জন্য দেওয়া'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়াও আল্লাহরই জন্য দেওয়া

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন,

---

২০১. তিরমিযী , হাদীছ নং ২৩৩৭ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ১১৬২ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৫১০৪

حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

'এমন কি তুমি নিজ স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও, তাও সদাকা হিসেবে গণ্য।'[২০২]

আমাদের এ দীন মাটিকে সোনায় পরিণত করে। চিন্তা করে দেখুন খানা খাওয়া হয় নিজ জীবন রক্ষার্থে, স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়া হয় মনের সুখের জন্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি এটা আমারই জন্য করেছ। কাজেই তোমার আমলনামায় লিখে দিচ্ছি যে, তুমি আমারই জন্য খাবার খেয়েছ। আমারই জন্য স্ত্রীকে খাইয়েছ। তোমার এসব কাজকে সওয়াবের কাজ হিসেবেই তালিকাভুক্ত করছি। আখিরাতে যখন পুণ্যের হিসাব করা হবে, তখন এ পানাহারও তোমার পুন্যের একাউন্টে দেখতে পাবে।

অর্থব্যয় না করাও আল্লাহর জন্য

হাদীছটির দ্বিতীয় বাক্য হল وَمَنَعَ لِلّٰهِ; এবং দেওয়া হতে বিরতও থাকে আল্লাহর জন্য'। অর্থাৎ কোথাও অর্থব্যয়ের অবকাশ দেখা দিল, কিন্তু সেখানে অর্থব্যয় করা হল না। তা করা হল না আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে। তিনি নারাজ হবেন সেই ভয়ে। উদাহরণত প্রকাশ্যে জনসম্মুখে চাঁদা তোলা হচ্ছে। প্রত্যেকেই অগ্রগামী হয়ে তা দিচ্ছে। কিন্তু আপনার মন দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু সকলেই দিচ্ছে বলে ভাবছেন আমি না দিলে তো নাক কাটা যাবে। সমাজে দুর্নাম হবে এবং সকলে কঞ্জুস বলবে। এই চিন্তা করে চাঁদা দেবেন বলেই মনস্থির করলেন এবং পকেট থেকে টাকা বেরও করলেন, কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল এখন চাঁদা দিলে তো মানুষকে দেখানোর জন্য দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলার জন্য দেওয়া হবে না। অথচ- এভাবে চাঁদা দেওয়া জায়েয নয়। দিলে তাতে কোন সওয়াব পাওয়া যায় না। শেষে আপনি বের করা টাকা ফের পকেটে ঢোকালেন। এই যে দেওয়া হতে বিরত থাকলেন এটা وَمَنَعَ لِلّٰهِ; এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এই না দেওয়াটা আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়েছে। আপনি চিন্তা করেছেন লোকে কঞ্জুস বলে বলুক, এভাবে দেওয়া যেহেতু জায়েয নয়, তাই আমি দেব না। শেষ পর্যন্ত আপনি দিলেনই না। কাজেই আপনার এ কাজ আল্লাহর জন্যই কৃত বলে গণ্য হবে।

---

২০২. বুখারী, হাদীছ নং, ৪৯৩৫; তিরমিযী, হাদীছ নং, ২০৪২ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৪৮০ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৩৯৯

বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপহারাদি দেওয়া

আজকাল বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে উপহার-সামগ্রি দেওয়ার রেওয়াজ পড়ে গেছে। কে কি দিল, কতটাকার জিনিস দিল বা কতটাকা দিল তা যথারীতি লিখে রাখা হয়, পরে এ নিয়ে আলোচনা হয়। একজন যা দেয় অপরজন চিন্তা করে আমার উচিত তার বেশিই দেওয়া অন্ততপক্ষে সমান-সমান তো বটেই। কুরআন মাজীদে এ জাতীয় দানকে হারাম বলা হয়েছে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কিছুতেই দেবে না। হাঁ, যদি এই চিন্তা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়ার আগ্রহ জাগে যে, সে আমার ভাই, তার ঘরে আজ আনন্দ, তার আনন্দে আমিও কেন শরীক হই না, তবে সন্দেহ নেই এটা ভালো জযবা। এ হিসেবে হাদিয়া তোহফা দিতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মনের থেকে যদি দেওয়ার ইচ্ছা না থাকে হয়ত টাকা-পয়সার অভাব আছে অথবা যাকে দেওয়া হবে তার সাথে বিশেষ সম্পর্কও নেই, কিন্তু সে আপনার কোন অনুষ্ঠানে উপহার দিয়েছিল বলে আপনাকেও তার বদলা দিতে হচ্ছে অথবা না দিলে সমাজে বদনাম হবে, লোকে কঞ্জুস বলবে, আর সে কারণে দিয়ে দেন,তবে এ দেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়।

বিয়েশাদি বা অন্যান্য আনন্দনুষ্ঠানে অনেকেই এ কাজ করে থাকে। পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। তা সত্ত্বেও বদনাম হবে বা লোকে কৃপণ বলবে সেই ভয়ে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে দেয়। এটা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। পক্ষান্তরে কে কৃপণ বলবে, কে অসামাজিক বলবে, কে বখীল বলবে তা কোনও তোয়াক্কা না করে, চিন্তা থাকে কেবল আল্লাহ তা'আলাকে রাজি করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আর এ কারণে সেই হারাম দান থেকে বিরত থাকে তবে এই বিরত থাকাটাও আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি জানা থাকে, অমুক ব্যক্তিকে টাকা দিলে সে তা অবৈধ কাজে ব্যবহার করবে, কাজেই তাকে টাকা-পয়সা দেওয়া জায়েয হবে না আর সে কারণে তাকে না দেয়, তবে এই না দেওয়াটাও আল্লাহর জন্যই হবে এবং এর কারণে সওয়াব পাওয়া যাবে।

অন্যকে দান বৈধ পন্থায় হওয়া চাই

এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) বলছেন, সর্বাবস্থায় দান করাও ভালো নয় এবং দান না করাও সর্বাবস্থায় মন্দ নয়। বিষয়টা নির্ভর করে নিয়ত ও অবস্থার উপর। কখনও কখনও দান করাও দূষণীয় হয়ে যায়, যেমন উপরে

চাঁদার উদাহরণ দ্বারা বোঝা গেল। আবার কখনও দান না করাতেই সওয়াব হয়। দান বৈধ পন্থায় হচ্ছে কি না এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে হচ্ছে কি না সেটাই বিবেচ্য। বৈধপন্থায় হওয়ার অর্থ শরী'আত নির্দেশিত পন্থায় হওয়া। যে খাত শরীআত সম্মত নয়, সেখানে দান করা বৃথা। সেই সংগে দান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে হওয়াও শর্ত। এদুটি শর্ত রক্ষা করে যে দান–খয়রাত হবে কেবল তাতেই সওয়াব পাওয়া যাবে। এমনিভাবে এ দু'টি শর্তের সাথে যদি দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকা হয়, তাও সওয়াবের কারণ হবে।

সম্পদের স্বভাবগত আসক্তি

হাদীছে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি এ দু'টি কাজ করবে অর্থাৎ দেবে তো আল্লাহরই জন্য দেবে আর না দেবে তো তাও আল্লাহরই জন্য, সে নিজ ঈমান পরিপূর্ণ করে ফেলল। ঈমানের পরিপূর্ণতাবিধান করার কী চমৎকার ব্যবস্থা এবং আর তার জন্য কত বড় সুসংবাদ।

এ হাদীছ দ্বারা জানা গেল দানশীলতা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় নয় এবং কৃপণতাও সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। আল্লাহ তা'আলার জন্য হলে দু'টোই ভালো ও প্রশংসনীয় আর আল্লাহ তা'আলার জন্য না হলে উভয়টি মন্দ ও নিন্দনীয়। মোটকথা চরিত্রের প্রতিটি দিকই স্বভাবগত। আর স্বভাবগত হওয়ার স্তরে কোনও গুণই ভালো বা মন্দ নয়, যেমন গতকাল আরয করা হয়েছিল যে, সম্পদের প্রতি আসক্তি বা টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়ায় কষ্টবোধ একটা স্বভাবগত ব্যাপার। তাই তা দূষনীয় নয় মাল তো বলাই হয় مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ 'স্বভাব যার প্রতি আকৃষ্ট হয়' এমন বস্তুকে। কাজেই মাল ও সম্পদের আসক্তি একটা স্বভাবগত বিষয়। এতে কোন পাপ নেই।

বিষয়াসক্তির সঠিক ব্যবহার ও ভুল ব্যবহার

ব্যবহারটাই আসল কথা। দেখতে হবে মালের মহব্বতকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করা হচ্ছে, না ভুল পন্থায়। বৈধ ও সঠিক পন্থায় ব্যবহার করলে সে মহব্বতে কোন দোষ নেই। যেমন সম্পদের ভালোবাসায় আপনি তার উপার্জনে লিপ্ত হলেন বৈধ পন্থায় এবং শরী'আতসম্মত উপায়ে কত বেশি অর্জন করা যায় সেই চেষ্টা করলেন। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি পন্থাসমূহ সম্পদের আসক্তিতে অবলম্বন করলেন এবং তাতে শরঈ রীতি নীতি মেনে চললেন। তো সম্পদের আসক্তিকে যেহেতু

বৈধ ও হালাল কাজে ব্যবহার করলেন তাই এ আসক্তি আপনার জন্য দূষণীয় নয় এবং এটা আপনার পক্ষে কোন ক্ষতির কারণ নয়। পক্ষান্তরে সম্পদের আসক্তিকে যদি অবৈধ কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন অবৈধ উপায়ে রোজগার করা, অর্জিত সম্পদকে ফরজ ও ওয়াজিব দায়িত্বপালনে খরচ না করা ইত্যাদি, তবে এ আসক্তি অবশ্যই নাজায়েয ও ক্ষতিকর। অর্থাৎ মূল আসক্তি প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় কিছুই নয় ; তা প্রশংসনীয় নিন্দনীয় হয় ব্যবহারের শুদ্ধাশুদ্ধের কারণে।

তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর কথাটি মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ আসক্তি যদিও মন্দ নয় ; কিন্তু পরিণামে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে, যাতে বৈধাবৈধের সীমানা হতে অনেক দূরে থাকে। সীমানা বরাবর থাকলে পরবর্তী ধাপে তা গুনাহে নিপতিত করতে পারে। তা যাতে করতে না পারে সেজন্য আগেভাগেই রশি টেনে ধরতে হবে।

অন্যের জিনিস ব্যবহার কখন জায়েয ?

অপর এক বাণীতে হযরত থানভী (রহঃ) বলেন,

মন যদি সাক্ষ্য দেয়, অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া খেলে সে অখুশী হবে না ; বরং খুশিই হবে, তবে অনুমতি ছাড়াও খাওয়া জায়েয হবে। বরং কেড়ে খাওয়াও জায়েয যদি সে বন্ধু উদারপ্রাণ হয়, কৃপণ না হয়। কৃপণ ব্যক্তি প্রাণভরে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। যাও ভালোবাসে, তা তার টাকা-পয়সার সমান হয় না। তাই কৃপণদের অনুমতিও সন্দহমুক্ত নয়। হাঁ উদারপ্রাণ বন্ধুদের সাথে প্রাণখোলা সম্পর্ক থাকলে তাদের থেকে কেড়ে খাওয়াও জায়েয।'[২০৩] এ ব্যাপারে মূলনীতি তো এটাই যে, কারও জিনিস তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার জায়েয নয়।

হাদীছ শরীফে আছে,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ

'কোনও মুসলিম ব্যক্তির মাল তার আন্তরিক অনুমতি ছাড়া হালাল হয় না।'[২০৪]

---

২০৩. আনফাসে ঈসা : ১৯০

২০৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং ১৯৭৭৪

এ হাদীছ দ্বারা জানা গেল অন্যের মাল ব্যবহারের জন্য কেবল তার অনুমতিই যথেষ্ট নয় ; বরং তার মনের সন্তুষ্টিও শর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত খুশিমনে অনুমতি না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবহার জায়েয হবে না।

ক্ষেত্রবিশেষে কেড়ে নেওয়াও জায়েয

হাঁ অনেকের সাথে প্রাণখোলা সম্পর্ক থাকে। সাধারণত তাদের কোনও জিনিস বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করলে অখুশী তো নয়ই ; বরং খুশিই হয়। তো যাদের সম্পর্কে শতভাগ বিশ্বাস থাকে যে অখুশি হবে না তাদের পক্ষ থেকে সরাসরি মৌখিক অনুমতিও শর্ত নয় ; বরং তাদের কোন বস্তু কেড়ে নেওয়াও জায়েয। হয়ত এরূপ এক ব্যক্তি কোন মজার খাবার খাচ্ছে। আপনি তার উপর হামলে পড়ে তা নিয়ে খেয়ে ফেললেন। এ খাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা এভাবে ছিনতাই করায় সে আদৌ নাখোশ হবে না ; বরং আরও খুশি হবে এবং মনে শান্তি পাবে। এমনও হতে পারে যে কৃত্রিমভাবে সে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেটা তার ছল মাত্র। আসলে জোর করে নেওয়াতে সে খুশিই হবে। এরূপ অন্তরংগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লিখিত আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। বরং কাড়াকাড়ি করে খাওয়াও জায়েয হবে। তবে সে যে খুশি হবে সে ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত থাকা শর্ত। কেবল নিজের পক্ষ থেকে কল্পনা করে নিলাম সে খুশি হবে, অথচ বাস্তবে তা নাও হতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে কাড়াকাড়ি করা কিছুতেই জায়েয হবে না। বরং পূর্ব সম্পর্ক ও অতীত অভিজ্ঞতা দ্বারা বিষয়টা সুস্পষ্ট থাকতে হবে।

মশকে মুখ লাগিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানি পান করা

হাদীছ শরীফে আছে, মক্কা বিজয়ের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মু হানি' (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন। হযরত 'আলী (রাযি.)-এর আপন বোন। তিনি তার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এ সময় তিনি ঘরের একটি মশক থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছিলেন।[২০৫]

এ হাদীছ থেকে ফুকাহায়ে কিরাম অন্তত দু'ডজন মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন। এ উম্মতের উপর ফুকাহায়ে কিরামের অবদান অকল্পনীয়। তাদের কাছে যখন কোন হাদীছ পৌছত, তারা সেটি নিয়ে বসে পড়তেন, এবং গভীর

---

২০৫. বুখারী, হাদীছ নং ১১০৫ ; মুসলিম, হাদীছ নং ১১৮০ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ৪৩৬ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২৫৮৬৬

পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে সন্ধান করতেন তাতে উম্মতের দিক নির্দেশনার জন্য কি-কি বিধান প্রচ্ছন্ন আছে। সেই পন্থাতেই এ হাদীছ থেকেও তারা দিক নির্দেশনামূলক বহু বিধান খুঁজে বার করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, সে ঘরটি ছিল হযরত উম্মুহানি (রাযি.)-এর। মশকটিও ছিল তাঁরই। পানির ব্যাপারে নিয়ম হল, যখন তা কারও নিজ সংরক্ষণে না থাকে, বরং খাল-বিল, নদী-নালা বা বড় পুকুর ও দীঘিতে থাকে, তখন তাতে সকলেরই অবারিত অধিকার থাকে, যার যত ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন কেউ সে পানি নিজ ঘরে নিয়ে আসে বা কলস-মশক প্রভৃতি পাত্রে ভরে নেয়; তখন তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এখন সে তা যেমন নিজে ব্যবহার করতে পারে, তেমনি অন্যকে হাদিয়া দেওয়া, দান করা এমনকি বিক্রি করারও এখতিয়ার তার আছে। কাজেই এ পানি তার অনুমতি ছাড়া কেউ পান করতে বা নিয়ে যেতে পারবে না। করলে তার পক্ষে তা জায়েয হবে না।

এবার প্রশ্ন হল, হযরত উম্মুহানি (রাযি.)-এর ঘরে যে মশক ছিল, সেটি তো তাঁরই ছিল এবং পানিরও মালিক ছিলেন তিনিই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অনুমতি ছাড়াই তা পান করেছিলেন। এই পান করাটা তার জন্য জায়েয হল কিভাবে?

এর উত্তর হল, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি তার মৌখিক অনুমতি গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর জানা ছিল হযরত উম্মু হানি (রাযি.)-এর ঘর থেকে তার অনুমতি ছাড়া কোন জিনিস তিনি ব্যবহার করলে তাতে উম্মু হানি (রাযি.)-এর নাখোশ হওয়ার কোনও কল্পনাই করা যায় না; বরং তিনি যে কতটা খুশি হবেন তা আর সব লোকের কল্পনার বাইরে। আর এ কারণেই তাঁর অনুমতি ছাড়া পানি পান করা তাঁর পক্ষে জায়েয ছিল।

অন্যের ভাগাড়ে প্রস্রাব করা

হাদীছ শরীফে আছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গা পড়ল। তিনি সেখানে প্রস্রাব করলেন।[২০৬]

---

২০৬. বুখারী, হাদীছ নং ২১৭ ; মুসলিম, হাদীছ নং ৪০২ ; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৩ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ১৮ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২১ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ৩০১ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২২১৫৭

ফুকাহায়ে কিরাম এখানেও প্রশ্ন তুলেছেন যে, সে ভাগাড়টি তো অন্য এক গোত্রের ছিল। তাদের অনুমতি ছাড়া তিনি সেখানে প্রস্রাব করলেন কিভাবে? অতঃপর তাঁরা এর উত্তর দেন যে, সে জায়গাটি ছিল তাদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গা, যে কারণে তা ব্যবহারের সাধারণ অনুমতি ছিল। হাদীছে যে سُبَاطَةَ قَوْمٍ (কওমের ভাগাড়) বলে ভাগাড়কে কওমের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা মালিকানা বোঝানোর জন্য নয়; বরং কেবলই সম্পর্ক বোঝানোর জন্য যে, তারা এটা ময়লা-আবর্জনা ফেলার কাজে ব্যবহার করত। কেউ কেউ বলেছেন, যদিও জায়গাটি তাদের মালিকানাধীন ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন লোকও এমন ছিল না, যার কাছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সে জায়গাটির ব্যবহার অপসন্দ হবে। সে হিসেবে ব্যবহারিক অনুমতি ছিলই।

সালামের জবাবে তায়াম্মুম করা

আরেক বারের কথা। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু ..) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তি তাকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিতে চাইলেন। কিন্তু তখন তাঁর ওযূ ছিল না। কাছেই এক ব্যক্তির বাড়ির প্রাচীর ছিল। তিনি সেই প্রাচীরে তায়াম্মুম করলেন তারপর সালামের উত্তর দিলেন। সালামে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয়, তাই বিনা ওযূতে সালামের উত্তর দেওয়া তাঁর সমীচীন মনে হচ্ছিল না। এ কারণেই তায়াম্মুম করে নেন।'[২০৭]

যদিও তায়াম্মুম করা ওয়াজিব ছিল না, তবুও আল্লাহ তা'আলার নামের আদব রক্ষার্থে তিনি তায়াম্মুম করে নেন।

মনে রাখতে হবে, সালামের জন্য তায়াম্মুম করা হলে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাড়িটি তো অন্য কারও ছিল। তার অনুমতি ছাড়া তিনি তায়াম্মুমের জন্য সেটি ব্যবহার করলেন কিভাবে? ফুকাহায়ে কিরাম এর উত্তর দেন যে, তায়াম্মুমের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও ঘর-বাড়ির প্রাচীর ব্যবহার করবেন আর সেই ব্যক্তির কাছে তা অপ্রীতিকর বোধ হবে এমন কোন লোকের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। সুতরাং পরোক্ষ অনুমতি ছিলই। সে কারণেই তিনি দেওয়াল ব্যবহার করেছিলেন।

---

২০৭. বুখারী, হাদীছ নং, ৩২৫ ; মুসলিম, হাদীছ নং, ৫৫৪ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ৩০৯ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৭৮ ; আহমাদ, হাদীছ নং ১৬৮৮৩

শরীআতের দৃষ্টিতে অন্যের মাল ব্যবহার

এসব ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য মূলত একথা বোঝানো যে, অন্যের মালামাল ব্যবহারে ইসলামী শরীআত খুবই স্পর্শকাতর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে তিনি অনুমতি ছাড়া অন্যের মাল ব্যবহার কিভাবে করলেন ?

কিন্তু আমাদের অবস্থা বড় আজব। হালাল-হারামের কোন বিচার নেই। বিশেষত যারা পাশাপাশি থাকে, যাদের মধ্যে মেলামেশা বেশি তারা একে অন্যের জিনিস এভাবে ব্যবহার করে যেন জিনিসটি নিজেরই। অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ হাদীছের দৃষ্টিতে কেবল মৌখিক অনুমতিই যথেষ্ট নয়,মনের সন্তুষ্টিও শর্ত।

কৃপণের অনুমতিতে সন্দেহ থেকে যায়

হযরত থানভী (রহঃ) তো এ পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, কৃপণের অনুমতিতে সন্দেহ থেকে যায় যে, সে তা খুশিমনে দিয়েছে কিনা। আপনি যদি কোন কৃপণ ব্যক্তির কাছে তার কোন জিনিস ব্যবহারের অনুমতি চান, তবে সে অনুমতি দেবে বটে। কিন্তু তা দেওয়ার সময় তার কলিজা চিরে যাবে। সে অনুমতি দেবে কেবল এই ভেবে যে, না দিলে খারাপ দেখা যায়। তা কি যে করি, দিলেও মুশকিল না দিলেও মুশকিল, যাকে বলে উভয়সংকট। লোক লজ্জার ভয়ে অগত্যা অনুমতি দিয়েই দেয়। এ কারণেই বলা হয়েছে বখীলের অনুমতিতে সন্দেহ থেকে যায়। তার অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু খুশিমনে দেয় না।

বখীলের কাছ থেকে নিজের হক জোরপূর্বক নেওয়া

এখানে আরও একটা বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। কৃপণ ব্যক্তি চাপের মুখে অনুমতি দিলে তার সে অনুমতিকে দু'ভাগ করা যেতে পারে। হয়ত এমন কোন ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে, যা তার এমনিই দেওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ তা তার দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথবা সে বিষয়টি তার দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ; বরং কোনও ঐচ্ছিক বিষয় ছিল।

বিষয়টা যদি তার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সে নিজ কর্তব্য পালন না করে, ফলে আপনি তার থেকে তা চাপ দিয়ে আদায় করে নেন, তবে তা হালাল হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চিতভাবেই তা হালাল।

উদাহরণত কৃপণ লোকটি বিবাহিত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া তার দায়িত্ব। এটা স্বামীর উপর স্ত্রীর হক। কিন্তু কৃপণ হওয়ার কারণে লোকটি স্ত্রীর এ হক যথাযথভাবে আদায় করছে না। হয়ত দেয়ই না অথবা দিলেও তা প্রয়োজন অপেক্ষা কম, যা দ্বারা স্ত্রীর দিন চলে না। এ অবস্থায় স্ত্রী লোকসম্মুখে বিষয়টা তুলল এবং সামাজিক চাপ দিয়ে খোরপোশের অনুমতি গ্রহণ করে নিল। অথচ স্ত্রী জানে অনুমতিদান কালে স্বামীর কলিজায় কেমন সাপে দংশন করছিল। তা যতই কলজে জ্বলুক এবং সামাজিক চাপের মুখেই অনুমতি দিক না কেন, যেহেতু স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া তার দায়িত্ব ছিল এবং সে তা পালনে গড়িমসি করছিল, তাই এরকম জবরদস্তিমূলক অনুমতি দ্বারাও স্ত্রীর জন্য খোরপোষ গ্রহণ বৈধ হবে। বরং এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য বিনা অনুমতিতেও তা নেওয়া জায়েয।

স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর খরচা গ্রহণ

হযরত হিনদা (রাযি.) ছিলেন হযরত আবূ সুফয়ান (রাযি.)-এর স্ত্রী। একবার তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আরয করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ সুফয়ান টাকা-পয়সা ধরে রাখে।'

অর্থাৎ একটু ব্যয়কুণ্ঠ। আমার ও আমার সন্তানদের খরচ ঠিকভাবে দেয় না। যা দেয় তাতে আমাদের চলে না। কখনও কখনও টাকা-পয়সা ঘরে রেখে বাইরে যায়। তার অনুমতি ছাড়া কি আমি তা নিতে পারি ?

উত্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমার ও তোমার সন্তানদের ন্যায়সংগতভাবে যা হলে চলে তা নিয়ে নাও।'[২০৮]

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি ছাড়াও নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যেহেতু তা স্ত্রীর হক ছিল।

---

২০৮ বুখারী, হাদীছ নং ৪৯৪৫ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ৫৩২৫ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ২২৮৪ ; আহমাদ, হাদীছ নং ২২৯৮৮

আন্তরিক অনুমতি ছাড়া যা গ্রহণ জায়েয নয়

কিন্তু যা হক ও প্রাপ্য নয় তা জোরপূর্বক নেওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। অনেক সময় মানুষ যথারীতি পরিকল্পনার মাধ্যমেই এ নাজায়েয কাজটি করে। চলো আমরা অমুক বন্ধুর উপর হামলা চালাই। সে বড় কৃপণ। সহজে খাওয়াতে চায় না। আজ সকলে মিলে ধরব। দেখি না খাইয়ে যায় কোথায়। বা সহজে টাকা ছাড়তে চায় না। আজ তার থেকে হাদিয়া- তোহফা আদায় করে ছাড়ব। কথা মত সকলে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। এমনভাবেই তার পেছনে লাগল, শেষ পর্যন্ত বেচারা তাদের কথা রাখতে বাধ্য হল। কথা তো রাখল, কিন্তু তার মনের উপর যে চাপ পড়েছে, কলজে চেরা যে কষ্ট সে বোধ করেছে তা তার মত ভুক্তভোগীই জানে। এহেন কষ্ট দিয়ে তার থেকে যা কিছুই আদায় করা হয়েছে বা খাওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। কেননা, সে কৃপণ হলেও এই খরচ তো তার দায়িত্ব ছিল না, এটা আপনাদের হক ছিল না, যা সে দিতে বাধ্য ছিল। তা সত্ত্বেও তার ইচ্ছার বিপরীতে তার নারাজী সত্ত্বেও জোরপূর্বক তা আদায় করা হয়েছে। তাই এর বৈধতার কোন রাস্তা নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোন মুসলিমের মাল তার আন্তরিক অনুমতি ছাড়া ভোগ করা হালাল নয়।'[২০৯]

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা সংগ্রহ

স্কুল-মাদরাসার জন্য চাঁদা তোলার বিষয়টাও এ হাদীছের আওতায় আসে। হযরত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহঃ) বলেন, লোকে নিজ প্রভাব খাটিয়ে চাঁদা তুলে থাকে। এ চাঁদাও সন্দেহপূর্ণ। কেননা চাঁদা যার থেকে উসূল করা হয়, সে এমনিতে তো দিতে রাজি ছিল না, কিন্তু যখন দেখে এত বড় মানুষ তার দোকানে এসে হাজির হয়েছে। তাকে ফেরায় কি করে। তাই মনে পাথর চাপা দিয়ে হলেও চাঁদা দিয়ে দেয়। কিন্তু খুশিমনে যেহেতু দেয়নি তাই তা নেওয়া বৈধ নয়।

হযরত থানভী (রহঃ) আরও বলেন, আজকাল প্রকাশ্য জনসভায় চাঁদা তোলা সমীচীন নয়। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে মাথা থেকে মসিবত টলানো,

---

২০৯. আহমাদ,হাদীছ নং ১৯৭৭৪

মানুষের নিন্দা-সমালোচনা থেকে বাচাঁ বা মান-সম্মান রক্ষার খাতিয়ে চাঁদা দেওয়া হয়ে থাকে। ইখলাসের সাথে কমই দেওয়া হয়। 'আজকাল' শব্দটি ব্যবহারের কারণ, জনসমাবেশে চাঁদা তোলার বৈধতা প্রমাণে তাবূক যুদ্ধের ঘটনা দ্বারা দলীল দেওয়া হয়ে থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদে প্রকাশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময়ের জন্য এ দলীল প্রযোজ্য নয়। কেননা যাদের থেকে চাঁদা নেওয়া হচ্ছিল তারা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। তাদের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা ছিল যে, তাদের দেওয়াটাও হবে আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং না দেওয়াটাও হবে তাঁরই জন্য। এর বাইরে দেওয়া না দেওয়ার কোন ধারণা তারা পোষণ করতেন না। সেই পুণ্যাত্মা ও বিশুদ্ধচিত্ত জামাতের সাথে আমরা নিজেদের তুলনা করি কোন্ সাহসে ? এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন যে, প্রকাশ্য জনসভায় চাঁদা সংগ্রহের যে রেওয়াজ পড়ে গেছে এটা ভালো নয়। এতে আন্তরিকতার সাথে না দেওয়ার আশংকা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে এ চাঁদা উপরিউক্ত হাদীছ ' কোন মুসলিমের মাল তার আন্তরিক অনুমতি ছাড়া হালাল নয়'-এর আওতায় পড়ে যায়। তাই এটা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র :
ইসলাহী মাজালিস : ৫ম খণ্ড, ৮৯-১০৮ পৃষ্ঠা

অপব্যয় ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

কৃপণতার বিপরীত স্বভাব হল অপব্যয়। কৃপণতা বলতে বোঝায় প্রয়োজন স্থানে ব্যয় না করা। আর অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কে বলা হয় অপব্যয়। আরবীতে 'ইসরাফ'। উভয়টিই নাজায়েয। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ বান্দাদের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا۝

'দয়াময় আল্লাহর বান্দা তারা, যারা অর্থব্যয় কালে অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। উভয়ের মাঝামাঝি হল মিতাচারের পন্থা।'[২১০]

খরচের আগে চিন্তা করে নাও

এ সম্পর্কে 'তরবিয়াতুস-সালিক'-গ্রন্থে হযরত থানভী (রহঃ)-এর চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে। যা তিনি কোনও এক মুরীদের চিঠির জবাবে লিখেছিলেন। তাতে বলেন,

'খরচ করার আগে দু'টো ব্যবস্থা নিন। প্রথমত চিন্তা করুন যেখানে খরচ করতে চাচ্ছেন, সেখানে খরচ না করলে কোনও ক্ষতি আছে কিনা। ক্ষতি না থাকলে সে খরচ বাদ দিন। আর ক্ষতির আশংকাবোধ হলে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করে নিন, এ খরচ করাটা অনুচিত ও অসমীচীন হবে না তো ? তিনি যে পরামর্শ দেন সে অনুযায়ী কাজ করুন। ক্ষতি দ্বারা কাল্পনিক ও আনুমানিক ক্ষতি নয় ; বরং বাস্তবিক ক্ষতি বোঝানো হয়েছে। তার মাপকাঠি হল শরী'আত।

---

২১০. ফুরকান : ৬৭

রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র

এ চিঠিতে হযরত থানভী (রহঃ) অপব্যয় হতে বেঁচে থাকার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। আমি পূর্বেও আরয করেছি যে, চিকিৎসক রোগীর সঠিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এ চিঠিতে হযরত থানভী (রহঃ) সেই নীতিই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, কোথাও খরচ করলে যদি ক্ষতির আশংকাবোধ না হয়, বরং খরচ না করলেই ক্ষতি হবে বলে মনে হয়। সেখানেও খরচ করার আগে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা উচিত। প্রতীয়মান হয়, পত্রলেখক হয়ত ফযুল খরচে অভ্যস্ত ছিল এবং তার নিজ চিন্তা-ভাবনার উপর আস্থা রাখা যাচ্ছিল না। সেজন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা দান করেছেন।

নয়ত আসল নিয়ম এটাই যে, কোথাও খরচ করার আগে চিন্তা করবে, খরচ না করলে কী ক্ষতি হতে পারে। খরচ না করলে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে ব্যস খরচ করবে। কিন্তু খরচ না করলে যদি ক্ষতির আশংকাবোধ না হয়, তবে অহেতুক খরচ করবে কেন? এ খরচই প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং এটাই অপব্যয়।

ক্ষতি আছে কি না তার সিদ্ধান্ত কে দেবে?

প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় খরচ না করলে ক্ষতি আছে আর কোথায় ক্ষতি নেই, তার মীমাংসা তো খুব সহজ নয়। যে- কোনও বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম-নীতি থাকে বটে, কিন্তু তার কার্যকারিতাও থাকে একটা সীমার মধ্যে। সে সীমার পর ফয়সালা নিতে হলে সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধির দরকার হয়।

এই যে বলা হল, ব্যয়ের আগে চিন্তা করে দেখ ব্যয় না করলে কোনও ক্ষতি আছে কিনা, এটা নেতিবাচক পন্থা। এর একটা ইতিবাচক পন্থাও হতে পারে। তা হলে ব্যয় করার সময় চিন্তা করে দেখ, এর কোন ফায়দা আছে কি না, ফায়দা থাকলে ব্যয় কর, অন্যথায় ক্ষান্ত হও। বস্তুত এটাই আসল মাপকাঠি। এজন্যই 'ইসরাফ' (অপব্যয়)-এর অর্থ করা হয়, এমন ব্যয়, যার কোন ফায়দা নেই। ফায়দা ও উপকার বলতে সাধারণভাবে দীন ও দুনিয়া উভয় রকম ফায়দাই বোঝানো হয়েছে। অবশ্য দুনিয়াবী ফায়দা বলতে এমন উপকারকেই বোঝাবে যা শরী'আতসম্মত ও বৈধ। এরূপ ব্যয় অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যে খরচের কোনও রকম উপকার নেই, কিংবা উপকার থাকলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়, তা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যয়কে অপব্যয় বলা যায় না

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা একটা মূলনীতি বের হয়ে আসে। এমন অনেক খরচ আছে, সাধারণত তাকে অপব্যয় মনে করা হয়, অথবা বাস্তবিক অর্থে তা অপব্যয় নয়। উদাহরণত এক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্যের ভেতর থেকে নিজ আরামের জন্য বা মনের শখে একটা জিনিস কিনল। তা সে কিনল অন্যের তুলনায় বেশি টাকা দিয়ে। হয়ত সে জিনিস বিশ-পচিশ টাকায়ও পাওয়া যায় আর সর্বোচ্চ একশ টাকায়ও বিক্রি হয়, কিন্তু দাম অনুযায়ী মানেরও পার্থক্য আছে। সে ব্যক্তি একশ' টাকারটাই কিনল। তা কেনার সামর্থ্য তার আছে এবং সেজন্য ঋণ করার প্রয়োজন হয়নি।

তো আরাম বা শখের জন্য জিনিসটি কিনলে তার পক্ষে তা অপব্যয় হবে না এবং তাতে তার কোন গুনাহ হবে না। এমনিভাবে ভ্রমন সুবিধার বিষয়টাও এর মধ্যে আসে, আপনি অন্য কোনও শহরে সফর করবেন। রেলগাড়ির যাত্রা। চাইলে শোভন শ্রেণীর টিকেটও কাটতে পারেন এবং চাইলে পারেন প্রথম শ্রেণীর টিকেটও কাটতে পারেন। আবার চাইলে পারেন বিমানযোগে যেতে। বলাবাহুল্য এ সবের মধ্যে ভাড়ার অনেক তারতম্য। এখন আপনার যদি প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে আর বেশি টাকা দিয়ে আরামজনক ভ্রমণ করেন, তাতে কোন দোষ নেই। এটা অপব্যয় ও গুনাহ নয়। এমনিভাবে মনের শখে বা স্ত্রী-সন্তানদের খুশি করার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করলে তা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে না।

বসবাসের তিনটি বৈধ স্তর

হযরত থানভী (রহঃ) বাসস্থান সম্পর্কে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যা অন্য যে- কোনও বিষয়েই প্রযোজ্য।

তিনি বলেন, বাসগৃহ কয়েক স্তরে হতে পারে। একটি স্তর কেবল 'বাস করা' (রাহাইশ)-এর। এর জন্য মাটির ঘর, টিনের ঘর বা এমন পাকা ঘরই যথেষ্ট, যাতে কোন পলেস্তরা, চুনকাম ইত্যাদি করা হয়নি। এরূপ ঘরে বাস করলে তাতে বসবাসের কাজ চলে যায়। তবে এটা বসবাসের সর্বনিম্ন মান।

দ্বিতীয় স্তর হল আরাম দায়ক বাস (আসাইশ)। যেমন একটি পাকাঘর। উপরেও পাকা ছাদ। ভেতরে আরামের জন্য খাট বেছানো। আরামে থাকা ও ঘুমানোর অন্যান্য সামগ্রীও আছে। এটা বসবাসের আরামদায়ক ব্যবস্থা। এটাও জায়েয। শরীর মনের আরামের জন্য কোন ব্যবস্থাগ্রহণে দোষ নেই।

তৃতীয় স্তর সৌন্দর্যমূলক বাস (আরাইশ)। যেমন চুনকাম করা পাকা বাড়ি, ভেতরে মোজাইক করা বা টাইলস লাগানো এবং শ্রীবৃদ্ধির অন্যান্য উপকরণও আছে। এবং আছে গৃহসজ্জার বিভিন্ন আসবাব। হালাল উপার্জন ও নিজ সামর্থ্য মোতাবেক এরূপ করা জায়েয। এটাও অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে না, এই হল বৈধ বাসগৃহের তিনটি স্তর।

চতুর্থ স্তর জায়েয নয়

চতুর্থ স্তর হল প্রদর্শন (নুমাইশ)। অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর জন্য এমন বাড়ি করা, যাতে লোকে মনে করে সে একজন আমীর লোক। তার অনেক টাকা-পয়সা; তাই তো এমন শানদার বাড়ি ও জমকালো গাড়ি। প্রদর্শনেচ্ছায় এরূপ বাড়ি বা অন্য যে কোনও কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। এতেও ফায়দা আছে বটে। যেমন লোকে বড় লোক মনে করবে আর তা মনে করার দরুন সম্মান করবে, সম্ভ্রমের সাথে কথা বলবে এবং হুকুম দিলে মান্য করবে। কিন্তু এটা বৈধ উপকার নয়। কেননা, এটা অহমিকা। শরী'আতে এ উপকারিতা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এটা অনর্থক কাজ।

আসল মাপকাঠি বৈধ উপকারিতা

দেখুন বসবাস, আরামদায়ক বসবাস ও সুন্দর বসবাস এ তিনওটি স্তর ফায়দাজনক। তাই এর যে- কোনও স্তরের গৃহ নির্মাণের জন্য যে টাকা খরচ করা হবে, তা প্রয়োজনীয় খরচ বলেই গণ্য হবে। কাজেই সে খরচ অপব্যয়ের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু প্রদর্শনের লক্ষ্যে যে বাড়ি নির্মাণ করা হয়, তাতে যদিও উপকার আছে, কিন্তু উদ্দিষ্ট উপকারটি শরীআত সম্মত না হওয়ায় এ খরচ অপব্যয় বলেই গণ্য হবে। সুতরাং যে সব কাজে কোন ফায়দা নেই, যেমন ইচ্ছাকৃত টাকা-পয়সা ফেলে দেওয়া, উচিত দামের চেয়ে বেশি দামে কোন পণ্য কেনা, যা একটু সাবধান হলে ও চেষ্টা করলে কম দামে কেনা যেত, কিন্তু অবহেলা ও অলসতা করার ফলে তাকে বেশি টাকা গুণতে হয়েছে এ সবই অপব্যয়।

দুই পয়সা খোঁজাখুঁজির ঘটনা

একবার আমি আব্বাজী (রহঃ)-এর সাথে লাহোর দিয়েছিলাম। আমি ছিলাম ছোট শিশু। আমার বড় ভাই জনাব যাকী কায়ফী (রহঃ) লাহোর থাকতেন। লাহোর যাওয়ার পর আব্বাজী (রহঃ), ভাইয়া ও আমি-এ তিনজন

পায়ে হেঁটে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। নাম ছিল 'কাপুরতলা হাউস'। আমরা হাঁটছিলাম অন্ধকার রাতে। এক জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া ছিল। খুব কষ্টে সে জায়গা পার হতে হত। বড় ভাইয়া পকেট থেকে পয়সা বের করছিলেন। হঠাৎ দুই পয়সা বা এক আনার একটা কয়েন পড়ে গেল। একে অন্ধকার, তাও দ্রুত যাওয়ার ছিল, আবার কাঁটাতারের ঝামেলা। ভাই সাহেব মনে করলেন শুধু শুধু এর পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করা কেন। সুতরাং খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

আব্বাজী জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ল ? ভাই সাহেব বললেন, দুই পয়সা বা এক আনার একটা কয়েন পড়ে গেছে। আব্বাজী বললেন, তুলে নিচ্ছ না কেন ? ভাই সাহেব বললেন, মাত্র দু'পয়সা তো ! আব্বাজী (রহঃ) বললেন, দু'ই পয়সাই হোক বা এক আনা, প্রথমে খুঁজে তো দেখ ! খুঁজে না পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। না খুঁজেই চলে যাচ্ছ কেন ? সুতরাং আব্বাজী একটা ম্যাচ আনালেন। তারপর নিজেই কাঠি জ্বালিয়ে বললেন, এবার খোঁজ। আমরা তার তালাশে লেগে গেলাম। আব্বাজী বললেন, দেখ, এক পয়সাই হোক আর দুই পয়সা, তা আল্লাহ তা'আলার নি'আমত বটে। কাজেই তাকে মামুলি জিনিস মনে করে অবহেলা করা আর না খুঁজে চলে যাওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। তাতে নি'আমতের অবমূল্যায়ন করা হয়।

নি'আমতের সামান্য অংশেরও কদর করা উচিত

হযরত থানভী (রহঃ) তাঁর এক বাণীতে বলেন, যেসব নি'আমত বহু অংশ বিশিষ্ট এবং সেই বহু অংশ দ্বারাই উপকার লাভ করা হয়, তার ক্ষুদ্রাংশকেও ইজ্জত করা ও মূল্য দেওয়া উচিত। এটা তোমার অবশ্যকর্তব্য। এ কারণেই আব্বাজী (রহঃ) বললেন, যে পয়সা পড়ে গেছে, তা এক বা দু' পয়সাই হোক না কেন, কিছুক্ষণ অবশ্যই তা তালাশ করে নাও। এরজন্য কিছুটা সময় ব্যয় কর, যাতে আল্লাহ তা'আলার নি'আমতের অকৃতজ্ঞতা না হয়ে যায়। বিনা তালাশে চলে যাওয়াটা অপব্যয় ও অকৃতজ্ঞতা। হাঁ তুমি যদি দান করে দিতে চাও তবে কোন অভাবগ্রস্তকে দাও। তার কাজে আসবে। সেটা অপব্যয় নয়। সদাকা করা হবে এবং পয়সার সঠিক ব্যবহার হবে।

অবৈধ উপকার লাভের জন্য অর্থব্যয়

আল্লাহ প্রদত্ত ছোট- ছোট নি'আমতের কদর করলে এবং সেজন্য শুকর আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা নি'আমত আরও বাড়িয়ে দেন। কদর না

করলে সেজন্য নি'আমত লোপ পাওয়ার ও শাস্তি আসার আশংকা রয়েছে। যা হোক পয়সা হারিয়ে যাওয়ার পর তা তালাশ না করা পয়সা বেহুদা খরচ করা ও ইচ্ছাকৃত নষ্ট করে ফেলার নামান্তর। আর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় হল এমন খাতে ব্যয় যার ফায়দা আছে বটে, কিন্তু সে ফায়দা শরী'আতসম্মত নয়। তা ছাড়া এভাবে অর্থব্যয়ে এমন সুখ ও আনন্দ লাভ হয়, যা শরী'আত সমর্থন করে না। এটাও এমন এক উপকার যা শরী'আতে বৈধ নয়। তাই এটা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইসরাফ ও তাবযীর

উলামায়ে কিরাম বলেন, ইসরাফ ও তাবযীর-এর মধ্যে সাধারণ বিশেষের সম্পর্ক। অর্থাৎ ইসরাফ সাধারণ, তাবযীর বিশেষ। শরী'আতসম্মত নয় এমন খাতে অর্থব্যয়কে বলা হয় তাবযীর, অর্থাৎ অবৈধ কাজে টাকা-পয়সা খরচ করা, যেমন সিনেমা দেখা, জুয়া খেলা ইত্যাদি। এটা ইসরাফও বটে। তবে যেসব খাত নাজায়েয ও হারাম নয়, কেবল নিরর্থক, উপকারবিহীন, তাতে অর্থব্যয়ও ইসরাফের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তা তাবযীর নয়। যা হোক ইসরাফ যেহেতু তাবযীরকেও শামিল করে তাই আমি ইসরাফের সংজ্ঞায় উভয় প্রকার অর্থব্যয়কেই যুক্ত করে বলেছি, এমন খাতে ব্যয় করা যার কোন উপকার নেই অথবা উপকার আছে বটে, কিন্তু তা শরী'আতসম্মত নয়।

মুজাহাদা কাকে বলে ?

পূর্বে আরয করেছিলাম, কারও যখন তারবিয়াত করা হয়, আখলাক-চরিত্রে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তখন তার অভিষ্ট লক্ষ্য, যেখানে তাকে পৌছনো উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে পৌছার আগে তাকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। সেই প্রস্তুতিরই নাম মুজাহাদা-সাধনা। যেমন লক্ষবস্তু হল হারাম থেকে বাঁচা, সেই লক্ষবস্তুতে পৌছানোর জন্য ভূমিকাস্বরূপ কখনও কখনও জায়েয কাজও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে হারাম থেকে বাঁচার পথ সুগম হয়ে যায়। এটাই মুজাহাদা। এজন্যই মাশায়েখে কিরাম তাদের তারবিয়াতের অধীনে থাকা লোকদের দ্বারা অনেক সময় জায়েয জিনিসও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তো ইসরাফ ও অপব্যয়ের প্রকৃত যে নিষিদ্ধ খাত, তা হল এমন সব স্থানে অর্থব্যয় করা যেখানে খরচ করার কোন ফায়দা নেই। কিংবা ফায়দা থাকলেও তা অবৈধ, শরী'আতে অনুমোদিত নয়।

খরচ না করলে যদি ক্ষতি না থাকে তবে সে খরচ বাদ দাও

কিন্তু তারবিয়াত ও ব্যক্তিগঠনের লক্ষে হযরত থানভী (রহঃ) মুরীদদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, খরচের আগে চিন্তা করে দেখবে খরচ না করলে কোনও ক্ষতি আছে কি না। খরচ না করলে যদি ক্ষতি না হয় তবে বাদ দেবে। খরচ করবে না। কেননা এই খরচের কোনও প্রয়োজন নেই। অবশ্য চিন্তা করলে এর মধ্যেও খরচের বৈধ দিক আছে। যেমন এমন সব ক্ষেত্রে খরচ করা, যেখানে খরচ না করলে কোন ক্ষতি নেই বটে, কিন্তু করার ফায়দা আছে। এর মধ্যে দুটো বিষয়ই শামিল হয়ে গেছে। সে হিসেবে অতিব্যয়ের বৈধ পন্থাও এর আওতায় পড়ে গেছে। কিন্তু হযরত থানভী (রহঃ) তারবিয়াতের উদ্দেশ্যে হুকুম দিয়েছেন, খরচ না করার মধ্যে কোন ক্ষতি না থাকলে সে খরচ বাদ দাও। তাতে মৌলিকভাবে সে খরচ বৈধই হোক না কেন।

খরচের আগে বিচক্ষণ কোন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ

তিনি অতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি ; সেই সঙ্গে আরও বলেছেন, যদি মনে হয় খরচ না করলে ক্ষতি হবে, তবে সেক্ষেত্রে কোনও বিচক্ষণ লোকের সাথে পরামর্শ করবে। অর্থাৎ আগেই খরচ করে বসবে না। বরং তার আগে সমঝদার কোন লোকের সাথে পরামর্শ করবে যে, খরচ করাটা অসংগত ও অসমীচীন হবে না তো ? তারপর তিনি যা বলেন সে অনুযায়ী কাজ করবে। নিজে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।

এ ব্যবস্থা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়

তবে এ ব্যবস্থা সকলের জন্য নয়। অর্থাৎ চিন্তা করার পর যদি বুঝে আসে খরচ না করলে ক্ষতি আছে, তবে সেক্ষেত্রেও যে খরচ করার আগে কারও সাথে পরামর্শ করে নিতে হবে, এ ব্যবস্থা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। বরং যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনেও খরচ করতে অভ্যস্ত হযরত থানভী (রহঃ) এ নির্দেশনা কেবল তাকেই দান করেছেন।

উপকার থাকা-না থাকার ফয়সালা শায়খকে দিয়ে করাবে

তারপর বলেছেন, ক্ষতি দ্বারা বাস্তবসম্মত ক্ষতি বোঝানো হয়েছে, কাল্পনিক ক্ষতি নয়। কোনটা বাস্তবসম্মত ক্ষতি তার মাপকাঠি হল শরীআত।

যা হোক প্রকৃত ব্যাপার সেটাই, যা আমি আরয করেছি। অর্থাৎ বিনা উপকারে বা নাজায়েয উপকার লাভের জন্য অর্থব্যয় করা অপব্যয়। অবশ্য

কোথায় উপকার আছে, কোথায় নেই সে সম্পর্কে খুব সহজ মূলনীতি বলা সম্ভব নয়। অনেক সময় মনে হয় এখানে খরচ করলে ফায়দা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফায়দা নেই। এখানেই শায়খের দরকার। তার সামনে পরিস্থিতি উল্লেখ করে তার অভিমত জানতে হয় যে, এখানে খরচ করা হবে কি না। মুলনীতি বলে দিলেই যদি কাজ হত তবে শায়খের প্রয়োজন কী ছিল ! ব্যস অপব্যয়ের সংজ্ঞা বলে দেওয়া হত, শর্তাবলী জানিয়ে দেওয়া হত এবং প্রত্যেকে তা পড়ে নিয়ে আমল করত। বস্তুত তা হয় না। এটা ব্যক্তিগঠনের বাস্তবসম্মত পন্থা নয়। এ কারণেই কুরআন মাজীদের সাথে আল্লাহ তা'আলা নবীও পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন এ কারণেই যে, কেবল পড়ে পড়ে সব কথা বোঝা সম্ভব হয় না। এর জন্য কোন শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের দরকার হয়।

শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের প্রয়োজনীয়তা

সাহাবায়ে কিরাম হিদায়াত লাভ করেছেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে, তাবি'ঈগণ লাভ করেছেন সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে, তাবে তাবি'ঈন লাভ করেছেন তাবি'ঈনের মাধ্যমে আর এ ধারাতেই যুগ-পরম্পরায় হিদায়াতী কার্যক্রম চলে আসছে। কেননা নিয়ম-নীতি একটা সীমার ভেতর নিজে নিজে কাজে লাগানো যায়। সে সীমার পর বাস্তব অবস্থার উপর নিয়ম-নীতির প্রয়োগ খুব সহজ থাকে না। এরই জন্য শায়খের দরকার। কোন অবস্থায় নীতিমালার প্রয়োগ কিভাবে করতে হবে তাঁর মাধ্যমেই তা স্থির করা সহজ হয়। অর্থব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টা সে রকমই। শায়খের নির্দেশনাতেই উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্থব্যয় করব, কি করব না তার দিশা পাওয়া সম্ভব হয়।

যা বাস্তবসম্মত প্রয়োজন নয়

হযরত থানভী (রহঃ) পরে আরেকটি বাণীতে বলেন,

ইসরাফ (অপব্যয়) সম্পর্কে বলছি, যখন কোন বস্তু কিনতে চাবে, আগে চিন্তা করে দেখবে তার প্রয়োজন আছে কি না। সংগে সংগেই যদি মনে হয় কেনা দরকার কিনে ফেলবে আর যদি তখনই স্থির করা সম্ভব না হয়, তবে কিনবে না। কেননা একটা জিনিস প্রয়োজন কিনা তা মীমাংসা করতে যদি আধা ঘন্টা ব্যয় হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে তা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। মনে যদি চাহিদা প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রয়োজন বুঝে না আসে, তবে জিনিসটি কিনে নেবে তারপর ধীরে-সুস্থে বসে চিন্তা করতে থাকবে। চিন্তা

ভাবনার পর সেটি অপব্যয় সাব্যস্ত না হলে ব্যবহার করবে, নয়ত কাউকে দান করে দেবে।'[২১১]

অর্থাৎ উপস্থিতভাবেই যদি একটা জিনিসের প্রয়োজন বুঝে এসে যায় তবে সেটা প্রয়োজনীয় বটে। কাজেই কিনে ফেল। আর যদি এমন হয় যে, আধা ঘন্টা ধরেই ভাবছ এ জিনিসটা দরকার কি না। এটা কোন্ কাজে লাগানো যায়। তারপর চিন্তা করে একটা প্রয়োজন বের করে ফেললে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করে করে প্রয়োজন খুঁজে বার করার দ্বারাই প্রমাণ হয় প্রকৃতপক্ষে সেটির কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য অনেক সময় এমন হয় যে, একটা জিনিস, হয়ত সেটা খাবার জিনিসই, দেখে খুব পসন্দ হয়েছে এবং কিনতেও খুব ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু সেটির প্রয়োজন কতটুকু তা ভেবে স্থির করা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটি কিনে ফেলবে তারপর ধীরেসুস্থে চিন্তা করতে থাকবে। চিন্তার করার পর অপব্যয় না হওয়া সাব্যস্ত হলে খেয়ে ফেলবে, অন্যথায় দান করে দেবে। কেননা তখন না কিনলে হয়ত সুযোগ চলে যাবে। তাই কিনে ফেলবে। কেনার পর এখন শান্ত মনে চিন্তা করতে থাক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনলাম, না অপ্রয়োজনীয় জিনিস। চিন্তা-ভাবনার পর প্রয়োজনীয় বলে মনে হলে তা ব্যবহার করবে। আর প্রয়োজনীয় না হলে দান করে দেবে।

স্ত্রী ও সন্তানদের খুশি করার জন্য অর্থব্যয়

তারপর ইরশাদ করেন, স্ত্রীকে খাইয়ে দেওয়াও দান করাই বটে। বিনা প্রয়োজনেও কেবল স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যদি কোন জিনিস কেনা হয়, তা অপব্যয় নয়। কেননা স্ত্রীর মনোরঞ্জনও শরীআতে কাম্য যদি তা সামর্থ্যের বাইরে না হয় এবং ঋণ করার দরকার না হয়।'[২১২]

অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মনোরঞ্জনার্থে যদি কোন জিনিস কেনে এবং সেটির অন্য কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তা অপব্যয় হবে না, কেন অপব্যয় নয় ? তিনি এর কারণ বলেন, স্ত্রীর মনোরঞ্জনও কাম্য। কথা সেটাই যা আগে বলা হয়েছে। অর্থব্যয়ের কোন ফায়দা থাকতে হবে। ফায়দা যে কেবল নিজেরই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অন্যের ফায়দাও ফায়দাই বটে। অন্যের মনোরঞ্জনও একটা উপকার। অন্যকে খুশি করতে পারাটাও

---

২১১. আনফাসে 'ঈসা : ১৯১

২১২. আনফাসে 'ঈসা :১৫১

একটা লাভ, তা স্ত্রীকে খুশি করা হোক, সন্তানকে খুশি করা হোক কিংবা পিতামাতা ও ভাইবোনকে। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ফায়দা, এজন্য যা-কিছুই খরচ করা হবে, তা অপব্যয় নয়।

উস্তাযের সম্মানার্থে বায়ান্ন পদের খাবার

একবার হযরত থানভী (রহঃ)-এর কাছে তাঁর উসতায হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) তাশরীফ আনেন। আমি আমার শায়খের কাছে শুনেছি, হযরত থানভী (রহঃ) উস্তাযের সম্মানার্থে বায়ান্ন পদের খাবারের আয়োজন করেন। হযরত শায়খুল-হিন্দ (রহঃ) দস্তরখানে খাদ্যের বিপুল সমাহার দেখে বললেন, ভাই, তুমি এটা কী করেছ ? হযরত থানভী (রহঃ) বললেন, সত্যি কথা হচ্ছে, এতেও মন ভরেনি। মন চাচ্ছিল আরও কিছু প্রস্তুত করাই।

অন্য কেউ বায়ান্ন পদের খাবার দেখলে বলবে এটা অপব্যয়। প্রকৃতপক্ষে অপব্যয় নয়। এটা ছিল উস্তাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এটাও জানা ছিল যে, কোন জিনিস নষ্ট হবে না। যা বাচঁবে কারও না কারও কাজে আসবে। আল্লাহ না করুন নষ্ট হলে তা অবশ্যই অপব্যয় হত, কিন্তু নষ্ট হবে না বলে নিশ্চিত জানা ছিল। সেইসংগে প্রদর্শনেচ্ছাও ছিল না। বায়ান্ন প্রকারের খাবার দেখে লোকে বাহবা দেবে, এ জাতীয় মনোভাবের প্রশ্নই সেখানে ছিল না। মূলত উস্তাযের খেদমত ও তাঁকে সম্মান জানানোর জযবাই কাজ করছিল। সুতরাং একে অপব্যয় বলার কোন সুযোগ নেই।

নিয়তভেদে সওয়াব ও গুনাহ

এ কাজই যদি রেকর্ড সৃষ্টির নিয়তে করা হয়, চারদিকে লোকে বলাবলি করবে অমুকে এমনই আয়োজন করেছিল যে, তাতে বায়ান্ন পদের খাবার তৈরী করা হয়েছিল-এই উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা অবশ্যই অপব্যয় হবে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ হবে।

এমনিভাবে বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে যে হাদিয়া- তোহফা দেওয়া হয়, তাতেও নিয়তের এ তারতম্য থাকতে পারে। নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে মহব্বতের দাবিতে যদি হাদিয়া দেওয়া হয়, তার খেদমত করা ও তার আনন্দে নিজ আনন্দ প্রকাশের তাগিদে যদি কোন উপহার দেওয়া হয়, তবে তা হবে সুন্নতের অনুসরণ। এভাবে হাদিয়া দেওয়া অত্যন্ত সওয়াব ও বরকতের কাজ। আবার এ কাজই যদি করা হয় নাম-ডাকের উদ্দ্যেশে, লোকে বলবে অমুকের বিয়েতে অমুকে এমন দামী উপহার দিয়েছে, তবে তা অপব্যয় ও

গুনাহের মধ্যে পড়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে অপব্যয় থেকে রক্ষা করুন।

অপব্যয় হতে বেঁচে থাকার উপায়

হযরত থানভী (রহঃ) এক মুরীদকে নসীহত করতে গিয়ে অপব্যয় হতে কিভাবে মুক্ত থাকা যাবে সে সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা করেছেন। তাঁর সে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ আমরাও অপব্যয় থেকে বেঁচে যাব। তিনি বলেন, আল্লাহওয়ালাদের কর্মপন্থা অবলম্বন কর শৌখিন লোকদের অনুসরণ করো না। রসম- রেওয়াজে আটকা পরে যেওনা।'[২১৩]

আল্লাহওয়ালাদের অনুসরণ

আল্লাহ তা'আলা বৈধ জিনিসের পরিধি করেছেন সুবিস্তৃত। তার মধ্যে কিছু তো এমন যা সব যুগের বুযুর্গানে দীন গ্রহণ করে থাকেন। ফলে তা গ্রহণে বরকত লাভ হয়ে থাকে। তার মানে এ নয় যে, তা গ্রহণ না করলে গুনাহ হবে। এমন কি আল্লাহওয়ালাগণ অবলম্বন করেছেন বলে তা সুন্নতও হয়ে যাবে না। পোশাকের কথাই ধরা যাক। আল্লাহ তা'আলা এক্ষেত্রে বৈধতার সীমানা বিস্তার করে দিয়েছেন। বিশেষ কোন পোশাক পরাকে বাধ্যতামূলক করেননি। বলেন নি যে, এই পোশাকই তোমাদেরকে পরিধান করতে হবে।

ফ্যাশন প্রচলনে বন্দী হয়ো না

এক পোশাক তো এমন, যা সাধারণত উলামায়ে কিরাম ও আল্লাহওয়ালাগণ পরে থাকেন। আরেক ধরনের পোশাক সাধারণ লোকজন ব্যবহার করে, তারা যে পোশাক পরে তাতেও কোন গুনাহ নেই। তা বৈধ পোশাকেরই আওতাভুক্ত। অনেক সময় বিশেষ ধরনের পোশাক চালু হয়ে যায়, যার মধ্যে শরী'আত বিরোধী কিছু থাকে না। সাধারণ লোকজন তা ব্যাপকভাবেই পরে থাকে। এতে কোন দোষ নেই। যেমন সেলোয়ার-পাঞ্জাবীর স্যুট বা কাবুলী সেট এবং তার উপর ওয়াস্কোট। এটা নাজায়েয পোশাক নয়। বরং বৈধ পোশাকেরই আওতাভুক্ত।

উলামায়ে কিরাম, বুযুর্গানে দীন ও আল্লাহওয়ালাগণ যে পোশাক পরে থাকেন তাও বৈধ পোশাক মাত্র। সুন্নত নয়। তবে তাদের রীতি-নীতির

---

২১৩. আনফাসে 'ঈসা : ১৯২

অনুসরণে সচেষ্ট থাকা উচিত। ফ্যাশনেবল লোকদের অনুকরণ করো না এবং রসম-রেওয়াজে বন্দী হয়ে যেও না। অর্থাৎ ইদানীং কি ফ্যাশন চলছে, কোন পোশাক আউট অব ফ্যাশন হয়ে গেছে, তা দেখে পোশাক বাছাই করো না। এ জাতীয় অনুকরণ প্রবণতা ছেড়ে দিতে হবে।

পোশাকে বুযুর্গানে দীনের অনুসরণ ভালো

এখানে কয়েকটা জিনিস বুঝে রাখা দরকার। তা না বোঝার কারণে আমাদের মধ্যে হয় বাড়াবাড়ি, নয় শৈথিল্য এই পরস্পরবিরোধী প্রান্তিকতা বিরাজ করছে। প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহওয়ালাগণ যে পোশাক পরিধান করেন তা পসন্দনীয় বটে, কিন্তু তাকে সুন্নত মনে করা ভুল।

অনেকেই পোশাক- লেবাসে বুযুর্গানে দীনের অনুসরণ করতে সচেষ্ট থাকে। তাদের টুপির মত টুপি পরে, তাদের জুতা দেখে জুতা কেনে এবং তারা যেমন জামা গায়ে দেন সে রকম জামা তৈরী করায়। বিশেষত নতুন-নতুন যারা দীনের পথে আসে, এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ অনেক বেশি।

লোকে প্রশ্ন করে, পোশাকে বুযুর্গানের দীনের অনুসরণ করার কী প্রয়োজন। এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ কেন ? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দোপাট (কিস্তি) টুপি পরেছিলেন ? তারা যেমন জামা-জুতা ব্যবহার করে তিনিও কি এ রকমই ব্যবহার করেছিলেন? জামার ব্যাপারে তো এতটুকুই বলা যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামা পরেছিলেন, কিন্তু তার জামা কি আমাদের জামার মত ছিল ? মোটেও নয়, তার জামা ছিল লম্বা আর আমাদের জামা হয় খাটো। আর তিনি সেলোয়ার পরেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য সেলোয়ার তিনি পসন্দ করেছেন। কিন্তু টুপি ও জুতা তিনি কি রকম পরেছিলেন তা জানা যায় না। সদরিয়া ও ওয়াস্কোটের প্রমাণ মেলে না। কাজেই এসব যখন পরেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, ফলে সুন্নতও বলা যায় না, তখন লোকে কেন এসবের এত গুরুত্ব দেয় ? কেন এতটা আগ্রহের সাথে এসব পোশাক পরিধান করে ?

একে সুন্নত মনে করা ভুল

এর উত্তর হল, আগ্রহ ও গুরুত্বদানের কারণ এ নয় যে,এসব জিনিস সুন্নত। বরং কেউ সুন্নত মনে করে যদি কিস্তি বা পাঁচকলি টুপি পরে তখন তা বিদ'আত হয়ে যাবে এবং গুনাহ হবে। বরং গুরুত্বদানের কারণ প্রত্যেক যুগে

উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দীন যে পোশাক পরিধান করেন, তা গ্রহণের বিশেষ ফায়দা আছে। ফায়দা হল, এর দ্বারা তাদের নৈকট্য অর্জিত হয় এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আশা করা যায়, এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের আখলাক-চরিত্রও আত্মস্থ করার তাওফীক দেবেন। ব্যস এই নিয়তে আল্লাহওয়ালাদের লেবাস অবলম্বন করা ভালো। তবে তাকে সুন্নত মনে করা ঠিক নয়। আর জরুরি মনে করা তো খুবই খারাপ।

হাফেজ মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব (রহঃ)-এর ঘটনা

উদাহরণত আমাদের বুযুর্গগণ সাধারণত সেলিমশাহী নাগরা ব্যবহার করতেন। সুতরাং হাফেজ মুহাম্মাদ আহমাদ (রহঃ)-এর জুতাও ছিল সেলিমশাহী। তিনি দারুল-উলূম দেওবন্দের মুহতামিম (মহাপরিচালক) ছিলেন। তিনি অপর সুবিখ্যাত মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব (রহঃ)-এর পিতা এবং দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী (রহঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র। সেকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ছিল। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে যে শাসক নিযুক্ত হত, তাকে বলা হত 'ভাইসরয়'। সে সময় যিনি ভাইসরয় ছিলেন। তিনি একবার হযরত হাফেজ মুহাম্মাদ আহমাদ (রহঃ)- কে দিল্লীতে গভর্ণর হাউসে নিমন্ত্রণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে সম্মাননাস্বরূপ তাঁকে শামসুল-উলামা উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তো নিমন্ত্রণ পেয়ে হযরত মাওলানা (রহঃ) দিল্লী গমন করেন। যখন গভর্ণর হাউসে ঢুকতে যাবেন, জেন্টলম্যান দারোয়ান তাকে আটকে দিল। বলল, আপনি যে জুতা পরে আছেন, এটি নিয়ে ভেতরে যেতে পারবেন না। তখন তার পরিধানে ছিল পাটের রশি দ্বারা তৈরি জুতা। এখন যে সেলিমশাহী নাগরা চালু আছে, এটা তো নরম ও পাতলা হয়ে থাকে; কিন্তু সেই রশির জুতা বেশ মোটা হত। যা হোক দারোয়ান বলল, ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করতে হলে এ জুতা পরে যেতে পারবেন না। বুট জুতা পরে যেতে হবে।

মুলাকাত করার কোনও সখ আমার নেই

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ (রহঃ) বললেন, আমি তো নিজে তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আবেদন করিনি। সাক্ষাত করার কোনও প্রয়োজনও আমার নেই। তিনিই আমাকে মুলাকাতের জন্য ডেকেছেন। এখন মুলাকাতের জন্য যদি তিনি এই শর্তারোপ করেন যে, আমাকে নিজ পসন্দের

জুতা খুলে তার পসন্দের জুতা পরতে হবে, তবে মুলাকাতের এ দাওয়াত আমি আগ্রাহ্য করলাম। আমি অপারগ। আমার ইচ্ছামতো পোশাকে তিনি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে রাজি থাকেন, তবে আমি সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার এ কথা তাকে জানিয়ে দাও। আর যদি সাক্ষাত করতে না চান, তবে আমি চলে যাচ্ছি। এই বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

তাঁর এ কথায় দারোয়ান সাহেবের দাপট মিইয়ে গেল। এবার সে চিন্তা করল, ভাইসরয় যদি জানতে পারেন মাওলানা সাহেব এসেছিলেন; কিন্তু আমার এ কথার কারণে ফিরে চলে গেছেন, তবে আমার খবর আছে। সুতরাং চটজলদি সে ভিতরে গিয়ে সংবাদ পৌছাল, মাওলানা সাহেব এই কথা বলছেন। ভাইসরয় তার উপর খুব রাগ করল যে, তুমি তার সাথে এমন ব্যবহার করলে কেন ? যাও এখনই তাকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

তিনি এমন জুতা কেন পরতেন ?

মাওলানা সাহেব (রহঃ) এমন জুতা সুন্নত হওয়ার বিশ্বাসে পরতেন তা নয়। কাজেই এই আপত্তি অবাস্তব যে, এমন জুতা পরা তো ফরয-ওয়াজিব ছিল না। তখন খুলে অন্য জুতা পরলে কিছু হারাম কাজ হয়ে যেত না। তা সত্ত্বেও তাতে অনড় থাকলেন কেন ?

বস্তুত তিনি বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন দুই কারণে। এক তো তিনি নিজ বুযুর্গগণকে এরূপ জুতা ব্যবহার করতে দেখেছিলেন। তাই তিনি এক্ষেত্রেও তাদের অনুসরণ করছিলেন। সন্দেহ নেই, এ অনুসরণ সুন্নত না হলেও বরকতপূর্ণ বটেই। দ্বিতীয়ত একজন 'আলেমকে দাওয়াত দেওয়ার পর এই শর্তারোপ করা যে, এই পোশাক, এই জুতা পরে আসতে হবে, অন্যথায় ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটা রীতিমত অবমাননাকর। তাই হযরত মাওলানা (রহঃ) তা মেনে নিতে পারেননি।

গুরুত্বদান কি বিদ'আত

অনেকে বলে থাকে, তোমরা যে লেবাস-পোশাককে এমন গুরুত্ব দাও যে, জামা এমন হতে হবে, সেলোয়ার এমন হতে হবে, জুতা এমন হতে হবে, টুপি এমন হতে হবে এটা বিদ'আত। কেননা, সুন্নাহ দ্বারা জামা-জুতার এ ধরন প্রমাণিত নয়। অথচ তোমরা এসবের এমন নিয়ম বানিয়ে নিয়েছ

যেমনটা কেবল সুন্নতের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কাজেই এই যে আবশ্যিক নয় এমন জিনিসকে আবশ্যিক বানিয়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা অবশ্যই বিদ'আত।

তাদের এ কথা ঠিক নয়। লেবাস-পোশাকের এ গুরুত্ব মূলত সুন্নত-ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাসে নয় ; বরং এ কারণে দেওয়া হয়ে থাকে যে এটা আমাদের উস্তাযবৃন্দ ও বুযুর্গদের তরিকা। তাদের তরিকা অবলম্বন করলে আমরা আশা করি, এই বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে আমাদের চারিত্রিক সাদৃশ্যও দান করবেন।

تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر ایا ہوں
حقیقت اس کو تو کردے میں صورت لے کر آیا ہوں

'হে আল্লাহ ! আমি তোমার প্রিয়জনের সাদৃশ্য নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি কেবল আকৃতিটা নিয়ে এসেছি। প্রকৃতিটাও তার মত করে দাও, হে মালিক।

বস্তুত বুযুর্গানে দীনের লেবাস- পোশাক গ্রহণ দ্বারা এই সাদৃশ্য অবলম্বনই উদ্দেশ্য। এর বেশি কিছু নয়।

যা আবশ্যিক নয় তাকে আবশ্যিক বানিয়ে নেওয়া বিদ'আত

অন্যদিকে কিছু লোক বাস্তবিকই মনে করে লেবাস- পোশাকের এ ধরন অবলম্বন করা ফরয বা ওয়াজিব, অন্ততপক্ষে সুন্নতে মুআক্কাদা তো বটেই। ফলে কেউ অন্যধরনের পোশাক পরলে তার নিন্দা করা হয়। কেন সে অন্যরকম পোশাক পরল সেজন্য তাকে তিরস্কার করা হয়। এ ধরনের গুরুত্বারোপ, যাতে বিশেষ কোন পোশাককে বাধ্যতামূলক মনে করা হয়, তা বাস্তবিকই সে পোশাককে বিদআত বানিয়ে দেয়। অমুকে কেন পাঁচকলি টুপি পরল না, কেন সে এই ধরনের জুতা পরল না, কেন অমুক কাটিংয়ের পোশাক গ্রহণ করল না, এ জাতীয় নিন্দা-তিরস্কার কেবল ফরয-ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই হতে পারে। এ নিন্দা যদি কোন বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়, তবে তা সে বৈধ বিষয়টিকে বিদ'আতে পরিণত করে। কাজেই যারা বিশেষ পদ্ধতির লেবাস- পোশাক গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে এরূপ নিন্দা-সমালোচনা করে, প্রকারান্তরে তারা সে পোশাককে বিদ'আত বানিয়ে দেয়। কখনও কখনও আমাদের মহলে এ জাতীয় ব্যাপার ঘটে যায়। শুরুটা তো হয়েছিল এখান থেকে যে, আল্লাহওয়ালাদের লেবাস অবলম্বন কর, তাতে বরকত লাভ

হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে তাতে এত বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়, যদ্দরুন তা ফরয-ওয়াজিবের পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে তাদের পক্ষে সে পোশাক বিদ'আত হয়ে যায়। বিষয়টা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনিন্দনীয় কাজে নিন্দা জানানো একটি নিন্দনীয় কাজ

আব্বাজী (রহঃ) খুব চমৎকার চমৎকার কথা বলতেন। সেসব কথা তিনি শুরুতেই বলে দিতেন তা নয় ; বরং প্রথমে বিভিন্ন উলামা মজলিসে তা পেশ করতেন। বলতেন, আমার ভাবনায় এই বিষয়টা এসেছে। আপনারা চিন্তা ফিকির করে বলবেন এটা সঠিক, না ভুল। আট-দশ মজলিসে যখন তাসদীক হয়ে যেত, যে, কথাটি সঠিক, তারপরই তিনি একটি নীতি হিসেবে তা মানুষের সামনে বয়ান করতেন। সে ধারাতেই তিনি বলতেন, 'অনিন্দনীয় কাজে নিন্দা জানানোই একটি নিন্দনীয় কাজ'। অর্থাৎ শরী'আত অন্যায়, হারাম ও অবৈধ সাব্যস্ত করেনি, এমন কোন কাজ যে ব্যক্তি করে তার নিন্দা-সমালোচনা করা এমনিতেই একটি নিন্দনীয় কাজ, যা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

তারবিয়াত ও গঠন প্রক্রিয়ার অধীন লোকদের ব্যাপার স্বতন্ত্র

এই যে নিয়ম বর্ণনা করা হল, এটা আম সাধারণের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ছাত্র, মুরীদ, সন্তান এবং এরকম আরও যারা তারবিয়াত-প্রশিক্ষণ ও গঠন-প্রক্রিয়ার অধীন, তাদের ব্যাপারটা অন্যান্য লোকদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা অনেক সময় তাদেরকে মুস্তাহাব কাজও নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয় এবং তা ছুটে গেলে নিন্দা-তিরস্কার করা হয়। বস্তুত এর উদ্দেশ্য থাকে তাদেরকে মুস্তাহাব আমলে অভ্যস্ত করে তোলা। নিন্দা-তিরস্কার সে লক্ষ্যেই। কাজেই তাদের নিয়ম ব্যতিক্রম। তারা উপরে বর্ণিত নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই মুস্তাহাব ত্যাগের কারণে পিতা তার সন্তানকে উস্তায তার ছাত্রকে এবং শায়খ তার মুরীদকে তিরস্কার করতেই পারেন। তাতে আপত্তির কিছু নেই।

কিন্তু যারা গঠন প্রক্রিয়ার অধীন নয় সেই আম সাধারণের ক্ষেত্রে নিয়ম ওইটাই, যা বলা হল। আপনি যদি চান তারাও আপনার মত হয়ে যাক বা আপনার ইচ্ছাস্বরূপ হয়ে যাক, তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যেতেই পারে, আপনি খোদা, নাকি খোদার পয়গম্বর ? নাকি প্রত্যেককে নিজের মত করে বানানোর ঠিকাদারী আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন ?

শরীআত যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তার ভেতর থেকে কেউ যদি কোন মুবাহ ও বৈধ কাজ করে তবে সেজন্য তাকে তিরস্কার করার কোন অধিকার আপনার নেই। এবং সেজন্য তাকে খারাপ ভাবারও কোন সুযোগ কারও নেই।

আল্লাহওয়ালাদের অনুকরণ করুন

যা হোক, আল্লাহওয়ালাদের পথ ও পন্থা অবলম্বনে সচেষ্ট থাকা উচিত। এতেই কল্যাণ ও বরকত এবং এতেই নিরাপত্তা। এরই বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মত আখলাক-চরিত্র গঠনেরও তাওফীক দিয়ে দেন। তবে এর জন্য শর্ত হল তা গ্রহণ করতে হবে এ নিয়তে যে, আমরা বাহ্যিক দিক থেকে যখন আল্লাহওয়ালাদের অনুকরণ করব, তখন আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও আমাদেরকে তাদের মত বানিয়ে দেবেন।

পক্ষান্তরে নিয়ত যদি থাকে দৃশ্যত নিজেদেরকে বুযুর্গদের মত বানানো, যাতে লোকে বুযুর্গ মনে করে সম্মান করে এবং তাদের চোখে বিশেষ মর্যাদা লাভ করি, তবে উল্টো ফলের আশংকা আছে। তখন এ ভান-ভনিতা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে। তাই নিয়ত খালেস করা জরুরি। গলত নিয়তের কারণে ভালো কাজও মন্দকাজে পরিণত হয়ে যায়।

বিশেষ বেশ-ভূষা গ্রহণ ভালো নয়

হযরত থানভী (রহঃ) দ্বিতীয় বাক্যে বলেছেন, বিশেষ বেশ–ভূষা গ্রহণ করো না। অর্থাৎ নিজের জন্য বিশেষ লেবাস- পোশাক নির্দিষ্ট করে নেবে না। যেমন আমি সর্বদা এরকম টুপি, এরকম জামা, এরকম পায়জামা, এরকম মোজা ও এরকম জুতা পরব। অতঃপর এর প্রতি এমন সচেতন থাকা যে, এই নির্দিষ্ট পোশাকেই পরিচিত হয়ে উঠবে। সুলূকের পথে এটা ভালো নয়। কেননা এর ফলে মানুষ তার প্রতি অংগুলীনির্দেশ করবে যে, ইনি তার এই বিশেষ পোশাকই সর্বদা পরে থাকেন। ইনি এ ছাড়া অন্য টুপি পরেন না। সাদা শেরোয়ানি ব্যবহার করেন, জুতাও সর্বদা এটাই দেখা যায়, এভাবে মানুষের মধ্যে তার বিশেষ পরিচিতি গড়ে ওঠে, যা বিনয়-নম্রতার পরিপন্থী এবং আমিত্ব বিলোপের পথে অন্তরায়। তাই উচিত যখন যে পোশাক সহজে পাওয়া যায় সেটাই পরবে এবং যাতে আরাম বোধ হয় সেটাই গ্রহণ করবে।

আকবর এলাহাবাদীর ঘটনা

বিখ্যাত কবি আকবার এলাহাবাদী সম্পর্কে আমি আব্বাজী (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, একদিন দেখা গেল তিনি আজব পোশাকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, পরনে লুংগি, গায়ে কলারওয়ালা শার্ট, মাথায় হেট, যেই দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পোশাকের একটার সাথে অন্যটার কোন মিল নেই। লুংগি-শার্ট ও হেটের পারস্পরিক সাদৃশ্য কোথায় ? একজনে তো জিজ্ঞেসই করে বসল, জনাব ! আপনি এটা কেমনতর পোশাক পরলেন ? জবাব দিলেন, এতে সমস্যা কী দেখলে ? ভাই যা পরে আরাম বোধ হয়েছে তাই পরেছি। আমার এখন লুংগি পরে আরাম লাগছিল তাই লুংগি পরেছি। কলারওয়ালা শার্টে আরামবোধ হচ্ছিল তাই এটা পরেছি। মাথায় রোদ লাগছিল, তা থেকে বাঁচার জন্য হেট পরেছি, যাতে শান্তি পেয়েছি তাই পরেছি। তোমাদের সমস্যাটা কোথায় ?

মনমত খাও মনমত পর

প্রবচন চালু আছে, খাবে নিজ পসন্দে আর পরবে অন্যের পসন্দে, নিজের যা খেতে ভালো লাগে, যা তোমার নিজের রুচিসম্মত তাই খাবে' এটা ঠিক নয় যে, ভালো লাগে অন্যের আর খাচ্ছ তুমি। এটা বোকামি। এমনিভাবে পরবে তাই, যা অন্যের পসন্দ। তোমার নিজের হয়ত একটা পোশাক পসন্দ, কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে তা সুন্দর নয়, লোকে তা পসন্দ করে না, তুমি সেই পোশাক পরবে না ; বরং লোকে যা পসন্দ করে সেটাই পরবে। প্রসিদ্ধ তো এরকমই। কিন্তু হযরত থানভী (রহঃ) বলেন, এ প্রবচন সঠিক নয়। বরং খাবে নিজ পসন্দে আর পরবেও নিজ পসন্দে। অর্থাৎ খাওয়া ও পরিধান করা উভয়েরই এক নিয়ম। যে খাবার তোমার রুচিসম্মত তাই খাবে। আর পোশাকও যা তোমার নিজ রুচিসম্মত তাই পরবে। পক্ষান্তরে তোমার নিজের পসন্দ তো এক পোশাক, কিন্তু যুগ বদলে যাওয়ায় ফ্যাশনও বদলে গেছে। ফলে লোকে এখন পসন্দ করছে অন্য পোশাক, তুমি যদি তাদের দেখাদেখি সেই পোশাক পর, যা কিনা তোমার নিজের পসন্দ নয়, তবে তা হবে আহাম্মকি।

যুগের অনুকরণ অপব্যয়কেই অবধারিত করে। কেননা আগে যে পোশাক তৈরি করেছিল, সেটা তো এখন কাজে লাগছে না। ফ্যাশন পাল্টে যাওয়ার কারণে সেটি আর পরতে পারছ না। তাই নতুন কাপড় বানাচ্ছ। এই ফ্যাশনপূজার অবশ্যম্ভাবী ফল হল অপব্যয় ও অপচয়।

দু'টি বিষয় অবলম্বন করুন

হযরত থানভী (রহঃ)-এর বাণী পড়ে বুঝে আসল যে, প্রত্যেক যুগেই উলামায়ে কিরাম ও নেককারদের লেবাস ও তার রীতি-নীতি অনুসরণে সচেষ্ট থাকা উচিত। নিয়ত থাকবে, তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা অবলম্বনের বরকতে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীও আমাকে দান করবেন। সে লেবাস ও তরিকাকে সুন্নত-ওয়াজিব মনে করা কিছুতেই উচিত হবে না। কাজেই অন্য লোকে ভিন্ন কোন লেবাস ও ভিন্ন রীতি-নীতি অবলম্বন করলে এবং তা শরী'আতবিরোধী না হলে সেজন্য তাদের নিন্দা-সমালোচনা করা যাবে না। এবং তাদেরকে খারাপও মনে করা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় বিশেষ কোন রীতি-নীতিকে এমন কঠোরতার সাথে ধরে রাখা যে, কোনও অবস্থায়ই তার ব্যতিক্রম করা হবে না, এটাও কিছু ভালো নয়। বরং যখন সে লেবাস সহজে পাওয়া যায় তা পরতে দ্বিধাবোধ করবে না। একবার একরকম টুপি পরা হয়েছে বলে অন্যবার অন্য টুপি পরা যাবে না এমন কোন কথা নেই। এমনিভাবে একবার এক জুতা পরলে সব সময়ই সেটা ধরার প্রয়োজন নেই। কেননা অতটা গুরুত্ব দিতে গেলে التزام ما لا يلزم অর্থাৎ যা আবশ্যিক নয়, তাকে আবশ্যিক বানিয়ে নেওয়া'-এর বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তা ছাড়া এতে একরকম বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে, যা সরলতা ও বিনয়-নম্রতার পরিপন্থী।

ঋণগ্রহণ হতে বিরত থাকা

হযরত থানভী (রহঃ)-এর দ্বিতীয়, নসীহত হল,

অপ্রয়োজনে কিছুতেই ধার-কার্জ করবে না, যদিও তাতে রসম-প্রথার বিপরীত কাজ করতে হয়। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে অনেক পেরেশানি হয় এবং তার পরিণাম হয় খুব খারাপ। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহওয়ালাদের পথ-ও পন্থা অবলম্বন করা।[২১৪]

এ নসীহতে অপব্যয় থেকে বাঁচার অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বলে দিয়েছেন। তা হল ধার-কর্জ হতে বেঁচে থাক। কঠিন প্রয়োজন ছাড়া ঋণগ্রহণ করবে না। কখনও পেটে পাথর বাঁধতে হলে তাও মেনে নাও, কিন্তু ঋণ কিছুতেই করো না। অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ ঋণ করতে বাধ্য হয়ে

২১৪. আনফাসে 'ঈসা : ১৯২

যায়। তখন তা করলে কোন দোষ নেই। তা হারাম বা নাজায়েয কিছু নয়। কিন্তু মন-মানসিকতা এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে হাত পাততে ঘৃণাবোধ হয়, তা দান-খয়রাতের জন্যই হাত পাতা হোক আর ধার-কর্জের জন্য হাত পাতা হোক।

ব্যয়হ্রাস করা

যখন নিয়ম বানিয়ে নেবে 'কখনও ঋণ করব না' তখন আপনা-আপনিই ব্যয়হ্রাস করতে হবে, খরচ কমাতে হবে। এ অবস্থায় আয় অনুপাতেই ব্যয় করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কেননা তার বেশি খরচ করতে গেলেই ধারের বোঝা বইতে হবে, ব্যস যখন নিয়ম বানিয়ে নিলে ধার করব না কিছুতেই, তখন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে ধার থেকে বেঁচে যাবে।

সামর্থ্য কম অথচ কাজ বেশি

আমাদের সমাজে একটা ব্যাপক ফ্যাসাদ হল সামর্থ্যের বাইরে কাজ ছড়ানো। খরচের নানা খাত বানিয়ে নেওয়া হয়েছে, অথচ সে অনুযায়ী আয় অনেক কম। তা সে ব্যয় কিভাবে মিটাবে ? ব্যস ঋণ করতে থাক। ঋণের পর ঋণ হতে থাকে। এক পর্যায়ে ঋণভারে জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। ঋণ গ্রহণের এই মত্ততা কেবল ব্যক্তিপর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়। এটা এখন এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রই চলছে ঋণের উপর।

চাদর দেখে পা ছড়াও

আগের জমানায় বুযুর্গানে দীন বলতেন, চাদরের বহর দেখে পা বিস্তার কর'। অর্থাৎ আগে দেখে নাও চাদর কত বড়। তারপর সে অনুসারে পা ছড়িয়ে দাও। তার বেশি ছড়াবে তো পা বের হয়ে যাবে। উদলা পায়ে শীতে কষ্ট পাবে। আজকালের নিয়ম হল আগে পা ছড়াও, তারপর সে অনুযায়ী চাদর খোঁজ। কিনতে না পারলে ভিক্ষা কর। পরিণামে আজ গোটা জাতি ঋণগ্রস্ত। এখন তো আমাদের রাষ্ট্রীয় বাজেটের ৪৬% খরচ হয়ে যায় ঋণপরিশোধে। শয়তান এমনই সূদের ফাঁদ পেতে দিয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব এখন তাতে আটকা পড়ে গেছে। কেবল আমাদের দেশই নয়, আমেরিকা পর্যন্ত বিশাল অংকের ঋণের ভেতর ডুবে আছে। তবে ধনী দেশ হওয়ায় বর্তমানে তার বিশেষ প্রভাব পড়ছে না, যেভাবেই হোক উতরে যাচ্ছে, কিন্তু বিষবাষ্পের এ বেলুন এক সময় ফাটবেই। আমাদের দেশ যেহেতু গরীব,

তাই ঋণভারে আমাদেরকে খাবি খেতে হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, আমাদের মান-সম্ভ্রম সব কিছুই সেই চাপের মধ্যে রয়েছে। যা হোক নসীহতের সারকথা হল অকারণে ঋণ করবে না।

ঋণগ্রস্তের জানাযা পড়তে অস্বীকার

হাদীছ শরীফে আছে, একবার জানাযার জন্য জনৈক ব্যক্তির মরদেহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনা হল। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কি কোন দেনা আছে ? তারা জানালেন, তার দেনা আছে। তিনি বললেন,

صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ

তা হলে তোমরাই তার জানাযা পড়। (আমি পড়ছি না)।[২১৫]

অথচ এক মামুলি নারীর জানাযাও তিনি অতি আগ্রহের সাথে পড়েছেন। সে মহিলা 'মসজিদে নববী' ঝাড়ু দিত। কিছুদিন যাবত তাকে দেখা যাচ্ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায় গেল। এক বর্ণনায় তাকে নারী, অন্য বর্ণনায় তাকে পুরুষ বলা হয়েছে। যা হোক সাহাবীগণ জানালেন, তার ইন্তিকাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমাকে জানালে না কেন ? তারা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এমন একটা সময় ছিল যখন জানাযায় হাজির হতে আপনার কষ্ট হত। সেজন্যই আপনাকে জানাইনি। তিনি বললেন, এরূপ করবে না। যখনই কারও ইন্তি কাল হয় আমাকে জানাবে। তারপর বললেন, তার কবর কোথায় ? আমাকে দেখিয়ে দাও। সুতরাং তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং কবরের উপর থেকেই তার জানাযা পড়লেন। তারপর বললেন,

اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْئَةٌ ظُلْمًا فَيُنَوِّرُهَا اللّٰهُ بِصَلَاتِىْ

'এ কবরসমূহ অন্ধকারে ভরা থাকে। আমি জানাযা পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে তা আলোকিত করে দেন।'[২১৬]

এ কারণেই হানাফী আলেমগণ বলেন, কবরে জানাযা পড়া কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষত্ব। অন্য কেউ পড়বে না। কেননা

---

২১৫. বুখারী, হাদীছ নং ২১২৭ ; তিরমিযী হাদীছ নং ৯৮৯ ; নাসাঈ, হাদীছ নং ১৯৩৪ ; আবূ দাউদ, হাদীছ নং ২৯০২ ; ইবন মাজা, হাদীছ নং ২৩৯৮।

২১৬. মুসলিম, হাদীছ নং ১৫৮৮ ; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৬৭৬

ওলী (দায়িত্বশীল) ছাড়া আর কারও জন্য কবরে জানাযা পড়া জায়েয নয়। ওলী যদি আগে জানাযা না পড়ে থাকে, তবে সে কবরে জানাযা পড়তে পারে।

যা হোক, এ হাদীছে দেখা যাচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাধারণ নারীরও কবরে গিয়ে কত আগ্রহের সাথে জানাযার নামায পড়েছেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আর বরকতে কবর আলোকিত করে দেন, অথচ তিনিই কিনা তাঁর সামনে রেখে দেওয়া ব্যক্তির জানাযা পড়তে অস্বীকার করেছেন, যার কারণ ছিল কেবল এই যে, সে ঋণগ্রস্ত ছিল যা তখনও পর্যন্ত আদায় করা হয়নি।

হযরত আবূ কাতাদা (রাযি.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাঁর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সবটা ঋণ ? তিনি বললেন, হাঁ, সবটা ঋণই আমি আদায় করে দেব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়ালেন।

পরিশোধের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ঋণ করলে কেন ?

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন কেন? দৃশ্যত তো সেই ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় বেশি বিপন্ন ছিল। যে কারণে অন্যদের তুলনায় দয়ালাভেরও বেশি উপযুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জানাযা পড়াতে চাইলেন না। বস্তুত এর দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তার যখন পরিশোধ করার সামর্থ্য ছিল না, তখন ঋণ করল কেন ? বোঝা গেল পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করা উচিত নয়। কেননা তাতে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুর আশংকা থাকে আর এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়াটা এমন কঠিন ব্যাপার যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তা ছিল তাঁর হাতে জানাযাপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ, কাজেই যথাসম্ভব ঋণগ্রহণ হতে বিরত থাকা উচিত, বিশেষত বিনাপ্রয়োজনে তো কিছুতেই নয়।

আমাদের সমাজে ঋণের মহামারি

আমাদের সমাজে ঋণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও উদাসীনতার সীমা নেই। বিশেষত দীনদার মহলে এটা এখন মহামারির রূপ লাভ করেছে। এক তো

কথায়-কথায় ঋণ গ্রহণ করা হয়, কতটা দরকার তা চিন্তা করা হয় না। আবার ঋণ নেওয়ার পরে যথাসময়ে পরিশোধের কোন দায় বোধ করা হয় না। বছরের পর বছর চলে যায় কিন্তু ঋণ পরিশোধ হয় না। আর এ কারণেই এখন আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করি যাতে কাউকে ঋণ দিতে না হয়। আল্লাহ তা'আলা সাহায্য-সহযোগিতা করার যতটুকু তাওফীক দিয়েছেন, তা করতে সচেষ্ট থাকি, কিন্তু সহজে ঋণ দেই না। কেননা ঋণ দিলে তা একটা আলাদা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাকে কত দিলে লিখে রাখ। তারপর কখন ফেরত দেবে সেই অপেক্ষায় থাক। ঠিক মত না দিলে তা নিয়ে চিন্তা কর। সে এক উটকো ঝামেলা। সারা জীবনে যত ঋণ দিয়েছি তার অধিকাংশই ফেরত পাওয়া যায়নি। অথচ অনেক ঋণগ্রহীতা বেশ দীনদার, আলেম, এবং বুযুর্গানে দীনের সাহচর্যপ্রাপ্তও বটে। ঋণ নিয়ে চলে গেছে তারপর অদ্যাবধি খবর নেই সে কোথায় আছে।

আজকাল তো গুনাহের কাজেও ঋণ নেওয়া হয়

যা হোক প্রথম কথা হল, ঋণ কেন নেওয়া হবে ? নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কিছুতেই ঋণ করা উচিত নয়। তারপর প্রয়োজনে নেওয়া হলেও যথাসময়ে পরিশোধের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

হযরত থানভী (রহঃ) তাঁর এ বাণীতে বলছেন, 'বিনা প্রয়োজনে কিছুতেই ঋণগ্রহণ করবে না। যদিও তাতে রসম-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়।' যেমন বিশেষ কোনও মওসুম বা উপলক্ষে দাওয়াত খাওয়ানোর প্রথা আছে। কিন্তু তা খাওয়ানোর মত টাকা-পয়সা নিজের কাছে নেই। তা না থাকুক, দাওয়াত খাওয়াতেই হবে। সুতরাং কারও কাছ থেকে ঋণ কর, তো এ ধার করাটা হচ্ছে প্রথাগত দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য, যা সম্পূর্ণ গুনাহের কাজ। হযরত থানভী (রহঃ) বলছেন, প্রথার বিরোধিতা কর তবুও ঋণ করো না।

তারপর বলেছেন, ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে খুব পেরেশান হতে হয় এবং তার পরিণাম খুবই খারাপ। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আল্লাহওয়ালাদের পন্থা অবলম্বন করা।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমলের তাওফীক দান করুন- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সূত্র : ইসলাহী মাজালিস ৫ম খণ্ড, ১২৪-১৬৪